

সংগ্রহে: আরাফাত মাহমুদ (আকাশ)

01762893415

01521468238

॥ ৪ ॥

‘আপনি ত দাঁকি মশাই একটি বাঘছাল বাগাবেন বলে মনে হচ্ছে। আর আমি?’

একটু যেন মনমরা হয়েই কথাটা বললেন লালমোহনবাবু। আমাদের খাওয়াদাওয়া হয়েছে প্রায় ঘণ্টাখানেক হল। তারপর নিচে বৈঠকখানায় বসে মহীতোষবাবুর কাছে নানা রকম জোমহর্ষক শিকারের গল্প শুনে এই কিছুক্ষণ হল নিজেদের ঘরে এসেছি। লালমোহনবাবুর কথায় ফেলুদা বলল, ‘কেন? যে-ই সমাধান করবে সংকেতটার সে-ই বাঘছাল পাবে। অন্তত পাওয়া উচিত। কাজেই আপনিও তাল ঠুকে লেগে পড়তে পারেন। আপনিও সাহিত্যিক মানুষ, ভাষার উপর বেশ দখল আছে।’

‘আরে মশাই, ভাষার উপর দখল মানে কি আর সংকেতের উপর দখল? মহীতোষবাবুও ত সাহিত্যিক। উনি হাল ছেড়ে দিলেন কেন? না মশাই, ওসব মড়ো বড়ো গাছ মাছ, তাল ফাঁক ছুঁই ফাঁক —ওসব আমার স্মার হবে না। আপনার ভাগ্যেই ঝুলছে বাঘছাল। এই এইটে দেবে নাকি?’

লালমোহনবাবু মেকেয় রাখা বাঘছালটির দিকে আঙুল দেখালেন। ফেলুদা বলল, ‘ভুল্লোক বড় বাঘের কথা বললেন শুনলেন না? ওসব চিতাচিতায় আমার কোনো ইন্টারেস্ট নেই।’

ফেলুদা এর মধ্যেই ছড়াটা খাতায় লিখে নিয়েছে, আর খাটে বসে সেটার দিকে একদৃষ্টে দেখছে।

‘কিছু এগোলেন?’ লালমোহনবাবু জিজ্ঞাস করলেন।

ফেলুদা খাতার পাতা থেকে চোখ না তুলেই বলল, ‘গদ্যস্তম্ভের সংকেত সে বিষয় কোনো সন্দেহ নেই।’

‘কী করে বুঝলেন? ওই মড়ো-বড়োর ব্যাপারটা কী?’

‘সেটা এখনো জানি না, তবে একটা গাছের কথা যে বলা হচ্ছে তাতে ত কোনো সন্দেহ নেই। মড়ো হর বড়ো গাছ। তারপর বলছে হাত গোন ভাত পাঁচ। এখানে হাতটা ইম্পোর্ট্যান্ট। সাধারণত এসব সংকেত প্রথমে একটা বিশেষ জায়গার কথা বলে, তারপর সেখান

থেকে কোনদিকে কতদূরে গেলে গদুস্তথন পাওয়া যাবে সেটা বলে। রবীন্দ্রনাথের গদুস্তথন পড়েননি? তেঁতুল বটের কোলে দক্ষিণে যাও চলে, ঈশান কোণে ঈশানি বলে দিলাম নিশানি? তেমনি এখানেও হাত কখাটা পাচ্ছি, দিক কখাটা পাচ্ছি। এই জনোই বলছি—’

ফেল্দুদার কথাটা শেষ হল না, কারণ ঘরে আরেকজন লোক ঢুকে পড়েছে।

দেবতোষ সিংহরায়।

সকালের সেই বেগুনী ড্রেসিং গাউনটা এখনো পরা, আর চোখে সেই অশুভ চাহনি, যেন মনে হয় সকলকেই সম্মেহ করছেন। দেবতোষবাবু সোজা লালমোহনবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘তোমরা কি ভোটরাজ্য লোক?’

লালমোহনবাবু ফ্যাকাশে হয়ে ঢোক গিলে বললেন, ‘ভু-ভোট মানে কি আপনি ভু-ভোটং—মানে, ই-ইলেকশনের—?’

‘না, উনি বোম্বেয় ভূটান রাজ্যের কথা বলছেন।’

ফেল্দুদা কথাটা বলার দেবতোষবাবুর দৃষ্টি ফেল্দুদার দিকে ঘুরে গেল, আর তার ফলে লালমোহনবাবু একটা বিতী অবস্থা থেকে উদ্ধার পেয়ে গেলেন।

‘শুনছিলাম ভোটেরা নাকি আবার আসছে?’ দেবতোষবাবু প্রশ্নটা ফেল্দুদাকেই করলেন। ফেল্দুদা খুব স্বাভাবিকভাবেই উত্তর দিল, ‘সেরকম ত শুনিনি। তবে আত্মকাল ইচ্ছে করলে ভূটান যাওয়া যায়।’

‘ও, তাই বুঝি।’

মনে হল দেবতোষবাবু এই প্রথম খবরটা শুনলেন।

‘তা বেশ। উপেন্দ্রকে ভোটরাজ্য অনেক হেল্প করেছিল। ওরা ছিল বলেই নবাবের সেনা কিছু করতে পারেনি। ওরা যুদ্ধটা জানে। সবাই জানে কি?’ দেবতোষবাবু একটা নীচনিশ্বাস ফেললেন। তারপর বললেন, ‘হাতিয়ার কি আর সবাইয়ের হাতে বাগ মানে? সবাই কি আর আদিত্যনারায়ণ হয়?’

কথাটা বলে দেবতোষবাবু দরজার দিকে ঘুরে দু’পা এগিয়ে গিয়ে ধেমে গেলেন। তারপর মৃদু ঘুরিয়ে মেঝের বাঘটার দিকে চেয়ে একটা অশুভ কথা বললেন।

‘যুঁধিষ্ঠিরের রথের চাকা মাটি ছুঁত না। তাও শেষটায় ছুঁল।’

ভুললোক চলে যাবার পর আমরা কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। তারপর ফেল্দুদা বিভ্রিবিড় করে বলল, ‘খড়ম পরেছে। তাতে

এর পর রাস্তার পর পর অনেকগুলো ঘটনা ঘটল। সেগুলো ঠিক মতো লেখার চেষ্টা করছি। বাইরে বারান্দায় সিঁড়ির দরজার পাশে একটা গ্র্যান্ডফাদার ক্লক থাকার দরুন ঘটনার সময়গুলো আন্দাজ করতে অসুবিধা হয়নি।

প্রথমেই বলে রাখি যে যদি বালিশ তোকের দিক থেকে শোবার কাম্বা ভালো হলেও, একটা ব্যাপারে গন্ডগোল হয়ে যাওয়াতে প্রথম রাস্তারে ঘুমটা একদম মাটি হয়ে গিয়েছিল। তার কারণ আমাদের তিনজনের মশারিতেই ছিল ফুটো। মশারি ফেলার দশ মিনিটের মধ্যে ভেতরে মশা ঢুকে কামড় আর খিনখিনুনির জ্বালায় আমাদের ঘুমের বারোটা বাজিয়ে দিল। ফেলদার সঙ্গে ওডোমস থাকে, শেষটায় তাই মেখে কিছুটা আরাম পাওয়া গেল। বাইরের ঘড়িতে তখন ৫৭ ৫৮ করে এগারোটা বেজেছে। দিনের বেলা মেথলা থাকলেও এখন জানালা দিয়ে চাঁদের আলো আসছিল। সবোচ্চ চোখের পাতাটা বৃদ্ধে এসেছে এমন সময় একটা চেনা গলার ধমকের সুরে কথা এল।

‘আমি শেষবারের মতো বলছি—এর ফল ভালো হবে না।’

গলাটা মহীতোষবাবুর। উত্তরে কে যে কী বলল তা বোঝা গেল না। তারপরে সব চুপচাপ। আরার বাঁ দিকে লালমোহনবাবুর মশারির ভিতর থেকে নাক ডাকার শব্দ শ্রব হচ্ছিল। আমি ডান পাশে ফেলদার খাটের দিকে ফিরে চাপা গলায় বললাম, ‘শুনলে?’

গম্ভীর ফিসফিসে গলায় উত্তর এল, ‘শুনছি। ঘুমো।’

আমি চুপ করে গেলাম।

তার কিছুক্ষণের মধ্যেই বোম্বইর ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুমটা যখন ভাঙল তখনো ঘরে চাঁদের আলো রয়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গে মেঘের গর্জনেও শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। একটা লম্বা গুড়গুড়ানি থামলে পর আরেকটা শব্দ কানে এল। ঘুট ঘুট... ঘুট ঘুট... ঘুট ঘুট...। তালে তালে একটানা শব্দ নয়। মাঝে মাঝে হচ্ছে, মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছে, আর মাঝে মাঝে মেঘের গর্জনে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। শব্দটা হচ্ছে বেশ কান্না থেকেই। আমাদের ঘরের ভিতরেই। ফেলদার খাটের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে কান পাততেই ওর জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ার শব্দ পেলাম। ও ঘুমোচ্ছে।

কিন্তু লালমোহনবাবুর নাক ডাকা বন্ধ কেন? ওর খাটের দিকে চেয়ে ডবল মশারির ভিতর দিয়ে কিছুই দেখতে পেলাম না। কিন্তু

একটা ক্ষীণ শব্দ যেন আসছে খাটের দিক থেকে। এটা আমার চেনা শব্দ। বাক্স-রহস্যের ব্যাপারে সিমলার বরফের মধ্যে একটা পিস্তলের গুলি লালমোহনবাবুর পায়ের কাছে এসে পড়ায় তার দাঁতে দাঁত নেগে ঠিক এই শব্দটাই হরেছিল।

সেই সঙ্গে আবার সেই শব্দটা কানে এল। ঘুট ঘুট... ঘুট ঘুট... ঘুট ঘুট...

আমি ঘাড় কাত করে মেঝের দিকে চাইলাম। ফলে মশারিটা একটু নড়ে ওঠাতে বোধহয় লালমোহনবাবু বুঝলেন আমার ঘুম ভেঙে গেছে। একটা বিকট চাপা ঘড়ঘড় শব্দে তিনি বলে উঠলেন, 'ত-ভপেশ—বা-বাঘ!'

বাঘ শুনেই আমার চোখ মেঝের বাঘছালাটার দিকে চলে গেল, আর যেতেই যা দেখলাম তাতে আমার রক্ত জল হয়ে গেল।

জ্যোৎস্নার আলো বাঘের মাথাটার উপর পড়েছে, আর স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি মাথাটা মাঝে-মাঝে এদিক-ওদিক নড়ে উঠছে, আর তার ফলেই ঘুট ঘুট শব্দ হচ্ছে।

আর থাকতে না পেরে যা থাকে কপালে করে ফেলুদার নাম ধরে একটা চাপা চিৎকার দিয়ে উঠলাম। ফেলুদার ঘুম যতই গাঢ় হোক না কেন, ও সব সময় এক ডাকে উঠে পড়ে, আর ওঠামাত্র ওর মধ্যে আর ঘুমের লেশমাত্র থাকে না।

'কী ব্যাপার? চাঁচাচ্ছিস কেন?'

আমারও প্রায় লালমোহনবাবুর মশা। কোনো রকমে ঢোক গিলে বলে ফেললাম, 'মেঝে... বাঘ।'

ফেলুদা মশারির ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে বাঘটার নড়ন্ত মাথাটার দিকে একদৃষ্টে খানিকক্ষণ দেখে নিল। তারপর দিবা নিশ্চিন্তভাবে এগিয়ে গিয়ে বাঘের খুঁতনিটা ধরে উপরে তুলতেই তার নিচ থেকে একটা গুবরে পোকা বেরিয়ে পড়ল। ফেলুদা অস্বাভাবিক সোটাঁকে দূর আঙুলের চাপে তুলে নিয়ে বলল, 'গুবরের আসন্ন শক্তির কথাটা কি তোরদের জানা নেই? একটা কীসার জাম্বাটি চাপা দিয়ে রাখলে সেটাকে সুস্থ টেনে নিয়ে সারা বাড়ি চক্কর দিতে পারে।'

ভয়ের কারণটা এত সামান্য জানলে অবিশ্যি ঘামটাম আপনা থেকেই শরিকিয়ে যায়। আমার আর লালমোহনবাবুরও তাই হল। এদিকে ফেলুদা গুবরেটাকে নিয়ে জানালার বাইরে ফেলে দিয়ে দেখি সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। এই গভীর রাত্তিরে ফেলুদা কী দেখছে সেটা ভাবছি, এমন সময় ও ডাক দিল, 'ভোপসে, দেখে যা।'

আমি আর লালমোহনবাবু ফেলদুদার পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম।

আগেই বলেছি পশ্চিম দিকটা বাড়ির পিছন দিক, আর এদিক দিয়েই কালবুর্নির জঙ্গল দেখা যায়। এই ক'মিনিটের মধ্যেই আলো মেঘে চাঁদ ঢেকে ফেলেছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকটিছিল বটে, কিন্তু তা ছাড়াও আরেকটা আলো দেখে অবাক লাগল। আলোটা মনে হল জঙ্গলের ভিতর ঘোরাফেরা করছে। টেরে আলো।

'হাইলি সার্পিশাস', ফিসফিস করে বললেন লালমোহনবাবু।

আলোটা এবার নিবে গেল।

এবার একটা চোখ ধাঁধানো বিদ্যুতের সঙ্গে সঙ্গে একটা কানফাটা বাজের আওয়াজ, আর তার পরমুহূর্তেই বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা শুরু হয়ে গেল। পশ্চিম দিক থেকেই ছাঁট, তাই দূটো জানালারই শার্পি বন্ধ করে দিতে হল। ফেলদুদা বলল, 'একটা বেজে গেছে, শুরুর পড়। কাল সকালে আবার জল্পেশবরের মন্দির দেখতে যাবার কথা আছে।'

আমরা তিনজনেই আবার মশারির ভিতর ঢুকলাম।

জানালায় রঙীন কাচ থাকার ফলে বিদ্যুৎ চমকালেই ঘরে রাম-ধনুর রঙ খেলছিল। সেই রঙ দেখতে দেখতেই আবার কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম তা টেরই পাইনি।

পরদিন সকালে সূর্য ডাঙল প্রায় সাতটায়। ফেলদা অবিশ্বাসে তার আগেই উঠে যোগবায়াম, দাঁড়ি কামানো-টামানো সব সেরে ফেলেছে। কথা আছে, তুড়িৎবাবু আটটায় এসে আমাদের নিয়ে জম্পেশবরের মন্দির দেখিয়ে আনবেন। মহীতোষবাবুর তিনজন চাকরের মধ্যে যার নাম কানাই, সে আমাদের চা দিয়ে গেল সাড়ে সাতটার কিছু পরে। ফেলদা চায়ের কাপ হাতে নিয়ে কোলের উপর রাখা খোলা খাতাটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে প্রায় আপন মনেই বলে উঠল, 'ধনি আদিত্যনারায়ণ। তুখোড় বুদ্ধি বলতে হবে।'

লালমোহনবাবু চক্ৰ শব্দ করে চারে একটু চুমুক দিয়ে বললেন, 'বাবু, ফাস্ট ক্লাস চা!—আরো এগোলেন বুদ্ধি?'

ফেলদা সেইভাবেই বিড়বিড় করে বলল, 'হাত গোন ভাত পাঁচ। ভাত হল অন্ন আর পাঁচ হল পণ্ড। দুটোকে উলটিয়ে নিয়ে সন্ধি করে হল পণ্ডাম। অর্থঃ পণ্ডাম হাত। বাঃ!...কিন্তু কিসের থেকে পণ্ডাম হাত? বড়ো গাছ কি? তাই হবে...তাই হবে...'

'ফেলদার গলা মিলিয়ে এল। আমার মন বলছে, ও দু'দিনের মধ্যেই সংকেতের সমাধান করে ফেলবে, আর বাঘছালটা পেয়ে যাবে।'

বারান্দার ঘড়িতে কিছুক্ষণ আগেই আটটা বেজে গেছে, কিন্তু তুড়িৎবাবু এখনো আসছেন না কেন? ফেলদার কিন্তু সেদিকে ত্রুক্ষেপই নেই। সে এক মনে সংকেত নিয়ে ভেবে চলেছে, আর মাঝে মাঝে বিড় বিড় করে উঠছে।

'ঠিক ঠিক জবাবে...ঠিক ঠিক জবাবে...। কিসের জবাব? প্রশ্নটা কই যে তার জবাব হবে? দিক পাও ঠিক ঠিক জবাবে...ঠিক ঠিক জবাবে...'

এবার ফেলদার বিড়বিড়ানি বন্ধ হবার আগেই দরজায় টোকা দিয়ে ঘরে একজন লোক ঢুকে পড়ল। তুড়িৎবাবু নন। শশাঙ্কবাবু।

'আপনারা—ইয়ে—চা খাচ্ছেন? ও...'

সদুলোকের চেহারা দেখেই মনে হল কিছু একটা হয়েছে। ফেলদা খাতা রেখে উঠে পড়ল।

‘কী ব্যাপার বলুন ত?’

শশাঙ্কবাবু গলা খকারিয়ে কেমন যেন অনামনস্কভাবে বললেন—
‘একটা দুঃসংবাদ আছে। ভীষণ, মানে মহাতোষের সেক্রেটারি, মারা
গেছে।’

‘সে কী? কী হয়েছিল? কাল রাতেও ত...’

কথাটা বলল ফেলুদা, কিন্তু আমরা তিনজনেই সমান হতভম্ব।
শশাঙ্কবাবু বললেন, ‘কাল রাতে কালবুনির দিকে গিয়েছিল—কেন
জানি না—এই একটুক্ষণ আগে তার মৃতদেহ পাওয়া গেছে। এক
কাঠুরে দেখতে পায়, আর দেখেই এসে খবর দেয়।’

‘কী ভাবে মারা গেলেন?’

‘কাঁধের অনেকখানি মাংস নাকি খেয়ে গেছে। বাঘ বলেই ত মনে
হচ্ছে।’

ম্যানস্ফোর্ড! আমার হাত-পা আবার ঠান্ডা হয়ে আসছে। লাল-
মোহনবাবু ঘরের মাকখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিন পা পিছিয়ে গিয়ে
টোবলে ভর করে দাঁড়ালেন। ফেলুদার মূর্খের ভাব অদ্ভুত রকম
গম্ভীর।

শশাঙ্কবাবু বললেন, ‘আপনারা এলেন, আর তার মধ্যে এই
দুর্ঘটনা। বুঝতেই পারছেন, আমাদের এখন এই নিরে একটু ব্যস্ত
ধাকতে হবে। এখনই, মানে, একবার যেতে হবে আর কি।’

‘আমরাও যেতে পারি কি?’

শশাঙ্কবাবু প্রশ্নটা শুনে ফেলুদার দিকে একবার দেখে তারপর
আমাদের দুজনের দিকে এক বলক দৃষ্টি দিয়ে বললেন, ‘আপনি ত
গোয়েন্দা মানুষ, আপনার এসব অভ্যাস আছে, কিন্তু এ’রা...’

‘ওরা গাড়িতেই থাকবে।’

ভদ্রলোক রাজী হয়ে গেলেন। বললেন, ‘তাহলে আপনারা তৈরি
থাকলে চলে আসুন। দুটো জীপ আছে, একটাতে না হয় আপনারা
তিনজন যাবেন।’

‘বন্দুক থাকবে কি সঙ্গে?’

প্রশ্নটা আমিও করতে পারতাম, কিন্তু করলেন লালমোহনবাবু।
অন্য সময় এ ধরনের প্রশ্ন শুনে হরমুখ শশাঙ্কবাবু হেসে ফেলতেন,
কিন্তু এখন গম্ভীর ভাবেই বললেন, ‘থাকবে। দিনের বেলা এমনিতে
ভয় নেই, তবু থাকবে।’

জীপে করে জঙ্গলের দিকে যেতে যেতে এই ভয়ঙ্কর ঘটনাটার



কথা ভাবছিলাম। কালই ডব্রলোক আমার সঙ্গে এত কথা বললেন, আর রাতারাতি তাকে বাঘে খেল? এত রাত্তিরে কী করছিলেন উনি জঙ্গলের মধ্যে? তাহলে কি কাল রাত্তিরে যে আলোটা দেখেছিলাম সেটা ডাঙিংবাবুই টেচের আলো?

আমাদের জুপিঁর সামনে আরেকটা জুপিঁ চলেছে। তাতে রয়েছেন মহীতোষবাবু, শশাঙ্কবাবু, এখানকার বনবিভাগের একজন কর্মচারী মিস্টার দত্ত, শিকারী মাধবলাল, আর যে লোকটা তুড়িৎবাবুর মৃতদেহ দেখতে পেরেছিল সেই কাঠুরে। মহীতোষবাবুকে কাল রাতেই হৈ হৈ করে শিকারের গল্প বলতে শুনিয়েছিলাম, আর আজ দেখে মনে হল এক রাস্তিরে তার দশ বছর বয়স বেড়ে গেছে। সেটা শুধু সেক্রেটারির মৃত্যুর জন্য, না ম্যানিটোর আছে এটা প্রমাণ হবার জন্য, তা অর্বিশা বুঝতে পারলাম না।

জঙ্গলের ভিতরে খুব বেশি দূরে যেতে হল না। বড় রাস্তা থেকে ঘুরে মিনিট পাঁচেক যাবার পর আমাদের সামনের জুপিঁটা থামল। রাস্তার দু'দিকে শাল আর স্বেগুন গাছ, আর তা ছাড়া আমার চেনার মধ্যে শিমুল, নিম, একটা প্রকাণ্ড কাঁঠালগাছ আর কয়েকটা বাঁশঝাড়। কাল রাতে যে বৃষ্টি হয়েছে তার ছাপ রয়েছে চারিদিকে। এখানে ওখানে ছোট ছোট গর্ত আর খানাখন্দের মধ্যে জল জমে রয়েছে।

জুপিঁ থামার সঙ্গে সঙ্গেই ফেলদা বলল, 'ওই দ্যাখ।'

ও যেদিকে আঙুল দেখাল সেদিকে বেশ খানিকক্ষণ চেয়ে থাকার পর দূরের একটা বাঁশঝাড়ের ধারে একটা কোপের পিছনে হাল্কা সবুজ রঙের যে জ্বিনিসটা চোখে পড়ল সেটা আমার চেনা। ওটা তুড়িৎবাবুর শার্ট। কাল রাতে ভদ্রলোক ওই শার্টটাই পরেছিলেন।

সামনের জুপিঁ থেকে সবাই নেমেছে। কাঠুরে লোকটা এগিয়ে গেল। তার পিছনে চললেন মহীতোষবাবু ও বাকি তিনজন। ফেলদাও জুপিঁ থেকে নেমে বলল, 'তোরা গাড়িতে থাক। এ দৃশ্য তোদের ভালো লাগবে না।'

যেখানে তুড়িৎবাবুর মৃতদেহ পড়ে আছে সে জায়গাটা আমাদের জুপিঁ থেকে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ হাত দূরে। কিন্তু জঙ্গল এত নিম্নতল বলেই বোধহয় সকলের কথাবার্তা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম। যার মূখে না শুনলাম তা পর পর লিখে যাচ্ছি।

বাঁশঝাড়টার ধারে পৌঁছে প্রথম কথা বললেন মহীতোষবাবু। শুধু দুটো কথা—'মাই গড!'—আর সেই সঙ্গে তাঁর ডান হাতের তেরোটা মিয়ে কপালে একটা আঘাত করলেন।

এবার মিস্টার দত্ত মৃতদেহটার দিকে এগিয়ে গেলেন, আর তার পরেই তাঁর কথা শোনা গেল।

'এই বৃষ্টিতে বাঘের পায়ের ছাপ খোঁজার চেষ্টা বৃথা। কিন্তু

বাঘ বলেই 'ত মনে হচ্ছে ! তাই নয় কি ?'

মহীতোষবাবু—'নিঃসন্দেহে !'

মিস্টার দত্ত—'কাল বৃষ্টি থেমেছে দুটোর পর। যেভাবে রক্ত ধুয়ে গেছে তাতে মনে হয়, খাওয়ার ব্যাপারটা বৃষ্টির আগেই সেরে ফেলেছে।'

ফেলুদা—'ম্যানসিটার কি যেখানে মানুষ মারে, সেখানেই খাওয়ার কাজটা সারে ? অনেক সময় ওরা শিকার মূখে করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যায় না ?'

মহীতোষবাবু—'তা তো বটেই। তবে আপনি যদি আশা করেন যে, মাটিতে বসে টেনে আনার দাগ থাকবে, নেটার বিশেষ সম্ভাবনা নেই। এমনিতেই বৃষ্টিতে দাগ মূছে যাবে। তাছাড়া একটা মানুষের দেহ বাঘ মূখে করে এমনভাবে নিয়ে যেতে পারে যে, সে দেহ মাটি টাচই করবে না। সুতরাং তর্জিককে কোথায় ধরেছিল বাঘে সেটা বোধ-হয় জানা যাবে না।'

ফেলুদা—'তর্জিকবাবুর চশমাটা কোথায় পড়েছে সেটা জানতে পারলে হয়ত...'

এরপর কিছুক্ষণ কারুর মুখেই কোনো কথা নেই। শশাঙ্কবাবু বোধহয় বাঘের পায়ের ছাপ খোঁজার জন্য এদিক ওদিক দেখছেন। ফেলুদা এখনো মৃতদেহের কাছেই রয়েছে। মিস্টার দত্ত মাধবলালকে কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় আবার ফেলুদার গলা পাওয়া গেল।

ফেলুদা—'বাঘ কি কেবল একটোমাত্র নখের সাহায্যে একটা গভীর আঁচড় দিতে পারে ?'

মহীতোষবাবু—'হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন ?'

ফেলুদা—'আপনারা বোধহয় লক্ষ্য করেননি—তর্জিকবাবুর বৃকের কাছে একটা গভীর ক্ষতচিহ্ন রয়েছে। শার্ট ভেদ করে একটা ধারালো জিনিস তার শরীরের মধ্যে ঢুকেছে। আপনারা এইখানে এলেই দেখতে পাবেন।'

কথাটা বলা মাত্র সকলে বাস্তবভাবে তর্জিকবাবুর মৃতদেহের দিকে এগিয়ে গেল। তারপর মহীতোষবাবুর গলা পেলাম।

মহীতোষবাবু—'সর্বনাশ ! এ যে খুন ! এ তো বাঘের আঁচড় নয়। তর্জিককে খুন করা হয়েছিল। তারপর তার মৃতদেহ বাঘে টেনে নিয়ে আসে। কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার !'

ফেলুদা—'খুন বা খুনের চেষ্টা। ছত্রির আঘাতেই তর্জিকবাবুর

মৃত্যু হয়েছিল কিনা সেটা এখনো বলা শক্ত। হয়ত তাকে জখম করে আততায়ী পালান। জখম অবস্থাতে স্বভাবতই বাঘের কাজটা আরো সহজ হয়ে গিয়েছিল। যে অস্ত্র দিয়ে এই কুকর্কীর্তিটা করা হয়েছে, সেটা খোঁজার চেষ্টা করা দরকার।’

মর্গীভোষবাবু—‘শশাঙ্ক, তুমি একদিন পুর্লিশে খবর দাও।’

কন্দুক হাতি মাধবলালকে ডিঙিবাবুর মৃতদেহের পাশে পাহারা রেখে আত্মসবাই জীপে ফিরে এল। ফেলদাদাকে এত গম্ভীর অনেকদিন দেখিনি। ফেরার পথে ও একটাও কথা বলল না। আমাদেরও কথা বলার মতো মনের অবস্থা ছিল না। বনের মধ্যে একপাল হরিণকে ছুটতে দেখেও মনটা নেচে উঠল না। লালমোহনবাবু এর আগেও আমাদের সঙ্গে গিয়ে কাটা দেওয়া অবস্থায় পড়েছেন, কিন্তু ওকে এমন ফ্যাকাসে হয়ে যেতে দেখিনি কখনো। কোনো জায়গায় বেড়াতে এসে আচমকা রহস্যের মধ্যে জড়িয়ে পড়ার ঘটনা ফেলদাদার জীবনে এর আগেও ঘটেছে, কিন্তু এভাবে নয়। এখানে ত শব্দ খুন নয় বা রহস্য নয়, তার উপরে আবার মানুষখেকো !

শশাঙ্কবাবু খবর দেওয়াতে কিছুক্ষণের মধ্যেই ফেলপাইগর্ডি থেকে পদলিশের লোক এসে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে। এখন বিকেল পাঁচটা। আজ আকাশ পরিষ্কার। আমরা মহীতোষবাবুর নিচের বাগানের অশুভ্র জালো চা বেয়ে ঘরে বসে আছি। ফেলদা ছুঁচকে পায়চারি করছে, মাঝে মাঝে আঙুল মটকাচ্ছে, আর মাঝে মাঝে একটা চারমিনার ধরিয়ে দ' চারটে টান দিয়েই টেবিলের উপর রাখা শিতলের ছাইদানিটার ফেলে দিচ্ছে। লালমোহনবাবু ইতিমধ্যে বার তিনেক মাটিতে শোয়ানো বাঘের মাথাটা পরীক্ষা করেছেন; বিশেষ করে নীতগলো।

‘ভুল্লোকের সঙ্গে যদি আরেকটু আলাপ করার সুযোগ হত।’

ফেলদা এ কথাটা আপন মনে আরো কয়েকবার বলেছে। সত্যি, ভীড়বাবুকে ডালো করে চেনার আগেই তিনি খুন হয়ে গেলেন। খুনের কারণ কী হতে পারে, ভীড়বাবুর সঙ্গে কারুর শত্রুতা ছিল কি না, এই সব না জানলে পরে ফেলদার পক্ষে রহস্যের কিনারা করা অশকিল হবে নিশ্চয়ই।

বারান্দার ঘাড়িতে পাঁচটা বাজার কয়েক মিনিট পরেই মহীতোষবাবুর একজন চাকর—যার নাম জানি না—এসে খবর দিল, নিচের বৈঠকখানায় আমাদের ডাক পড়েছে।

আমরা তিনজনে বেশ বাস্তবাবেই নিচে গিয়ে হাজির হলাম। মহীতোষবাবু আর শশাঙ্কবাবু ছাড়াও আরেকটি ভুল্লোক সোফায় বসে আছেন। পোশাক দেখে বুঝলাম ইনি পদলিশের লোক। মহীতোষবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন—

‘ইনি ইনস্পেক্টর বিশ্বাস। আপনিই প্রথম ফতীহটা দেখে খুনের কথাটা বলেছেন জেনে আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চাইলেন।’

ফেলদা নমস্কার করে মিস্টার বিশ্বাসের উলটো দিকে সোফাটায় বসল, আমরা দুজন একটু দূরে আরেকটা সোফায় বসলাম।

মিস্টার বিশ্বাসের গায়ের রং রীতিমতো কালো, মাথায় চকচকে টাক, যদিও বয়স বোধহয় চল্লিশ-টাল্লিশের বেশি নয়। সরু একটা

গোফিও আছে, তার দুটো দিক আবার লম্বায় সমান নয়। ছাটিবার সময় বোধহয় একটু অসাবধান হয়ে পড়েছিলেন। ভদ্রলোক তাঁক-দৃষ্টিতে ফেলদাদার দিকে দেখে বললেন, 'আপনি শুনলাম শখের ডিটেকটিভ।'

ফেলদাদা একটু হেসে ব্যাখ্যায় দিল, কথাটা ঠিক।

বিশ্বাস বললেন, 'আপনাদের আর আমাদের মধ্যে তফাতটা কোথায় জানেন ত? আপনারা কোথাও গেলে পরে সেখানে খুন হয়, আর আমরা কোথাও খুন হলে পরে সেখানে বাই।' কথাটা বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হো হো করে হেসে উঠলেন ইনস্পেক্টর বিশ্বাস।

ফেলদাদা আর কথা না বাড়িয়ে একেবারে কাজের কথায় চলে গেল। বলল, 'খুনের অস্টো পাওয়া গেছে কি?'

বিশ্বাস হাসি খামিরে মাথা নেড়ে বললেন, 'না। তবে খোজা হচ্ছে। জঙ্গলের মধ্যে থানাতল্লাসীর ব্যাপারটা কিরকম কঠিন সে ত বুঝতেই পারছেন। তার উপর আবার ম্যানমিটার। পুলিশরাও তো মানুস—জানে, ম্যান—বুঝলেন ত? হোঃ হোঃ হোঃ।'

বিশ্বাস মশাই এত হাসছেন দেখে ফেলদাদাও যেন জোর করেই একটু হেসে আবার গম্ভীর হয়ে বলল, 'ছুরির আঘাতেই মরেছিলেন কি ডিঙিবাবু?'

বিশ্বাস বললেন, 'সেটা ত অল্প এখন বোকবার উপায় নেই। লাসের বা অবস্থা, এমনিতেই বাঘে খেলে গেছে অনেকটা। তার উপর এই পরম; পোস্ট মর্টেমে কোনো ফল হবে বলে মনে হয় না। আসল কথা হচ্ছে—কোনো ব্যক্তি ডিঙিবাবুকে কোনো ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে খুন করেছিল, বা খুন করার চেষ্টা করেছিল। তারপর বাঘে কী করেছে না করেছে সেটা আমাদের কনসার্ন না। তার জন্য যা স্টেপ নেবার সেটা নেবেন মিস্টার সিংহরায়।'

মহীতোষবাবু গম্ভীরভাবে মেঝের কার্পেটের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এর মধ্যেই অশপাশের গ্রামে প্যানিক আরম্ভ হয়ে গেছে। আমার লোকও ত জঙ্গলে কাঠ কাটার কাজ করে। আরো দু' মাস কাজ রয়েছে, তারপর বর্ষা নামলে বন্ধ। অবস্থা গুরুতর সেটা বুঝতে পারছি। কিন্তু ডিঙিকে এভাবে আক্রমণ করল কে এবং কেন, সেটা না জানা অবধি আমি অন্য কিছু ভাবতেই পারছি না। অর্থাৎ আমিই ত আর একমাত্র শিকারী নই এ অঞ্চলে। বনবিভাগ থেকে শিকারীর ব্যবস্থা করা কঠিন হবে না।'

মিস্টার বিশ্বাস গলা খাকরিয়ে একটু মড়ে বসে বললেন, 'আমার কাছে রহস্য একটাই—এত রাত করে জঙ্গলে গেলেন কেন আপনাদের তড়িৎবাবু। খুনের একটা খুব সহজ কারণ থাকতে পারে। তড়িৎ-বাবুর পকেটে কোনো মানিব্যাগ বা টাকা-পয়সা পাওয়া যায়নি। তার ঘর খুঁজে সেখানেও পাওয়া যায়নি। এ অঞ্চলে গন্ডা বদমাইসের ত অভাব নেই। এ অঞ্চলে কেন বলাছি—সারা দেশেই নেই—হোঃ হোঃ হোঃ। তাদেরই কেউ এ কুকীর্তিটা করে থাকতে পারে। স্রেফ রাহাজানি আর কি।'

ফেলুদা একটা সিগারেট ধরিয়ে শান্তভাবে বলল, 'মাঝ রাত্তিরে জঙ্গলের মধ্যে তড়িৎবাবুর মতো একজন নিরীহ লোকের কাছ থেকে টাকা বার করে নিতে কি ছুরি মারার দরকার হয়? মাঝায় একটা লাঠির বাড়ি মেরেই কার্যসিদ্ধি হয় না কি?'

বিশ্বাস কান্টহাসি হেসে বললেন, 'তা হরত হয়। কিন্তু তড়িৎ-বাবুকে খুন করার অন্য কী কারণ থাকতে পারে বলুন। খোঁটিতটা কোথায়? তড়িৎবাবু ছিলেন মিস্টার সিংহরায়ের সেক্রেটারি, লেখা-পড়া নিয়ে থাকতেন, পাঁচ বছর হল এখানে এসেছেন, কারুর সঙ্গে মেলামেশা নেই, এ বাড়ির লোকের বাইরে কারুর সঙ্গে আলাপ পরিচয়ও নেই। গন্ডা বদমাইস ছাড়া তার উপর এ ধরনের আক্রমণ করবে কে? এবং কেন করবে?'

ফেলুদা ডুর্দ কুঁচকে চুপ করে রইল। বিশ্বাস বললেন, 'সাদা-সিঁধে রাহাজানির ব্যাপারটা আপনাদের মতো শখের ডিটেকটিভদের আপীল করবে না জানি। তা বেশ ত, আপনি রহস্য চান, রহস্যও ত রয়েছে। বার করুন ত দেখি, তড়িৎবাবুর মতো লোক মাঝরাত্তিরে জঙ্গলে যায় কেন।'

শশাঙ্কবাবু চুপচাপ একটা আলাদা সোফায় বসেছিল। ফেলুদা যে কেন মাঝে মাঝে আড়চোখে ঠুর দিকে চাইছিল সেটা বুঝলাম না। মহীভোষবাবুর চেহারায় এখনো সেই ফ্যাকাসে ক্রান্ত ডাবটো রয়েছে। বার বার খালি মাথা নাড়ছেন আর বলছেন, 'কিছুই বুঝতে পারছি না...। কিছুই বুঝতে পারছি না...।'

আরো মিনিটখানেক বসে থেকে আমরা তিনজনে উঠে পড়লাম। মিস্টার বিশ্বাস বললেন, 'আপনি নিজের খুঁশি মতো তদন্ত চালিয়ে যেতে পারেন মিস্টার মিস্তর। তাতে আমি কিছু মাইন্ড করব না। হাজার হোক—কত চিহ্নটা ত আপনিই প্রথম দেখেছিলেন।'

বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে ফেলুদা দোতলায় গেল না। গাড়ি-

সারান্দা দিয়ে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসে ডান দিকে ঘুরে পুরোন
আন্তাবল আর হাতিশালের পাশ দিয়ে একেবারে বাড়ির পিছন দিকে
গিয়ে হাজির হলাম আমরা। পিছন ফিরে উপর দিকে চাইতেই
দোতলার একসারি জানালার মধ্যে একটা থেকে দেখলাম লালমোহন-
বাবুর ভোয়ালেটা ঝুলছে। এটা না হলে কোনটা যে আমাদের ঘর
সেটা চেনা মুশকিল হত। আমাদের ঘরের ঠিক নিচেই একতলার
একটা দরজা রয়েছে। এটাকে খিড়কি দরজা বলা যেতে পারে। এটা
দিয়েই নিশ্চয় কাল রাতে বেরিয়ে ভিড়বাবু জঙ্গলের দিকে গিয়ে-
ছিলেন।

সামনে বিশ-পঁচিশ হাত দূরে একটা খোলার চালওয়ালা ছোট
একতলা বাড়ি রয়েছে। তার সামনে আট-দশজন লোক জটলা করছে।
তার মধ্যে একজনকে আমরা আগে দেখেছি। এ হল মহীভোববাবুর
দারওয়ান। বাড়িটাও সম্ভবত দারওয়ানেরই। ফেলদার পিছন পিছন
আমরা এগিয়ে গেলাম বাড়িটার দিকে। দূরে কালবুনির জঙ্গল দেখা
যাচ্ছে, তার শাল গাছের মাথাগুলো অন্য গাছের উপর উঁচিয়ে রয়েছে।
জঙ্গলের পিছনে দেখা যাচ্ছে ঘোঁরাটে নীল ঢেউ খেলানো পাহাড়ের
সারি।

বাড়িটার কাছাকাছি পেঁছতে দারওয়ান আমাদের সেলাম করল।
ফেলদা জিগোস করল, 'তোমার নাম কী?'

'চন্দন মিসির, হুজুর।'

ঝড়ো লোক, মাথার চুলে কদম ছাট, পিছনে টিকি, চোখের পাশের
চামড়া কুঁচকে গেছে। কথা বলার ঢং দেখেই বোকা যায় খৈনি যায়।

'কদ্দিন কাজ করছ এখানে?'

'পঁচাশ বরিস হইরে গেলো হুজুর।'

চন্দন মিসিরের কথায় বুঝলাম, ভিড়বাবুর মৃত্যুর চেয়ে মানুষ-
থেকে বাঘ নিয়ে এখানকার লোকেরা অনেক বেশি ব্যস্ত হয়ে
পড়েছে। পাগলা হাতি নাকি প্রায়ই বেরোয়, কিন্তু মানুষথেকে বাঘ
গত ত্রিশ বছরের মধ্যে এই প্রথম। চন্দনের মতে এখানে কিছু লোক
কেআইনিভাবে চোরা শিকার করে, তাদের কারুর গুলিতে হয়ত
বাঘটা জখম হয়েছিল, আর সেই থেকেই ওটা ম্যানস্টার হয়ে গেছে।
অনেক সময় বেশি বয়সে বাঘের দাঁত খয়ে গেলেও ওরা ম্যানস্টার
হয়ে যায়। আবার মাঝে মাঝে দেখা যায় যে সজ্জার ধরে খেতে গিয়ে
তার কাটা এমনভাবে চোখে মূখে ঢুকে গেছে যে তার ফলে কাবু
হয়ে বাঘ জানোয়ার ছেড়ে আরো সহজ শিকার মানুষের দিকে গেছে।



ফেলদা বলল, 'এখানকার লোকেরা কি চাইছে যে মহাঁভোষ-
বাবু বাঘটাকে মারুন?'

চন্দন মিসির তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, 'সে ত চাইবে,
লৌকিন বাবু ত এ জঙ্গলে শিকার করেননি কখনো। আসামে
করিয়েছেন, ওড়িশায় করিয়েছেন—এ জঙ্গলে করেননি।'

থবরটা শুনে আমরা সকলেই অবাক হলাম। ফেলদা বলল, 'কেন,
এখানে করেননি কেন?'

চন্দন বলল, 'এই জঙ্গলে বাবুর দাদাজী (ঠাকুরদাদা) বাঘের

হাতে মরলেন, বাবুর বাবা ঐ বাঘের হাতে মরলেন, তাই বাবু এখানে না করে দূসরা জায়গা দূসরা জগালে চলে গেলেন।'

মহীতোষবাবুর বাবাও যে বাঘের হাতে মরেছিলেন সেটা এই প্রথম শুনলাম। ফেলুদা জিগোস করাতে চন্দন বলল যে, মহীতোষ-বাবুর বাবা নাকি মাচা থেকে বাঘকে গুলি করেছিলেন, আর দেখে মনে হয়েছিল বাঘটা মরে গেছে। মিনিট দশেক পরে মাচা থেকে বাঘের দিকে যেতেই সেটা নাকি ভুললোককে আক্রমণ করে সাংঘাতিক-ভাবে জখম করে। ক্ষত সেপটিক হয়ে কয়েক দিনের মধ্যেই নাকি ভুললোক মারা যান।

খবরটা শুনে ফেলুদা কিছুক্ষণ ভূরু কুঁচকে মাটির দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর খোলায় বাড়িটার দিকে দেখিয়ে বলল, 'তুমি ওই বাড়িতে থাক?'

'হ্যাঁ, হুজুর।'

'রাস্তারে ঘুমোয় কখন?'

চন্দন প্রশ্নটা শুনে একটু থতমত খেয়ে ফেলুদার দিকে চাইল। ফেলুদা এবার আসল প্রশ্নে চলে গেল।

'কাল রাস্তারে যে বাবু খুন হলেন—'

'তোড়িতবাবু?'

'হ্যাঁ। উনি বেশ বেশ রাস্তারে বাড়ি থেকে বেরিয়ে জঙ্গলের দিকে গিয়েছিলেন। তুমি তাকে যেতে দেখেছিলেন কি?'

চন্দর মিসির বলল, গতকাল না দেখলেও তড়িতবাবুকে সে তার আগের দিন, এবং তারও আগে বেশ কয়েকদিনই সম্বোধন। জঙ্গলের দিকে যেতে দেখেছে। গতকাল তড়িতবাবুকে না দেখলেও আরেক-জনকে দেখেছে।

কথাটা শুনে ফেলুদার মুখের ভাব বদলে গেল।

'কাকে দেখেছিলেন?'

'তা জানি না হুজুর। তোড়িতবাবুর চট্টের মুখটা বড়—তিন সেলের পুরোন টর্চ। আর এটা ছিল ছোট টর্চ, তার মুখ ছোট। তবে তাই বলে আলো কম নয়।'

'তুমি কেবল আলোই দেখেছ? আর কিছু দেখনি?'

'নোহি হুজুর। আউর কুছ নোহি দেখা।'

ফেলুদা আরো কি বিষয়ে জানি একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল, এমন সময় দেখি মহীতোষবাবুর চাকর বাসন্তভাবে দৌড়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

'বাবু আপনাদের ডেকেছেন। বললেন জরুরী দরকার।'

আমরা ফিরে এসে দেখি মহীতোষবাবু গাড়িবারান্দায় দাঁড়িয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। ফেলুদাকে দেখামাত্র বললেন, 'আপনার অনুমান ঠিক। ডিঙিকে গুঁড়া বদমাইসে মারেনি।'

'কী করে জানলেন?'

'যে অস্ত্রটা দিয়ে তাকে মারা হয়েছিল সেটা আমাদেরই বাড়িতে ছিল। কাল যে ভরোয়ালটা আপনাকে দেখিয়েছি, সেইটো। সেটা আর ঠাকুরদার আলমারিতে নেই।'

কানাই চাকরটাই আদিত্যনারায়ণের ঘরে ধুনো দিতে গিয়ে তলোয়ারের অভাবটা লক্ষ্য করে, আর করেই মহীতোষবাবুকে খবর দেয়। ঘরে অনেক বইপত্রের আছে যেগুলো মহীতোষবাবুর লেখার কাছে দরকার হয়; তাই আর ঘরটায় চাঁবি দেওয়া হত না। চাকর সবই পুরোন আর বিশ্বাসী। চুরি এ বাড়িতে বহুকাল হয়নি, তাই ও নিয়ে কেউ মাথাও ঘামাত না। তার মনে এই ঢো, বাড়ির যে-কেউ ইচ্ছে করলে ও তলোয়ার বার করে নিতে পারত।

আলমারিটা খুব ভালো করে পরীক্ষা করেও ফেলুদা কোনো রুদ্র বা ওই জাতীয় কিছু পেল না। শুধু তলোয়ারটাই নেই, আর সব যেখানে যেমন ছিল সেইভাবেই আছে।

পরীক্ষা শেষ হলে পর ফেলুদা বলল যে, ও তর্ডিৎবাবুর শোবার ঘর, আর তর্ডিৎবাবু যেখানে কাজ করত সেই জায়গাটা একটু দেখতে চায়।—‘তবে তার আগে আপনার মনে কোনোরকম সন্দেহ হচ্ছে কিন সেটা জানতে চাই।’

মহীতোষবাবু কিছুক্ষণ গম্ভীর থেকে মাথা নেড়ে বললেন, ‘তর্ডিৎকে খুন করার কোনো কারণ থাকতে পারে এমন কোনো লোক ত এখানে আছে বলে মনে হয় না। ওর এমনিতেও মেলামেশা কম ছিল, কাজ নিয়ে থাকত; মাঝে মাঝে হেঁটে বাইরে বেড়াতে যেত। মৃতদেহ স্থানি, বদ অভ্যাস-টভ্যাসও কিছু ছিল না। আর ঠাকুরদার তলোয়ার দিয়েই যদি তাকে মেরে থাকে তাহলেও ত আমাদের বাড়িরই লোক। নাঃ—আমি শু ভেবে কুলিকিনারা পাচ্ছি না।’

আমরা তিনজনে মহীতোষবাবুর সঙ্গে তর্ডিৎবাবুর ঘর দেখতে গেলাম। আমাদের ঘরেরই মতো বড় একটা ঘর। আসবাব ছাড়া তর্ডিৎবাবুর নিজের জিনিসপত্র বলতে নীল রঙের একটা বড় স্ফটিকের, একটা কাঁধে কোলানো কাপড়ের ব্যাগ, আলনায় টাঙানো শার্ট প্যান্ট পাঞ্জামা গোর্জ তোম্বালে ইত্যাদি, একটা তাকে প্রসাধনের জিনিসপত্র, একটা ছোট টেবিলের উপর রাখা ইংরেজি আর বাংলা কিছু গল্পের বই, একটা আলার্ম ক্লক, একটা মুনোখা রুদ্র-ব্যাক কানি, আর দুটো



পেনসিল। ও ছাড়া খাটের পাশে একটা টেবিলের উপর রাখা ফ্লাস্ক-
আর জলের গেলাস, আর একটা ছোট ট্রানজিস্টার রেডিও।

সুটকেসটায় চাবি ছিল না। ফেলুদা সেটা খুলতেই দেখা গেল
তার মধ্যে খুব পরিপাটি করে কাপড়চোপড় সাজানো রয়েছে। ফেলুদা
বলল, 'ভদ্রলোক কতকাতায় যাবার জন্য তৈরিই হয়ে ছিলেন।'

মিনিট পাঁচেক পরে তড়িৎবাবুর ঘর থেকে আমরা মহীভোব-
বাবুর আপিস ঘরের দিকে রওনা দিলাম। যাবার পথে ফেলুদা
মহীভোববাবুরে জিগোস করল, 'সেব্রেটারি বলতে ঠিক কী ধরনের

কাজ করতেন ভড়িৎবাবু, সেটা একটু বলবেন কি ?’

মহীতোষবাবু বললেন, ‘চিঠিপত্র লেখার কাজ ত আছেই, তাছাড়া আমার হাতের লেখা ভালো নয় বলে পান্ডুলিপি ও-ই কপি করে দিত। তারপরে প্রুফ দেখত, কলকাতায় গেলে পাবলিশারদের সঙ্গে দেখা করা, কথাবার্তা বলা, এসবও করত। ইদানিং আমার বংশের ইতিহাস লেখার ব্যাপারে শুকে অনেক পুরনো বই কাগজপত্র দলিল চিঠি ইত্যাদি ঘাটতে হয়েছে। সে-সব পড়ে তথ্য নোট করে রাখত।’

‘এগুলো বাকি সেই সব নোটের খাতা?’ ফেলদা ভড়িৎবাবুর ডেস্কের উপর রাখা গোটা আশ্টেক বড় সাইজের খাতার দিকে দেখাল। মহীতোষবাবু মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন।

‘আর এগুলো কি আপনার নতুন শিকার কাহিনীর প্রুফ?’

লম্বা লম্বা কাগজের ভাড়া, দেখলেই বোঝা যায় সেগুলো প্রুফ। ফেলদা এক ভাড়া প্রুফ তুলে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখাচ্ছিল।

‘প্রুফ-দেখিয়ে হিসেবে কি খুব নিড়-রযোগ্য ছিলেন ভড়িৎবাবু?’

প্রশ্নটা শুনে মহীতোষবাবু বেশ অবাক হয়েই বললেন, ‘আমার ত তাই ধারণা। আপনার কি সন্দেহ হচ্ছে?’

‘প্রথম পাতার প্রথম প্যারাগ্রাফেই দুটো ভুল দেখছি শুধরনো হয়নি।’

‘তাই নাকি?’

গর্জন কথাটার রেফ বাদ করে গেছে, আর হরিশের র-রে ফুটকি নেই।’

‘আশ্চর্য... আশ্চর্য...’

মহীতোষবাবু অনামনস্কভাবে প্রুফের কাগজগুলোর উপর চোখ বুলিয়ে ফেলদাকে ফেরত দিয়ে মিলেন।

‘সম্প্রতি ভড়িৎবাবুকে কি চিন্তিত বা উদ্ভ্রান্ত বলে মনে হত আপনার?’ ফেলদা প্রশ্ন করল।

‘কই, সেরকম তো কিছু লক্ষ্য করিনি।’

ফেলদা ভড়িৎবাবুর কাজের টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে কী বেন দেখছে। একটা প্যাড খোলা রয়েছে, তার উপর হিজিবিজি লেখা। ফেলদা প্যাডটা হাতে তুলে নিয়ে কাগজের উপর চোখ রেখে বলল, ‘আপনাদের বংশের ইতিহাস লেখার জন্য কি মহাভারত ঘাটের দরকার হাঁছিল?’

‘কেন বলুন ত?’

‘ভড়িৎবাবু এই প্যাডে বোধ হয় অনামনস্কভাবেই কয়েকটা কথা

লিখেছেন। এই যে দেখুন না—অর্জুন, কীচক, নারায়ণী, উত্তর, অশ্বখামা। এর সবই শু মহাভারতের নাম। নারায়ণী হল কৃষ্ণের সেনার নাম। কীচক ছিল বিরাট রাজার শালা, আর উত্তর হল বিরাটের ছেলে, অভিমন্ত্রের শালা।’

মহীতোষবাবু বললেন, ‘আমার কাজের জন্য ওকে মহাভারত পড়তে হয়নি, তবে ব্যাপারটা কী জানেন, তীড়ং ছিল বইয়ের পোকা। ঠাকুরদাদার লাইব্রেরিতে কালীপ্রসন্নর মহাভারত রয়েছে। সেটা নিয়ে ঘাঁটোঘাঁটি করে থাকতে পারে।’

আমরা মহীতোষবাবুর আশিস স্বর থেকে ঘাইরের বদ্রাস্থান এসে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় একটা চেনা গুরুগম্ভীর গলার থিরেটোরের ঢং-এ কথা কানে এল—

‘সব ধরংস হয়ে যাবে...সব ধরংস হয়ে যাবে। সত্যের ভিত্তি টলমল করছে, সব ধরংস হয়ে যাবে।’

শুধু গলাটাই শুনলাম, মানুষটাকে দেখতে পেলাম না। মহীতোষবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, বৈশাখ মাসটা প্রতি বছরই দাদার এরকম হয়। তারপর বর্ষা এলে গরমটা কমলে কিছুটা নিশ্চিন্ত।’

আমরা আমাদের ঘরের সামনে পৌঁছে গেছি। ফেলুদা বলল, ‘কাল একবার জঙ্গলে যাব ভাবছিলাম। একটু অনুসন্ধানের সারাজ্ঞান। আর্পান কী বলেন?’

মহীতোষবাবু ফুরু ফুঁচকে বললেন, ‘তীড়ংকে যেখানে ফেলে রেখে গিয়েছিল বাঘ, তার কাছাকাছি সে আর আসবে না বলেই শু মনে হয়। বিশেষ করে দিনের বেলা। অন্তত বাঘ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা তাই বলে। কাজেই আপনারা যদি ওই স্পটের কাছাকাছি থাকেন তাহলে বেশি রিস্ক নেই। সত্যি বলতে কি, এ জঙ্গলে যে বড় বাঘ এখনো রয়ে গেছে সেটাই শু আমার কাছে একটা বিরাট বিস্ময়।’

‘সঙ্গে মাধবলালকে পাওয়া যাবে শু? আর একটা জীপ...?’

‘নিশ্চয়ই।’

মহীতোষবাবু চলে গেলেন। বললেন, তলোয়ারের খবরটা ইনস্পেক্টর বিশ্বাসকে দিতে হবে।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বিকেলের পর থেকে আকাশের মেঘ একদম কেটে গেছে। লালমোহনবাবু অনেকক্ষণ থেকে চুপচাপ ছিলেন; দেখে মনে হচ্ছিল হয়ত কোনো গল্পের স্লট মাথায় আসছে, কারণ মাঝে মাঝে পকেট থেকে লাল টুকটুকে একটা টাটোর ডাররি বার করে কী যেন নোট করছিলেন। ঘরে এসে পাখাটা খুলে দিবে খাটে বাস

বললেন, 'কি রকম বোনাস পেয়ে গেলেন বলুন। এটা আমারই দৌলিতে সেটা স্বীকার করছেন ত ?'

'একশোবার।'

ফেলদাদা তড়িৎবাবুর ডেস্কের উপর থেকে সেই মহাভারতের নাম লেখা প্যাডটা আর 'কোর্চবিহারের ইতিহাস' বলে একটা বই নিয়ে এসেছিল। এখন সে খাটে বসে প্যাডের দিকে চেয়ে রয়েছে। কিছুদ্ধকণ চেয়ে থেকে বিড়বিড় করে বলল, 'সব ক'টাই মহাভারতের নাম তাতে সন্দেহ নেই, কেবল এই "উত্তর" কথাটা...। উত্তর...উত্তর। উত্তর নামও হতে পারে, উত্তর দিকও হতে পারে, আবার উত্তর মানে উত্তর কাল—পরবর্তীকাল—এও হতে পারে। আবার উত্তর মানে প্রশ্নের উত্তর...জবাব...জবাব...'

ফেলদাদা হঠাৎ যেন চমকে উঠল। তারপর খাটের পাশের টেবিলের উপর থেকে নিজের খাতাটা নিয়ে সংকেতের পাতাটা খুলল।

'দিক পাও ঠিক ঠিক জবাবে।—খ্যাংক ইউ তড়িৎবাবু। আপনার উত্তর বিরাটরাজ্যের ছেলে হতে পারে—আমার উত্তর হল উত্তর দিক। দিক পাও ঠিক ঠিক জবাবে। অর্থাৎ দিক পাও ঠিক ঠিক উত্তরে। তার মানে উত্তর দিকটাই হল ঠিক দিক। হাত গোন তাত পাঁচ! পঞ্চম হাত। উত্তর দিকে পঞ্চম হাত। কিন্তু তারপর ? ফাল্গুন তাল জোড়, দুই মাঝে দুই ফোড়। ফাল্গুন...এই ফাল্গুনটা নিয়েই যত গাণ্ড—'

আবার ফেলদাদার সেই চমকে উঠে কথা থেমে যাওয়ার ব্যাপার।

'তড়িৎবাবুর টেবিলের উপর একটা বাংলা অভিধান ছিল না ?' সে চাপা গলায় বলে উঠল।

লালমোহনবাবু বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, সংসদের অভিধান। লাল রঙ। আমারও আছে।'

'ওটা দেখা দরকার।'

ফেলদাদার পিছন পিছন আমরাও ছুটলাম মহীতোষবাবুর আপিস ঘরে।

অভিধান খুলে 'ফাল্গুন' বার করে ফেলদাদার চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল।

'ফাল্গুন—ফাল্গুন হল অর্জুনের একটা নাম। আর অর্জুন শূর্য পঞ্চপাণ্ডবের একজন নয়, অর্জুন গাছও বটে। এ জগলে অর্জুন গাছ কালও দেখেছি।'

'ডাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াচ্ছে ?' লালমোহনবাবু জিনিসটা ভালো করে না বুঝেও উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন।

‘ফাল্গুন তাল জোড়, দুই দহর দুই ফোঁড়। একটা অর্ধদুই গাছ আর জোড়া তাল গাছের মাঝখানে জমি খুঁড়তে হবে।

‘কিন্তু সেরকম গাছ কোথায় আছে সেটা জানছেন কি করে?’

ফেলদা বলল, ‘আরেকটা কোনো বড়ো গাছের উত্তরে পঞ্চাশ হাত গেলেই পাওয়া যাবে।’

‘আরেক্ষা, বড়ো গাছ! বড়ো গাছ ছাড়া ছোকরা গাছ আছে নাকি এ জঙ্গলে? আর গাছ ত মশাই সব কেটে ফেলোছে। মহীতোব-বাবুর নিজেরই ত কাঠের ব্যবসা। এ সংকেত লেখা হয়েছে কাম্বিন আগে? সত্তর পঁচাত্তর বছর হবে না?’

আমরা আমাদের ঘরে ফিরে এসেছি। ফেলদা আবার চুপ, আবার গম্ভীর। মেঝেতে বাঘছাইলের দিকে চেয়ে রয়েছে অন্যমনস্কভাবে। প্রায় মিনিটখানেক ওইভাবে থেকে বলল, ‘বা ভাবছি তাই যদি হয় তাহলে বড় বাঘের ছালটা তড়িৎবাকুদ্রই পাওয়া উচিত ছিল। সংকেত সমাধানের ব্যাপারে তড়িৎ সেন্সার্স্ত ফেলদা মিস্ত্রির চেয়ে কম ব্যর না। খুঁড়ি, যেতেন না।’

লালমোহনবাবু বললেন, ‘কিন্তু প্যাডে যে আরো সব মহাভারতের নাম রয়েছে? কীচক, অশ্বখামা—এদের সঙ্গে সংকেতের কী সম্পর্ক?’

‘সেই কথাই ত আমিও ভাবছি...’

ফেলদা আবার প্যাডের দিকে চাইল। তারপর বলল, ‘অবিশ্যি এই কাগজের সব ক’টা নামই যে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত, এটা ভাবার কোনো কারণ নেই। এবং এগুলো যে একই সময় লেখা সেটাও ভাবার কোনো কারণ নেই। এই দেখুন—কীচক আর নারায়ণী ডট পেন দিয়ে লেখা। দেখলেই বুঝতে পারবেন। কালির রঙ সবই এক বলে মনে হয়, কিন্তু অন্য লেখাগুলোর নিচের দিকের টোনগুলো ইয়ং মোটা—যেটা ডট পেনে কখনো হয় না।’

লালমোহনবাবু প্রায় গোয়েন্দার মতো করে কাগজটার দিকে ডুবু ডুবু করে তাকিয়ে থেকে বললেন, ‘তাহলে কীচক আর নারায়ণীর সঙ্গে সংকেতের—’

কথাটা শেষ হবার আগেই দরজার দিক থেকে গম্ভীর গলায় কথা এসে পড়ল লালমোহনবাবু চমকে উঠে হাত থেকে প্যাডটা ফেলেই দিলেন।

‘কীচকদের নিয়ে কথা হচ্ছে কি?’

দেবতোষবাবু।

পদা ফাঁক হল। ভদ্রলোক ভিতরে ঢুকে এলেন। আবার সেই

বেগুনী ড্রেসিং গাউন। ভুল্ললোকের কি আর কোনো জামা নেই ? ফেলুদা বলল, 'আসুন দেবতোষবাবু, ভিতরে আসুন।' ভুল্ললোক ফেলুদার কথায় কান না দিয়ে একটা প্রশ্ন করে বসলেন।

'পুখুরাজা দীঘির জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছিলেন কেন জান ?'

'আপনি বলুন। আমরা জানি না।' ফেলুদা বলল।

'কারণ কীচকদের সংস্পর্শে এসে পাছে ধর্মনাশ হয়, সেই ভয়ে।'।

': 'কীচক একটা জাতির নাম ?' ফেলুদা অবাক হয়ে জিগ্যেস করল।

'যাযাবর জাতি। জঙ্গলে গেলে একবার একটু খোঁজ করে দেখো ত তারা এখানে আছে কিনা। বনমোরগ শিকার করতে তাঁর-ধনুক নিয়ে।'।

'নিশ্চয়ই দেখব খোঁজ করে,' ফেলুদা খুব স্বাভাবিকভাবে বলল। তারপর বলল, 'আপনাকে একটা কথা জিগ্যেস করতে পারি কি ?'

দেবতোষবাবু কেমন যেন অবাক ফ্যালফ্যালে ভাব করে ফেলুদার দিকে চাইলেন।

': 'জিগ্যেস করবে ? আমাকে ত কেউ কিছু জিগ্যেস করে না !'

'আমি করছি। এখানে প্রাচীন গাছ বলতে কোনো বিশেষ গাছ আছে কি ? আপনি স্থানীয় ইতিহাস ভালো করে জানেন বলেই আপনাকে জিগ্যেস করছি।'।

': 'প্রাচীন গাছ ?'

'হ্যাঁ। মানে এমন গাছ যাকে লোকে বড়ো গাছ বলে জানে।'।

প্রাচীন গাছ শুনে, দেবতোষবাবুর ঘোলাটে চোখ আরো ঘোলাটে হয়ে গিয়েছিল, এখন হঠাৎ জ্বলজ্বল করে উঠল।

'বড়ো গাছ ? তাই বল। প্রাচীন গাছ আর বড়ো গাছ কি এক হল ? বড়ো নাম ত শুধু বয়সে বড়ো বলে নয়। গাছের গায়ে একটা ফোকর আছে, সেটা দেখতে ঠিক একটা ফোকলাদাঁত বড়োর হাঁ করা মূখের মতো। সেই গাছের নিচে ঠাকুরদাদার সঙ্গে গিয়ে চড়ুইভাতি করেছি। ঠাকুরদাদা বলতেন ফোকলা ফকিরের গাছ।'।

'গাছটা কী গাছ ?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'কাটা ঠাকুরানীর মন্দির দেখেছ ? সে-ও রাজদুর হাত থেকে নিস্তার পায়নি। সেই মন্দিরের পশ্চিম দিকে হল ফোকলা ফকিরের গাছ। অবশ্য গাছ। সেই গাছেই একদিন মহী—'

'দাদা, চলে এস।'।

দেবতোষবাবু কথা শেষ করতে পারলেন না। কারণ মহীতোষ-

বাবু দরজার বাইরে থেকে তাঁর বাজুখাই গলার হাঁক দিয়েছেন। পদা
আবার ফাঁক হল। মহীতোষবাবু গম্ভীর মূখ করে ঘরে ঢুকলেন।
বুঝলাম সেই কঠিন মানদণ্ডটা আবার বাইরে বেরিয়ে এসেছে।

‘তোমার ওষুধ খাবার কথা; খেয়েছ?’

‘ওষুধ?’

‘মশ্বথ দেয়নি?’

দেবতোষবাবুর জন্য একজন আলাদা চাকর আছে, নাম মশ্বথ।

‘আমি ত ভাল আছি, আবার ওষুধ কেন? আমার মাথার মশ্চণা—’

মহীতোষবাবু তাঁর দাদাকে এক রকম জোর করেই ঘাড় ধরে ঘর
থেকে বার করে নিয়ে গেলেন। বাইরে থেকে ছোট ডাইয়ের ধমক
শুনতে পেলাম।

‘ভাল আছি কি না-আছি সেটা ডাক্তার বুঝবে। তোমাকে যা ওষুধ
দেওয়া হয়েছে সেটা তুমি খাবে।’

গলা মিলিয়ে এল; আর সেই সঙ্গে পারের শব্দও।

‘ভদ্রলোককে সত্যিই কিন্তু আজ অনেকটা স্বাভাবিক বলে মনে
হচ্ছিল। মন্তব্য করলেন লালমোহনবাবু। ফেলুদার কানে যেন কথাটা
গেলই না। সে আবার বিড়বিড় শব্দ করছে।

‘অশ্বথ গাছে... অশ্বথ গাছে... অশ্বথ...। কিন্তু মূড়ো হয় কেন?
মূড়ো হয় বুড়ো গাছে... মূড়ো হয়...’

হঠাৎ হাত থেকে খাতাটা প্রচণ্ড জোরে বিছানার ফেলে দিয়ে
ফেলুদা ব্যথিয়ে উঠে চিৎকার করে উঠল—‘হয়! হয়! হয়! হয়!’

‘কী হয়?’ লালমোহনবাবু যথার্থই ভাবাচ্যাকা।

‘বুঝতে পারছেন না? মূড়ো হয় বুড়ো গাছে। তার মানে বুড়ো
গাছে, তার মূড়ো, মানে মূড়ু, অর্থাৎ গোড়া—হল হয়।’

‘হল হয়? সে আবার কী?’ লালমোহনবাবু আরো হতভম্ব।
সত্যি বলতে কি, আমারও মনে হচ্ছিল ফেলুদা একটু আবোল তাবোল
বকছে। এবার ফেলুদা যেন বেশ বিরক্ত হয়েই লালমোহনবাবুর দিকে
চোখ পাকিয়ে গলা উঁচিয়ে বলল, ‘আপনি না সাহিত্যিক? হয় মানে
জানেন না? ঘোড়া, ঘোড়া, ঘোড়া। হয় মানে ঘোড়া। হয় মানে অশ্ব।
বুড়ো গাছের গোড়া হল অশ্ব। আরো বলতে হবে?’

‘অশ্বথ!’ চোঁচিয়ে উঠলেন লালমোহনবাবু।

‘অশ্বথ। ভড়িৎবাবু অশ্বথই লিখেছিলেন এমনি কলম দিয়ে, আর
পরে খেয়ালবশত আ-কার আর মা জুড়ে দিয়েছেন ডট পেন দিয়ে।
আর আমি ভাবছি মহাভারত। ছি ছি ছি ছি!’

আমি জানি ফেলদুদা কাল অনেক রাত অবধি ঘুমোয়নি। আমি আর লালমোহনবাবুও জেগে ছিলাম প্রায় এগারোটো অবধি। তড়িৎ-বাবুর মতো একজন আশ্চর্য বুদ্ধিমান লোক কী বিস্তীর্ণভাবে ও কী রহস্যজনকভাবে মারা গেলেন সেই নিয়ে আলোচনা করছিলাম। কতকগুলো ব্যাপার যে ফেলদুদাকেও রীতিমতো ধাঁধিয়ে দিয়েছিল সেটা বেশ বৃক্সতে পারছিলাম। ফেলদুদা নিজেই সেগুলোর একটা লিস্ট করেছিল; সেটা এখানে তুলে দিচ্ছি—

১। তড়িৎবাবু ছাড়া আর কে কাল রাতে জপালে গিয়েছিল? যে গিয়েছিল সেই কি ভালোয়ার নিয়েছিল? সেই কী খুদনী? না সে ছাড়াও আরও কেউ গিয়েছিল? হাল ফাসানের টর্চ কার কাছে আছে?

২। প্রথম রাতে মহীতোষবাবু কার সঙ্গে ধমকের সুরে কথা বলছিলেন?

৩। দেবতোষবাবু কাল মহীতোষবাবু সম্পর্কে কী ঘটনা বলতে যাচ্ছিলেন, সে সময় মহীতোষবাবু এসে তাঁকে ডেকে নিয়ে গেলেন?

৪। দেবতোষবাবু সেদিন বুদ্ধিষ্টির রথের কথাটা বললেন কেন? সেটা কি পাগলের প্রলাপ, না তার কোনো মানে আছে?

৫। শশাঙ্কবাবু এত চূপচাপ কেন? সেটা কি ঠুর স্বভাব, না বিশেষ কোনো কারণে উনি চূপ মেরে গেছেন?

লালমোহনবাবু সব শূনেটুনে বললেন, 'মশাই, আমি কিন্তু একটি লোককে মোটেই ভরসার চোখে দেখতে পাচ্ছি না। ওই দাদা বাড়িটি পাগল হতে পারেন, কিন্তু ঠুর হাতের কব্জিটা দেখেছেন? মহীতোষবাবুর চেয়েও চওড়া। আর কালাপাহাড়ের উপর যা আকোশ দেখলাম, কাউকে কালাপাহাড় মনে করে ধাঁ করে একটা ভালোয়ারের ঘা বাঁসিয়ে দেওয়া কিছুই আশ্চর্য না।'

কথাটা শূনে ফেলদুদা কিছুক্ষণ লালমোহনবাবুর দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'আমার সঙ্গে মিলে আপনার কল্পনাশক্তি ও পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা যে যুগপৎ বেড়ে চলেছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

দেবতোষবাবু যে তলোয়ারের আঘাতে খুন করার ক্ষমতা রাখেন সেটা আমিও বিশ্বাস করি। তবে তুড়িৎবাবুর খুনের পেছনে যে-ধরনের হিসেবী কার্যকলাপের ইঙ্গিত পাওয়া যায়—আদিত্যনারায়ণের অলমারি খুলে তলোয়ার নেওয়া, তুড়িৎবাবুকে অনুসরণ করে এতখানি পথ হেঁটে জঙ্গলে যাওয়া—তাও আবার দুর্বোলের রাতে—তারপর অশ্বকারেই তাগ করে তলোয়ার চালানো—এটা মনে রাখতে হবে যে এক হাতে টর্চ জ্বললে অন্য হাতে তলোয়ার চালানো সম্ভব নয়—এই এতগুলো কাজ একজন পাগলের সঙ্গে সম্ভব কিনা সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আসলে আরেকবার জঙ্গলে গিয়ে অনুসন্ধান না করলে চলছে না। যা ঘটেছে সব ত ওইখানে। কাজেই বাড়িতে বসে শুধু কল্পনা-কল্পনার সাহায্যে বেশি দূর এগোন যাবে না। এটা ঠিক যে তুড়িৎবাবু সংকেতের সমাধান করে গদুস্তম্বের সম্মুখেই গিয়েছিলেন। গদুস্তম্ব নিয়ে সোজা কলকাতার চলে যাবেন, এটাই ছিল তাঁর প্ল্যান। কিন্তু এমন একটা আরামের চাকরি ছেড়ে গদুস্তম্বের প্রতিই বা তার সোভটা গেল কেন? ভদ্র-লোককে ত রাজার হাজে রেখেছিলেন মহীতোষবাবু। মাইনেও যে ভালো দিতেন সেটা তুড়িৎবাবুর জামাকাপড়, হাতের ঘড়ি, প্রসাধনের জিনিসপত্র ইত্যাদি দেখলেই বোঝা যায়। সিগারেটটাও খেতেন বিলিতি, এই মাগুগির বাজারে।’

আজ সকাল থেকে আবার মেঘ করে আছে, তবে বৃষ্টি পড়ছে না। জানালা দিয়ে জঙ্গলটা চোখে পড়তেই কেমন জ্বলি গা ছম ছম করে ওঠে। ফেলুদা সবেমাত্র বলেছে একবার মহীতোষবাবুর সঙ্গে দেখা হওয়া উচিত, এমন সময় চাকর এসে খবর দিল—নিচে ডাক পড়েছে। একটা জুপের আওয়াজ কিছুক্ষণ আগেই পেরেছিলাম। নিচে গিয়ে দেখলাম ইস্পেক্টর বিশ্বাস হাজির।

‘আপনি খুঁশি ত?’ বিশ্বাস ফেলুদাকে দেখেই প্রশ্নটা করলেন।

‘কেন?’

‘একটা রহস্য পেরে গেলেন। এই বাড়ি থেকেই অস্ত্র নিয়ে গিয়ে তুড়িৎবাবুকে খুন করা হয়েছে, সেটা ত আপনার কাছে একটা জোর খবর, তাই নয় কি?’

‘অস্ত্র নেই মানেই যে সেটা দিয়ে খুন করা হয়েছে, এটা নিশ্চয়ই আপনি মনে করেন না।’

‘আমি তা মনে করব কেন? কিন্তু আপনি তাই ভাবছেন না কি?’

দুজনেই বেশ ভদ্রভাবে কথা বললেও বেশ বুদ্ধিতে পারছিলাম

যে দুজনের মধ্যে একটা চাপা রেবারেঁষি চলেছে। কোনো দরকার ছিল না; মিস্টার বিশ্বাসই প্রথম ঠেস দিয়ে কথা বলেছেন। ফেলদা একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'আমি এখনো কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাইনি। আর আপনি যদি মনে করেন যে আমি খুঁশি হয়েছি, তাহলে বলতে বাধ্য হব যে আপনার ধারণা ভুল। খুনের ব্যাপারে আমি কোনো দিনই খুঁশি না। বিশেষ করে তর্ডিৎবাবুর মতো একজন বুদ্ধিমান লোক এত অল্প বয়সে এভাবে প্রাণ হারাবেন, এতে খুঁশি হবার কী আছে মিস্টার বিশ্বাস?'

'বুদ্ধিমান লোক?' বিশ্বাস ঠাট্টার সুরে বললেন। 'বুদ্ধিমান লোকের এমন মতিভ্রম হবে কেন যে রাত দুপুরে বাঘের জঙ্গলে যাবে সফর করতে? এর কোনো সম্ভাব্যজনক উত্তর দিতে পারেন আপনি, মিস্টার মিস্তির?'

'পারি।'

আমরা ছাড়া ঘরে তিনজন লোক—মহীতোষবাবু, বিশ্বাস আর শশাঙ্কবাবু। তিনজনেই ফেলদার কথার যেন তটস্থ হয়ে ওর দিকে চাইল। ফেলদা বলল, 'তর্ডিৎবাবুর জঙ্গলে যাবার একটা পরিষ্কার কারণ ছিল।' এবার ফেলদা মহীতোষবাবুর দিকে চাইল। 'আপনার সংকেতের মানে আমি বার করেছি মহীতোষবাবু—তবে আমারও আগে করেছিলেন তর্ডিৎ সেনগুপ্ত। কাজেই বাঘহালটা ঠুরই প্রাপ্য ছিল। আমার বিশ্বাস উনি জঙ্গলে গিয়েছিলেন গুপ্তধনের সম্ভানে।'

মহীতোষবাবুর চোখ কপালে উঠে গেছে দেখে ফেলদা তাকে পুরো ব্যাপারটা বর্ণনা করে দিল। ফোক্‌লা ফাঁকিরের গাছের কথা শুনে মহীতোষবাবু অবাক হয়ে বললেন, 'কই, ওরকম কোনো গাছ আছে বলে ত জানি না।'

'কিন্তু আপনার দাদা যে বললেন ছেলেবেলা আপনারা ওখানে চড়ুইভাতি করতে যেতেন, আপনার ঠাকুরদাদার সঙ্গে?'

'দাদা বললেন?' মহীতোষবাবুর কথার পরিষ্কার বাগ্‌গের সুর। 'দাদা যা বলেন তার কতটা সত্যি কতটা কম্পনা তা আপনি জানেন? আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে দাদার মাথার ঠিক নেই।'

ফেলদা চুপ করে গেল। দেবতোষবাবুর মাথার ব্যারাম নিয়ে তারই আপন ভাইয়ের সঙ্গে সে কীভাবে তর্ক করবে?

এদিকে মহীতোষবাবু কিন্তু বেশ ফ্যাকাশে হয়ে গেছেন। হাত কচলাতে কচলাতে বললেন, 'তার মানে তর্ডিৎ গুপ্তধন নিয়ে কলকাতার পালানোর মতলব করছিল। হয়ত আর ফিরেও আসেন না।'

অথচ আমি এর কিছুই জানতে পারিনি।’

মিস্টার বিশ্বাস সোফা ছেড়ে উঠে বাঁড়িরে বাঁ হাতের তেলোতে ডান হাত দিয়ে একটা ঘূষি মেরে বললেন, ‘যাক, তাহলে ভুললোকের বনে যাবার একটা কারণ পাওয়া গেল। এবার জানা দরকার আততায়ী কে।’

‘এই বাঁড়িরই লোক তাতে বোধহয় সন্দেহ নেই। আছে কি?’ ফেলুদা একটা ধোঁয়ার রিং ছেড়ে জিগ্যেস করল।

মিস্টার বিশ্বাস একটা বাকি হাসি হেসে চোখ দুটোকে ছোট ছোট করে বললেন, ‘তা ভ বটেই। তবে এ বাঁড়ির লোক বলতে আপনিও কিন্তু বাদ যাচ্ছেন না, মিস্টার মিস্তির। আপনি নিজে তলোয়ারটা দেখেছিলেন। ওটা হাত করার সুযোগ এ বাঁড়ির অন্য বাসিন্দাদের যেমন ছিল, তেমন আপনারও ছিল। আপনি তড়িৎবাবুকে আগে থেকে জানতেন কি না, তার প্রতি আপনার কোনো আকোশ ছিল কি না, সে সব কিন্তু কিছুই জানা যায়নি।’

মিস্টার বিশ্বাসের কথায় ফেলুদা আরেকটা ধোঁয়ার রিং ছেড়ে বলল, ‘কেবল দুটো জিনিস সকলেই জানে। এক, আমি এখনে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছি, এমনিতে আসার কথা ছিল না; দুই, তড়িৎবাবু যে ছুরির আঘাতে মরে থাকতে পারেন সেদিকে আমিই প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করি। নাহলে তাকে বাঘের শিকার বলেই চালিয়ে দেওয়া হচ্ছিল।’

মিস্টার বিশ্বাস এবার একটা হালকা হাসি হেসে বললেন, ‘আপনি আমার কথাটা এত সিরিয়াসলি নিচ্ছেন কেন? ভয় নেই, আমাদের লক্ষ্য আপনার দিকে নয়, অন্য দিকে।’

লক্ষ্য করলাম যে, কথাটা বলার পর বিশ্বাস আর মহাত্মাবাবুর মতো, যাকে বলে দৃষ্টি বিনিময়, সেরকম একটা ব্যাপার ঘটে গেল— বোধহয় এক সেকেন্ডের জন্য। ফেলুদা বলল, ‘আপনি কালকে যে কথাটা বলেছিলেন সেটা এখনো বলছেন ত?’

‘কী কথা?’ জিগ্যেস করলেন মিস্টার বিশ্বাস।

‘আমি আমার ইচ্ছেমতো অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে পারি ত?’

‘নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। কেবল আমার আর আপনার কাজটা ক্ল্যাশ না করলেই ভালো। কেউ কারুর বাধা সৃষ্টি করলেই কিন্তু মর্শ্যকর হবে।’

‘সেটার বোধ হয় কোনো সম্ভাবনা নেই। আমি জঙ্গলের দিকটা-তেই উদন্ত চালাবো প্রযত্নত। সে ব্যাপারে বোধ হয় আপনার খুব

একটা উৎসাহ নেই।’

‘এনিথিং ইউ লাইক’—বললেন মিস্টার বিম্বাম।

এবার ফেলুদা মহীতোষবাবুর দিকে ফিরল।

‘দেবভোষবাবুর সঙ্গে কথা বলে কোন ফল হবে না বলছেন?’

মহীতোষবাবু অধৈর্য হলেন কিনা জানি না, তবে মনে হল একবার যেন ঐর চওড়া চোরাগলের হাড়টা একটু শক্ত হল। পরমুহুর্তেই আবার স্বাভাবিক হয়ে শান্ত গম্ভীর গলায় বললেন, ‘দাদার শরীরটা কাল থেকে একটু বেশি খারাপ হয়েছে। ঐকে ডিসটার্ব করাটা ঠিক হবে না।’

ফেলুদা ছাইদানে সিগারেট ফেলে দিয়ে সোফা ছেড়ে উঠে বলল, ‘আমি ত আর অনির্দিষ্টকাল আপনার অতিথি হয়ে থাকতে পারি না, বা থাকতে চাইও না। কালই আমাদের মেয়েদের শেষ দিন। আপনাকে বলছিলাম একবার জঙ্গলে যেতে চাই। আপনি যদি একটু মাধবলালকে বলে দেন, আর আপনার একটা জীপ...’

দুটোর ব্যবস্থাই হয়ে গেল। এখন সাড়ে আটটা। ঠিক হল আমরা দশটা নাগাদ বেরিয়ে পড়ব। জঙ্গলে খোরার জন্য হান্টিং বট ছিল আমার আর ফেলুদার; আমরা দুজনেই সেগুলো বার করে পরে নিলাম, যদিও জানি যে আমাকে হয়ত জীপ থেকে নামতেই দেবে না। আমার ধারণা ছিল লালমোহনবাবু হয়ত নিজে থেকেই নামতে চাইবেন না, কিন্তু এখন লালমোহনবাবুর হাবভাব দেখে বেশ অবাক লাগল। বাথরুমে গিয়ে ধুতি ছেড়ে খাকি প্যান্ট পরে এলেন, আর বাস থেকে একটা জ্বরদস্ত বট জুতো বার করে নিয়ে সেটা পরতে লাগলেন। ফেলুদা ব্যাপারটা শুধু একবার আড়চোখে দেখে নিল, যুখে কিছু বলল না।

‘আচ্ছা, বাথের চাইনি শুনেছি নাকি সাংঘাতিক ব্যাপার? সত্যি নাকি মশাই?’ বট পায়ে দিয়ে মেঝের উপর মিলিটারি মেজাজে পায়চারি করতে করতে প্রশ্ন করলেন লালমোহনবাবু। ফেলুদা তৈরি হয়ে জানালার ধারে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, এখন শুধু জীপ আর শিকারীর অপেক্ষা। সে লালমোহনবাবুর প্রশ্নের জবাবে বলল, ‘তা ত বটেই; তবে শিকারীরা এটাও বলে যে বাঘ নাকি মানুষকে ভয় পায়। একজন লোক যদি বাঘ দেখলে পরে তার চোখে চোখ রেখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, তাহলে বাঘ নাকি উল্টো-যুখে ঘুরে চলে যায়। আর শুধু চাইনিতে যদি কাজ না দেয়, তাহলে হাত-পা ছুঁড়ে চেঁচাতে পারলেও নাকি একই ফল হয়।’

‘কিন্তু ম্যানস্টেটার ?’

‘সেখানে আলাদা ব্যাপার ।’

‘তাই বলুন । কিন্তু তাহলে আপনি যে...?’

‘আমি বাচ্ছি কেন ? তার কারণ দিনের বেলা বাস বেরোবার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে । যদি বেরোর তার অন্য কন্ডাক্ত ত সন্ধ্যাই থাকছে । আর তেমন বেসংতিক দেখলে জীপ ত রইয়েছে, উঠে পড়লেই হল ।’

এর পরে জীপ আসার আগে লালমোহনবাব্দ শ্রুত্ব একটা কথাই বলেছিলেন ।

‘খুনের ব্যাপারটা কিছুই বৃকতে পারছি না মশাই । একেবারে টোটাল ডার্কনেস ।’

ফেলুদা বলল, ‘অম্বকারটা বাতে না দ্র হয় তার জন্য চেষ্টা চলছে লালমোহনবাব্দ । সেই চেষ্টাকে বিফল করাই হবে আমাদের লক্ষ্য ।’

যেখানে ভাড়াবাবুর মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল, আমরা সেই-
খানে এসে দাঁড়িয়েছি। সেদিনও এই সময়টাতেই এসেছিলাম, কিন্তু
আজ কিছুক্ষণ হল যেহেতু গিয়ে রোদ ওঠার ফলে আলোটা অনেক
বর্শি। এখানে এখানে পাতার ফাঁক দিয়ে রোদ মাটিতে পড়েছে, আর
লক্ষ্য করছি সেদিনের চেয়ে পাখিও ডাকছে অনেক বর্শি। লালমোহন-
বাবু অর্থাৎ যে কোনো পাখি ডেকে উঠছে, সেটাকেই বাঘ কাছা-
কাছি থাকার লক্ষণ বলে মনে করছেন।

ভাড়াবাবুর মৃতদেহ সেদিনই সকালে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়ে-
ছিল। কলকাতায় টেলিফোন করে খবর দেওয়াতে ঠিক বড় ভাই এসে-
ছিলেন, শেষ কাজ তিনিই করে দিয়ে গেছেন। আজ আর সেই বাঁশ-
ঝাড়টার আশেপাশে সেদিনকার সাংঘাতিক ঘটনার কোনো চিহ্নই নেই।
কিন্তু তাও ফেলদা অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে চারদিকের জমি পরীক্ষা
করছে। মাধবলালও ফেলদার সঙ্গে কাজে লেগে গেছে। মনে হল বেশ
উৎসাহই পাচ্ছে। লোকটাকে যত দেখছি ততই ভালো লাগছে। চেহারা-
টাও বেশ। হানলেই গালের দু' পাশে দুটো খাঁজ পড়ে, আর ডুর্দ না
কুঁচকালেও খপালে পাঁচ-ছ'টা লাইন পড়েই আছে। জীপে আসতে
আসতে ও বনছিল, বনবিভাগ থেকে মানুষকেোর খবর ছড়িয়ে পড়ার
পর থেকে এর মধ্যেই বেশ কয়েকজন শিকারী নাকি বাঘটা মারার ইচ্ছা
প্রকাশ করেছে। তার মধ্যে কার্শিয়াং-এর এক চা বাগানের ম্যানেজার
মিস্টার সাব্রু নাকি আজকালের মধ্যেই এসে পড়বেন। সাব্রু নামকরা
শিকারী, তেরাইয়ের জঙ্গলে নাকি এককালে অনেক বাঘ মেরেছেন।
মাধবলাল নিজেই অনেক বাঘ হরিণ বুনো শূরোর ইত্যাদি মেরেছে,
তারই একটি গল্প সে সব বলতে আরম্ভ করেছে, এমন সময় ফেলদা
হঠাৎ বাঁশঝাড়ের দিক থেকে তার নাম ধরে ডাক দিল। মাধবলাল
ব্যস্তভাবে এগিয়ে গেল ফেলদার দিকে, তার পিছন পিছন
আমরাও। এটা বলা দরকার যে আমাদের দুজনের জীপ থেকে নামার
ব্যাপারে ফেলদা আজ কোনো আপত্তি করেনি।

ফেলদা মাটিতে উবু হয়ে বসে একটা বাঁশের গোড়ার দিকে

চেয়ে আছে।

‘দেখুন ত এটা কী ব্যাপার, ফেলদা মাধবলালকে উদ্দেশ্য করে বলল।

মাধবলাল ঝুঁকে পড়ে এক ঝলক দেখেই বলল, “বুলেট লাগা খা।”

মাধবলালের পদবী দূবে, বাড়ি সাহেবগঞ্জ, কিন্তু বাংলা বুঝতে বা বলতে কোনো অসুবিধা হয় না।

বাঁশটার গায়ে যে একটা কতীচিহ্ন রয়েছে সেটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। লালমোহনবাবু অবাক হয়ে আমার দিকে চাইলেন। ফেলদাও যে অবাক সেটা বোঝাই যাচ্ছে। আর তিনেক অসহিষ্ণুভাবে নিজের হাতের তেলোতে ঘর্ষি ঘেঁরে বলল, ‘দাগটা পুরোন কি টাটকা সেটা বলতে পারেন?’

মাধবলাল বলল, ‘দিন দুয়েকের বেশি পুরোন হতেই পারে না।’

‘ব্যাপারটা কী?...ব্যাপারটা কী?...’ ফেলদা বিড়বিড় করে বলল, ‘বন্দুক...তলোয়ার...সব যে গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। তুড়ি-বাকুকে মারল তলোয়ারের খোঁচা, বাঘকে মারল গদূলি...সে গদূলি ত আবার মনে হচ্ছে বাঘের গায়ে লাগেনি। নাকি—’

মাধবলাল বাঁশঝাড়ের নিচ থেকেই কী বেন কুড়িয়ে নিয়েছে। এমনি চোখে ভালো দেখাই যায় না। কাছে গিয়ে বুঝতে পারলাম, ইঁপ দূয়েক লম্বা লম্বা কতকগুলো রোঁয়া।

‘বাঘের লোম কি?’ বলল ফেলদা।

‘বাঘের লোম’, বলল মাধবলাল। ‘গদূলি বাঘের গা খেঁবে গিয়ে ছিল বলে মনে হয়।’

‘আর তাই কি বাঘ খানিকটা মাংস খেয়েই পালিয়েছিল?’

‘সেই বকমই মালুম হচ্ছে।’

ফেলদা দু-এক পা করে এগিয়ে যেতে শুরু করল। মাধবলালও হাতে বন্দুক নিয়ে দৃষ্টি সম্মাগ রেখে তাকে অনুসরণ করল। আমরা দুজনের মাঝামাঝি সবচেয়ে নিরাপদ জায়গাটা বেছে নিলাম। ফেলদার পকেটে রিভলভার আছে জানি, আর তাতে টোটাও ভরা আছে। কিন্তু তাতে ত আর বাঘের কিছু হবে না। পিছন থেকে একটা গাড়ির আওয়াজ শ্রুনে বুঝলাম, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে জীপটাও এগোচ্ছে। তার ফলে বাবধান কিছুটা কমলেও জীপ আমাদের কাছে আসতে পারবে না, কারণ আমরা রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের ভিতর চলে এসেছি।

মিনিট তিনেক এভাবে হাটুর পর ফেলদা হঠাৎ কী জানি দেখে

জান দিকে কোণাকূণিভাবে দ্রুত পারে এগিয়ে গেল।

একটা কাঁটা ঝোপ। তার মধ্যে একটা কাপড়ের টুকরো আটকে রয়েছে। সবুজ কাপড়। নিঃসন্দেহে তড়িৎবাবুর শার্টের অংশ। মাধবলাল না বললেও আন্দাজ করেছিলেন, বাঘ তড়িৎবাবুকে মুখে করে নিয়ে যাবার সময় ঝোপের কাঁটার তড়িৎবাবুর শার্টের একটা অংশ ছিঁড়ে আটকে গিয়ে এই চিহ্ন রেখে গেছে।

এবার দেখলাম মাধবলাল আমাদের ছাড়িয়ে নিজেই এগিয়ে গেল। বুদ্ধিলাম সে-ই এবার পথ দেখাবে, কারণ সে আন্দাজ করেছে বাঘ কোন পথে এসেছিল। বোধ হয় আমাদের কথা ভেবেই মাধবলাল ধীরে ধীরে এগিয়েছে, কারণ চারদিকে কাঁটা ঝোপ।

সামনে একটা তেঁতুল গাছ। তার গুঁড়ির কাছ থেকে জমিটা ঢালু হয়ে পিছন দিকে নেমে গেছে বলেই বোধ হয় সেখানটা শুকনো রয়েছে। মাধবলাল সেখানে পৌঁছে থেমে গেল, তার দু'ধিঁ মাটির দিকে। আমরাও এগিয়ে গেলাম।

যদিও এ জিনিসটা এর আগে কোনোদিন দেখিনি, তাও বুঝতে অসুবিধা হল না যে, আমরা বাঘের পারের ছাপ দেখছি। আমরা যদিকে যাচ্ছি সেই দিকেই গেছে ছাপগুলো।

কাঁপা ফিসফিসে গলায় লালমোহনবাবুর প্রশ্ন এল, 'একি দুপেয়ে বাঘ নাকি মশাই?'

মাধবলাল হেসে উঠল। ফেলুদা বলল, 'এইভাবেই বাঘ হাটে। সামনের পা আর পিছনের পা ঠিক একই জায়গায় ফেলে, তাই মনে হয় দু'পায়ে হাটেছে।'

মাধবলাল এগিয়ে চলেছে, আমরা তার পিছনে। জীপের আওরাজ আর পাচ্ছি না। বোধ হয় হাল ছেড়ে দিয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়েছে। একটা কুলকুল শব্দ পাচ্ছি। একটা নালা জাতীয় কিছু আছে বোধ হয় কাছাকাছির মধ্যে। লালমোহনবাবুর নতুন বুটটা প্রথম দিকে বস্ত বেশী মচ মচ শব্দ করছিল, তাতে ফেলুদা মন্তব্য করেছিল, সেটা নাকি ম্যানদ্রটারের কৌতুহল উদ্বেক করার পক্ষে আইডিয়াল, কিন্তু এখন কাদায় ভিজে আওরাজটা প্রায় মরে এসেছে।

একটা শিমূল গাছ পেরিয়ে কয়েক পা যেতেই মাধবলাল আবার দাঁড়িয়ে পড়ল।

'আপকা পাম রিসলভার হয় না?'

এবার আমাদের চোখ গেল হাত বিশেক দূরে সামনের ঘাসের দিকে। ঘাসগুলো জিরে কী যেন একটা জিনিস এগিয়ে আসছে।

‘ক্রেইং’, বলল মাখবলাল।

নামটা জানি। অসম্ভব বিবধর সাপ।

এবার সাপটাকে দেখতে পেলাম। চলা খামিরে স্থির হয়ে ঘাসের উপর দিগ্নে মাথাটা তুলে আমাদের দেখছে। ফলা নেই। সারা গায়ে হলদে আর কালো ডোরা।

ফেলদা যে কখন রিস্তলভারটা বার করল টেরই পেলাম না। হঠাৎ একটা কানফাটা শব্দের সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম সাপের মাথাটা খেঁতলে গেল। আরেকটা গুলি। এবার সব স্থির। গাছ থেকে পাখি ডেকে উঠেছে। দূরে আরেকটা গাছ থেকে বাদিরের কিচির মিচির। মাখবলাল শব্দ বলল, ‘সাবাস’, আর লালমোহনবাবু হাঁচি হাসি আর কাশি মিলিয়ে একটা অশুভ শব্দ করে একদম চুপ মেরে গেলেন।

ফেলদা বাঁ দিকে বাচ্ছে দেখে মাখবলাল বারণ করল। বলল, ওদিকে একটা নালা আছে, সেটা পেত্রোলেই নাকি একটা উঁচু পাথরে ঢিবি আর অনেকগুলো বড় বড় পাথরের চাঁই। ওখানে নাকি বাঘের বিশ্রামের খুব ভালো জায়গা রয়েছে, কাজেই ওদিকটার যাওয়া খুব নিরাপদ নয়। অগত্যা ফেলদা মাখবলালের নির্দেশ মতো সোজাই চলল।

বন যে সব জায়গায় সমান ঘন তা নয়। বাঁ দিকে চাইলেই বোকা যায় ওদিকে নালা থাকার দরুন বন পাতলা হয়ে গেছে। জানোয়ারের মধ্যে এক বাদিরই দেখা যাচ্ছে মাঝে মাঝে—ল্যাজ পার্কিয়ে গাছের ডাল থেকে দোল খাচ্ছে, এগাছ থেকে ওগাছে দিবি লাফিয়ে চলে যাচ্ছে, আর আমাদের দেখলে দাঁত খিঁচোচ্ছে।

ফেলদা নিশ্চয়ই আশা করছিল যে, আরো অনুসন্ধান করলে আরো কিছু পাবে, কিন্তু এবারে পাওয়াটা জুটে গেল লালমোহনবাবুর কপালে। লালমোহনবাবুর বুটের টেকের খেয়ে একটা জিনিষ ছিটকে প্রায় দশ হাত দূরে গিয়ে পড়তেই আমাদের চোখ সেদিকে গেল।

একটা গাড়ি রাউন রঙের চামড়ার মানিব্যাগ। ফেলদা সেটা খুলতেই তার ভিতর থেকে দুটো একশো টাকার নোট আর বেশ কিছু অনা ছোট ছোট নোট বেরিয়ে পড়ল। এসব ছিল বড় খাপটার। অন্য খাপ থেকে কয়েকটা রং চটে যাওয়া কুড়ি পরসার ডাকটিংকট, দু-একটা ক্যাশ মেমো আর একটা ওষুধের প্রেসক্রিপশন বেরোল। বস্টিতে ভিলে ব্যাগটার অবস্থা বেশ শোচনীয় হলেও নোটগুলো এখনো দিবি ব্যবহার করা চলে।

ফেলুদা সব জিনিস আবার ব্যাগের মধ্যে পুরে ব্যাগটা খাটের
বুকপকেটে ঢুকিয়ে নিল।

আমরা আবার এগিয়ে চললাম।

এদিকটার জঙ্গল বেশ ঘন হয়ে উঠেছে। চারিদিকে প্রকাণ্ড
প্রকাণ্ড শাল গাছ, মাঝে মাঝে অন্য গাছ—সেগুন, শিমূল, জাম্বু,
কাঁঠাল, ছাতিম। অর্জুন গাছও রয়েছে এখানে সেখানে। আমি জানি
ফেলুদা সেগুনের দিকে বিশেষভাবে চোখ রাখছে, আর এও জানি
যে অর্জুনের কাছাকাছি কোনো ভাল গাছ এখনো পর্বন্ত চোখে
পড়েনি। মাধবলাল এরই মধ্যে এক ফাঁকে পকেট থেকে একটা ছুরি
বার করে দুটো গাছের ডাল কেটে আমাকে আর মালমোহনবাবকে
দিয়েছে; আমরা সেগুনো লাঠি হিসাবে ব্যবহার করছি। ফেলুদা
হাটতে হাটতেই মাধবলালকে প্রশ্ন করল, ‘বাঘের পায়ের ছাপ দেখে
বাঘ সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানা যায়, তাই না?’

মাধবলাল বলল, ‘হ্যাঁ, এটাকে বেশ বড় বাঘ বলেই তো মনে
হয়।’

আমি মনে মনে ভাবছিলাম—একটা আশুত মানুষের লাশ মুখে
করে বাঘটা এতখানি পথ এসেছে, তার মানে, কী সাংঘাতিক শক্তি
বাঘের! অবিশিষ্ট মানুষের আর কীই বা ওজন। গরু ঘোষ মেয়েও
ত শূন্যেই বাঘ ওইভাবেই মুখে করে নালাটোলা লাফিয়ে ডিঙিয়ে
মাইলের পর মাইল পথ চলে যায়। মহীতোষবাবুর বইয়েতেই নাকি
আছে যে বাঘের ছাল ছাড়ালেই দেখা যায় ভিতরে কেবল মাসুল আর
মাসুল।

ফেলুদা এবার আরেকটা প্রশ্ন করল মাধবলালকে।

‘মহীতোষবাবু এ জঙ্গলে কখনো শিকার করেননি। তাই না?’

মাধবলাল বলল, মহীতোষবাবুর কুসংস্কারের কথাটা সে জানে।
তবে এরকম কুসংস্কার নাকি অনেক শিকারীর মধ্যেই দেখা যায়।
‘আমার নিজেই নেই’, মাধবলাল বলল, ‘তবে আমার বাবার ছিল।
জোয়ান বয়সে একবার বাঘ মারতে বাবার আগে হাতে বিছুটি লেগে-
ছিল, আর সেইদিনই একটা প্রায় দশ ফুট লম্বা বাঘকে বন্দকের এক
গুলিতে ঘারেল করেছিলেন। সেই থেকে বাঘ মারতে বাবার আগে
হাতে বিছুটি ধরে নিতেন।’

ফেলুদা বলল, ‘করবেট সাহেবেরও কুসংস্কার ছিল। ম্যানইটার
মারতে যাবার দিন সকালে একটা সাপ দেখলে তার মনটা খুঁশি হয়ে
যেত।’

মহীতোষবাবুর বাপ-ঠাকুরদা দুজনেই এ জগলে বাঘের হাতে প্রাণ দেন, কাজেই মহীতোষবাবুর পক্ষে এখানে শিকার করার আশঙ্কিতো খুব স্বাভাবিক।

আমরা মাধবলালের পিছন পিছন প্রায় কুড়ি মিনিট ধরে হাটার পর ফেলদা আসলে যে জিনিসটা খোঁজার জন্য এসেছিল, সেটা পেয়ে গেল। হালকা বেগুনী রঙের ছোট ছোট ফুলে ভরা একটা কোপের ধারে পড়ে আছে, তার পাথরবসানো হাতলটা খালি দেখা যাচ্ছে, ইস্পাতের অংশটা কোপে ঢাকা।

আদিত্যনারায়ণের তলোয়ার।

জিনিসটা চোখে পড়তেই ফেলদা প্রায় বাঘের মতোই নিঃশব্দে কাঁপিয়ে পড়ে তলোয়ারটা মাটি থেকে তুলে নিল।

খুব মন দিয়ে দেখলে বোঝা যায় তলোয়ারের ডগার এখনো খয়েরি রঙের রক্তের দাগ।

ফেলদা তলোয়ারটা হাতে নিয়ে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে দেখে বলল, 'তার মানে খুনের জায়গাটা এর চেয়ে খুব বেশি দূরে নয়। আরো একটু এগোন যায় কি, মাধবলালজি?'

মাধবলাল বলল, 'আর একশো গজ গেলেও মন্দির পড়বে।'

'কী মন্দির?'

'এখানে বলে কাটা ঠাকুরানীর মন্দির। ভিতরে কিছু নেই। শুধু দালানটা ভাঙাচোরা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে।'

কাটা ঠাকুরানীর মন্দিরের কথা কালই বিকেলে শুনোছি। দেব-তোষবাবুর কাছে। ওরই পশ্চিমে ফোকলা ফকিরের গাছ।

ফেলদা আর কিছু না বলে এগিয়ে চলল, তার হাতে আদিত্য-নারায়ণের তলোয়ার। দেখে মনে হয় সেও যেন শের শার মতোই তলোয়ার হাতে বাঘ মারতে চলেছে।

কাটা ঠাকুরানীর মন্দির যে বহুকালের পুরোন সেটা দেখলেই বোঝা যায়। তার ফাটল থেকে অশথ গাছের চারা বেরিয়েছে। তার মাথাটাকে পাশের একটা বটগাছের ঝুঁরি নেমে আঁকড়ে ধরে পিষে যেন তার প্রাণটাকে বের করে দিয়েছে। ফেলদা কিন্তু মন্দিরের দিকে দেখাছিলই না। তার চোখ চলে গেছে মন্দিরের ডানদিকে। প্রায় বিশ হাত দূরে একটা সতিাই বড়ো প্রকাণ্ড অশথ গাছ শুকনো ডালপালা মেলে দাঁড়িয়ে আছে। গাছে পাতা প্রায় নেই, বসলেই চলে। যেটা আছে সেটা হল মাটি থেকে প্রায় এক মানুস উঁচুতে একটা ফোকর।

ফেলদার পিছন পিছন আমরাও প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে গাছটার

মিকে এগিয়ে যেতে ক্রমে ফোকরের চারিদিক ঘিরে গাছের গায়ে
ছোপছোপ এবড়ো-খেবড়ো শিরা উপশিরা সব মিলিয়ে একটা দাঁড়ি-
ওলালা বৃদ্ধের চেহারা আমাদের চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠল। দাঁড়িটা
গজিরেছে বেন ফোকরের ঠিক নিচে। হাঁ করা ফোকলা বৃদ্ধের সঙ্গে
আশ্চর্য মিল।

ফেলদাদার দৃষ্টি আবার ঘুরে গেল।

‘ওই দিকটা উত্তর দিক কি?’ ফেলদাদা জিজ্ঞাসা করল
মাধবলালকে।

‘হ্যাঁ—ওটাই উত্তর।’

‘হতেই হবে। ওই ত অজরুন গাছ। আর ওই যে জোড়া তাল।’

অবাক হয়ে দেখলাম সংকেতের নির্দেশের সঙ্গে সব ইন্দ্রবহু
মিলে যাচ্ছে।

‘পশ্চিম হতেই হবে। সেখানেও ফুল নেই’, বলে ফেলদাদা অজরুন
গাছটার দিকে এগিয়ে গেল।

গাছটার কাছে পৌঁছে জোড়া তাল গাছ লক্ষ্য করে খানিক দূরে
এসোতেই একটা ঝোপড়ার পিছনে জলকাদায় ভরা একটা বেশ বড়
গর্ত চোখে পড়ল। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে গর্তটা এই কয়েকদিন আগেই
খোঁড়া হয়েছে।

আর এটাও বোঝা যাচ্ছে যে তার ভিতর থেকে একটা হাঁড়িটাড়ি
গাছের জিনিস বার করে নেওয়া হয়েছে।

‘গদস্তখন হাওয়া?’ লালমোহনবাবু এই প্রথম গলা চাড়িয়ে কথা
বললেন।

ফেলদাদার মূখের ভাব ধ্বংস। এটাকে অবিশিষ্ট নতুন কোনো
রহস্য বলা চলে না। বোঝাই যাচ্ছে তড়িৎবাবুকে যে খুন করেছে
সেই গদস্তখন হাত করেছে। ফেলদাদা তবুও গর্তের দিকে একদৃষ্টে
চেয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বলল, ‘তোরা একটু জিরিয়ে
নে। আমি আশপাশটা একটু সার্ভে করে নিচ্ছি।’

সত্যি বলতে কি, এতক্ষণ পা টিপে টিপে কাঁটা বাঁচিয়ে জুগলে
হেঁটে বেশ ক্রান্ত লাগছিল, তাই আমি আর লালমোহনবাবু
বিশ্রামের একটা সুযোগ পেয়ে খুশিই হলাম। ফোকলা ফকিরের
তলার একটা শূন্য জায়গা বেছে আমরা মাটিতেই বসলাম, আর
মাধবলাল গাছের গুঁড়িতে বন্দুকটাকে হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে
আমাদের সামনে বসে তার ডেরো বছর বয়সে সে ভাল্লুকের আকর্ষণ
থেকে কীভাবে উদ্ধার পেয়েছিল সেই গল্প বলতে লাগল। আমার

মন কিন্তু পুরোপুরি গল্পের দিকে যাচ্ছে না, কারণ একটা চোখ রয়েছে ফেলদাদার দিকে। সে ঠোঁটের ফাঁকে একটা টোটকা ধরানো চার-মিনার নিয়ে মন্দিরের চারপাশটা সার্ভে করছে। একবার মনে হয় একটা সিগারেটের টুকরো তুলে নিয়ে আবার সেটাকে ফেলে দিল। আরেকবার হাটু গোড়ে বসে কোমরটাকে ভাঁজ করে প্রায় মাটিতে নাক ঠেকিয়ে কী যেন দেখল।

প্রায় দশ মিনিট ধরে ভ্রম ভ্রম করে চারিদিকে সার্ভে করে ফেলদাদা মন্দিরের ভেতর ঢুকল। ঘনি সাহস ফেলদাদার। বাইরের থেকে মন্দিরের ভেতরটা অন্ধকূলের মতো মনে হয়। এককালে নাকি দশভুজার মূর্তি ছিল, কালাপাহাড়ের দৌলতে সে মূর্তির মাথা, চারটে হাত আর পেটের খানিকটা কাটা যায়। সেই থেকে মন্দিরের নাম হয়ে যায় পেটকাটি বা কাটা ঠাকুরানীর মন্দির। এখন ওর ভিতরে নির্ঘাৎ মাপ, তরুণ আর গিরগিটির বাসা। তাও ফেলদাদা নির্বিকারে মন্দিরের ভিতর ঢুকে সার্ভে করে মিনিটখানেক পরে বোরিয়ে এসে রহস্যজনকভাবে বলল, 'ভাল্লভ ব্যাপার। আলো পেতে হলে যে অন্ধকারে প্রবেশ করতে হয় তা এই প্রথম জানলাম।'

'কী মশাই, ডার্কনেস গন?' বলে উঠলেন লালমোহনবাবু।

'খানিকটা', বলল ফেলদাদা, 'অমাবস্যার পর প্রতিপদের চাঁদ বলতে পারেন।'

'তাহলে ত খোলকলা পুরতে এখনো অনেকদিন মশাই।'

'আপনি শব্দ চাঁদের কথা ভাবছেন কেন? সূর্য বলেও ত একটা জিনিস আছে। রাতটা কেটে গেলেই ত তার দেখা পাওয়ার কথা।'

'কালই, তার মানে, ক্রাইম্যান বলছেন?'

'আমি আর কিছুই বলছি না লালমোহনবাবু, শব্দ বলছি যে এই প্রথম একটা আলোয় আভাস দেখতে পাচ্ছি। চ তেঃগনে, ব্যাড্ চ।'

আমরা বেরিয়েছিলাম দশটার, ফিরতে ফিরতে হল প্রায় সাড়ে বারোটা। ফেলদাদা তলোয়ারটা সোজা মহীতোষবাবুর হাতে তুলে দেবে বলে ঠিক করেছিল, কিন্তু এসে শুনলাম উনি আর শশাঙ্কবাবু বেরিয়ে গেছেন। বনবিভাগের বড় কতী নাকি এসে কালবুর্নি ফরেষ্ট বাংলোতে রয়েছেন, সেখানেই গেছেন। কাজেই তলোয়ারটা এখন আমাদের ঘরে, আমাদেরই কাছে।

ঘরে আসার আগে অবিশিষ্ট আমরা একতলার কিছুটা সময় কাটিয়ে এসেছি। ফেলদাদার মাথায় কী যেন ঘুরাছিল; ও দোতলার না গিয়ে সোজা চলে গেল ট্রোফি রুমে। সেই যেখানে জানোয়ারের ছাল আর মাথাগুলো রয়েছে, আর র্যাকে রাখা রয়েছে বন্দুকগুলো। ফেলদাদা র্যাক থেকে একটা একটা করে বন্দুক নামিয়ে সেগুলো খুব মন দিয়ে দেখল। বন্দুকের নল, বন্দুকের বাঁটি, বন্দুকের ট্রিগার, সেফটি ক্যাচ—প্রত্যেকটা জিনিস ও খুব মন দিয়ে পরীক্ষা করে দেখল। লালমোহনবাবু কী যেন একটা বলতে গিয়েছিলেন, কিন্তু ফেলদাদা তাকে থমকে থামিয়ে দিল।

‘এখন কথা বলার সময় নয় লালমোহনবাবু, এখন চিন্তা করার সময়।’

লালমোহনবাবু এতদিনে ফেলদাদার মতিগতি খুব ভালোভাবেই জেনে গেছেন, তাই আর স্বিকৃতির মত খুসি হলেন না।

দোতলার উঠে বারান্দা দিয়ে আমাদের ঘরের দিকে যেতে ফেলদাদা থমকে থেমে গেল। তার দৃষ্টি দেবতোষবাবুর ঘরের দিকে।

‘সেকি, দাদার ঘরে তালা কেন?’

সত্যিই ত! ভদ্রলোক ঘর ছেড়ে গেলেন কোথায়? আর তালা লাগিয়ে যাবারই বা কারণটা কী?

ফেলদাদা কী ভাবল জানি না। মনে কিছুই বলল না। আমরা আমাদের ঘরে গিয়ে হাজির হলাম।

ফেলদাদার এখনকার অবস্থাটা আমার খুব চেনা। জটিল রহস্যের জট ছাড়ানোর প্রথম অবস্থায় ওর ভাবটা এরকমই হয়। দু’ মিনিট

ভুরু কুঁচকে চুপ করে বসে থেকেই আবার উঠে দাঁড়াল, তারপর খানিকটা পাশচারি করে আবার হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে মাথা হেঁটে করে চোখ বুজে ডান হাতের মাঝের আঙুলের ডগা দিয়ে কপালে আস্তে আস্তে টোকা মারা, তারপর আবার হাঁটা, আবার বসা—এই রকম আর কি। এইভাবেই একবার খাট ছেড়ে উঠে পাশচারি শুরু করে হঠাৎ থেমে গিয়ে বলল, 'কেউ যখন নেই, আর দেবতোষবাবুর ঘর যখন বন্ধ, তখন এই ফাঁকে একটু চোরা অনুসন্ধান চালালে বোধহয় মন্দ হয় না।'

কথাটা বলে ফেলুদা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আর্মি দরজা দিয়ে গলা বাড়িয়ে দেখলাম, ও এদিক ওদিক দেখে মহীতোষবাবুর কাজের ঘরে ঢুকল।

বাঘের পায়ের ছাপ দেখে অবধি লালমোহনবাবুর সাহস অনেকটা বেড়ে গেছে। উনি এখন দিবা বাঘছালটার উপর চিড় হয়ে শূরে বাঘের মাথাটা বাগিশের মতো ব্যবহার করছেন। এইভাবে কিছুক্ষণ সিলিং-এর দিকে চেয়ে থেকে বললেন, 'কী শুভক্ষণেই বইটা মহীতোষবাবুকে উৎসর্গ করেছিলাম বল ত। এমন একটা প্রিলিং অভিজ্ঞতা কি না হলে হত? আজ সকালের কথাটাই চিন্তা কর—বাঁশের ভেতর বুলেট, ঘাসের মধ্যে সাপ, রয়েল বেঙ্গলের পায়ের ছাপ, গোড়ো মন্দির, গুপ্তধন, জরাগ্রস্ত অশ্ব গাছ—আর কত চাই? এখন একবারটি ম্যানস্টারের মুখোমুখি পড়তে পারলেই অভিজ্ঞতা কম্প্লীট।'

'শেষেরটা কি সত্যি করেই চাইছেন আপনি?' আর্মি জিগ্যেস করলাম।

'আর ভয় নেই', একটা বিরাট হাই তুলে বললেন লালমোহনবাবু, 'মাধবলাল শিকারী আর ফেলু মিস্তির শিকারী দু'পাশে থাকলে মানুষকে কোর বাপের সাক্ষ্য নেই কিছু করে।'

লালমোহনবাবু প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, আর আর্মি মহীতোষবাবুর শিকারের বইটা পড়ছিলেন, এমন সময় ফেলুদা ফিরে এল।

'কিছু পেলেন?'

ফেলুদার পায়ের আওয়াজ পেয়েই লালমোহনবাবু সোজা হয়ে বসেছেন।

ফেলুদা গম্ভীর। বলল, 'যা খুঁজছিলাম তা পাইনি, আর সেটাই সিগনিফিক্যান্ট।'

তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে জানালার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থেকে বলল, 'যুর্দিষ্ঠিরের রথের চাকা মাটিতে ঠেকল কেন জানেন ত

লালমোহনবাবু ?

‘সেই অশ্বখামা হত ইতি গজ-র ব্যাপার ত ?’

‘হ্যাঁ। বুদ্ধিমানের পুরোপুরি সত্যি কথা বলেননি তাই। কিন্তু আজকের দিনে মিথ্যে বললেই যে চাক। মাটিতে ঠেকে যাবে এমন কোনো কথা নেই। এ বৃগে মানুষের দোষের শাস্তি মানুষই দিতে পারে, ভগবান নয়।’

এর পরে একটা জীপের আওয়ার পাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই চাকর এসে খবর দিল যে, ভাত বাড়ি হয়েছে, বাবু এসেছেন, খেতে ডাকছেন।

মহীতোষবাবুর বাড়িতে খাওয়াটা ভালোই হয়। সব সময় হয় বি. না জানি না, কিন্তু আমরা যে ক’দিন রয়েছি সে ক’দিন রোজই মুরগি হয়েছে। কাল রাতে বিলিতি কায়দায় রোস্ট হয়েছিল, লালমোহনবাবু কাটা চামচ ম্যানেজ করতে পারছেন না দেখে মহীতোষবাবু বললেন যে, পাখির মাংস হাত দিয়ে খেলে নাকি কেতার কোনো ভুল হয় না। আজকেও খাওয়ার তোড়জোড় ভালোই ছিল, কিন্তু প্রথম থেকেই কষাবাতি এমন গুরুগম্ভীর মেজাজে শুরু হল যে খাওয়ার দিকে বেশি নজর দেওয়া হল না। আমরা খাবার ঘরে ঢুকতেই মহীতোষবাবু বললেন, ‘মিস্টার মিস্ত্রি, সংকেতের ব্যাপারটা যখন চুকেই গেছে, তখন ত আর আপনাদের এখানে ঘরে রাখার কোনো মানে হয় না। কাজেই আপনি যদি বলেন তাহলে আপনাদের ফেরার বন্দোবস্ত আমার লোক করে দিতে পারে। জলপাইগুড়িতে লোক যাচ্ছে, আপনাদের রিজার্ভেশনটা করে আনতে পারে।’

ফেলুদা কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে বলল, ‘আমাদের দিক থেকেও আপনার আতিথেয়তার সুযোগ আর নেবো না বলেই ভাবছিলাম। তবে আপনার যদি খুব বেশি আপত্তি না থাকে তাহলে আজকের দিনটা থেকে কাল রওনা হতে পারি। বৃকতেই ত পারছেন, আমি গোয়েন্দা মানুষ, আমি থাকতে থাকতে একজন এভাবে খুন হলেন, তার একটা কিনারা না করে যেতে পারলে মনটা খুঁতখুঁত করবে। আমিই করি, বা পলিশই করুক, কীভাবে ঘটনাটা ঘটল সেটা জেনে যেতে পারলে ভাল হত।’

মহীতোষবাবু খাওয়া বন্ধ করে ফেলুদার দিকে সোজা তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, ‘সুস্থ মস্তিষ্কে খুন করতে পারে এমন লোক আমার বাড়িতে কেউ নেই, মিস্টার মিস্ত্রি।’

ফেলুদা যেন কথাটা গায়েই করল না। বলল, ‘আপনার দাদাকে কি অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়েছে? ঠিক ঘরে তালা দেখছিলাম।’

মহীতোষবাবু সেইরকম গম্ভীরভাবেই বললেন, 'দাদা যথেষ্ট আছেন। তবে কাল রাত থেকে ঠুর একটু বাড়াবাড়ি যাচ্ছে। ওষুধ খাননি। তাই ঠুর একটু সংযত করে রাখা দরকার। নইলে আপনাদেরও বিপদ আসতে পারে। আপনারাও ত মোতলাতেই থাকেন। উনি বাইরের লোককে এমনিতেই সন্দেহের চোখে দেখেন। শুধু তাই না, যে সব ঐতিহাসিক চরিত্র সম্পর্কে ঠুর মনে বিরূপ ভাব আছে, বাইরের লোককে সেইসব চরিত্র বা তাদের অনুচর বলে কল্পনা করেন। তড়িৎতে ত কালাপাহাড় ভেবে একদিন ঠুর টুটি টিপে ধরেছিলেন। শেষটার মশখ গিয়ে কোনোমতে ছাড়ার।'

ফেলুদা খাওয়া না খামিয়ে দিবি স্বাভাবিকভাবে বলল, 'তড়িৎবাবুর খুন হওয়াটাই কিন্তু একমাত্র ঘটনা নয়। আপনার গুস্ত-ধনও কে যেন সরিয়ে ফেলেছে। খুব সম্ভবত সেই একই ব্যক্তি।'

'সে কি!—এবার মহীতোষবাবুর মৃত্যুর গ্রাস আর মৃত্যু পর্যন্ত পৌঁছল না—গুস্তধন নেই? আপনি দেখে এসেছেন?'

'হ্যাঁ। গুস্তধন নেই, তবে ভলোয়ারটা পাওয়া গেছে। আর তাকে রক্তের দাগও পাওয়া গেছে।'

মহীতোষবাবু বেশ কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে বসে রইলেন। এবার ফেলুদা তার তৃতীয় বোম্বাটা দাগল।

'তড়িৎবাবুকে বখন বাঘে খাচ্ছিল, তখন সেই বাঘের দিকে তাক করে কেউ একটা গর্দিল ছোঁড়ে। সেটা বাঁশের গর্দিতে লাগে। গর্দিলটা সম্ভবত বাঘের গা ঘেঁষে গিয়েছিল, কারণ বাঘের কিছু লোম পাওয়া গেছে, ঘাঁটিতে পড়ে ছিল। কাল্পেই মনে হচ্ছে সে ব্যক্তি বেশ কয়েকজন লোক বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে জঙ্গলের একটা বিশেষ অংশে ঘোরাফেরা করছিল।'

'পোচার।'

কথাটা অপ্রত্যাশিতভাবে বলে উঠলেন শশাঙ্কবাবু। পোচার মানে যে চোরা শিকারী সেটা জানতাম। শিকারের বিরুদ্ধে আইন পাশ হবার পরেও এরা লুকিয়ে লুকিয়ে শিকার করে বাঘের চামড়া, হরিণের সিং, গন্ডারের সিং, এইসব বিক্রি করে। এমন কি বাঘ-ভাল্লুকের বাচ্চা ধরেও মাঝে মাঝে বিক্রি করে।

শশাঙ্কবাবু বলে চললেন, 'তড়িৎকে যে-ই খুন করে থাকুক, তাকে বাঘে ধরে নিয়ে যাবার পর জঙ্গলে নিশ্চয়ই কোনো পোচার ঢোকে। পোচারই বাঘটাকে গর্দিল করেছিল, যে গর্দিল বাঘের গায়ে আঁচড় কেটে বাঁশের গর্দিতে লেগেছিল।'

ফেলুদা ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বলল, 'সেটা অবিশিষ্ট্য অসম্ভব নয়। কাজেই বন্দুকের ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের না ভাবলেও চলবে। কিন্তু অন্য দুটো রহস্য রয়েছেই থাকে।'

'দুটো নয়, একটা', বললেন মহীতোষবাবু। 'গুরুত্বপূর্ণ। ওটা পাওয়া দরকার। ওটা না পেলে সিংহরায় বংশের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ওটা পেতেই হবে।'

'তাহলে এক কাজ করুন না কেন', ফেলুদা বলল, 'আমরা সবাই চলুন আরেকটিবার ওখানে যাই। জায়গাটা হল কাটা ঠাকুরানীর মন্দিরের পাশে।'

মহীতোষবাবু জঙ্গল অভিযানে আপীতি করেননি। কিন্তু হলে কী হবে, বিকেল সাড়ে তিনটে থেকে চারিদিক অন্ধকার করে মুষল-ধারে বৃষ্টি নামল। সম্ভ্রান্ত পর্বন্ত যখন সে বৃষ্টি থামল না, তখন আমরা জঙ্গলে বাবার আশা ত্যাগ করলাম। ফেলুদা গম্ভীর থেকে এখন একেবারে গোমড়া হয়ে গেছে। মহীতোষবাবু যে আমরা চলে গেলে খুশি হন সেটা ঠিক কথার পরিষ্কার বোঝা গেছে। কালও যদি খারাপ থাকে তাহলে হয়ত ফেলুদাকে তড়িৎবাবুর খুনের রহস্য সমাধান না করেই চলে যেতে হবে। অবিশিষ্ট্য আরেকবার কাটা ঠাকুরানীর মন্দিরে গেলেই যে ফেলুদার মনের অন্ধকার কীভাবে দূর হবে তা জানি না। তবে ও যে মনে মনে খানিকটা আগ্রহ হ্রাস হয়েছে সেটা ওর চোখ মাঝে মাঝে যেভাবে জ্বলে উঠেছিল তা থেকেই বুঝতে পারছিলাম।

এর মধ্যে আমরা তিনজনেই একবার বাইরের বারান্দার বোরিয়ে-ছিলাম। তখন গ্র্যান্ডফাদার ক্রকে সাড়ে পাঁচটা বেজেছে। তখনও দেখলাম দেবতোষবাবুর ঘরের দরজা বন্ধ। লালমোহনবাবু ফিসফিস করে বললেন, 'একবার খড়খড়ি ফাঁক করে দেখে এলে হত না ভদ্রলোক কী করছেন! এ তুম্বাটে ড কেউ নেই বলেই মনে হচ্ছে।'

ফেলুদা অবিশিষ্ট্য লালমোহনবাবুর অনেক কথার মতোই এটা-তেও কান দিল না।

সাতটার সময় মেঘ কেটে গিয়ে আকাশে তারা দেখা দিল। মনে হচ্ছিল কুচকুচে কালো আকাশের গায়ে তারাগুলো এই মাঠ পালিশ করে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফেলুদা হাতে জলোয়ার নিয়ে খাটে বসে আছে। আমরা দু'জনে সবে জানাটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় লালমোহনবাবু আমার শাওঁর আশ্রিতনটা খামচে ধরে

ফিসফিস গলার বললেন, 'সবু টর্চ!'

দারোয়ানের বাড়িটা আমাদের জানালা থেকে দেখা যায়। আমাদের বাড়ি আর ওর বাড়ির মাঝামাঝি একটা গোলাগত গাছ। তার নিচে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। আরেকটা টর্চওয়ালা লোক সেই লোকটার দিকে এগিয়ে গেল। এটা সেই ধরনের টর্চ যেগুলো বাড়ির প্লাগ পরেলেই গন্ধে দিলে চার্জ হয়ে থাকে। ছোট্ট বালব, ছোট্ট কাচের মুখ, কিন্তু আলোর বেশ তেজ।

এবার ফেলুদা ঘরের বাড়িটা নির্ভিয়ে দিয়ে আমাদের পাশে এসে দাঁড়াল।

'মাধবলাল', ফেলুদা ফিসফিস করে বলল।

যে লোকটা অপেক্ষা করছিল তাকে আমারও মাধবলাল বলে মনে হয়েছিল, কারণ এই অন্ধকারেও হলদে শার্টের কণ্ঠটা আবছা আবছা বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু যে লোকটার হাতে টর্চ সে যে কে তা বোঝা ভারি মুশকিল। সে মহীতোষবাবুও হতে পারে, ঠিক দাদাও হতে পারে, শশাঙ্কবাবুও হতে পারে, আবার অন্য লোকও হতে পারে।

এখন টর্চের আলো নিভে গেছে। কিন্তু দুজনে দাঁড়িয়ে যে খুব নীচু গলার কথা বলছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিছুক্ষণ পর হলদে শার্টটা নড়ে উঠল। তারপর টর্চের আলোটা জ্বলে উঠে আমাদের বাড়ির দিকে চলে এল। ফেলুদা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ঘরের বাড়িটা ঝুলিয়ে দিল।

লালমোহনবাবু বোধহয় নিজেই নিজের মনের মতো করে গোয়েন্দাগিরি চালিয়ে যাচ্ছেন, তাই তিনি হঠাৎ এক ফাঁকে বাগান্দার বোরিয়ে কী জানি দেখে এলেন।

'কী দেখলেন? দরজায় এখনো ডালা?' ফেলুদা জিগোস করল।

'হ্যাঁ।' লালমোহনবাবু অপ্রস্তুত হাসি হেসে বললেন।

'আপনার কি ধারণা উনিই গিয়েছিলেন মাধবলালের সঙ্গে কথা বলতে?'

'আমি শু গোড়াতেই বলেছি মশাই, দাদাটিকে আমার ভাল লাগছে না। পাগল জিনিসটা বড়ো ডেঞ্জারাস। আমাদের নর্থ ক্যাল-কাটায় এক পাগল ছিল, সে আপনার সারকুলার রোডের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে ট্রাম আর বাস লক্ষ্য করে বেমত্যা ঢিল ছুঁড়ত। কী ডেঞ্জারাস বলুন ত!'

'দেবতোষবাবুর দরজা বন্ধতে কী প্রমাণ হল?'

‘তার মানে ভদ্রলোক নিচে বাননি।’

‘কী করে প্রমাণ হয় সেটা; ভদ্রলোক আদৌ ঐ তাল্লা-বন্ধ দরজার পিছনে আছেন কিনা সেটা আপনি কী করে জানলেন? সারাদিনে তাঁর কোনো সাড়াশব্দ পেয়েছেন কি?’

লালমোহনবাবু যেন বেশ খানিকটা দমে গেলেন। একটা দীর্ঘ-শ্বাস ফেলে বললেন, ‘মশাই, কত চেষ্টা করি আমার চিন্তা ঠিক আপনার চিন্তার সঙ্গে এক লাইনে চালাব—কোথায় যেন গাঙগোল হয়ে যায়।’

‘গাঙগোল না। কোলিশন। আপনি উল্টো পথে চলেন কিনা। আপনি আগে ক্রিমিনাল ঠিক করে নিয়ে তারপর তার ঘাড়ে ক্রাইমটা বসাতে চেষ্টা করেন, আর আমি ক্রাইমের খাঁচটা বৃথে নিয়ে সেই অনুযায়ী ক্রিমিন্যাল খোঁজার চেষ্টা করি।’

‘এই ব্যাপারেও তাই করছেন?’

‘ও ছাড়া ত আর রাস্তা নেই লালমোহনবাবু।’

‘কোনখান থেকে শুরু করেছেন?’

‘কুরুক্ষেত্র।’

এর পরে আর লালমোহনবাবু কোনো প্রশ্ন করেননি।

আমাদের মশারি বদলে দেওয়াতে ঘুমটা ভালোই হাঁড়িল, কিন্তু মাঝরাতিরে একটা চিংকারে ঘুম ভেঙে খড়মড় করে উঠে বসতে হল। চিংকারটা করেছে ফেলুদা। জেগে দেখি ও দাঁড়িয়ে আছে ঘরের মাঝখানে, হাতে রয়েছে আদিত্যনারায়ণের তলোয়ার। বাইরে থেকে চাঁদের আলো এসে ইম্পাভের ফলাটার উপর পড়াতে সেটা ঝিলিক মারছে। যে কথাটা শূনে ঘুমটা ভেঙেছিল সেটা ফেলুদা আরো দু’বার বলল, তবে অত চেঁচিয়ে নয়। ‘ইউরেকা! ইউরেকা!’

আর্কিমিডিস কী যেন একটা আবিষ্কার করে উল্লাসের সঙ্গে এই গ্রীক কথাটা বলে উঠেছিল। তার মানে হল ‘পেরেছি।’ ফেলুদা যে কী পেয়েছে সেটা বোঝা গেল না।

সকালে চ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শশাঙ্কবাবু আমাদের ঘরে এলেন দেখে বেশ একটু অবাক লাগল। ফেলদা ভদ্রলোককে বেশ খাতির-টাতির করে বসতে বলে বলল, 'আপনার সঙ্গে আর আলাপই হল না ঠিক করে। মহীতোষবাবুর বন্ধু হিসেবে আপনারও নিশ্চয়ই অনেক রকম অভিজ্ঞতা হয়েছে।'

শশাঙ্কবাবু টেবিলের সামনে চেয়ারটার বসে বললেন, 'অভিজ্ঞতার শুরু কি সেই আজকে? মহীর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব পঞ্চাশ বছরের উপর। সেই ইস্কুল থেকে।'

'আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

'মহীতোষ সম্পর্কে?'

'না। ডিঙিবাবু সম্পর্কে।'

'বলুন।'

'আপনার মতে উনি কেমন লোক ছিলেন?'

'চমৎকার। অত্যন্ত বুদ্ধিমান, অত্যন্ত ধীর প্রকৃতির যুবক ছিল ডিঙি।'

'আর কাজের দিক দিয়ে?'

'অসাধারণ।'

'আমারও তাই ধারণা...'

এবার শশাঙ্কবাবু ফেলদার দিকে সোজা দৃষ্টি দিচ্ছে বললেন, 'আমি আপনাকে একটা অনুরোধ করতে চাই।'

'বলুন।'

শশাঙ্কবাবুকে এই প্রথম সিগারেট খেতে দেখলাম। ফেলদারই দেওয়া একটা চারমিনার ধরিয়ে একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'এই তিন দিনে আপনার অনেক রকম অভিজ্ঞতা হল। আপনি নিজেও বুদ্ধিমান, তাই সাধারণ লোকের চেয়ে নিশ্চয়ই অনেক বেশি দেখেছেন, শুনছেন, বুঝেছেন। আজ হরত আপনার এখানে শেষ দিন। আজ কী ঘটেছে তা জানি না। যাই ঘটুক না কেন, এই বিশেষ জায়গার এই বিশেষ জমিদার পরিবারটি সম্বন্ধে আপনি যা জেনে

গেলেন, সেটা যদি আপনি গোপন রাখতে পারেন, এবং আপনার এই বন্ধুটিকেও গোপন রাখতে বলেন, তাহলে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ বোধ করব। আমি জানি মহীতোষও এটাই চাইবে। বাংলাদেশের প্রায় যে কোনো জমিদার বংশের ইতিহাস ঘটিলেই অনেক সব অশুভ অপ্রিয় ঘটনা বেরিয়ে পড়বে সে ত আপনি জানেন। সেরকম সিংহ-রায় বংশের ইতিহাসেও অনেক অপ্রিয় তথ্য লুকিয়ে আছে সেটা বলাই বাহুল্য।’

ফেলুদা বলল, ‘শশাঙ্কবাবু, আমি তিন দিন ধরে মহীতোষবাবুর আতিথেয়তা ভোগ করেছি। সে কারণে আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। আমি কলকাতায় গিয়ে সিংহরায় পরিবার সম্পর্কে বদনাম রটাব, এটা কখনো হবে না। এ আমি কথা দিতে পারি।’

এর পর একটা প্রশ্ন ফেলুদা বোধহয় না করে পারল না।

‘দেবতোষবাবুর ঘরের দরজা কাল থেকে বন্ধ দেখছি। এ ব্যাপারে আপনি কোনো আলোকপাত করতে পারেন কি?’

শশাঙ্কবাবু একটা অশুভ দৃষ্টিতে ফেলুদার দিকে চাইলেন। তারপর বললেন, ‘আমার বিশ্বাস আজকের দিনটা ঘুরোবার আগে আপনিই পারবেন।’

‘পুলিশ কি তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে?’

‘উহু।’

‘সে কি! হঠাৎ বন্ধ করার কারণটা কি?’

‘যার উপর সন্দেহটা পড়ছে, মহীতোষ চায় না যে পুলিশ তাকে কোনোরকমভাবে বিস্তৃত করে।’

‘আপনি দেবতোষবাবুর কথা বলছেন?’

‘আর কে আছে বলুন?’

‘কিন্তু দেবতোষবাবু যদি খুন করেও থাকেন, তিনি ত আর অভিযুক্ত হবেন না, কারণ তাঁর ত মাথা খারাপ।’

‘তা হলেও, ব্যাপারটা প্রচার হয়ে পড়বে ত! মহীতোষ সেটাও চায় না।’

‘সিংহরায় বংশের মর্দাদা স্বাক্ষর জন্য?’

‘ধরুন যদি তাই হয়!’—বলে শশাঙ্কবাবু উঠে পড়লেন।

সাড়ে আটটার মধ্যে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। আজও প্রথম দিনের মতো দুটো জীপ। একটায় ফেলুদা, লালমোহনবাবু আর আমি, অন্যটায় মহীতোষবাবু, শশাঙ্কবাবু, মাধবলাল আর মহী-

তোষবাবু একজন বেয়ারা। আজ আমাদের সঙ্গে তিনটে বন্দুক। একটা নিয়েছে মাধবলাল, একটা মহীতোষবাবু, আর একটা—ফেলদা। বন্দুক নেবার ইচ্ছেটা ফেলদাই প্রকাশ করল। ফেলদার রিভলভার চালানোর কথা মাধবলালই মহীতোষবাবুকে খুব ফলাও করে বলেছিল, তাই বন্দুক চাইতে মহীতোষবাবু আর আপত্তি করলেন না। বললেন, ‘আপনার শ্রুতিমতো একটা বেছে নিন। বাঘের জন্যই যদি হয় ত শ্লি-সেভেন-ফাইফটা নিতে পারেন।’ ওসব নম্বর-টম্বল আমি বুঝি না, তবে বেশ জবরদস্ত রাইফেল সেটা দেখে বুঝতে পারছি।

লালমোহনবাবুর মধ্যেও একটা চাপা উত্তেজনার ভাব, কারণ ফেলদা তার হাতে আদিত্যনারায়ণের তলোয়ারটা ধরিয়ে দিয়েছে। দেবার সময় বলল, ‘একদম হাতছাড়া করবেন না। আজকের নাটকে ওটার একটা বিশেষ ভূমিকা আছে।’

ভোরে যখন উঠেছিলাম তখন আকাশ মোটামুটি পরিষ্কার ছিল, কিন্তু এখন আবার মেঘ করে এসেছে। কালকের বৃষ্টির ফলে রাস্তায় কাদা হয়েছিল, তাই আমাদের পেঁপেতে খানিকটা বেশি সময় লাগল। কাটা ঠাকুরানীর মন্দির একেবারে জঙ্গলের ভিতরে, জীপ অতদূর যাবে না। কাল যেখানে নেমেছিলাম আজ সেখান থেকে প্রায় আরো আধ মাইল ভিতরে গিয়ে আমাদের জীপ থামল। মাধবলাল রাস্তা চেনে; সে বলল, ‘সামনে একটা নালা পেরিয়ে মিনিট পনের হাটলেই আমরা মন্দিরে পেঁপে যাব।’

অল্প অল্প মেঘের গর্জন আর গাছের পাতা কাঁপানো ঝিরঝিরে বাতাসের মধ্যে আমাদের অভিযান শুরু হল। গাড়ি থেকে নামবার আগেই ফেলদা রাইফেলে টোটো ভরে নিয়েছে। মহীতোষবাবু নিজে তার বন্দুকটা নেননি; ওটা রয়েছে বেয়ারা পর্বত সিং-এর হাতে। পর্বত সিং নাকি সব সময়ে মহীতোষবাবুর সঙ্গে শিকারে গেছে। বেঁটেখাটো গাটোগোটা চেহারা, দেখলেই ঝাঝা যার গায়ে অসম্ভব জোর।

আজ খানিকদূর হাটার পরই দূরে একপাল হরিণ দেখে মনটা নেচে ওঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বুকটা ধড়াস করে উঠল। এই জঙ্গলের মধ্যেই কোথাও হয়ত সেই মানুষখেকো বাঘটা রয়েছে। এমনিতে বাঘ নাকি শিকারের খোঁজে রোজ অক্লেশে পঁচিশ-তেরিশ মাইল হেঁটে এ বন থেকে ও বন চলে যায়। কিন্তু এ বাঘ যদি জখমী বাঘ হয়ে থাকে তাহলে হয়ত তার পক্ষে বেশি দূর হাটা সম্ভবই না। আর এমনিতেই জঙ্গল আর আগের মতো বড় আর ছড়ানো নেই। গত

বিশ-পঁচিশ বছরে মাইলের পর মাইল গাছ কেটে ফেলে সেখানে চাষের জাঁম হয়েছে, চা বাগান হয়েছে, লোকের বসতি হয়েছে। কাজেই বাঘ যে খুব দূরে চলে যাবে সে সম্ভাবনা কম। দিনের বেলা বাঘ সাধারণত বেয়োয় না এটা ঠিক; কিন্তু মেঘলা দিনে নাকি বেয়োন অসম্ভব না। এ ব্যাপারটা কালকেই ফেলুদা আমাকে বলেছে।

যে নালাটা আজ আমাদের পেরোতে হল সেটা কালকেও পেরিয়েছি। কাল প্রায় শূন্য ছিল, আজ কুলকুল করে জল বইছে। নালার ধারে বালি, তাতে জানোয়ারের পায়ের ছাপ। বাঘ নেই, তবে হরিণ, শূয়োর আর হাইনার পায়ের ছাপ মাধবলাল চিনিয়ে দিল। আমরা নালা পেরিয়ে, ওপারের বনের মধ্যে ঢুকলাম। একটা কাঠ-ঠোকরা মাঝে মাঝে ডেকে উঠছে, দূর থেকে একটা ময়ূরের ডাক শুনতে পাচ্ছি, আর কয়েকটা ঝিঁঝি ঝমাগত ডেকে চলেছে। পায়ের সামনে ঘাসের উপর মাঝে মাঝে সড়াং সড়াং শব্দ পাচ্ছি, আর বৃক্ষতে পার্শ্বি যে গিরগিটির দল মানুষের পায়ের তল্যায় পিবে বাবার ভয়ে এক ঝোপড়া থেকে আরেক ঝোপড়ার পিছনে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে।

ক্বে আমরা আমাদের চেনা জায়গায় পৌঁছে গেলাম। কাল এখানে এসেছিলাম অন্য পথ দিয়ে। এই যে সেই তলোয়ারের জায়গা। আমাদের দলপতি মাধবলাল অত্যন্ত সাবধানে শব্দ না করে পা ফেলে এগিয়ে চলেছে, আর বাকি সকলে তার দেখাদেখি সেই ভাবেই চলার চেষ্টা করছি। মাটি এমনিতেই ভিজ়ে নরম হয়ে আছে, শূকনো পাতা প্রায় নেই বললেই চলে, তাই সাতজন লোক একসঙ্গে হাঁটা সত্ত্বেও প্রায় কোনো শব্দই হচ্ছিল না।

নামনের গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে ইঁটের পাঁজা দেখা যাচ্ছে। কাটা ঠাকুরানীর ফাটা মন্দির।

একজনও একটাও কথা না বলে একটুও শব্দ না করে মন্দিরের সামনে পৌঁছে গেলাম। সকলে থামল। সেদিন শূন্য ফোকলা ফাঁকির গাছ, অজুঁন গাছ আর জোড়া তাল গাছের দিকে লক্ষ্য ছিল বলে আশেপাশে যে আরো কতরকম গাছ আছে সেটা খেয়াল করিনি। সেই সব গাছের ফাঁক দিয়ে ঝিরঝির করে বাতাস আসছে, আর আসছে নালার কুলকুল শব্দ। মন্দিরের পিছন দিকেই নালা। ওই নালার জল খেতে আসে জম্ভু জানোয়ার। বাঘও আসে। মানুষখেকোও।

ফেলুদা অজুঁন আর জোড়া তালের মাঝখানে গর্তটার দিকে এগিয়ে গেল। মহীতোষবাবুও গেলেন পিছন পিছন। আজ গর্তে আরো বেশি জল। ফেলুদা সোঁদকে আঙুল দেখিয়ে নিস্তব্ধতা ভেঙে

দিয়ে প্রথম কথা বলল।

‘এই গর্তে ছিল আদিত্যনারায়ণের গদ্যতখন।’

‘কিন্তু...সেটা মেল কোথায়?’ চাণা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন মহীতোষবাবু।

‘কাছাকাছির মধ্যেই আছে, যদি না কালকের মধ্যে কেউ সেটা সরিয়ে থাকে।’

মহীতোষবাবুর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল।

‘আছে? আপনি সত্যি বলছেন আছে?’

‘আপনি জানেন সে গদ্যতখন কী জিনিস?’ ফেলুদা পালাটা প্রশ্ন করল।

উত্তরনাথ মহীতোষবাবুর কপালের শিরা ফুলে উঠেছে, চোখ দুখ লাল হয়ে গেছে। বললেন, ‘না জানলেও অনুমান করতে পারি। আমার পূর্বপুরুষ যশোবন্ত সিংহরায় ছিলেন কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণ ভূপের সেনাধ্যক্ষ। যশোবন্তের উপার্জিত টাকা—নরনারায়ণের নিজের টাকালালের টাকা—যার নাম ছিল নারায়ণী টাকা—সেই টাকা ছিল আমাদের বাড়িতে। এক হাজারের উপর রৌপ্যমুদ্রা, চারশো বছরের পুরোন। আদিত্যনারায়ণ যখন এ টাকা লুকিয়ে রাখেন, তখন তাঁর মাথা ধরাপ হতে শুরু করেছে—ষাট বছর বয়সে ছেলেমানুষী দৃষ্টবুদ্ধি খেলছে। তিনি যারা যাবার পর সে টাকা খুঁজেও আর পাওয়া যায়নি। এতদিনে এই সংকেত তার সম্ভান দিয়েছে। ও টাকা আমার চাই মিস্টার মিস্তির, ওটা হারালে চলবে না।’

ফেলুদা মহীতোষবাবুর দিক থেকে ঘুরে মন্দিরের দিকে এগোচ্ছে। মন্দিরের কাছাকাছি পৌঁছে হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বলল, ‘তোপসে, বন্দুকটা ধর ত। মন্দিরের ভিতর রিভলভারই কাজ দেবে।’

আমার হাত কাঁপতে শুরু করেছে। কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বন্দুকটা হাতে নিলাম। জিনিসটা যে এত অসম্ভব রকম ভারি সেটা দেখে বুঝতে পারিনি।

ফেলুদা মন্দিরের ভাঙা দরজা দিয়ে অধিকারের ভিতর ঢুকল। চৌকাঠ পেরোনোর সময় লক্ষ্য করলাম, ও পকেটে হাত ঢোকাল।

পাঁচ গোনার মধ্যেই পর পর দু'বার রিভলভারের আওয়াজে আমার গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেল। তারপর মন্দিরের ভিতর থেকে ফেলুদার কথা শোনা গেল।

‘মহীতোষবাবু, আপনার লোকটিকে একবার পাঠান ত।’

পর্বত সিং বন্দুকটা তার মনিবের হাতে দিয়ে মন্দিরের ভিতরে ঢুকে এক মিনিটের মধ্যেই একটা সর্বাঙ্গ কাদা-মাথা পিতলের ঘড়া নিয়ে বেরিয়ে এল, তার পিছনে ফেলুদা। মহীতোষবাবু পর্বত সিং-এর দিকে ছুটে গেলেন। ফেলুদা বলল, 'কেউটের যে রৌপ্যমুদ্রার প্রতি মোহ থাকতে পারে এটা ভাবিনি। কালই শিসের শব্দ পেয়ে-ছিলাম, আজ দেখি ঘড়াটাকে সন্মুখে আলিঙ্গন করে পড়ে আছেন বাবাজী।'

মহীতোষবাবু হাত থেকে বন্দুক ফেলে দিয়ে সেই ঘড়াটার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে তার ভিতর থেকে সবে একমুঠো রূপোর টাকা বার করেছেন, এমন সময় একটা কাকর হরিণ ডেকে উঠল। আর তার ঠিক পরেই এক সঙ্গে অনেকগুলো বানর আশপাশের গাছ থেকে চেঁচাতে আরম্ভ করল।

তারপরে কয়েক মূহূর্তের মধ্যে এতগুলো ঘটনা একসঙ্গে ঘটে গেল যে ভাবতেও মন বাঁধিয়ে যায়। প্রথমে মহীতোষবাবুর মধ্যে একটা আশ্চর্য পরিবর্তন দেখা গেল। এক মূহূর্ত আগে যিনি এক-সঙ্গে এতগুলো রূপোর টাকা দেখে আহ্লাদে আটখানা হয়ে গিয়ে-ছিলেন, তিনি হাত থেকে সেই টাকা ফেলে দিয়ে ইলেকট্রিক শক্-খাওয়ার মতো করে চম্কে উঠে দাঁড়িয়ে এক লাফে তিন হাত পিছিয়ে গেলেন। আমরা সবাই যে যেখানে আছি সেখানেই পাথরের মতো দাঁড়িয়ে পড়েছি। ফেলুদাই প্রথমে মুখ খুলল। কিন্তু তার গলার স্বর চাপা ফিসফিসে—'তোপসে, গাছে ওঠ। লালমোহনবাবু, আপনিও।'

আমার পাশেই ফোকলা ফাঁকরের গাছ। ফেলুদার হাতে বন্দুকটা চালান করে দিয়ে ফোকলা ফোকরে পা দিয়ে উঠে হাত বাড়িয়ে একটা বড় ডাল ধরে দশ সেকেন্ডের মধ্যে আমি মাটি থেকে দশ হাত উপরে উঠে গেলাম। তার পরেই লালমোহনবাবু তার হাতের তলোয়ারটা আমার হাতে চালান দিয়ে একটা ভাস্কর্য ব্যাপার করলেন। অবিশ্যি উনি পরে বলেছিলেন যে ছেলেবেলায় আমতায় থাকতে নাকি অনেক গাছে চড়েছেন, কিন্তু চল্লিশ বছর বয়সেও যে তিনি এক নিমেষে আমার চেয়ে উপরের একটা ডালে উঠে পড়তে পারবেন এটা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

যাক ঘটনাগুলো আমি উপর থেকেই দেখেছিলাম। লালমোহন-বাবু কিছুক্ষণ দেখে আর দেখতে পারেননি, কারণ তিনি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন; তবে এমন আশ্চর্যভাবে তাঁর হাত-পা গাছের চওড়া



ডালের দৃ'দিকে ঝুঁলে ছিল যে তিনি মাটিতে পড়ে যাননি।

চারদিক থেকে বিশেষ বিশেষ জানোয়ার আর পাখির ডাক শুনতেই বোঝা গিয়েছিল যে কাছাকাছির মধ্যে বাঘ এসে পড়েছে। অবিশ্যি বাঘ এদিকে আসার আরেকটা কারণ ছিল সেটা পরে জেনেছিলাম। মোট কথা বাঘ আসছে বুঝেই ফেলুদা আমাদের গাছে চড়তে বলছিলেন।

সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার করলেন মহীতোষবাবু। তার এই চেহারা যে কেমনদিন দেখব সেটা ভাবিনি; অবাক হয়ে দেখলাম ভদ্রলোক ফেল্দুদার দিকে ঘুরে দাঁতে দাঁত চেপে বলছেন, 'মিস্টার মিস্তার, আপনার যদি প্রাণের মায়ী থাকে তু চলে যান।'

'কোথায় যাব মহীতোষবাবু?'

দু'জনের হাতেই বন্দুক। মহীতোষবাবুরটা উপর দিকে উঠছে ফেল্দুদার দিকে।

'বলছি যান!' আবার বললেন মহীতোষবাবু। 'জীপ রয়েছে ওই দিকে। আপনি চলে যান। আমি আদেশ করছি, আপনি—'

মহীতোষবাবুর কথা শেষ হল না। একটা বাঘের গর্জনে সমস্ত বনটা কেঁপে উঠেছে। শুনলে মনে হবে না যে একটা বাঘ, মনে হবে পঞ্চাশটা হিংস্র জানোয়ার একসঙ্গে গর্জন করে উঠেছে।

এবার গাছের উপর থেকে দেখতে পেলাম—মন্দিরের পিছনে আরো কতগুলো অর্জুন গাছের সাদা ডালের ফাঁক দিয়ে একটা গনগনে আগুনের মতো চলন্ত রং। সেটা লম্বা ঘাসের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে একটা প্রকাণ্ড ডোরাকাটা বাঘের চেহারা নিল। বাঘটা এগিয়ে আসছে কাটা ঠাকুরানীর ডান পাশ দিয়ে, আমাদের এই খোলা জায়গাটার দিকে।

মহীতোষবাবুর হাতের বন্দুকটা নিচে নেমে এসেছে। একে ডারি বন্দুক তার উপর ঠাঁর হাত ধর ধর করে কাঁপছে।

এদিকে ফেল্দুদার বন্দুকের নলটা উপর দিকে উঠছে। আরো তিনজন লোক আছে আমাদের সঙ্গে—শশাঙ্কবাবু, মাধবলাল আর পর্বত সিং। পর্বত সিং এইমাত্র একটা প্রকাণ্ড লাফ দিয়ে পালাল। অন্য দু'জন কী করছে জানি না, কারণ আমার চোখ একবার বাঘ আর একবার ফেল্দুদার দিকে যাচ্ছে।

এখন বাঘটা মন্দিরের পাশে এসে পড়েছে।

বাঘের মুখটা ফাঁক হল। তার দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছে। এতগুলো শিকার এক সঙ্গে চোখের সামনে সে নিশ্চয়ই দেখেনি কখনো।

বাঘটা ধেমে গেছে। তার শরীরটা একটু নীচু হল। এটা লাফ মারার আগের অবস্থা, থাকে ওত পাতা বলে। এইভাবে লাফ দিয়ে প'ড়ে বাঘ একটা মোহকেও—

দুঃম! দুঃম!

প্রায় একই সঙ্গে দুটো বন্দুক গর্জিয়ে উঠল। আমার কান ঝালাপালা। দৃষ্টিটাও যেন এক মহাহতের জন্য আপসা হয়ে গেল।

তারই মধ্যে দেখলাম বাঘটো লাফ দিয়ে যেন শূন্যপথে একটা অদৃশ্য
বাধার সামনে পড়ে উল্টো দিকে একটা ডিগবাজি খেয়ে একেবারে
গদগদধনের কলসীটার ঠিক পাশে আছড়ে পড়ল, তার ল্যাজের ঝাপটায়
কলসীটা প্রচণ্ড খটখট শব্দে ছিটকে গড়িয়ে গিয়ে তার থেকে চারশো
বছরের পুরোন নারায়ণী টাকা ছড়িয়ে পড়ল।

ফেলদা বন্দুকটা নামিয়ে নিয়েছে। মাখবলাল বলল, 'উয়ো মর
গিয়া।'

'কান্ন গুলিতে মরল বলুন ত ?

প্রশ্নটা করল ফেলদা। মহীতোষবাবুর উত্তর দেবার ক্ষমতা
নেই। তিনি মাথা হেঁট করে মাথায় হাত দিয়ে মাটিতে বসে আছেন।
তার হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া বন্দুকটা এখন শশাঙ্কবাবুর হাতে।

শশাঙ্কবাবু বাঘটার দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর বললেন,
'এসে দেখুন মিস্টার মিস্তুর। একটা গুলি গেছে চোয়ালের তলা
দিয়ে গিয়ে একেবারে মাথার খুলি ভেদ করে; আরেকটা গেছে কানের
পাশ দিয়ে। দুটোর যে কোনোটাতেই বাঘটা মরে থাকতে পারে।'

জোড়া বন্দুকের গুলির আওয়াজে উত্তর দিকের গ্রাম থেকে লোকজন ছুটে এসেছে। তারা মহা ফুর্তিতে বাঘটাকে মন্দিরের ওপাশে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে বাঁশের সঙ্গে বেঁধে কাঁধে তোলার আয়োজন করছে। এটাই যে মানুষথেকো ভাত্তে কোনো সন্দেহ নেই। আরো দুটো গুলির চিহ্ন বাঘের গায়ে পাওয়া গেছে; একটা পিছনের পায়ে, আরেকটা চোয়ালের কাছে। এর যে কোনো একটার ফলে বাঘ তার স্বাভাবিক শিকারের ক্ষমতা হারিয়ে মানুষের পিছনে ধাওয়া করতে পারে। বাঘটোর বয়সও যে বেশি সেটা তার গালের দু'পাশের ঘন লোম থেকেই বোঝা যায়।

পর্বত সিং ফিরে এসেছে। সে মহীতোষবাবুর হাত ধরে তুলে তাঁকে মন্দিরের ভাঙা সিঁড়ির উপর বসিয়ে দিয়েছে। ভদ্রলোক এখনো ঘন ঘন শ্বাস মুছলেন। লালমোহনবাবুর জ্ঞান ফিরেছে। গাছ থেকে নামাটা তাঁর পক্ষে ওঠার মতো সহজ হয়নি, আমার সাহায্য নিতে হয়েছে। নেমে এসেই, যেন কিছু হয়নি এমন ভাব করে আমার হাত থেকে তলোয়ারটা আবার নিয়ে নিয়েছেন।

কিছুক্ষণ চুপচাপের পর ফেলুদা কথা বলল।

'মহীতোষবাবু, আপনি বুঝাই দৃষ্টিচলিতা ডুগছেন। আমি আপনার শিকারের অক্ষমতা কারুর কাছে প্রকাশ করব না সেটা আমি শশাঙ্কবাবুকে কথা দিয়েছি। আমি ব্যাপারটা অনেক আগে থেকেই সন্দেহ করেছি। লালমোহনবাবুর চিঠিতে আপনার সেই দেখে আমি ভেবেছিলাম আপনি বুঝি বৃদ্ধ। লিখতে গেলে যদি আপনার হাত কাঁপে, তাহলে বন্দুক ধরলে সে হাত স্থির থাকবে কী করে সে চিন্তা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। অবিশ্যি এমনও হতে পারে যে, আপনার হাত খুব সম্প্রতি বিকল হয়েছে; বইয়ে যে সব শিকারের কথা লিখেছেন সে-সব আপনিই করেছেন। কিন্তু আমার মনে নতুন করে সন্দেহ ঢুকিয়ে দিলেন আপনার দাদা। দেবতোষবাবু অসংলগ্ন কথা বললেও, তাঁর একটা কথার সঙ্গে আরেকটা কথার সরাসরি সম্পর্ক না থাকলেও তিনি যে আজগুবি মিথো বলছেন এটা কিন্তু আমার কখনো মনে

হয়নি। তিনি যা বলছেন তার মধ্যে খুঁজলে অর্থ পাওয়া যায়, এটাই আমার মনে হয়েছিল। আপনি শিকারের বই লিখছেন সেটা নিশ্চয়ই উনি জানতেন, আর আপনি যে এত বড় একটা মিথ্যের আশ্রয় নিয়েছেন তাতে তিনি নিশ্চয় খুবই কষ্ট পেয়েছিলেন। এই মিথ্যে নিয়ে আশ্চর্য আমি দু'বার তাঁর মধ্যে শুনছি। সবার হাতে হাতিয়ার বাগ ঘানে না এটাও তিনি—'

ফেলদার কথা বন্ধ করে মহীতোষবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন—

'বাগ মেনেছিল। সাত বছর বয়সে আমি এরায়গান দিয়ে শালিক মেরেছি, চড়ুই মেরেছি—পঞ্চাশ গজ দূর থেকে। কিন্তু...'

মহীতোষবাবুর দৃষ্টি বড়ো অব্যব গাছটার দিকে চলে গেল। তারপর বললেন, 'একদিন চড়ুইভাতি করতে এসে ওই গাছে চড়েছিলাম—ওই ডালে—দেখানে আপনার ভাইটি উঠেছিল। দাদা বলল বাঘ আসছে, আর আমি বাঘ দেখব বলে লাফ মেরে—'

'হাত ভাঙলেন?'

'কম্পাউন্ড ফ্র্যাকচার', এগিয়ে এসে বললেন মহীতোষবাবু বন্ধু শশাঙ্ক সান্যাল। 'কোনোদিনই হাড় জোড়া লাগেনি ভাল করে।'

ফেলদা বলল, 'কিন্তু বংশের মর্যাদা রক্ষা করার জন্য শিকারী হবার শখ হল? আর নিজের দেশে নিজের জঙ্গলে মিথ্যে ধরা পড়ে বাবে বলে উড়িয়া আর আসামের জঙ্গলে শিকার করলেন? আপনি করলেন মানে, করলেন শশাঙ্কবাবু, কিন্তু লোকে বুদ্ধি মেরে সিংহরায় পরিবারে তিন পুরুষ ধরে বাঘ শিকারের ধারা চলে আসছে। তাই না মহীতোষবাবু?'

মহীতোষবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'শশাঙ্ক যা করেছে তার বন্ধুর জন্য, তেমন আর কেউ করে না। ওর মতো শিকারী আমাদের পরিবারেও কেউ জন্মায়নি।'

'কিন্তু সম্প্রতি সেই বন্ধুকে কি একটু চিড় ধরেছিল?'

মহীতোষবাবু আর শশাঙ্কবাবু দুজনেই চুপ করে আছেন দেখে ফেলদা বলে চলল, 'বই বেরোবার আগে আমি অন্তত মহীতোষ সিংহরায়ের নাম শুনিনি। কিন্তু বেরোবার পরে আজ হাজার হাজার লোকে তাঁর নাম শুনছে, এবং একটা বিরাট মিথ্যাকে সত্যি বলে মেনে নিচ্ছে। আসল শিকারী কিন্তু তাঁর ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। সেটা কি তিনি খুব সহজেই মেনে নিতে পারছেন? বন্ধুদের খাতিরে কতটা আত্মত্যাগ সম্ভব? আপনি সেদিন রাতে শশাঙ্কবাবুকেই কথা শোনাচ্ছিলেন না? আমি কি অনুমান করতে পারি যে,

বেশ কিছুদিন থেকেই শশাঙ্কবাবু আর আপনার মধ্যে একটা মনো-
মালিন্য ও কথা কাটাকাটি চলছে?’

এখনো দুজনে চুপ। ফেলদাদা স্থিরদৃষ্টিতে মহীতোষবাবু
দিকে চেয়ে থেকে বলল, ‘মোনিং সম্মতি লক্ষণম্ বলেই ধরে নিচ্ছি।
আর, আরেকটা ব্যাপারেও আপনার বোধহয় মৌন অবলম্বন ছাড়া
স্বাস্থ্য নেই।’

মহীতোষবাবু ভয়ে ভয়ে ফেলদাদার দিকে চাইলেন। ফেলদাদা
বলল, ‘ভাড়িৎবাবুর সাহিত্যকীর্তির জন্যই যে আপনি প্রশংসা পাচ্ছেন,
সেটাও বোধহয় সত্যি। তাই নয়, মহীতোষবাবু? আপনি সেদিন
আপনার পান্ডুলিপির কথা বললেন, কিন্তু আমি তন্ন তন্ন করে
খুঁজেও আপনার লেখা একটি টুকরো কাগজও কোথাও পেলাম না।
আসলে আপনি লিখতেন না, আপনি মূখে মূখে আপনার মতো করে
বলতেন, আর ভাড়িৎবাবু সেটাকে তার আশ্চর্য্য সাবলীল ভাষায়
সাজিয়ে দিতেন আর সেই সাজানো লেখা প্রকাশিত হত আপনার
নামে। ভাড়িৎবাবুকে আপনি ভাল মাইনে দিতেন, তাকে আরামে
রেখেছিলেন, তোয়াজে রেখেছিলেন এ সবই ঠিক। কিন্তু একজন
সত্যিকারের গদ্যশিল্পীর পক্ষে ওগুলো যথেষ্ট নয় মহীতোষবাবু।
সে সবচেয়ে বেশি যেটা আশা করে সেটা হল তার গুণের আদর—
যেটা না পেয়ে ভাড়িৎবাবুর মন ক্রমে ভেঙে যায়। তারপর সংকেতটা
হাতে পড়ে, আর তার সমাধানও হয়ে যায়। নারায়ণীমুদ্রার কথাটা
হয়ত তিনি আপনার পারিবারিক কাগজের মধ্যে পেয়েছিলেন। মোট
কথা তিনি স্থির করেন যে, গদ্যস্তম্ভ নিয়ে আপনার কাজে ইস্তফা
দিয়ে চলে যাবেন। কিন্তু সে আশা তার পূর্ণ হল না।’

মহীতোষবাবু যেন বেশ কষ্ট করেই উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘সবই
ত বুঝলাম মিস্টার মিস্টার, এর সবই ঠিক এবং কোনোটাই আমার
শুনতে ভালো লাগছে না। কিন্তু ভাড়িৎকে এভাবে হত্যা করল কে?
তার না হয় আমার উপর আক্রোশ ছিল, কিন্তু তার উর্গার কারো
আক্রোশ ছিল বলে তু আমি জানি না ভাড়িৎ ছাড়া আর কে এসেছিল
সেদিন জুগলে?’

‘কে এসেছিল তা বোধহয় আমি বলতে পারি।’

মহীতোষবাবু পায়চারি আরম্ভ করেছিলেন, ফেলদাদার কথা
শুনেন থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন।

‘পারেন?’

ফেলদাদার দৃষ্টি ধরে গেল।

‘শশাঙ্কবাবু, আপনি সোঁদিন রায়ে ট্রোমি রুম থেকে একটি উইন-চেস্টার রাইফেল নিয়ে এই জঙ্গলে আসেননি ? কাল রায়ে ওটার বাঁটে সামান্য একটু মাটি লেগে রয়েছে দেখলাম, যেটা পরশু রায়ে সোঁখনি।’

শশাঙ্কবাবুর নার্ভ বোধহয় বাঘ শিকার করেই আশ্চর্যরকম শক্ত হয়ে গিয়েছিল। উনি অদ্ভুত ঠান্ডাভাবে ফেলদার দিকে চেয়ে বললেন, ‘যদি এসেই থাকি—আপনি তার কী মানে করতে চাইছেন সেটা বলবেন কি?’

ফেলদাও ঠিক শশাঙ্কবাবুর মতোই শান্তভাবে বলল, ‘বন্ধু সম্পর্কে’ আপনার হতাশা জাগলেও আপনি তার গুস্তথনের ওপর লোভ করবেন সেটা আমি মোটেই ভাবছি না। তবে আমার ধারণা, তড়িৎবাবু যে সংকেতের সমাধান করে ফেলেছেন সেটা আপনি জানতেন, তাই না?’

শশাঙ্কবাবু বললেন, ‘শুধু তাই না, তড়িৎ গুস্তথন পেলে তার অর্ধেক আমাকে অফার করেছিল। তড়িৎ বুঝেছিল মহীতোষ আমাদের দুজনেরই একইভাবে বর্ণিত করেছে। কিন্তু আমি তড়িৎের প্রস্তাবে রাজী হইনি। শুধু তাই নয়, আমি গুস্তথনের সম্মানে এখানে আসতে অনেকবার বারণ করেছিলাম। কারণ ওই ম্যানইটার। শেষটার সোঁদিন রায়ে জানালা দিয়ে ওর টর্চের আলো দেখে আমি বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। এখানে এসে দেখি গুস্তথন পড়ে আছে, কিন্তু তড়িৎ নেই। তারপর অনুসন্ধান করে দেখলাম রক্তের দাগ, বাঘের পাখের ছাপ। গুস্তথন মন্দিরের ভিতর রেখে, সেই চিহ্ন ধরে আমি এগিয়ে যাই বাঁশবনের কাছাকাছি পর্যন্ত। বিদ্রোহের আলোতে দেখি বাঘ তড়িৎের মৃতদেহের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। অস্থকারে আন্দাজে গুলি চালাই। বাঘ পালায়। তারপর...’

শশাঙ্কবাবু কেন জানি চুপ করে গেলেন। ফেলদা বলল, ‘বাকিটা আমি বলি? এটাও অনুমান। ভুল হলে আমাকে শুধরে দিবেন।’

‘বেশ। বলুন।’

‘আপনিই কাল রায়ে মাখবলালের সঙ্গে কথা বলছিলেন না?’

শশাঙ্কবাবু অস্বীকার করলেন না। ফেলদা এবার আর একটা প্রশ্ন করল।

‘সেটা কি মন্দিরের পিছনে বাঘের জন্য টোপ ফেলার প্রস্তাব দিতে? ওই শিমূল গাছটার মগডালে শকুনির পাল দেখে মনে হচ্ছে ওর কাছাকাছি একটা মরা জানোয়ার পড়ে আছে।’

‘মোঘের বাচ্চা,’ চাপা গলায় বললেন শশাঙ্কবাবু।

‘তার মানে আপনি চাইছিলেন যে আজ বাঘ বেরোক, যাতে আপনি অন্তত একজন বাইরের লোকের সামনে প্রমাণ করে দিতে পারেন যে শিকারী আসলে হচ্ছেন আপনি, মহীতোষবাবু নন।’

মহীতোষবাবু হঠাৎ ফেলদাদার দিকে এগিয়ে এসে কাঁধে হাত দিয়ে অনুনয়ের সুরে বললেন, ‘মিস্টার মিস্টার, আমি আপনাকে একটা অনুরোধ করব, আপনাকে সেটা রাখতে হবে।’

‘কী অনুরোধ?’

‘এই গুরুত্বপূর্ণের কিছু অংশ আমি আপনাকে দিতে চাই। সেটা আপনাকে নিতে হবে।’

ফেলদাদা মহীতোষবাবুর চোখে চোখ রেখে মৃদু হেসে বলল, ‘রৌপ্যমুদ্রা আমি চাই না মিস্টার সিংহরায়। কিন্তু একটা জিনিস আমি নেবো।’

‘কী জিনিস?’

‘আদিত্যনারায়ণের তলোয়ার।’

লালমোহনবাবু কথাটা শোনা মাত্র এগিয়ে এসে ফেলদাদার হাতে তলোয়ারটা দিয়ে দিল।

‘এই তলোয়ার আপনি চাইছেন?’ মহীতোষবাবু অবাক হয়ে বললেন। ‘নারায়ণী রৌপ্যমুদ্রা না নিয়ে ইস্পাতের তলোয়ার নেবেন?’

‘এ তলোয়ারকে আর সাধারণ তলোয়ার বলা চলে না মহীতোষবাবু। এর সঙ্গে ইতিহাস ছাড়াও আরো কিছু জড়িত হয়ে পড়েছে।’

‘আপনি তড়িতের খুনের কথা বলছেন?’

‘না।’

‘তবে?’

‘খুনের কথা বলছি না, কারণ তড়িৎবাবু খুন হননি।’

‘তবে? আত্মহত্যা?’

‘তাও না।’

‘আপনি কি হেস্টালি তৈরি করছেন মিস্টার মিস্টার?’ মহীতোষবাবুর গলার স্বরে বৃক্লাম, তার ভিতরের কঠিন মানুষ্টা আবার বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

ফেলদাদা বলল, ‘না, তা করছি না, মহীতোষবাবু। যা ঘটেছিল সেটাই বলতে যাচ্ছি। সেটা এত স্পষ্ট বলেই আমাদের দৃষ্টি সেদিকে যাচ্ছিল না। তলোয়ারটা তড়িৎবাবু নিজেই আদিত্যনারায়ণের ঘর থেকে সরিয়েছিলেন।’

‘সে কি, কেন?’

‘কারণ গদুস্তখন পেতে হলে তাকে মাটি খুঁড়তে হবে, আর তার জন্য শাবল জাতীয় একটা কিছুর দরকার। তড়িৎবাবু হাতের সবচেয়ে কাছে ছিল এই তলোয়ারটা।’

‘তারপর?’

‘তারপর কী—সেটা বলার আগে এই তলোয়ারের একটা বিশেষত্ব আমি আপনাদের দেখাতে চাই।’

এই বলে ফেলদা তলোয়ারটা নিয়ে কোন জানি শশাঙ্কবাবুর দিকে এগিয়ে গেল। শশাঙ্কবাবু সাহসী হলেও ফেলদাকে ওইভাবে অস্ত্র হাতে নিয়ে এগিয়ে আসতে দেখে একটু যেন উসখুস করে উঠলেন। এবার ফেলদা এক আশ্চর্য খেল দেখাল। সে তলোয়ারটা শশাঙ্কবাবুর হাতের বন্দুকের নলের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে গেল, আর খুব কাছাকাছি আসতেই একটা খটাং শব্দ করে ইস্পাতে ইস্পাতে জোড়া লেগে গেল।

‘একি, এ যে চুম্বক!’ বলে উঠলেন শশাঙ্কবাবু।

‘হ্যাঁ, চুম্বক’, বলল ফেলদা। ‘তলোয়ারটাই চুম্বক, বন্দুকটা না। আগে চুম্বক ছিল না, কারণ আদিত্যনারায়ণের আলমারিতে তলোয়ারের পাশেই আরো ছোটখাটো অনেক লোহা আর ইস্পাতের জিনিস ছিল। চুম্বক হলে তলোয়ার বার করা বা রাখার সময় সেগুলো এর গায়ে আটকে যেত নিশ্চয়ই, কিন্তু যায়নি। এ তলোয়ার চুম্বকে পরিণত হয়েছে পরশু রাত্রে।’

‘কী করে?’ জিজ্ঞাসা করলেন মহীতোষবাবু। সকলেই রুদ্ধ-শ্বাসে ফেলদার কথা শুনছে।

ফেলদা বলল, ‘কোনো মানুষের হাতে লোহা বা ইস্পাতের কোনো জিনিস থাকা অবস্থায় যদি তার উপর বাজ পড়ে, তাহলে সে জিনিস চুম্বকে পরিণত হয়। শব্দ, তাই নয়, সে জিনিস অনেক সময় বিদ্যুৎকে আকর্ষণ করে। তড়িৎবাবুর মৃত্যু হয়েছিল বজ্রাঘাতে, এবং হয়ত এই তলোয়ারই তার মৃত্যুর জন্য দায়ী। মাটি খুঁড়ে কলসী বার করার পর বৃষ্টি নামে, তার সঙ্গে বাজ ও বিদ্যুৎ। তড়িৎবাবু অবশ্য-গাছের নিচে আশ্রয়ের জন্য ছুটে আসেন। বাজ পড়ে। তড়িৎবাবু ছিটকে পড়ার সময় তার হাতের তলোয়ার বৃকে বিধে যায়। সম্ভবত মৃত্যুর পরমুহূর্তেই তলোয়ার তার দেহে প্রবেশ করে।’

মহীতোষবাবুর সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছে। তাঁর দৃষ্টি অবশ্য গাছটার দিকে গেল। ভাঙা ভাঙা অক্ষুট স্বরে বললেন, ‘তাই ভাবছিলাম, এই গাছটা হঠাৎ এত খুঁড়ো হয়ে গেল কী করে!’

মহীতোষবাবুর কথার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লালমোহনবাবু বলে উঠলেন, 'ভড়িৎবাবু শেষটার ভড়িৎপুষ্ট হয়ে মারা গেলেন।'

দুঃখের বিষয় ঠিক এই চমৎকার কথাটায় কান দেবার মতো মনের অবস্থা তখন কারুরই ছিল না।

* * *

আমরা আজ কলকাতা ফিরে যাচ্ছি। আজ বাইরে রোদ, দু'দিন বৃষ্টি হওয়ার দরুন গরমও কম। আমরা জিনিসপাট গুঁছিয়ে ঘরে বসে আছি, মাঝে মাঝে বাইরে থেকে দেবতোষবাবুর গলা পাচ্ছি। সকালে উঠেই দেখছি ঠিক ঘরের দরজায় আর তালা নেই। গাছ থেকে নামার সময় লালমোহনবাবুর হাটু ছড়ে গিয়েছিল। ক্ষতের উপর উনি স্টীকিং প্লাস্টার লাগাচ্ছেন, এমন সময় মহীতোষবাবুর চাকর একটা স্টীলের ট্রাঙ্ক মাথায় করে ঘরে ঢুকে সেটাকে মাটিতে নামিয়ে রেখে বলল, মহীতোষবাবু পাঠিয়ে দিয়েছেন। ফেলদা সেটা খুলতেই দেখা গেল তার মধ্যে খুব সাবধানে প্যাক করা রয়েছে একটা চমৎকার বাঘছাল। একটা খামও ছিল ট্রাঙ্কটার মধ্যে, তার ভিতরে তিন লাইনের একটা চিঠি—

'ডায়ার মিস্টার মিস্ত্রি, আমার কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ এই বাঘছালটি গ্রহণ করিয়া আমাকে বাধিত করিবেন। ১৯৫৭ সালে সম্বলপুরের নিকটবর্তী এক জঙ্গলে আমার বন্ধু শ্রীশশাঙ্কমোহন সান্যাল কর্তৃক এই বাঘটি নিহত হইয়াছিল।'

লালমোহনবাবু চিঠিটা পড়ে বললেন, 'দু'জনের গুঁলিতে যেটা মরল, সেটা কি দ'ভাগে ভাগ করা হবে?'

ফেলদা বলল, 'না। ওটা শশাঙ্কবাবু আমাকেই দেবেন বলেছেন।'

'ও, তার মানে আপনি একাই...'

'না, একা না। দু'টোর একটা আপনাকে উপহার দেবো বলে স্থির করছি।'

'উপহার?'

'উপহার। গাছের ডালে উঠে অজ্ঞান হয়েও যে মাটিতে না পড়ে কুলে থাকা যায়, সেইটে সর্বপ্রথম আপনিই প্রমাণ করেছেন।'

লালমোহনবাবু হাঁ হাঁ করে উঠলেন।

'আরে মশাই, আমি ত বলেইছি আমার কল্পনাশক্তিটা সাধারণ লোকের চেয়ে একটু বেশি। আপনারা বলছেন বাঘ, আর আমি দেখছি একটা লৌলিহান অশ্বিনীখা, আর তার মধ্যে একটা পৈশাচিক দানব দাঁত খিঁচুচ্ছে, আর সেই সঙ্গে কণপটাই বিদীর্ণ করা এক হুঙ্কার

ছেড়ে একটা জেট প্লেন টেক অফ করছে আমারই উপর ল্যান্ড করবে বলে। এতেও যদি সংজ্ঞা না হারাই ত সংজ্ঞা জিনিসটা রয়েছে কী করতে ?'



এক

রহস্য রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক লালমোহন গাঙ্গুলি ওরফে জটোরু স্লেট থেকে একটা চীনাবাদাম তুলে নিয়ে ডান হাতের বড়ো আঙুল আর তার পাশের আঙুল দিয়ে সেটার উপর একটা হালকা হুশিয়ার চাপ দিতেই ব্রাউন থোলসের মধ্যে থেকে মসৃণ ফরসা বাদামটা স্ফুৎ করে বেরিয়ে তাঁর বাঁ হাতের তেলোর উপর পড়ল। সেটা মধ্যে পুরে খোসাটা সামনের টেবিলে রাখা অ্যাশ-ট্রেতে ফেলে নিয়ে হাত বেড়ে ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, 'দশাবমেষ ঘাটে বিজয়া দশমী দেখেছেন কখনো?'

ফেলুদার সামনে দাবার বোর্ড, তার উপরে একটা সাদা রান্না, একটা সাদা গজ আর একটা সাদা বোড়ে, আর একটা কালো রান্না আর দুটো কালো বোড়ে। বোর্ডের পাশে গ্রেট গেম্‌স অফ চেস বলে একটা বই খোলা; ফেলুদা তার মধ্যে থেকে একটা চ্যাম্পিয়নশিপ গেম বেছে নিয়ে তার চালগুলো বই দেখে দেখে চালিচ্ছিল। খেলার প্রায় মাঝামাঝি লালমোহনবাবু এসে পড়েন। আজকাল আর ঠুর সংগ বাড়াবাড়ি রকম ভদ্রতা না করলেও চলে, তাই ফেলুদা শ্রীনৃপকে চা আনতে বলে খেলাটা শেষ করে নিচ্ছিল, আর চালের ফাঁকে ফাঁকে লালমোহনবাবুর প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিল। এ-প্রশ্নটার জবাবেও সে বই থেকে চোখ না তুলেই বলল, 'উঁহু।'

'ওঃ—সে যা ব্যাপার না! সে এক, যাকে বলে, জমজমাট ব্যাপার। সে মশাই আপনি না দেখলে ইয়েই করতে পারবেন না।'

ফেলুদা খেলার শেষ চালটা চলে বোর্ডের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'আপনি কি আমার লোভ দেখাবার চেষ্টা করছেন?'

'তা কতকটা ঠিকই ধরেছেন, হেঃ হেঃ!'

'কিন্তু আপনি যে-ভাবে বর্ণনা করলেন তাতে আপনার চেষ্টা বার্থ হতে বাধ্য।'

'কেন?'—লালমোহনবাবুর ডুর্ দুটো নাকের উপর জুড়ে গিয়ে সেকেন্ড ব্র্যাকেট হয়ে গেল।

ফেলুদা বোর্ড ভাঁজ করে ঘুটিগুলো বাক্সে ভরতে ভরতে বলল, 'কারণ কোনো ঘটনা বা দৃশ্য সম্পর্কে কেবলমাত্র জমজমাট বিশেষণটা ব্যবহার করলে

আসলে কিছুই বলা হয় না। ওতে চোখের সামনে কোনো ছবি ফুটে ওঠে না, ফলে দশাঙ্কসমূহে বিজয়া-দশমীর বিশেষত্বটা কিছুই বোঝা যায় না, আর তার ফলে ফেলু মিস্তিরের মনে কোনো সাড়া জাগে না। আপনি উপন্যাস লেখেন, আপনার বর্ণনা এত দায়সারা হবে কেন?’

‘ঠিক বলেছেন, ঠিক বলেছেন,’ লালমোহনবাবু জিভ কেটে বস্তু হয়ে বলে উঠলেন। ‘আসলে প্রায় পঁচিশ বছর হয়ে গেল ত, তাই ডিটেলগুলো সব মাথার মধ্যে ভালগোল পাকিয়ে গেছে। তবে দশাঙ্কসমূহে ভাসান দেখে চোখ-কান ধাঁধিয়ে গেস্লে এটা বেশ মনে আছে।’

‘এইত—চোখ এবং কান। বর্ণনার ওই দুটোর জন্য খোরাক চাই, সম্ভব হলে নাকও।’

‘নাক!’—লালমোহনবাবুর ভুরু দুটো উপর দিকে উঠে এক জোড়া খিলেন হয়ে গেল।

সম্ভব হলে...কলকাতার স্মৃতিঘাটে এমনভাবে কোনো যে বিশেষ গন্ধ পাওয়া যায় তা না। লোক মার্কেটের কাছে বিকেলের দিকটা বেলাফুলের গন্ধ, বা মিউ মার্কেটের পশ্চিম দিকে বাগ্গীশ স্ট্রীটের কোনো বিশেষ অংশে শর্টক মাস্কের গন্ধ, হামপাতালের কাছে ডিস্ট্রিক্টফোর্সের গন্ধ, শ্মশানের কাছে মড়া পোড়ার গন্ধ—এই সবই নিশ্চয় লক্ষ করে থাকবেন। ভেমনি কাশীর বর্ণনাতোও কিছু কিছু গন্ধের উল্লেখ না করলে কি চলে? বিশ্বনাথের গলিতে ধূপ ধূনো গোবর শয়ওলা জোকের ঘাম মেশানো গন্ধ, আবার গলি ছেড়ে বাইরে এসে বড় রাস্তা দিয়ে ঘাটের দিকে হাঁটার সময় কিছুক্ষণ প্রায় একটা নিউট্রাল গন্ধহীন অবস্থা, আবার ঘাটের সিঁড়ি বেই শূন্য হল অর্মান ধাপে ধাপে একটা উগ্র গন্ধ কমে বেড়ে গিয়ে প্রায় পেটের ভাত উলটে আসার অবস্থা। সেটা যে ওই বোকাপাঠাগুলোর গা থেকে বেরোচ্ছে সেটা যে না জানে তার বুদ্ধিতে কিছুটা সময় লাগবে। তারপর ছাগলগুলোকে পিছনে ফেলে একটু এগোলেই পাবেন একটা গন্ধ যাতে ছল মাটি তেল ঘি ফুল চন্দন ধূপ ধূনো সব একসাথে মিশে রয়েছে।’

‘তার মানে আপনি বেনারস গেছেন’, মন্তব্য করলেন জটায়ু।

‘গোছ। শুধু কলেজের ছাত্র। হিন্দু ইউনিভার্সিটির সঙ্গে স্নেহে খেলতে গেসলাম।’

লালমোহনবাবু পকেট হাতজাচ্ছেন দেখে ফেলুদা বজল, ‘আপনি যে কাগজের কাটিংটা খুঁজছেন, সেটা আপনি ঘরে ঢোকান আধ মিনিটের মধ্যে আপনার পকেট থেকে বেরিয়ে মাটিতে পড়ে এখন ওই টৌলফোনের টৌবলের পায়াল লটকে আছে।’

‘এঃ হে—রুমালটা বার করার সময়...’

লালমোহনবাব, ওঠার আগেই আমি কাগজটা তুলে ঠিক হাতে এনে দিলাম। ফেলুদা বলল, ওটা সেই কাগজের খবরটা ত? কাশীর সেই সাধুবার ব্যাপার?

লালমোহনবাব, তাঁর ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'আপনি জানেন, তবু এতক্ষণ কিছ্ বলেননি? কী রহস্যময়ক ব্যাপার বলুন ত।'

আমি লালমোহনবাবের হাত থেকে কাটিং-টা নিয়ে দেখলাম তাতে লেখা রয়েছে—

বারাণসীর মহালি-বাবা

বারাণসীতে গত বৃহস্পতিবার এক সাধুবার আবির্ভাব শহরে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে বলে জানা গেল। অভয়চরণ চক্রবর্তী নামক বাঙালীটোলার জটনৈক প্রবীণ বাসিন্দা কেদার ঘাটে প্রথম সাধুবার সাফা পান, এবং অচিরেই তাঁর অলৌকিক শক্তির পরিচয় পান। সাধুবার আপাতত শ্রীচক্রবর্তীর গৃহেই অবস্থান করছেন। ভক্তগণের নিকট ইনি মহালি-বাবা নামে পরিচিত। তাঁরা বলেন, বাবাজী নাকি প্রয়াগ থেকে গঙ্গাবক্ষে ভাসমান অবস্থায় বারাণসীতে এসে পৌঁছেছেন।

এ-ধরনের সাধুবার কথা আজকাল এত শোনা যায় যে আমার কাছে খবরটা তেমন একটা কিছ্ বলে মনে হল না। কিন্তু লালমোহনবাব, দেখলাম ভয়ঙ্করভাবে মেতে উঠেছেন। বললেন, 'হয়ত সেই একেবারে তিম্মতে গঙ্গার সোঁস থেকে ভাসা শব্দ, করেছে। ডাবলেও গায়ে কাঁটা দেয়।'

'গঙ্গার সোঁস তিম্মতে এ খবর কে দিল আপনাকে?'

'ও হো হো, সারি—ওটা বোধ হয় রক্ষপুত্র। বাই হোক—তিম্মত না হোক হিমালয় ত! তাই বা কম কিসে?'

'আপনার কি তাকে দর্শন করার ইচ্ছে জেগেছে?'

'যেমন-তেমন সাধু হলে হত না, কিন্তু এর মধ্যে একটা রহস্যের গন্ধ পাচ্ছেন না আপনি? মহালি-বাবা—নামটাই ত ইউনিক।'

ফেলুদা তক্তপোষ থেকে উঠে পড়ল।

'নামটা মন্দ হয়নি সেটা স্বীকার করছি। খবর পড়ে ওই একটি জিনিসই মনে দাগ কাটে, আর কিছ্ নয়। কাশী যদি যেতেই হয় ত মহালি-বারার জন্য নয়। কচৌরি গলির হনুমান হালদৈকরের রাবাড়ির মাদ এখানো মুখে লেগে রয়েছে। ও জিনিসটা ত কলকাতার বাজার থেকে উঠেই গেছে।'

'আর ধরুন যদি গিরে দেখেন যে হালদৈকরকে কোনো অজ্ঞাত আততায়ী খুন করে গেছে—তার রাবাড়ির রসে রক্তের ছিটে পড়ে রস গোলাপী হয়ে

গেছে—তাহলে ত কথাই নেই। কাশীও হল, কেসও হল, ক্যানও হল—হ্যাঃ হ্যাঃ। এক টিলে তিন পাখি। আপনি ত বেশ কিছুদিন বসে, তাই না?’

কথাটা ঠিকই। মাস তিনেক হল ফেল্দার হাতে কোনো কাজ নেই। অবিশ্যি তার একটা কারণ আছে, আর সেটা আমি এর আগেও বলেছি। ফেল্দা বলে একটা ক্রাইমের পিছনে যদি কোনো ভীক্ষুবৃন্দী ক্রিমিন্যালের কারসমূহের ছাপ না থাকে, তাহলে সে-ক্রাইমের কিনারা করতে বিশেষ মাথা-থাটানোর প্রয়োজন হয় না, আর মাথা না খাটোতে পারলে ফেল্দার তৃপ্তি হয় না। কাজেই কেস মানুসি বৃদ্ধিতে পারলে সে বেশির ভাগ সময়ই মকেনকে ফিরিয়ে দেয়।

এক কথায় ফেল্দা চায়, তার ভীক্ষুবৃন্দীটাকে শানিয়ে নেবার সুযোগ। সে সুযোগ গত তিন মাসের মধ্যে আসেনি। এই অবসরে অবিশ্যি ফেল্দা অজান্তে বই পড়েছে, নিরমিত যোগব্যায়াম করেছে, সিগারেট খাওয়া কমিয়েছে, দাবা খেলেছে, দু'বার চুল ছাঁটিয়েছে, দুটো বাংলা, একটা হিন্দী আর পাঁচটা বিদেশী ছবি দেখেছে, একদিন আমাকে সঙ্গে করে শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড় থেকে বালিগঞ্জে আমাদের বাড়ি অর্থাৎ হেঁটে এসেছে এক ঘন্টা সাতাল্ল মিনিটে। এর মধ্যে একবার দাড়ি গোঁফ রাখবে বলে সাতদিন শেঁভিং বন্ধ করে আট দিনের দিন আফ্রান নিজের চেহারা দেখে মত পাল্লটিয়ে আবার পুরোন চেহারায় ফিরে গেছে।

লালমোহনবাবু বললেন, ‘আপনার কেস নেই, আর আমার মাথার গল্পের স্পট নেই। এই প্রথম পুজোর আমার বই বেরোল না, জানেন ত? আগে ত এ-বই, সে-বই থেকে এটা ওটা বামচে নিয়ে তার উপর কিছুটা বং চাঁড়িয়ে যা হোক একটা কিছু খাড়া করে বিতায়; আপনার হাতে বার বার ধরা পড়ে চুরি বিদ্যে ত নো লংগার বড় বিদ্যে, তাই এখন নিজেরই মাথা খাটোতে হয়। ভাবছিলাম কলকাতার এই বন্ধ আবহাওয়া থেকে বেরোতে পারলে বোধ হয় রেনটা কিছুটা খুলত।’

‘সেতে পারি, তবে একটা রিস্ক আছে।’

‘কী রিস্ক?’

‘গিয়ে-টিরে শেষটার আমিও কেস পেলাম না, আপনিও স্পট পেলেন না।’

বেনারস গিয়ে লালমোহনবাবু গল্পের স্পট পেয়েছিলেন ঠিকই; তবে ফিরে আসার দু'মাস পরে কুর্জামনে তাঁর যে রহস্য উপন্যাসটা বেরোল, সেটার সঙ্গে টিনাটিনের একটা গল্পের আশ্চর্য মিল।

ফেল্দার কিন্তু গিয়ে সত্যিই লাভ হয়েছিল। তা না হলে অবিশ্যি এ বইটাই লেখা হত না। ফেল্দার জীবনে সবচেয়ে ধূরন্ধর ও সাংঘাতিক

প্রতিবন্ধীরা সঙ্গে তাকে এই বেনারসেই লড়তে হয়েছিল। ও পরে বলেছিল—
'এই রকম একজন লোকের জন্যই আশ্বিন অপেক্ষা করছিলাম যে ভোপ্পে।
এসব লোকের সঙ্গে লড়ে জিততে পারলে সেটা বেশ একটা টর্নিকের কাজ
দেয়।'

দশাশ্বমেধ ঘাটের রাস্তার উপর পঞ্চাশ বছরের পুরোন বাংগালী হোটেল
ক্যালকাটা লজ। হোটেলের ম্যানেজার নিরঞ্জন চক্রবর্তী লালমোহনবাবুর গড়-
পারের প্রতিবেশী পুলক চ্যাটার্জির ভায়রা ভাই। পুলকবাবু আগে থেকে
আমরা আসছি বলে জানিয়ে দেওয়ারত হোটলে জায়গা পেতে কোনো অসুবিধা
হয়নি। অমৃতসর মেলে আমরা বেনারস পেঁছলাম সকাল সাড়ে নটার। সেখান
থেকে টাক্সি নিয়ে হোটলে আসতে আসতে হয়ে গেল দশটা।

ম্যানেজার মশাই নিজেকে তখন হোটলে নেই, কিন্তু তার জায়গায় যিনি
ছিলেন তিনিই, চাকর হরকিশণের হাতে আমাদের জিনিসপত্র উপরে পাঠিয়ে
খাতায় আমাদের নাম-ধাম লিখিয়ে সই করিয়ে নিলেন।

সোভলার গির্দে দেখি ঘরে চারটে খাট। তার একটার নিচে একটা মাঝারি
সুটকেস, আর বেমন-ডেমনভাবে গুটিয়ে রাখা একটা হোল্ড-অল। এ ছাড়া
খাটের পাশে তাকে আর আলনায় কিছু জিনিসপত্র কাপড়-চোপড় ইত্যাদি রয়েছে।
ফেশদার সেগুলোর উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে লালমোহনবাবুর দিকে
কিরে চাপা গলার বলল, 'নারসিকা গর্জনে আপনার ঘুমের বাধাত হয় না শু?'

'কেন? কই, আপনার ত নাক ডাকে না।'

'আমার না; আমি আমাদের রুম-মেটের কথা বলছি।'

'সেইক মশাই, আপনি লোকটার ওই কটা জিনিসপত্র দেখেই—'

'সঠিক বলে বলছি না; এটা অনুমান-মাত্র। সাধারণত মোটা লোকেরাই
নাক ডাকার বেশি, আর ইনি যে শীর্ণকার নন সেটোও এর সার্ভ আর প্যাস্টের
বহর দেখেই বোঝা যাচ্ছে। তার উপরে ফেনলের শিশি থেকে অনুমান করা
হয় যে এর মাঝে মাঝে নাক বন্ধ হয়ে যায়। সেখানেও নাক ডাকার একটা
সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে।'

'সর্বনাশ!—আরো কিছু বুঝলেন নাকি?'

'তাকের উপর প্রসাধনের জিনিসের মধ্যে শেভিং-এর সরঞ্জামের অভাবটা
অর্থপূর্ণ নয় কি? অবিশ্যি যদি ইনি মাকুল হয় থাকেন তাহলে আলাদা
কথা, না হলে বলব দাঁড়-গোফ অবশ্যম্ভাবী।'

হরকিশণের আনা চায়ের কাপ হাতে নিয়ে তিনজন ঘরের উত্তর দিকের
বারান্দায় এসে দাঁড়লাম। যে-রাস্তার উপরে বারান্দা, সেটাই পূর্ব দিকে চলে
গেছে সোজা দশাশ্বমেধ ঘাটে। রাস্তার দুদিকে সারি সারি দোকানে হিন্দি

আর ইংরাজিতে লেখা সাইনবোর্ড। ফেলুদা কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'তোপ্পে, তোকে বাদি কল্যা ষায় কলকাতার পাট উঠিয়ে এখানে এসে বাকি জীবনটা কাটাতে হবে—পারবি?'

একটু ভেবে বললাম, 'বোধহয় না।'

'কিন্তু এখানে এসেছিঁস মনে করেই মনটা নেচে উঠেছে—তাই নয় কি?'

সঁতাই তাই। কাশীতে সারাজীবন থাকতে ভালো লাগবে না নিশ্চয়ই, কিন্তু যখনই ভাবছি আট-দশ দিনের বেশি থাকবার দরকার নেই তখনই মন বলছে বেনারসের মতো জায়গা হয় না।

'তার কারণটা কী জানিস?'—ফেলুদা বলল—'তুই যে নিচের দিকে তাকিয়ে শুধু একটা রাস্তা দেখাছিস তা ত নয়; তুই দেখাছিস বেনারসের রাস্তা। বেনারস! কাশী! বারাণসী!—চারটিখানি কথা নয়। পৃথিবীর প্রাচীনতম শহর, পুণ্যতীর্থ, পণ্ডিথান! রামায়ণ মহাভারত মুনিস্বর্ষি যোগী সাধক হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ জৈন সব মিলে এই বেনারসের একটা ডেল্টা আছে যার ফলে শহরটা নোংরা হয়েও ঐতিহ্যে ঝলমল করতে থাকে। যারা এখানে বসবাস করে তারা দিন গুরুরানোর চিন্তায় আর এসব কথা ভাববার সময় পায় না, কিন্তু বার্য্য করেক দিনের জন্য বেড়াতে আসে তারা এইসব ভেবেই মশগুল হয়ে থাকে।'

লালমোহনবাবু এই ফাঁকে কখন জানি ভিতরে চলে গিয়েছিলেন, হঠাৎ তার গলার আওয়াজ পেয়ে পিছন ফিরে দেখি তিনি সঙ্গে একজন অচেনা লোককে নিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছেন। বছর পঞ্চাশেক বয়স, মাঝারি রঙ, মাথার কাঁচাপাকা চুল মাঝখানে সিঁচি করে পিছন দিকে টেন করে আঁচড়ানো। চোখা নাকের নিচে পাতলা পান-বাওয়া ঠোঁট অল্প হাসিতে ফাঁক হয়ে আছে। ডুপলোক ফেলুদাকে নমস্কার করে বললেন, 'আপনার পরিচয় পেলুম এনার কাছ থেকে। আমার হোটেলে'র সম্মান বাড়ল, হেঃ হেঃ।'

বুঝলাম ইনিই হলেন ম্যানেজার নিরঞ্জন চক্রবর্তী।

'কোনো অসুবিধা-টসুবিধা—?'

'না না—দিবিং বসস্থ।'

আসুন, নিচে আসুন আমার ঘরে। আপনাদের চা দিয়েছে? শুধু চা? অ্যাঃ—ছি ছি!'

দেয়ালে তিনটে ইংরিজি আর দুটো বাংলা ক্যালেণ্ডার, জ্বর রবীন্দ্রনাথ সুভাষ বোস বিবেকানন্দ আর শ্রীঅরবিন্দ'র ছবি টাঙানো। ম্যানেজারের ঘরে বসে আমরা আরেক কাপ চা আর হাল্কা সোহন খেলায়। এ ঘরটা বাড়ির ভিতরের দিকে, তাই সাইকেল রিকশার হর্ন ছাড়া রাস্তার আর কোনো শব্দই আসে না।

নিরঞ্জনবাবু বললেন, 'আমার হোটেল গত মার্চ' মাসে বিশালী গৃহময় বাগচী থেকে গেছেন—ওই আপনাদের তিন মন্ডর ঘরটাতেই। ও—কী মাসুল মশাই! আশ্চর্য পাঞ্জাবি পুরে গোবুল্লিয়ার মোড়ে পান কিনতে গেচে, আর তিন মিনিটে রাস্তায় ভীড় জমে গেচে। হাত ভাঁজ করে পান মূখে পুরছে আর তাতেই বাইসেপ ঠেলে বেরুচ্ছে।...আপনি কিন্তু যাবার আগে আমাদের অ্যালবামে দু'লাইন লিখে দিয়ে যাবেন। অনেক গুণী লোকের লেখা রয়েছে ওতে। তবে মাগির বাকার, বোঝেন ত—মনের মতো মেন্দু দিতে পারব না আপনাদের, এই যা দুঃখ।'

ফেলদা বলল, 'আপনি শূদ্ধ আমার লেখা চাইছেন কেন—ইনিও কিন্তু খ্যাতিতে কম যান না।'

লালমোহনবাবু বিনয় করার ভাব করে কী একটা বলতে গিয়েও বললেন না। নিরঞ্জনবাবু হেসে বললেন, 'ওর কথা আমার ভায়া ভাই আগেই জার্নিরে-টিল। আপনার আসাটা সারপ্রাইজ কিনা, তাই বলছি আর কি।'

লালমোহনবাবু কিছুক্ষণ থেকেই উদ্বেগ করছিলেন, এবার আর থাকতে না পেরে বললেন, 'কাগজে দেখলুম—এখানে একটি সাধুবার আবির্ভাব হয়েছে?'

'কে, আবলুস বাবা?'

'কই না ত। আবলুস ত নয়। মছলি-বাবা নাম দিয়েছে যে কাগজে।'

'ওই হল। হিন্দিওয়ালারা মছলি বলছে। আবলুস নাম আমার দেওয়া। গিরে দেখলে বুঝবেন নামকরণটা কেমন হয়েছে।'

'সত্যিই সত্যিই এসেছেন নাকি?'

প্রশ্নগুলো লালমোহনবাবুই করছেন, ফেলদা প্রোভা। নিরঞ্জনবাবু বললেন, 'ভাই ত বলচে। বলে এখন নাকি প্রমাণ থেকে আসছেন। তবে স্টাটিং পয়েন্ট হল গিরে হরিম্ভার। এখেন থেকে যাবেন মূঙ্গার-পাটনা। তারপর একদিন হয়ত দেখবেন কাবুঘাটে গিরে মোস্তফা ফেলচেন বাবাজী!'

'অলৌকিক ক্ষমতার ব্যাপকতা কী মশাই?'

'যা শূনিচি তাই বলচি। কেদার ঘাটে চৈৎপাত হয়ে পড়ে ছিলেন বাবাজী। ভোর সাত্তরে অস্ত্র চাক্ষুসি ঘাটে নেমেছেন। পঁয়ত্রিশ বছরের অভ্যাস মশাই—খড়ি ধরে সাড়ে চারটে—ফাস্ট টু অ্যারাইভ—শীঘ্র প্রাণ্য বর্ষ। কোনো সন্দেহ নেই। সস্তর বছর বয়স, চোখে ছানি। পা ফেলতে গিয়ে শানের বকলে নরম নরম কী ঠেকেছে, ঝুঁকে দেখেন মনুষ্য। গায়ের চামড়া কুঁচকানো, মনে হয় অনেকক্ষণ জলে ছিল। লোকটা এপাশ ওপাশ করছিল—যেন সেইদশ অবস্থা থেকে সবে জ্ঞান ফিরচে। চাক্ষুসি মশাই ঘাড় নিচু করে দেখাচেন, এমন সময় বাবাজী চোখ খুলে তাঁর দিকে চেয়ে হিন্দি টোনে বাংলা ভাষায়

বললেন, 'মা এত জল দিয়ে ঘিরে রেখেছে তোকে, তাও ভোর আগুনের ভয় ?'
 -- বাগ্, ওই এক কথাতেই অভয় চক্কাঁস্তি ক'ত ।'

আমরা তিনজনে মূখ চাপিয়া-চাপিয়া করছি দেখে নিরঞ্জনবাবু ব্যাশারটা
 হুঁকিয়ে দিলেন ।

'কাশী আসার আগে অভয় চক্কাঁস্তি থাকতেন চুঁচড়োয় । সেইথেনে একবার
 কালাঁপুজোয় তাঁর বাড়িতে আগুন লাগে । তাতে তাঁর স্ত্রী আর একটি চোন্দ



বছরের ছেলে মারা যায় । সেই থেকে ভুল্ললোক বিবাগী হয়ে কাশীবাসী হয়ে
 যান । অত্যন্ত সদাশয়, সান্ত্বিক মান্দ্য । বাবাজীর এই কথায় তার মনের কী
 অবস্থা হবে সে ত বুঝতেই পারচেন ।'

'সেদিন থেকেই বাবাজী অভয় চক্কাঁস্তির বাড়িতে ?'

'সেদিন কী মশাই, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দীক্ষা-টীক্ষা ক'র্মালট । তারপর
 যা হয় । খবর রটে যায় । লোক আসতে শুরু করে । ব্রেগ্‌লার দর্শন । ঘাটের

কাছেই অভয় চকোতির বাড়ি। ভেতরে উঠোন। দণ্ডের উপর বাবাজী বসেন, উঠোনে ভক্তরা। একটি একটি ভক্ত কাছে যায়, বাবাজী তাদের একটি করে মন্ত্রপুত শঙ্ক দিয়ে দেন।

‘শঙ্ক কী মশাই?’ প্রশ্ন করলেন লালমোহনবাবু।

‘মাছের আঁশ মশাই, মাছের আঁশ। মোকেরা বলেছে স্বয়ং কিছু আবার মাছ হয়ে এসেছেন।’

‘সে আঁশ কি খেতে হয় নাকি মশাই?’ লালমোহনবাবু এমনভাবে নাক কুঁচকেছেন যে আঁশটে গন্ধ পাচ্ছেন।

‘খেতে হবে কেন? পরদিন সূর্য ওঠার ঠিক আগে—বাকে বলে ব্রাহ্মমুহুর্ত—সেই সময়ে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিলেই হল।’

‘ওটা করে কী কেউ কোনো ফল পাচ্ছে?’

‘আর পাঁচজনকে কথা শুনে বলতে পারি না—আমার একটা কলিক পেনের মতো হচ্ছিল; গোপেন ডাক্তার ম্যাগফিস্ট খেতে বলেছিল। খাচ্ছিলুম। বাবাজী এলেন, দর্শন করলুম, আঁশ পেলুম—পরদিন ভাসে ভাসিয়ে দিলুম। এখন পেনটা নেই বললেই চলে—তা সে হোমিওপ্যাথির গুল না আঁশপ্যাথির গুল তা বলতে পারি না।’

‘কদিন থাকবেন এখানে কিছু জানেন?’

‘ইনি ডাক্তার কোনোখানেই নাকি বেশিদিন থাকেন না। তবে এ’র দণ্ডের দিনটা নাকি ভক্তরাই ঠিক করে দেন।’

‘কিরকম?’

‘সটা আজ সম্ভবেলা জানা করব। আপনাদের নিয়ে যাব। আজই নাকি জানা যাবে বাবাজীর কাশীর মেয়াদ আর কদিন।’

তুই

নিরঞ্জনবাবুর ঘরে বসে আরো কিছুক্ষণ কথা বলে আমরা বোরিংয়ে পড়লাম। ছদ্মলোক বললেন ঠিক হাতে কিছুটা সময় আছে, তারপর নাকি ব্যাংক যেতে হবে, তার আগে পর্যন্ত উনি আমাদের সঙ্গে ঘুরবেন।

হোটেল থেকে বোরিংয়ে ডান দিকে কিছু দূর গেলেই রাস্তার লোক আর গাড়ি জোচলের শব্দের সঙ্গে একটা নতুন শব্দ কানে আসতে থাকে। আরো কিছু দূর গেলেই একটা মোড় ঘুরে সামনে গঙ্গা দেখতে পাওয়া যায়। এখান থেকে রাস্তাটা ঢালু হয়ে সিঁড়ির ধাপ আরম্ভ হয়ে যায়। প্রত্যেক ধাপের মাঝখানে আর দু'পাশে লাইন করে ভিখরী। এক সঙ্গে এতো ভিখরী এর আগে কখনো দেখিনি। এই ভিখরীর আশেপাশেই চরে বেড়াচ্ছে বোকা-পাঠার দল। লালমোহনবাবু বললেন, 'খনি আপনার নাকের স্মরণশক্তি মশাই। এ গন্ধ শু আমি নিজেও শৈয়ছি আগের বার—কিন্তু তুলে গেলাম কি করে?'

দশাশ্বমেধ ঘাটের বর্ণনা দিতে গেলে আমিও হয়ত লালমোহনবাবুর মতো জমজমাট কথাটা ব্যবহার করতাম, কিন্তু ফেলুদার ধমকের পর আর করব না। হোটেল ফিরে এসে ঘাটের লোককে কী কী কাজ করতে দেখেছি তার একটা নম্বর দেওয়া লিস্ট করতে গিয়ে একশো তেরো অবধি পৌঁছে থেমে গেলাম। সেটা আবার ফেলুদা পড়ে বজল, 'দিব্যা হয়েছে—কেবল গোটা বিশেক বাদ পড়েছে।'

ঘাটের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে উত্তর দিকে চাইলে রেলের ব্রিজটা দেখা যায়, আর পূর্ব দিকে নদীর ওপারে দেখা যায় রামনগর—যেখানে রাজা আছে, কেন্দ্রা আছে, আর নদীর ধারে নাকি সম্রাসীদের একটা আস্তানা আছে।

দশাশ্বমেধের পাশেই উত্তরে হল মানসদির ঘাট। ঘাটের উপরেই একটা বাড়ির ছাতে প্রায় চারশো বছর আগে রাজা জয়সিংহের তৈরি জ্যোতিষদিয়ার যন্ত্রপাতি রয়েছে। দিল্লীরটার মতোই এটাও একটা ছোটখাটো যন্ত্র-যন্ত্র। ফেলুদা হয়ত সেটা দেখবার মতলবেই মানসদির ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে উঠাছিল, এমন সময় একটা ঘটনা ঘটল।

এটা বলা দরকার যে এদিকটায় দশাশ্বমেধের স্নানের হট্টগোল প্রায় পৌঁছয় না বললেই চলে। আওয়াজের মধ্যে দূর থেকে ভেসে আসা লাউডস্পীকারে

হিন্দি ফিল্মের গান, আর আমাদের থেকে বেশ কয়েক ধাপ নিচে দুলন লোকের কাপড় কাচার শব্দ। আমাদের ডান দিকে একটা বটগাছ, তাতে কতগুলো বাঁদর বসিরাটো করছে। গাছের উপর দিকের ডালপালা একটা হলদে বাড়ির ছাতের উপর ন্যূন পড়েছে। একটা চীৎকার শুনে আমাদের চারজনকেই দৃষ্টি ছাতটার দিকে চলে গেছে।

একটি ছেলে ছাতের পাঁচিলের উপর উঠে দাঁড়িয়েছে। তিনতলা বাড়ির ছাত। ছেলেটি যেখানে দাঁড়িয়েছে তার সামনে একটা সরু গলি, আর গলির ওপাশে আরেকটা তিনতলা বাড়ি। সেটার রং লাল। সেটার ছাতেও নিশ্চয়ই একজন কেউ আছে, যদিও তাকে দেখা যাচ্ছে না। তাকেই উদ্দেশ্য করে প্রথম ছেলেটি চ্যাঁচাচ্ছে।

‘শয়তান সিং!’

হাঁক দেবার মেজাজটা যেন সে একটা ফিল্মের হিরো।

শাশ থেকে নিরঞ্জনবাবু ফিসফিস করে বললেন, ‘ঘোম্বলদের বাড়ির ছেলে। কুদৃশিত ডানপিটে।’

আমার তলপেটটা কেমন জ্বলি করছে। ছেলেটি যদি একবার টাল হারায় ও চীৎকার-পাশাশ কুট নিচে পাথরে বাঁধানো রাস্তায় পড়বে।

আর লুকিয়ে কোনো লাভ নেই। আমি জানি তুমি কোথায় আছ!—আবার চীৎকার করে উঠল ছেলেটি।

ফেলুদাও টান হয়ে উপরের দিকে চেয়ে ঘটনাটা দেখছে। এবার লালমোহন-বাবুর খসখসে চাপা গলা শোনা গেল।

‘শয়তান সিং হচ্ছে অকুঁড় নন্দীর লেখা পাঁচখানা বইয়ের ডিক্সন মশাই—রহস্য-রোমাঞ্চ নিরীক।’

‘আমি আসছি তোমার কাছে!—’ আবার চীৎকার এল—‘তুমি অতঃসম্পর্কের জন্য প্রস্তুত হও!’

ছেলেটি হঠাৎ পাঁচিল থেকে নেমে উঠাও। ভাবছি এবার কী নাটক দেখবে কে জানে, এমন সময় হঠাৎ দেখি একটা বাঁশ হলদে বাড়ির পাঁচিলের উপর দিয়ে বেরিয়ে সামনের লাল বাড়ির ছাতের দিকে এঁগিয়ে গিয়ে দুই বাড়ির মাঝখানে একটা দ্বিধা তৈরি করল। এইবার ফেলুদা মূখ খুলল, যদিও গলার শব্দ চাপা।

‘ওনার মতলবটা কী?’

‘শয়তান সিং!’—আবার হুৎকার। ‘তুমি দল গুণতে গুণতে আমি তোমার কাছে এসে পড়ব।’

এবার যেটা ঘটল তাতে আমাদের সকলেরই ঘাম হুটে গেল।

ছেলেটি পাঁচিল থেকে কানিশে নেমে থপ করে বাঁশটা ধরে শুকনো ঝুলে



পড়ল।

‘এক...দুই...তিন...চার...’

উল্টো দিকের ছাত থেকে শয়তান সিং গদগতে শব্দ করে, আর এ ছেলেরি বঁধ ধরে কুলতে কুলতে এগোচ্ছে।

‘একটা কিছু করুন মশাই।’ নিরঞ্জনবাবু ধরা গলায় বললেন,—‘আমার কলিক পেনটা আবার—’

ফেলদাদার ডান হাতের তর্জনিটা গোথরোর ফোঁস করার মতো এক লাফে ঠোটে চলে এল। আমরা সবাই দম কণ্ঠ করে এই খুঁদে ছেলের দূর্সাহসিক ব্যাণারটা দেখতে লাগলাম।

‘ছয়...সাত আট...ন—ন!’

নয় গোন্যর সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরি উল্টো দিকে পেঁঁছে গিয়ে কানিশে পা ফেলেই বাঁশেরই উপর ভর করে পার্টিচল টপকে লাল বাড়ির ছাতে নেমে গেল। তারপর শোনা গেল একটা অচেনা গলায় এক বিকট চীৎকার, আর সেই সঙ্গে প্রথম ছেলেরিটার এক অশুভ উল্লাসের হাসি।

লালমোহনবাবু বললেন, ‘মেরেই ফেললে ন্যাকি মশাই?—কোয়রে কেন ছোরা গোছের কী একটা কুলতে দেখলুম।’

ফেলদাদা গালির দিকে পা বাড়িয়ে বলল, ‘ভিলেনটি কিরকম জানি না, হিরোটি যে দূর্দান্ত সাহসী তাতে কোনো সন্দেহ নেই।’

নিরঞ্জনবাবু বললেন, ‘বোখাল বাড়িতে রিপোর্ট করা ছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই।’

আমরা আরেকটু এগোতেই লাল বাড়িটার দরজার সামনে পেঁঁছে গেলাম। ভিতরে অন্ধকার। কাছেই বোধ হয় সিঁড়ি, কারণ ধূপ ধাপ পায়েল শব্দ পাচ্ছি, আর সেই সঙ্গে ছেলেরিটার কথা এগিয়ে আসছে।

...‘তারপর ঝপাৎ করে পড়বে জলে, আর ভাসতে ভাসতে ভাসতে ভাসতে চলে যাবে একেবারে সমুদ্রে, আর সেখানে একটা হাঙর এসে টপ করে গিলে ফেলবে। আর সেই হাঙরটা যখন ক্যাশ্টেন স্পার্কের দিকে চার্জ করবে, তখন ক্যাশ্টেন স্পার্ক হারপুন দিয়ে ঘ্যাচাৎ করে মারবে সেটার পেটে, আর—’

এইটুকু বলে আর বলা হল না, কারণ ঘামে চপ্ চপ্ ছেলে দুটি দরজা দিয়ে বাইরে এসে পড়েছে, আর প্রথম ছেলেরিটা আমাদের দেখেই থমকে দাঁড়িয়েছে। বয়স বছর দশের বেশি নয়, ধপধপে ফরসা রং, চোখ নাক একেবারে রাজপুত্রের মতো। অন্য ছেলেরিটার বয়স কিছুটা বেশি। ইনি যে বাঙালী নন সেটা দেখলেই বোঝা যায়। দুজনেরই চোয়াল যেভাবে চলছে তাতে বোঝাই যায় তারা মুখে চুইং গাম পুরে নিচ্ছে।

ফেলদাদা প্রথম ছেলেরিকে বলল, ‘ও-ত শয়তান সিং আর তুমি কে?’

‘ক্যাপ্টেন স্পার্ক’, চাব্বকের মতো উত্তর দিল ছেলেটি।

‘তোমার আরেকটা নাম আছে না? তোমার বাবা তোমাকে কী বলে ডাকেন?’

‘আমার নাম ক্যাপ্টেন স্পার্ক’। আমার বাবাকে বিবাহ-ভীর মেরে খুন করেছিল শয়তান সিং আফ্রিকার জঙ্গলে। তখন আমার বয়স সাত। তখন থেকে আমার চোখে প্রতিহিংসার বিদ্যুৎ জ্বলে, তাই আমার নাম স্পার্ক।’

‘সর্বনাশ,’ বললেন লালমোহনবাবু, ‘এ যে অক্লান্ত নন্দীর বই মৃৎস্থ করে ফেলেছে মশাই।’

ছেলেটি লালমোহনবাবুর দিকে একবার কটমট করে তাকিয়ে তার বন্ধুকে নিয়ে গম্ভীরভাবে গলি দিয়ে এগিয়ে গিয়ে মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

‘বর্ন আকটর’—মন্তব্য করলেন জটায়ু।

ফেলুদা নিরঞ্জনবাবুকে জিজ্ঞাসা করল, ‘ঘোষাল বাড়িতে কাউকে চেনেন?’

‘চিনব না? আশ্চিন্দ রয়েছি কাশীতে।’ ওদের সকলেই চেনে। প্রায় একশো বছর হল বেনারসে বাস। এই যে খোকারে দেখলেন, এর ঠাকুরদা অম্বিকা ঘোষাল এখানেই থাকেন। ওকালতি করতেন, বছর বাহনক হল ছেড়ে দিয়েছেন। খোকার বাপ উমানাথ ঘোষাল কলকাতায় থাকেন, ফেরিক্যালের ব্যবসা। প্রত্যেক পূজোয় ফার্মাল নিয়ে এখানে আসেন। এদের বাড়িতেই দুর্গাপূজো হয়। খনিদানি পরিবার মশাই। এদের জমিদারি ছিল ইস্টবেঙ্গলে পদ্মার ধারে।’

‘একবার উমানাথের সঙ্গে দেখা করা যায়?’

‘কেন যাবে না? আপনারা ত আবলুসবাবা দর্শনে যাবেন বলছিলেন, সেখানেও দেখা হয়ে যেতে পারে। শূন্যচি নাকি ইনিও দীক্ষা নেবেন নেবেন করতেন।’

আবলুসবাবাকে সেখে নিরঞ্জনবাবুর নামকরণের তারিফ না করে পারা যায় না। ফেলুদা দেখেছে কিনা জানি না, আমি নিজে জীবনে এত মিথকালো লোক দেখিনি। শব্দ কালো নয়, এমন মসৃণ কালো যে হঠাৎ দেখলে মনে হয় গায়ে বৃষ্টি সাপের খোলসের মতো একটা কিছুর পরে আছেন। তার উপরে কাঁধ অবধি চেউ খেলানো চুল, আর বুক অবধি চেউ খেলানো দাড়ি—দুটোই কুচকুচে কালো। সাধুবাবা জোয়ান লোক; বয়স ত্রিশ-পঁয়তাল্লিশের বেশি হলে আশ্চর্য হব। অবিশিষ্ট জোয়ান নাহলে আর এত সীতার কাটেন কী করে। বাবার চেহারা আরো খোলতাই হয়েছে তার গায়ের টকটকে লাল সিলেক্স চাদর আর লুঙ্গির জন্য।

আমরা চারজন উঠানে ভক্তদের ভাঁড়ের গিছনে দাঁড়িয়েছি, বাবাজী

বারান্দার শীতল-পাটির উপর বিছানো একটা সাদা চাদরে বসেছেন, তার দু'পাশে দুটো আর পিছনে একটা হলদে মখমলের তাকিয়া। বাবার বাঁ পাশে একজন বৃদ্ধ চোখ বৃজে হাত জোড় করে বসে আছেন, যোঝাই খাচ্ছে ইনি হলেন অভয় চক্রবর্তী। বাবা নিজে পদ্মাসনের ভাঁগিতে বসে অল্প অল্প দুলছেন, আর ডান হাতের তেলো দিয়ে হটিয়ে হাত বুলোচ্ছেন। দোলানিটা হচ্ছে তালে তালে, কারণ বারান্দার এক ধারে বসে একজন লোক কাঠের খঞ্জনি বাঁজিয়ে একটা হিন্দুস্থানী ভজন গাইছে। গানের প্রথম দুটো লাইন মনে ছিল, হোটেলে ফিরে এসে খাতার লিখে রেখেছিলাম—

ইতনী বিনতি রঘুনন্দন সে

দুখ স্বপ্ন হানারা মিটাও জী—

আজ আর সেই মাছের অশির ব্যাপারটা হচ্ছে না। তার বদলে আজ একটা বিশেষ ঘটনা ঘটবার কথা আছে; মহলিাবাবু আজ তার ভক্তদের কাছ থেকে জেনে নেবেন আর কদিন পরে তাঁকে কাশী ছেড়ে চলে যেতে হবে। সেটা যে কী ভাবে জানা হবে তা এখনো কেউ জানে না।

লালমোহনবাবুর দেখাছি বেনারসে এসেই ভক্তিভাবটা একটু বেড়ে গেছে। সকালে দশাঙ্কমেধ ঘাটে ঠুকে বার তিনেক বেশ গলা উঁচিয়ে 'জয় বাবা বিশ্বনাথ' বলতে শুনছি। এখানে এসে দেখাছি বাবাজীকে দেখেই ঠর হাত দুটো আপনা থেকেই জোড় হয়ে গেছে। এত ভক্তি দেখালে অ্যাডভেঞ্চার গল্পের স্টাট মাথায় কী করে আসবে জানি না। বোধ হয় তাই বহুদিন মহলিাবাবু ঠুকে স্বপ্নে স্টাট দিয়ে দেন।

কালো প্যাণ্ট আর নীল রঙের গুরু সার্ট পরা একজন ভদ্রলোক সবেমাত্র আমাদের পিছন দিয়ে ঢুকে আমাদেরই পাশে দাঁড়িয়ে বোধহয় ভাবছেন ভীড় ঠেলে কী করে এগোন যায়। নিরঞ্জনবাবু, লোকটির দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'ঘোষাল সাহেব এলেন না?' ভদ্রলোক গলা নামিয়ে উত্তর দিলেন, 'আছে না, এনার খুঁজতুতো ভাই আর তার স্ত্রী এসে পেঁপীয়েছেন আর দু'গণাপুর থেকে, বাড়িতে ভাই...'

ভদ্রলোকের রং ফরসার দিকে, হুঁলপিটা হাল ফাশানের, চোখে চশমা, সব নিলিয়ে মোটামুটি গলাক চতুর চেহারা। 'আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে নই'—নিরঞ্জনবাবু ফেলদার দিকে চেয়ে বললেন—'ইনি বিকাশ সিংহ—উমানাথবাবুর সেক্রেটারি।'

তারপর আমাদের তিনজনেরও পরিচয় করিয়ে দিলেন নিরঞ্জনবাবু। ফেলদার নাম শুনেই সিংহ মশাইয়ের কুর্তা কুঁচকে গেল।

'প্রদেব মিত্র? গোহরদা প্রদোষ মিত্র!'

'হ্যাঁ মশাই'—নিরঞ্জনবাবু গলা চাপতে ডুলে গেলেন—'স্বনামধন্য ডিটেক-

ভিত্তি। আর ইনিও অবিশ্য কয় হয়ে নন—'

নিরঞ্জনবাবু লাগামোহনবাবুর দিকে দেখানোর সঙ্গেও সিংহ মশাইয়ের দৃষ্টি ফেলানোর দিকেই রয়ে গেল। ভদ্রলোক কী বেন বলতে চাইছেন।

'ইয়ে আপনি এখানে আছেন জানিলে...কোথায় উঠেছেন বলুন ত?'

'আমারই হোটেলের মশাই!'—নিরঞ্জনবাবু এবার খেয়াল করে গলাটা নামিয়ে কথাটা বললেন।

'ঠিক আছে, মানে...' বিকাশবাবু এখনো আমতা-আমতা করছেন—
'একবারটি বোধ হয়...ঠিক আছে, কাল না হয় যোগাযোগ করব।'

ভদ্রলোক নমস্কার করে তীড় চেঁলে এগিয়ে গেলেন।

'এক সূর্য, এক সূর্য, এক চন্দ্র।'

মহলিাবাবু দুহাত তুলে চেঁচিয়ে উঠছেন। ভজন থেমে গেল। ভক্তরা সবাই থমকে গিয়ে সোজা হয়ে বসল। এতক্ষণ লক্ষ করিনি, এবার দেখলাম বাবার যেদিকে অভয়বাবু বসেছেন তার উল্টোদিকে আরেকটি ভদ্রলোক—বছর চা্লিশেক বয়স—সামনে একটা নকশা করা খালি নিরে বসেছেন। খালির পাশে স্তম্ভ করে কালো কালো কী জানি রাখা রয়েছে।

'দু হাত দু পা দু চোখ দু কান!'—বাবাজী আবার শুরু করলেন। এসব বলার কী খানে কিছুই বুদ্ধিতে পারছি না; অন্যেরা কেউ বুদ্ধিছে কিনা তাও বুদ্ধিতে পারছি না।

'তিন কুল তিন কাল চারদিক চার বৃগ পণ্ড ভূত পণ্ড ইন্দ্রিয় পণ্ড নদ পণ্ড পান্ডব—এক, দু, তিন, চার, পাঁচ!'

বাবাজী একটু থামলেন। খালিওয়ালা ভদ্রলোক তার দিকে হাঁ করে চেয়ে আছেন, ভক্তরাও সব চেয়ে আছে। লাগামোহনবাবু আমার কানের কাছে ফিস-ফিস করে বললেন, "প্রিলিং!" বাবাজী আবার শুরু করলেন—

'ছে রিশ, ছে অতু, সন্ত সুর সন্ত সিন্দু, অষ্ট ধাতু অষ্ট সিদ্ধি, নবগ্রহ নবগ্রহ, দশকর্ম দশ মহাবিদ্যা দশাবতার দশাম্বমেধ—এক থেকে দশ।'

এইটুকু বলে বাবাজী খালিওয়ালা ভদ্রলোকের দিকে ইশারা করলেন। ভদ্রলোক ফিসফিস করে বাবাজীকে কী যেন বলে দিলেন। তারপর ভক্তদের দিকে ফিরে অস্বাভাবিক রকম সরু গলায় বললেন, 'এবার আপনারা এক থেকে দশের মধ্যে একটি সংখ্যা বেছে নিয়ে একে একে বাবাজীর সামনে এসে এই খালির মধ্যে থেকে একটি কাগজের টুকরো নিয়ে তাতে এই কাঠকয়লায় সাহায্যে সংখ্যাটি লিখে আমার হাতে দিয়ে দেবেন।' প্রথমে বাঙলায় বলে আবার সেটা হিন্দি করে বললেন।

ফেলানা নিরঞ্জনবাবুর দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, 'যে সংখ্যাটা সবচেয়ে বেশি ব্যয় পড়বে, সেটাই কি বলে দেবে বাবা কীদিন থাকবেন?'

হয়ত তাই। সেটা ত বললে না কিছ্‌দু।

‘খাঁসি তাই হয় তাহলে বোধহয় বাবাজীর সাতদিনের বেশি ঐরাদ নেই।’

‘আপনি লিখবেন নাকি?’

‘না মশাই। বাবা থাকছেন কি বাচ্ছেন সে নিয়ে ত আমাদের অত মাথা-ব্যথা নেই। আমরা দেখতে এসেছি, দূর থেকে দেখে চলে যাব—বাস্‌। তবে একটা জিনিষ জানার কৌতুহল হচ্ছে। এইসব ভক্তদের মধ্যে কিছ্‌দু কিছ্‌দু গণ্যমান্য লোকও আছেন ত, নাকি সবাই মাজানো ভক্ত?’

‘কী বলছেন মশাই!—নিরঞ্জনবাবুর চোখ কপালে উঠে গেল। ‘এরা সব বলতে পারেন একেবারে ক্রীষ অফ কাশী। ওই দেখুন—সাদা চাদর গারে, মাথায় ঢাক—উঁনি হলেন প্রতীকর মহেশ বাচস্পতি, মহাপণ্ডিত—আজম্ম কাশীতে রয়েছেন। তারপর ওই দেখুন মৃত্যুঞ্জয় সেন কবিরাজ, দয়ালকর শত্রুগ—এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের এজেন্ট। যিনি বাবাজীর পাশে যিনি নিয়ে বসে আছেন তিনি হলেন অভয় চকোস্তির ভাইপো—আলিগড় ইউনিভার্সিটিতে ইংরিজির প্রফেসর। উকীল ব্যারিস্টার ডাক্তার প্রোফেসর হাল্‌ইকর—কিছ্‌দু বাদ নেই মশাই। আর মহিলা ভক্ত আছেন সে ত দেখতেই পাচ্ছেন। আর ওই দেখুন—’

নিরঞ্জনবাবু একজন সাদা পাঞ্জাবি আর সাদা বেনারসী টুপি পরা জাদিরেল লোকের দিকে দেখালেন।

‘ওকে চেনেন? উঁনি হলেন মগনলাল মেঘরাজ। ওর মতো পরমা আর মাপট কাশীতে আর কারুর নেই। বেনারসে যদি বাঘ থাকত ত এখানকার বলদগুলোর সঙ্গে এক ঘাটে জল খেত ওর নান্নে।’

‘মগনলাল মেঘরাজ?...নামটা চেনাচেনা মনে হচ্ছে।’

নিরঞ্জনবাবু ফেল্দুদার দিকে আরো খানিকটা ঝুঁকে পড়লেন—আর সেই সঙ্গে আমিও।

‘দু’বার পুঁলিশ রেড হয়ে গেছে ওর বারিড়িতে। একবার কলকাতায়—ওর বড়বাজারের গদিতে—একবার এখানে। চোরা কারবার, জালো টাকা—যা ভাবতে চান ভাবুন না।’

‘পুঁলিশ ত পায়নি কিছ্‌দু—তাই না?’

‘পুঁলিশ ত সব ওর হাতের মৃঠায় মশাই। রেড ত নামকাওয়াশে।’

ভক্তের দল এখনো একজন একজন করে গিয়ে কাগজে নম্বর দিয়ে আসছে। দেখে মনে হয় বেশ কিছ্‌দুক্ষণ সময় লাগবে। আমরা আরো মিনিট পাঁচেক দেখে বাইরে বেরিয়ে এলাম। গেটের কাছে পৌঁছতে না পৌঁছতে পিছন থেকে একটা ডাক শুনে ঘুরে দেখি আর সঙ্গে নিরঞ্জনবাবু আমাদের অলাপ করিয়ে দিলেন, সেই মিস্টার সিংহ ব্যস্তভাবে আমাদের দিকে এগিয়ে

জাসছেন।

“আপনারা চললেন?”—ভদ্রলোক বিশেষ করে ফেল্দার দিকে ভাবিয়েই প্রশ্নটা করলেন। উত্তরে ফেল্দা কিছু বলার আগেই ভদ্রলোক বললেন, “ইয়ে, আপনাদের এখনই একবারটি আমাদের বাড়ি আসা সম্ভব হবে কি? মিস্টার ছোবাল আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারলে খুশি হতেন।”

ফেল্দা হাতের বাড়িটা দেখে নিরে বলল, “আমাদের আর কী অসুবিধা” বলুন। নিরঞ্জনবাবুকে অবিশ্যি হয়ত হোটেলে ঘিরে বেডে হবে।”

“আপনারা তিনজনে ঘরে অসুন,” নিরঞ্জনবাবু বললেন, “তবে বেশি রাত না করলে খাবারটা গরম গরম খেতে পারবেন—এইটে শব্দ বলে রাখলাম। আজ আপনাদের জন্য ফাউল কারি করতে বলিচি।”

তিন

‘আপনার নাম আমি শুনছি। আপনিই ত ভুবনেশ্বরের যক্ষীর ভাড়া মাথা উন্মার করে দিয়েছিলেন—তাই না?’

‘আজ্ঞে হ্যাঁ—ফেলদা’ ওর পক্ষে যতটা সম্ভব বিনয়ী হাসি হেসে বলল। উমানাথ বে.বালের বয়স চাঞ্চল্যের বেশি না, গায়ের রং ছেলেরই মতো টকটকে, চোখ দুটো কটো আর চুলদুন্দু। কথা বলার সময় লম্বা করলম যে দুটো ছুর, এক সঙ্গে কখনই উপরে উঠছে না; একটা ওঠে ত অন্যটা নিচে থেকে যায়।

‘এ’রা সব আপনার—?’—ভুললোকের দৃষ্টি ফেলদার দিক থেকে আমাদের দুজনের দিকে ঘুরে গেছে।

‘এটি আমার খুড়তুতো ভাই তপেশ, আর ইনি লালমোহন লালদলী, জটোর, হুশনারে আডভেঞ্চারের গল্প লেখেন।’

‘জটোর?’—উমানাথের ডান ছুরটো উঠে গেল। ‘নামটা চেনা চেনা লাগছে। রক্তুর কাছে ওর কিছু বই দেখছি বলে মনে মনে পড়ছে। তাই না হে বিকাশ?’

‘আজ্ঞে হ্যাঁ,’ বললেন বিকাশবাবু, ‘খান তিনেক আছে বোধহয়।’

‘বোধহয় আবার কি। তুমিই ত যত রাজ্যের রহস্যের বই কিনে নাও ওকে?’ বিকাশবাবু অপ্রস্তুত হাসি হেসে বললেন, ‘ও ছাড়া ও আর কিছু পড়তেই চায় না।’

‘ও বরসে ত ওসব পড়বেই, পড়বেই,’ বলে উঠলেন লালমোহনবাবু। ‘সকালে ক্যাপ্টেন স্পার্ক’ আর শরতান সিং-এর নাম শোনা অবধি উনি বেশ মনমগ্ন হয়ে ছিলেন; এখন আবার মূর্খে হাসি ফুটেছে। রহস্য রোমাঞ্চ বইয়ের বাজারে অক্লুর নন্দী নাকি জটোর সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী।

ফেলদা বলল, ‘আমি এমনিতেই একটা কারণে আপনার কাছে আসতে চেয়েছিলাম।...আপনার ছেলের সঙ্গে আজ আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছে। তার আসল নামটা যদিও এখনো জানতে পারিনি; তবে সে যে ভূমিকায় অভিনয় করছিল তার নামটা জানি।’

‘অভিনয়?’—উমানাথবাবু হোহো করে হেসে উঠলেন। ‘আরে ও যে শব্দ নিজে অভিনয় করে তা ত নয়, অন্যদেরও সে নামটায় বদলে অভিনয় করায়।’

তোমাকেও একটা কী নাম দিয়েছিল না, বিকাশ ?”

‘মাত্র একটা?’ বিকাশবাবুও হেসে উঠলেন।

‘যাই হোক—তা, কোথায় দেখা হল আমার ছেলের সঙ্গে?’

ফেলুদা কোনোরকম বাড়াবাড়ি না করে অল্প কথার অন্তর্ভুক্ত গুঁড়িয়ে সকালের ঘটনাটা উমানাথবাবুকে বলল। ভুল্ললোক শূনে প্রায় চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন।

‘কী সর্বনাশের কথা!—ছেলে আমার ডার্মাটো সে ত জানি; তা বলে তার এতটা পুঁসাহস সে ত জানতাম না। ও ত মরতে মরতে বেঁচে গেছে! বন্ধুকে একবার ডেকে পাঠাও ত হে বিকাশ।’

মিস্টার সিংহ ছেলেটির খোঁজে বেরিয়ে গেলেন। ফেলুদা বলল, ‘ডাক-নাম রুকু সে ত জানলাম। ভালো নামটি কী?’

‘রুকিমণীকুমার,’ বললেন উমানাথবাবু। ‘ও-ই আমার একমাত্র ছেলে; কাজেই ঘটনাটা শূনে আমার মনের অবস্থা কী হচ্ছে সে ত বুঝতেই পেরেছেন।’

দুর্গাকুন্ড রোডের উপর বিগাট কম্পাউন্ডের মধ্যে বিশাল বাড়ি ঘোষাল-দের। রাতে বাড়ির বাইরেটা ভালো করে দেখতে পারিনি—শুধু গেটের উপর মার্বেল ফলকে লেখা শংকরী-নিবাস নামটা দেখেছি। আমরা বসেছি একতলার বৈঠকখানায়। আমাদের ডান পাশে দরজা দিয়ে পূজোর দালান দেখা যাচ্ছে। আমি যেখানে বসেছি সেখান থেকে প্রতিমার আধখানা দেখতে পাচ্ছি। রঙ ফগার করে এখনও চলেছে।

চাকর টোঁতে করে চা-মিস্টি এনে আমাদের সামনের টেবিলে রেখে বাবর পর উমানাথবাবু বললেন, ‘আপনারা মহলিাবাবা দর্শনে গিয়েছিলেন শুনলাম। কী মনে হল দেখেটেখে?’

ফেলুদা একটা পেঁড়ার আধখানা কামড় দিয়ে মূর্খ ফেলে বলল, ‘আমরা অল্পক্ষণই ছিলাম। শুনলাম আপনিও নাকি যাচ্ছেন?’

‘যাচ্ছি মানে একবারই গেছি। শ্বিভীকবার যাবার আর বাসনা নেই, কারণ সেদিন আমি না-খাকার জন্যেই দুর্ঘটনা ঘটল।’

উমানাথবাবু চুপ করলেন। আমরাও চুপ। লালমোহনবাবু দেখলাম আড়চোখে একবার ফেলুদার দিকে দেখে নিলেন।

‘দুর্ঘটনা?’—ফেলুদা ফাঁক ভাবার জন্য প্রশ্ন করল।

‘হ্যাঁ।’ উমানাথবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ‘শুধু দামের দিক দিয়ে নয়, প্রভাবের দিক দিয়েও একটি অমূল্য জিনিস গত বৃদ্ধকর—অর্থাৎ আমি যেদিন বাবাজীকে দেখতে যাই সেদিন—আমার বাবার ঘর থেকে উধাও হয়ে গেছে। আপনি যদি সেটিকে উদ্ধার করতে পারেন ত আমাদের অশেষ উপকার হবে, এবং সেই সঙ্গে আপনাকে উপযুক্ত পারিশ্রমিকও দেব।’

আমার বৃকের ভিতরে আমার খুব চেনা একটা ধূকপুকুনি আরম্ভ হয়ে গেছে।

‘জিনিসটা কী সেটা জানতে পারি?’ ফেলদা জিগোস করল।

‘ছোট্ট একটা জিনিস, মিস্টার ঘোষাল দা’ অঙ্কুল ফাঁক করে জিনিসটার সাইজ বৃদ্ধিয়ে দিলেন। ‘আড়াই ইঞ্চি লম্বা একটা গণেশের মূর্তি। সোনার মূর্তি, তার উপর দামা পাথর বসানো।’

‘ওটা কীভাবে এলো আপনার ঘাড়ের কাছে?’

‘বলছি সেটা। একেবারে গল্পের মতো।...আপনার ত খোঁজখবর চারমিনার ছাড়া চলে না—’

ভদ্রলোক নিজে একটা জানহিল মূখে পুরতেই ফেলদা আগুন এগিয়ে দিয়ে সেই মপো নিজেও একটা চারমিনার ধরিয়ে নিল। একটা বড় টান দিয়ে খোঁয়া ছেড়ে মিঃ ঘোষাল তার কাঁহনী বলাতে শব্দ করলেন।

‘আমার ঠাকুরদামার বাবা সোমেশ্বর ঘোষালের ছিল ভ্রমণের নেতা। ছাত্রাবস্থা বয়সে তিনি একা দেশ দেখতে বেরিয়ে যান। তখন নতুন রেলগাড়ি হয়েছে, কিছু পথ তাতে যাবেন, আর বাকিটা হর হেটে, আর না হরত যা যানবাহন পাওয়া যায় তাতেই। দক্ষিণ ভারতে ঘুরছিলেন। গিচনপল্লী থেকে মাদুরা হয়ে সেতুবন্দর দিকে যাচ্ছিলেন গরুর গাড়িতে, জপালে ভরা পাহাড়ে পথ দিয়ে। এই সময় মাঝরাতিরে তিনটি সশস্ত্র ডাকাত তাঁর গাড়ি আক্রমণ করে। সোমেশ্বর সাংঘাতিক শক্তিশালী লোক ছিলেন। মপো বাঁশের লাঠি ছিল। একা তিনজনের মপো লড়ে একটির মাথা ফাটিয়ে দেন, অন্য দুটি পালায়। ডাকাতদের একটা থলে পিছনে পড়ে থাকে। তার মধ্যে ছিল এই গণপতি। সেই মূর্তি মপো করে উনি দেশে ফেরেন। তারপর থেকেই আমাদের বংশের ভাগ্য ফিরে যায়। আমাদের আপনি কুসংস্কারাক্রান্ত সেকালের মানুষ বলে মনে করবেন না। আমাদের বংশে যা ঘটতে দেখছি তার থেকে কতকগুলো বিশ্বাস আমার মনে জন্মেছে—বাস, এইটুকুই। সত্যি বলতে কি, গণেশ আসার পর থেকে আমাদের ফ্যামিলিতে কোনো বড় রকম দুর্ঘটনা ঘটেনি বললেই চলে। ওটা আসার দু বছরের মধ্যেই পদ্মার ডাঙনে নদী আমাদের বাড়ির বিশ হাতের মধ্যে এগিয়ে আসে। কিন্তু বাড়ির কোনো ক্ষতি হয়নি। অবিশি এ ছাড়াও আরো অনেক নাজির আছে, সব দিতে গেলে দীর্ঘ ইতিহাস হয়ে যাবে। আসল কথা এই যে, একশো বছর আমাদের ফ্যামিলিতে থাকার পর আজ সে মূর্তি উদ্ধৃত। বাড়িতে পূজো, বাইরে থেকে আত্মীয়-স্বজন আসছে, কিন্তু সমস্ত সমারোহের উপর খেন একটা ছায়া পড়ে রয়েছে।’

উমানাথবাবু যেন ক্রান্ত হয়ে সোফায় এগিয়ে পড়লেন। ফেলদা প্রশ্ন করল, ‘কবে গিয়েছিলেন আপনি মহালিখাবাবুকে দেখতে?’

‘তিনদিন আগে। গত বুধবার। পনেরই অক্টোবর। আমরা এসেছি মাত্র দিন দশেক হল। মহলিবার কথা শুনে আমার গিল্লীর দেখতে যাবার শখ হল, তাই ওকে আর রুকুকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলাম।’

‘আপনার ছেলেও যেতে চাইল?’

‘নামটা শুনে কৌতূহল! বলল ওর কেন? এক বইয়েতে নারিক কার কথা রয়েছে যে সস্তর মাইল সাতার কেটে এসেছিল কুমীর হাঙরের মধ্যে দিয়ে। অবিশ্যি বাবাজীকে দেখে মোটেই ভালো লাগেনি। দশ মিনিটের মধ্যে উসখুস শব্দ হয়ে গেল। ওর জন্যেই ত ভাড়াভাড়ি ফিরে এলাম। এসে দেখি এই ‘কান্ড’।’

‘সিন্দুক আপনার বাবার ঘরে থাকে বলছিলেন না?’

‘হ্যাঁ, তবে চাবিটা এমনিতে আমার ঘরেই থাকে। রিং-এর মধ্যে পাঁচ ছটা চাবি, তার মধ্যে একটিই হল ওই সিন্দুকের। এমনিতে কেখাও বেরোলে আমার স্ত্রীর কাছে চাবিটা থাকে, কিন্তু সেদিন ও-ও যাচ্ছে বলে বাবার ঘরের দেয়ালে চাবিটা রেখে যাই। হঠাৎ খুব ব্যস্তমানের কাজ হয়নি, কারণ কথা সন্ধান দিকে একটু অফিস-টোফিস খান, খুব একটা হুঁশ থাকে না। যাই হোক—বাবার সময় চাবিটা রেখে দেয়ালটা একেবারে শেষ অবধি ঠেলে বন্ধ করে দিয়ে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে দেখি আর ইঁপু খোলা। সন্দেহ হয়; তখন সিন্দুক খুলে দেখি শল্য নেই।’

ফেলদা একটুক্ষণ ভুরু কুঁচকে থেকে বলল, ‘আপনার বাড়িতে সেদিন সেই সময়ে কে কে ছিলেন সেটা জানতে পারি কি?’

ফেলদা খাতা আনেনি, তবে উত্তরটা যে ওর মুখস্থ থাকবে, আর নামগুলো হোটলে গিয়ে লিখে নিতে পারবে সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

মিঃ ঘোষাল বললেন, ‘দায়েরান চিলোচনকে আপনারা গেটে দেখলেন; ও প্রায় পঁয়তিশ বছর হল আমাদের বাড়িতে রয়েছে। চাকর ঠাকুর বি সবাই পুরোন। প্রতিমা গড়েন শশীবাবু আর তার ছেলে কানাই। শশীবাবু কাজ করছেন চিশ বছরের উপর। ছেলোটো খুব ভালো। এ ছাড়া মালী আছে, সে পুরোনো। আর আছে বিকাশ—যে আপনাদের সঙ্গে করে নিয়ে এল।’

‘বিকাশবাবু কদিন আছেন?’

‘সেব্রেটারির কাজ করছে বছর পাঁচেক, আছে অনেকদিন। ও প্রায় ফার্মালি মেম্বারের মতোই হয়ে গেছে। ওর বাবা অখিলবাবু আমাদের জমিদারি সেবেসতার কাজ করতেন। ওর মা বিকাশ হবার সময়ই মারা যান। তার বছর দশেক পরে বাপও চলে গেলেন ডুপসিতে। অনাথ ছেলোটো সঙ্গদোষে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে শুনে আমার জ্যাঠামশাই ওকে বাড়িতে এনে রাখেন। ইন্সুল কলেজ সবই আমাদের বাড়িতে থেকেই। এমনি ব্যস্তমান ছেলে। লেখাপড়ায় বেশ ভালোই ছিল।’

চুঁরির খবরটা পুঁলিশে দেননি?’

‘সেই রাতেই। এখনো পশ্চিম কোণে হাটসি পায়নি।’

‘গণেশের খবর বাইরের কেউ জানত?’

উমানাথবাবু উত্তর দেবার আগেই বিকাশবাবুর সঙ্গে বুদ্ধিগণীকুমার এসে হাজির হল। আমি ভেবেছিলাম ক্যাপ্টেন স্পার্কের ভাগে বুদ্ধি প্রচণ্ড ধমক আছে, কিন্তু দেখলাম উমানাথবাবু সেরকম লোক নন। শুধু আড়াচোখে একবার ছেলের দিকে চেয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, ‘কাল থেকে পুঁজোর কটা দিন আর বাইরে থাকে না। বাড়িতে বাগান আছে, ছাত আছে—খুঁশ খেলতে পার; খুঁড়ি আছে, খুঁড়ি ওড়াতে পার, বই আছে পড়তে পার, কিন্তু আমাদের সঙ্গে ছাড়া বাইরে বেরোবে না।’

‘আর সময়তান সিং?’ কুর কুঁচকে প্রশ্ন করল বুদ্ধিগণীকুমার।

‘সে আবার কে?’—উমানাথবাবুর বাঁ ভুরুটা উঠে গেছে উপর দিকে।

‘ও যে কারাগারের শিক ভেঙে পালিয়েছে।’

‘ঠিক আছে, আমি ওর খবর এনে দেব তোমাকে,’ হাসকাতাবে হেসে আম্বাসের সুরে বললেন বিকাশবাবু। বুদ্ধি মনে হল খানিকটা ভরসা পেয়েছে। অন্তত সে তার শাস্তির ব্যাপারে আর কোনো আপত্তি না করে বিকাশবাবুর হাত ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

উমানাথবাবু বললেন, ‘বুঝতেই পারছেন আমার পুঁটটি একটু অতিমাত্রায় কম্পনাপ্রবণ। যাই হোক—আপনার প্রশ্নের জবাব দিই এবার—গণপতির খবর আমরা দেশে থাকতে অনেকই জানত। ওটা একটা কিংবদন্তীর মতো মধ্যে মধ্যে বাটে গিয়েছিল। সেটা অবিশ্যি আমার জন্মের আগে। পরের দিকে এ নিয়ে আর বিশেষ কেউ আলোচনা করত না। আমার নিজের ছাত্রজীবন কাটে কলকাতায়। কলেজে থাকতে দু’একটি বন্ধুকে আমি গল্পকহলে গণেশের কথা বলোঁছিলাম। তার মধ্যে একটি বন্ধু—অবিশ্যি এখন তাকে আর বন্ধু বুলি না—সম্প্রতি কাশীতে রয়েছেন। তার নাম মগনলাল মেঘরাজ।’

‘বুঝছি,’ ফেলুদা বলল, ‘তাকে আজ মছলিবাবার ওখানে দেখলাম।’

‘জানি। আমি বৌদিন গোঁহিলাম সেদিনও ছিল। তার বাবাজীর কাছে বাতায়ত করার একটা করণ আছে। কিছুদিন থেকে তার ভাগ্য পরিবর্তন হয়েছে। খারাপের দিকে অবশ্যই। বছর দু’এক আগে ওর প্লাইউডের ফার্ট্রিতে আগুন লাগে থেকে এর শুরু। তারপর এই গত কয়েক মাসের মধ্যে ওর গোলমালে কারবার সম্বন্ধে অনেক গল্পব বাজারে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে ওর কলকাতার এবং বেনারসের বাড়িতে পুঁলিস বেড হয়ে যায়। আমি এখানে আসার দু’দিন বাদেই আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। সোজাসুঁজি বলল যে গণেশটা ওর দরকার। ওটা যে কলকাতার আমার কাছে থাকে না,



এখানে বাবার সিন্দুক থাকে, সেটা ও জানত। চল্লিশ হাজার অর্থি অফার করেছিল এটোর জন্য। আমি সোজাসুজি না বলে দিই। ও যাবার সময় শাসিয়ে যায় যে জিনিষটা ও হাত করে তবে ছাড়বে। তার ঠিক পাঁচদিন পরে গণেশ সিন্দুক থেকে উদাও হয়ে যায়।’

ভদ্রলোক চুপ করলেন। ফেলুদাও চুপ, চিন্তিত। আমি জানি ওর তিনমাসের অবসর এইখানেই শেষ হল। সামনের কটা দিন কাশীই হবে ওর কাজের জায়গা, উদ্ভূত জায়গা। লালমোহনবাবুর ভবিষ্যৎবাণী মনে পড়ছে— এক টিলে তিন পাঁচ। অর্থাৎ কাশের ব্যাপারটা নির্ভর করছে—

‘আমাদের খুব ভাগ্য ভাল যে আপনি ঠিক এই সময়ে এসে পড়লেন। আপনার উপর কাজের ভারটা দিতে পারলে—’

‘নিশ্চয়ই। একশোবার!’ ফেলুদা উঠে দাঁড়িয়েছে। ‘আপনি অনুমতি দিলে কাল সকালে একবার আসতে চাই। আপনার বাবার সঙ্গে একবার কথা বলে যাবে কি?’

‘কেন যাবে না? বাবার ও এখন রিটার্ড জীবন। অর্থাৎ বাবার মেজাজটা ঠিক যাকে বলে মোলায়েম তা নয়। তবে সেটা বাইরের খোলস। আর আপনি যদি আমাদের বাড়ির এদিক ওদিক ঘুরে দেখতে চান, তাও পারেন স্বচ্ছন্দ। আমি ঠিকোচনকে বলে রাখব আপনাকে এলে যেন ঢুকতে দেয়। আর বিকাশ রয়েছে, ও-ও সব ব্যাপারে আপনাদের হেলপ করতে পারে। আটটা নাগাত এলে ভাল—তাহলে বাবাকে তৈরি অবস্থায় পাবেন।’

বাড়ি ফেরার পথে পর পর দুটো অন্ধকার গলি দিয়ে আসবার সময় তিন তিনবার পায়ের আওয়াজ শুনে পিছন ফিরে চাদর মর্দী দেওয়া একই লোককে দেখতে পেরে সেদিকে ফেলুদার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছিলেন। ও যে শব্দ পাসাই দিল না তা নয়—সারা রাস্তা ধরে গুনগুন করে ইশক ইশক ইশক ছবির এফনিতেই একটা বাজে গান সমানে ভুল সুরে গেয়ে গেল।

চার

ক্যালকাটা লজের ঠাকুর ফাউল কারিগর দ্বিবি রেখেছিল। এ ছাড়া রুই মাছের কালিয়া ছিল, রাধাও ভাঙো হয়েছিল, কিন্তু ঐ লমোহনবাবু খেলেন না। বললেন, 'মহালিখাবাবুকে দেখার পর থেকে আর মাছ খেতে মন চায় না মশাই।'

'কেন?' ফেলুদা বলল, 'খেলেই মনে হবে বাবাকে চিবিয়ে থাকছেন? আপনার কি খারাপ বাবা নিজে মাছ খান না?'

'খান বন্ধি?'

'শুনলেন ত বাবা। জলেই থাকেন বেশির ভাগ সময়। জলে মাছ ছাড়া আর খাবার কী আছে বলুন। মাছেরাও যে মাছ খায় সেটা জানেন?'

লমোহনবাবু চুপ ঘেরে গেলেন। আমার কিস্বাস কাল থেকে উনি আবার মাছ খাবেন।

সাপ্তাহিকের নানারকম ঘটনার পর রাতে একটা লম্বা ঘুম দেব ভেবেছিলাম, কিন্তু খানিকটা ব্যাধাত করলেন রুম-মেট জীবনবাবু। জীবনবাবু মোটা, জীবনবাবু বেঁটে, জীবনবাবুর চাপ দাড়ি, আর জীবনবাবু খালিশে মাথা রাখার দশ মিনিটের মধ্যে নাম ডাকতে শুরু করেন। উদ্ভ্রলোক একটা ডাক্তারি কোম্পানির রিপ্রেজেন্টেটিভ, দুদিন হল এসেছেন, কালই সকালে চলে যাবেন। ফেলুদার সঙ্গে পরিচয় হবার এক মিনিটের মধ্যে বাগ খুলে কোম্পানির নাম খোদাই করা একটা ডট পেন ফেলুদাকে দিয়ে দিলেন—যদিও সেটা ওকে অস্বভাবের গোয়েন্দা বলে চিনতে পারার দরুন কিনা বোঝা গেল না।

পরদিন সকালে সাড়ে সাতটার মধ্যে আমরা তিনজন চানটানে করে চা ডিম দুটি খেয়ে বেরি। বেরোবার মুখে নিরঞ্জনবাবুর সঙ্গে দেখা হল। ফেলুদা দুটো আঙোবাজে কথার পর জিগোস করল, 'মগনলাল মেঘরাজের বাড়িটা কোথায় জানেন?'

'মেঘরাজ? যমদুর জানি ওর দুটো বাড়ি আছে শহরে, দুটোই একেবারে হাট অফ কালীতে। একটা বোধহয় স্তানবাপীর উত্তর দিকের গলিটায়। আপনি ওখানে কাউকে জিগোস করলেই দোঁখিয়ে দেবে। পরম ধার্মিক ত, তাই একেবারে খোদ বিশ্বনাথের ঘন্টা শুনতে শুনতে টাকার হিসেব করে।'

নিরঞ্জনবাবুর কাছ থেকে আরেকটা খবর পেলাম। মছলিবাবা নাকি আর স্বামিন আছেন শহরে। কথাটা শুনে ফেলদাদা শূদ্ধ ওর একপেশে হাসিটা হাসল, মূর্খে কিছুর বলল না।

ঘড়ি ধরে আটটার সময় আমরা শংকরী নিবাসের গেটের সামনে গিয়ে হাঁকির হলাম। টিলোচনের জেহারাটা রাতে ভালো করে দেখিনি, আজ দিনের আলোতে গালপাটের বহর দেখে বেশ হকচকিয়ে গেলাম। বয়স সত্তর-টের হবে নিশ্চয়ই, তবে এখনো মেরুদণ্ড একদম সোজা। আমাদের দেখেই হাসির সঙ্গে একটা স্মার্ট স্যালুট ঠুকে গেটটা খুলে দিল।

গাড়িবারান্দার দিকে কিছুর এগিয়ে যেতেই বিকাশবাবু বেরিয়ে এলেন।

‘জানাবা দিয়ে দেখলাম আপনাদের ঢুকতে।’ ভদ্রলোক বোধহয় সবেমাত্র মাড়ি কামিয়েছেন; বাঁ দিকের তুলিপির নিচে এখনো সাবান লেগে রয়েছে। ‘ভেতরে বাবেন? কতামশাই কিন্তু রোঁড়। আপনি ওর সঙ্গেই আগে কথা বলবেন ত?’

ফেলদাদা বলল, ‘তার আগে আপনার কাছ থেকে কিছুর তথ্য জেনে নোট করে নিতে চাই।’

‘বেশ ত, বলুন না কী জানতে চান।’

বিকাশবাবুর কাছ থেকে কতকগুলো তারিখ নোট করে নিয়ে খাতায় যা দাঁড়াল তা এই—

১। মঙ্গললাল উমানাথবাবুর সঙ্গে দেখা করতে আসেন ১০ই অক্টোবর।

২। উমানাথবাবু তার স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে মছলিবাবা দর্শনে যান ১৫ই অক্টোবর সন্ধ্য সাড়ে সাতটার। বাড়ি ফেরেন সাড়ে আটটার কিছু পরে। এই সময়ের মধ্যেই গণেশ চুরি যায়।

৩। ১৫ই অক্টোবর সাড়ে সাতটা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে শংকরী-নিবাসে ছিল—উমানাথবাবুর বাবা অম্বিকা ঘোষাল, বিকাশ সিংহ, অম্বিকা-বাবুর বেয়ায়া বৈকুণ্ঠ, চাকর ডরম্বাজ, ষি সৌদামিনী, ঠাকুর নিত্যানন্দ, মালী লক্ষ্মণ, তার বউ আর তাদের একটি সাত বছরের ছেলে, দারোয়ান টিলোচন, প্রতিমার কারিগর শশী পাল ও তার ছেলে কানাই, আর প্রতিমার কাজে জোগান দেবার একজন লোক, নাম নিবারণ। ওই এক ঘণ্টার মধ্যে ঘাইরে থেকে কেউ না এসে থাকলে বুঝতে হবে এদেরই মধ্যে কেউ না কেউ অম্বিকাবাবুর ঘরে ঢুকে তার টেবিলের দেওয়াল থেকে চাবি নিয়ে সিঁদুক খুলে গণেশ বার করে নিয়েছিল।

খাতায় নোট করা শেষ হলে ফেলদাদা বিকাশবাবুর দিকে ফিরে বলল, ‘কিছুর মনে করবেন না—এ ব্যাপারে ত কড়িকে বাদ দেওয়া চলে না, কাজেই আপনাকেও—’

ফেলুদার কথা শেষ হবার আগেই বিকাশবাবু হেসে বললেন, 'বুঝছি; এ ব্যাপারটা পুজিশের সঙ্গে এক দফা হয়ে গেছে। আমি সেদিন ওই এক ঘন্টা সময়টা কী করছিলাম সেটা জানতে চাইছেন ত?'

হ্যাঁ—তবে তার আগে একটা প্রশ্ন আছে।'

'বলুন।—কিন্তু এখানে কেন, আমার ঘরে চলুন।'

বাড়ির সামনের দরজা দিয়ে তাকে জানদিকে দোতলার ঘাবার সিঁড়ি আর বাঁদিকে বিকাশবাবুর ঘর। বাঁক কথা ঘরে বসেই হল।

ফেলুদা বলল, 'আপনি গণেশের কথাটা জানতেন নিশ্চয়ই।'

'অনেকদিন থেকেই জানি।'

'মগনলাল যেদিন উমান্থবাবুর সঙ্গে দেখা করতে আসেন সেদিন আপনি বাড়িতে ছিলেন?'

হ্যাঁ। আমিই মগনলালকে রিসিভ করে কৈঠকখানায় বসাই। তারপর ভরদ্বাজকে দিয়ে দোতলার মিস্টার ঘোষালের কাছে খবর পাঠাই।'

'তারপর?'

'তারপর আমি নিজের ঘরে চলে আসি।'

'দুজনের মধ্যে যে কথাকাটাকাটি হয়েছিল সেটা আপনি জানতেন?'

না। আমার ঘর থেকে কৈঠকখানার কথাবার্তা কিছু শোনা যায় না। তাছাড়া আমার ঘরে তখন রেডিও চলছিল।'

'যেদিন গণেশটা চুরি গেল, সেদিনও কি আপনি আপনার ঘরেই ছিলেন?'

'বেশির ভাগ সময়। মিস্টার ঘোষালরা যখন বাইরে যান তখন আমি ঠুঁদের গেট পর্যন্ত পৌঁছে দিই। ওখান থেকে বাই পুজোমুড়পে। শরীফাবাবুর কাজ দেখতে বেশ লাগে। সেদিন ভুল্ললোককে দেখে অসুস্থ মনে হল। জিগোস করতে বললেন শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে। আমি ঘরে এসে ওষুধ নিয়ে ওকে দিয়ে আসি।'

'হোমিওপ্যাথিক কী? আপনার লেজুফে দুটো হোমিওপ্যাথিক বই দেখছি।'

'হ্যাঁ, হোমিওপ্যাথিক।'

'কী ওষুধ জানতে পারি?'

'পালসেটিল্যা থাট।'

'ওষুধ দিয়ে ঘরে ফিরে আসেন?'

'হ্যাঁ।'

'কী করছিলেন ঘরে?'

'সব্বনো রেডিও থেকে আখতারি বাঈয়ের রেকর্ড দিচ্ছিল—তাই শুনছিলাম।'

'কতক্ষণ রেডিও শোনেন?'

‘ওটা চালানোই ছিল। আমি মাপাফিন পড়ছিলাম। ইলান্দ্রোটেড উইকলি।’

‘তারপর মিস্টার ঘোষাল ফেরা না পর্যন্ত আর বাইরে বেরোন নি?’

‘না। বেঙ্গলী ক্লাব কাবুলিওয়ালা থিয়েটার করছে; ওদের তারক থেকে দুজনের আসার কথা ছিল মিস্টার ঘোষালের সঙ্গে দেখা করার জন্য—ঘোষালের প্রধান আর্তিথি হওয়ার জন্য অনুরোধ করতে। ওদের আসার অপেক্ষায় বসে ছিলাম।’

‘ওরা এসেছিলেন?’

‘অনেক পরে। নটর পরে।’

ফেলুদা দরজা দিয়ে দোতলার দ্বার সিঁড়ির দিকে হেঁচিয়ে বসলেন, ‘আপনি যেখানে বসেছিলেন সেখান থেকে ওই সিঁড়িটা দেখা যাচ্ছিল কি?’

‘হ্যাঁ।’

‘ওটা দিয়ে কাউকে উঠতে বা নামতে দেখেছিলেন বলে মনে পড়ে?’

‘না। তবে ওটা ছাড়াও আরেকটা সিঁড়ি আছে। পিছন দিকে। জমাদারের সিঁড়ি। সেটা দিয়ে কেউ উঠে থাকলে আমার জ্ঞানার কথা নয়।’

বিকাশবাবুর সঙ্গে কথা শেষ করে আমরা ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে দোতলার অম্বিকাবাবুর ঘরে গেলাম।

জানালার ধারে একটা গুদ্রোন আয়াম কেদারায় বসে বৃদ্ধ ভদ্রলোক নিবিষ্ট মনে স্টেটসম্যান পড়ছেন। পারের আওরাজ পেয়ে কপজটা সরিয়ে বাড়ি ফিরিয়ে সোনার চলমার উপর দিয়ে হুকুটি করে আমাদের দিকে দেখলেন। ভদ্রলোকের মাথার ঘাকখানে টাক, কানের দুপাশে বগধলে সাফা চুল, দাড়ি স্নোঁক কামানো, দু চোখের উপর কাঁচাপাকা মেশানো ঘন ভুরু।

বিকাশবাবু আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

অম্বিকাবাবু মুখ খুলতেই বুঝলাম যে ওর দুপাটি দাঁতই কলস। কথা বলার সময় কিটু কিটু করে আওরাজ হয়, মনে হয় এই বুঁকি দাঁত বলে পড়ল। প্রথমেই সোজা লালমোহনবাবুর দিকে চেয়ে বললেন, ‘আপনারও পুঁজি নাকি?’ লালমোহনবাবু চক্কে গিয়ে চোক গিলে বললেন, ‘আমি? না না—আমি কিছুই না।’

‘কিছুই না? এ আবার কিরকম বিনয় হল?’

‘না। ইনিই, জানে, গো-গো—’

বিকাশবাবু এঁগিয়ে এসে ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দিলেন।

‘ইনি প্রমোদ মিত্র। গোস্বামী হিসেবে খুব নামডাক। পুঁজিও কিছুই করতে পারল না, তাই মিস্টার ঘোষাল বসেছিলেন...’

অম্বিকাবাবু এবার সোজা ফেলুদার দিকে চাইলেন।

উমা কী বলেছে? বলেছে গণেশ গেছে বলে ঘোষাল বংশ যদংস হয়ে যাবে? ননসেন্স! তার বয়স কত। চরিত্র পেয়েছনি। আমার তিয়াস্তর। ঘোষাল বংশের ইতিহাস সে আমার চেয়ে বেশি জানে? উমা ব্যবসারে উন্নতি করেছে সে কি গণেশের দৌলতে? নিজের বুদ্ধিশুদ্ধি না থাকলে গণেশ কী করবে? আর তার যে বুদ্ধি সে কি গণেশ দিয়েছে? সে বুদ্ধি সে পেয়েছে



তার বংশের রক্তের জোরে। নাইনটিন টোয়েন্টিফোরে কেম্ব্রিজে ম্যাথাম্যাটিকস্-এ ট্রাইপস করতে যাচ্ছিল অম্বিকা ঘোষাল—যাকে দেখছে ভোমাদের সামনে। শাবর সাতদিন আগে পিঠে কারাবন্ধন হয়ে যায় ঋগ্ন অবস্থা। বাঁচিয়ে দিল না হয় গণেশ, কিন্তু বিলেত যাওয়া যে পণ্ড হয়ে গেল চিরকালের জন্যে, তার জন্য কে দায়ী?... উমানাথের ব্যবসা বুদ্ধি আছে ঠিকই, তবে ওর জন্মান্যে উচিত ছিল একশো বছর আগে। এখন ও শুধুই নাকি কোন এক ব্যবসায়ীরা কাছে দীক্ষা নেবার মতলব করছে।

‘তার মানে আপনার গণেশটা যাওয়াতে কোনো আপসোস নেই?’

—অম্বিকাবাবু চশমা খুলে তার ঘোলাটে চোখ দুটো কেন্দ্রের মূখের উপর ফোকাস করলেন।

‘গণেশের গলিয়ার একটা হীরে বসানো ছিল সেটার কথা উমানাথ বলেছে?’

‘তা বলেছেন।’

‘কী হীরে তার নাম বলেছে?’

‘না, সেটা বলেননি।’

‘ওঁ ও। জানে না তাই বলেনি। কম্পতি হীরের নাম শুনেছ?’

‘সবুজ রঙের কি?’

ফেলুদার এই এককথার অম্বিকাবাদ নরম হয়ে গেলেন। দৃষ্টিটা নার্মিয়ে নিয়ে বসলেন, 'অ, তুমি এ বিষয়ে কিছু সন্দেহটো দেখছি। অতীত প্রেমায় হীরে! আমার আপসঙ্গ হয়েছে কেন জান? শব্দ দামী জিমিস বলে নয়; দামী ত বটেই; ওটার জন্য কত টাকার দিতে হচ্ছিল শুনলে তোমার মাথা ঘুরে যাবে। আসল কথা হচ্ছে—ইট ওয়জ এ ওয়র্ক অফ আর্ট। এসব লাকটোক আমি বিশ্বাস করি না।'

'ওই টেবিলের দেয়ালেই কি চাঁবাটা ছিল?' ফেলুদা প্রশ্ন করল। অম্বিকাবাদের আরাম কেনারা থেকে তিন-চার হাত দূরেই দূটো জানালার মাঝখানে টেবিলটা। এটা ঘরের দক্ষিণ দিক। সিন্দুকটা রয়েছে উত্তর-পশ্চিম কোণে। দূটো মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড আঁদিকালের খাট, তার উপর একটা ছ' ইঞ্চি পুরু তোষকের উপর শীতলপাটি পাতা। অম্বিকাবাদ ফেলুদার প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে উল্টে আরেকটা প্রশ্ন করে বসলেন।

'আমি সন্ধ্যবেলা নেশা করি সেটা উমা বলেছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

ফেলুদা এত নরমভাবে কারুর সঙ্গে কোনোদিন কথা বলেনি। অম্বিকাবাদ বললেন, 'গুণশ নাকি চাইলে সিঁখি দেন; আমি খাই আফিং। সন্ধ্যর পর আমার বিশেষ হুঁশ থাকে না। কাজেই সাতটা থেকে আটটার মধ্যে আমার ঘরে কেউ এসেছিল কিনা সে কথা আমাকে জিজ্ঞেস করে ফল হবে না।'

'আপনার চেয়ার এখন যে ভাবে রাখা রয়েছে, সন্ধ্যবেলাও কি সেইভাবেই থাকে?'

'না। সকালে কাগজ পড়ি, তাই জানালা থেকে আমার পিছনে। সন্ধ্যর আকাশ দেখি, তাই জানালা থেকে সামনে।'

'তাহলে টেবিলের দিকে পিঠ করা থাকে। তার মতন ওদিকের দরজা দিয়ে কেউ এলে দেখতেই পাবেন না।'

'না।'

ফেলুদা এবার টেবিলটার দিকে এগিয়ে গিয়ে বসে সাবধানে টান দিয়ে দেয়ালটা খুলল। কোনো শব্দ হল না। বসে করার বেলাতেও ভাই।

এবার ও সিন্দুকটার দিকে এগিয়ে গেল। চৌকির উপরে রাখা পেছায় সিন্দুকটা প্রায় আমার বুক অবধি পৌঁছে গেছে।

'পুলিশ নিশ্চয়ই এটার ভিতর ভালো করে খুঁজে দেখেছে?'

বিকানবাব বললেন, 'তা তো খুঁজেইছে, অঙ্কুরের ছাপের ব্যাপারেও পরীক্ষা করে দেখেছে, কিছুই পাঠনি।'

অম্বিকাবাদের ঘরের দরজা দিয়ে বেরোলে ভাইনে পড়ে নিচে খাবার সিঁড়ি, আর খায়ে একটা ছোট ঘর। ঘরটা দিয়ে ডান দিকে বেঁচিয়ে একটা

চওড়া শেখত পাথরে বাঁধানো বারান্দা। এটা বাড়ির দক্ষিণ দিক। শূন্য দিকে বাগানের নিম্ন আর তেঁতুল গাছের মাঝখানের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে দূরে গঙ্গার জল সিকালের রোদে চিক্‌চিক্‌ করছে। আমাদের সামনে আর ডাইনে বেনারস শহর ছড়িয়ে আছে। আমি মাস্তুরের চুড়ো গুলুছি, ফেলুদা বিকাশ-বাবুকে একটা সিগারেট দিয়ে নিজে একটা মদ্যে পুরোছে, এমন সময় ফুরফুরে হাওয়ার সঙ্গে উপর দিক থেকে কী বেন একটা জিনিস পাক খেতে খেতে নেমে এসে লালমোহনবাবুর পাখাবির উপর পড়ল। লালমোহনবাবু সেটা খপ করে ধরে হাতের মৃঠে। খুলতেই দেখা গেল সেটা আর কিছুই না—একটা চুইং গামের রূপার।

‘রুক্মিণীকুমার ছাতে আছেন বলে মনে হচ্ছে?’ ফেলুদা বলল।

‘আর কোথায় থাকবে বলুন’, বিকাশবাবু হেসে বললেন, ‘তার ও এখন বন্দী অবস্থা। আর তাছাড়া ছাতে তার একটি নিজস্ব ঘর আছে।’

‘সেটা একবার দেখা যার?’

‘নিশ্চয়ই। সেই সঙ্গে চলুন পিছনের সিঁড়িটাও দেখিয়ে দিই।’

একরকম লোহার সিঁড়ি হয় বেগুনী বারান্দার দেয়াল বেয়ে পাক ধেরে উপরে উঠে যায়। এটা দেখলাম সেরকম সিঁড়ি নয়। এটা ইস্টের তৈরি, আর বারান্দা ভিতরেই। তবে এটাও পাকানো সিঁড়ি। ওঠবার সময় ঠিক মনে হয় কোনো মিনার বা মনুমেন্টে উঠছি।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে সামনেই ছাতের ঘর, আর বাঁ দিকে ছাতে যাবার দরজা। ঘরের ভিতরে মেঝেতে উবু হয়ে বসে আছে রুকু। একটা লাল-সাদা পেটকাটি ঘুড়ি মাটিতে ফেলে হাটুর চাপে সেটাকে ধরে রেখে ডাঙে মদ্যন্তো পরাচ্ছে। আমাদের আসতে দেখেই কাজটা বন্ধ করে সোজা হয়ে বসল। আমরা চারজনে ছোট ঘরটাতে ঢুকলাম।

বোঝাই যায় এটা রুকুর খেলার ঘর—বাঁদ ও রুকুর জিনিস ছাড়াও আরো অনেক কিছু কোমঠাসা করে রাখা রয়েছে—মদ্যন্তো পুরোনো মচের ধরা ষ্টাংক, একটা প্যাকিং কেস, একটা ছেঁড়া মাদ্যন্ত, তিনটে হারিকেন লন্ঠন, একটা কাং কনা ঢাকাই জ্বালা, আর কোণে ডাই করা পুরোনো খবরের কাগজ আর মাসিক পত্রিকা।

‘তুমি গোয়েন্দা?’

ফেলুদার দিকে সটান একমুহুর্তে তাকিয়ে প্রশ্ন করল রুকু। আজ দেখছি ফরসা রংটা রোদে পড়ছে যেন একটা ডামাটে লাগছে। তার মদ্যে যে চুইং গাম রয়েছে সেটা তার চোয়ালে নাড়া দেখেই বোঝা যাচ্ছে। ফেলুদা হেসে বলল, ‘খবরটা ক্যান্টেন স্পার্ক কি করে পেলেন সেটা জানতে পারি!’

‘আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট বলেছে,’ গম্ভীর ভাবে জানাল রুকু। সে আবার

ঝড়ের দিকে মন দিচ্ছে।

‘কে তোমার আর্গিসট্যান্ট?’ ফেলুদা জিজ্ঞাস করল।

‘স্পার্কের আর্গিসট্যান্ট বলে আর্গিট মিটা জান না? তুমি কিরকম ঘোয়েন্দা?’

লালমোহনবাবু ছোট্ট একটা কানিশ দিয়ে তার দিকে আশ্বাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, ‘হুদিরাম রকিত! সাতের চার কুট হাইট! স্পার্কের জান হাত।’

ফেলুদা ব্যাপারটা বুঝে নিজে বলল, ‘কোথায় আছে তোমার আর্গিসট্যান্ট?’

উত্তরটা এল বিকালবাবুর কাছ থেকে। ভদ্রলোক একটা অপ্রস্তুত হাসি হেসে বললেন, ‘ও ভূমিকাটা এখন আমাকেই পূরন করতে হচ্ছে।’

‘তোমার রিভলভার আছে?’ হঠাৎ প্রশ্ন করল রুকু।

‘আছে,’ বলল ফেলুদা।

‘কী রিভলভার?’

‘কোল্ট।’

‘আর হারপুন?’

‘উ’হু। হারপুন নেই।’

‘তুমি জলের জন্য লিকার করো না?’

‘এখন পর্যন্ত প্রয়োজন হয়নি।’

‘তোমার ছোরা আছে?’

‘ছোরাও নেই। এমনকি এরকম ছোরাও নেই।’

রুকুর মাথার উপরেই দেয়ালে পেরেক থেকে একটা খেলার ছোরা ঝুলছে। এটাই কাল ওর কোমরে বাঁধা দেখেছিলেন।

‘ওই ছোরা অ্যামি শরতান সিং-এর পেটে ঢুকিয়ে ওর নাড়িভুড়ি বার করে দেব।’

‘সে ত বুঝলাম,’ ফেলুদা রুকুর পাশে মোকোতে বসে পাড় খলল, ‘কিন্তু তোমাদের বাড়ির সিদ্দিক থেকে যে একজন শরতান সিং একটা সোনার গণেশ চুরি করে নিয়ে গেল তার কী হবে?’

‘শরতান সিং এবাড়িতে ঢুকেই পারবে না।’

‘কম্পট স্পার্ক’ সেদিন ঘছলিবাবাকে দেখতে না গেলে এ ব্যাপারটা হত না—তাই না?’

‘ঘছলিবাবার গায়ের রঙটা কম্পার গম্পোরিয়ার মতো কালো।’

‘সাবাস!’ বলে উঠলো লালমোহনবাবু, ‘তুমি গোবিলার সোগ্রাস পড়েছ রুকুবাবু?’

গুপ্তারিলা যে লালমোহনবাবুরই লেখা গোবিন্দার গোপ্তার-এর নম্বই ফুটে লম্বা অতিকার রাবুসে গোবিন্দার নাম সেটা আমি জানতাম। গল্পের আইডিয়াটা কিং কং থেকে নেওয়া, সেটা লালমোহনবাবু নিজের স্বীকার করেন। জটায়ুর বর্ণনায় গোবিন্দার গায়ের রং ছিল কন্টিপাথরে আলকাতরা মাখালে যেমন হয় সেইরকম। লালমোহনবাবু 'ও বইটা আসলে আম—' বলেই ফেলুদার কাছ থেকে একটা কড়ি ইশারা পেয়ে খেমে সেলেন।

রুকু বলল, 'গণেশ ত একজন রাজার কাছে আছে। শয়তান সিং পাবেই না। কেউ পাবে না। ডাকু গুপ্তারিয়াও পাবে না।'

'আবার অতুর নন্দী!—দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন জটায়ু।

বিকাশবাবু হেসে কললেন, 'ওর কথাই মশে তাল রেখে চলেতে হলে আগে রহস্য রোমাঞ্চ গিরিজ গুলে খেতে হবে।'

ফেলুদা এখনও মাটিতে বসে আড়চোখে রুকুর দিকে চেয়ে আছে, তার ভাব দেখে মনে হয় যেন সে রুকুর আঙ্গুদবী কথাগুলোর ভিতর থেকে আসল মানুষটাকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করছে। রুকু তার কথাই মশেই দিবি। খুঁজতে সূতো লাগিয়ে চলেছে। এবার ফেলুদা প্রশ্ন করল, 'কোথাকার রাজার কথা বলছ তুমি রুকু?'

উত্তর এল—'আফ্রিকা।'

মোহনবাড়ি থেকে চলে আসার আগে আমরা আরেকজন লোকের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তিনি হলেন শশীভূষণ পাল। শশীবাবু নারকোলের মালার হাফে রং নিয়ে নিজের তৈরি তুলি দিয়ে কার্তিক ঠাকুরের গালে লাগাচ্ছিলেন। শুপুলোকে বয়স ষাট পঁয়ষাট হবে নিশ্চয়ই, রোগা প্যাকাটি চেহারা, চোখে পুরু কাঁচের চশমা। ফেলুদা জিগোস করতে বললেন উনি নাকি মৌল বছর বয়স থেকে এই কাজ করছেন। ওর আদি বাড়ি ছিল কৃষ্ণনগর, ঠাকুরদাদা অধর পাল নাকি প্রথম কাশীতে এসে বসবাস আরম্ভ করেন সিপাহী বিদ্রোহের দু' বছর পরে। শশীবাবু থাকেন গণেশ মহল্লায়। সেখানে নাকি ওরা হাড়াও আরো কয়েকখর কুমার থাকে। ফেলুদা বলল, 'আপনার জ্বর হয়েছিল শুনলাম; এখন ভাল আছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। সিংহি মশাইয়ের ওষুধে খুব উপকার হয়েছিল।'

শশীবাবু কথা বলছেন, কিন্তু কাজ বন্ধ করছেন না।

'আপনার কাজ শেষ হচ্ছে কবে?' ফেলুদা জিগোস করল।

'অল্প পরশুই ত ঘণ্টা। কাল রাত্তিরের ডেউরই হয়ে যাবে। বয়স হয়ে গেল ত, তাই কাজটা একটু ধরে করতে হয়।'

‘তাও আপনার তুলির টানে এখনো দাঁড়ি জের আছে।’

আজ্ঞে এ কথা আপনি বলছেন, আর, আরবছর এই দুঃস্বাধাকুর দেখেই এই একই কথা বলেছিলেন কলকাতার আর্ট ইন্সটিটিউটের একজন শিক্ষক। এ ছিনিসের কদর আর কে করে বলুন। সবাই ঠাকুরই দেখে, হাতের কাজটা আর ক’জন দেখে।’

বিকাশবাবু যৌদিন আপনাকে ওধু দেন, সেদিনই সম্ভাব্য বাড়ির দোতলার সিঁদুর থেকে একটা জিনিস চুরি যায়। এ খবর আপনি জানেন?’

শশীবাবু হাতের তুলিটা বেন একমুহূর্তের জন্য কেঁপে গেল। গলার সুরটাও যেন একটু কাঁপা। বললেন—

‘আজ পঁচাত্তর বছর হল প্রতি বছর এসে এই একই কাজ করে যাচ্ছি এই ঘোষণাবাড়িতে, আর আমার কিনা এসে পুঁলিশে জেরা করল! হাতে তুলি নিলে আমার আর কোনো হুঁশ থাকে না, জানেন, নাওয়া খাওয়া ভুলে যাই। আপনি জিগ্যেস করুন সিংহি মশাইকে, উনি ত মাঝে মাঝে এসে দাঁড়িয়ে দেখেন। আপনি খোকাকে জিগ্যেস করুন। সেও ত এসে চুপটি করে দাঁড়িয়ে দেখে আমার কাজ। কই বলুন ত তাঁরা—আমি ঠাকুরের সামনে ছেড়ে একটা মিনিটের জন্যে কোথাও যাই কি না।’

শশীবাবু সপ্তে আরেকটি বছর কাড়ির ছেলে কাজ করছে। জললাম ইনিই হলেন শশীবাবুর ছেলে কানাই। কানাইকে তার বাপের একটা ইরাদা সংস্কারণ বলা চলে। কাজ দেখলে মনে হয় সে বংশের ধারা বজায় রাখতে পারবে। কানাই নাকি গণেশ চুরির দিন সাভটার পরে ঠাকুরের সামনে ছেড়ে কোথাও যাননি।

বিকাশবাবু আমাদের সঙ্গে গোট অর্ধি এলেন। ফেলদা বলল, ‘আপনাদের বাড়িতে এখন অনেক লোক তাই আর উমানাথবাবুকে বিরক্ত করলাম না। আপনি শূধু বলে দেবেন যে আমি হস্ত মাঝে মাঝে এসে একটু ঘুরে টুকে দেখতে পারি, প্রয়োজন হলে একে-ওকে দু’একটা প্রশ্ন করতে পারি।’

বিকাশবাবু বললেন, ‘মিস্টার ঘোষাল যখন আপনার উপর ব্যাপারটা ছেড়ে দিয়েছেন তখন ত আপনার সে অধিকার আছেই।’

বেরোবার মুখে একটা শব্দ পেয়ে ফেলদার সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখটাও বাড়ির ছাদের দিকে চলে গেল।

রুকু আর লাল-সাদা পেটকাটিটা সবে মাত্র উড়িয়েছে। সূতের টানে বাড়িটাই হাওয়া কেটে ফরফর শব্দ করছে। রুকুকে এখন থেকে দেখতে পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই, তবে তার লাটাই সমস্ত হাত দুটো মাঝে মাঝে ছাদের পাঁচলের উপর দিয়ে উঁকি মারছে।

‘ছেলেটিকে খুব একা বলে মনে হয়,’ ফেলদা ঘড়িটার দিকে চোখ রেখে বলল। ‘সত্যিই কি তাই?’

বিকাশবাবু বললেন, ‘রুহু উম্মানোখবাবুর একমাত্র ছেলে। এখানে তু তবু একটি বন্ধু হয়েছে। আপনি ত দেখেছেন সুরষকে। কলকাতায় ওর সময়সসী বন্ধু একটিও নেই।’

পাঁচ

এখানে এসে অবধি বেশির ভাগ সময়টা ঘরে বসে বাঙ্গালীদের সঙ্গে কথা বলে মাঝে ভুলে ক্ষেত হাঁচ্ছন যে আমরা কাশীতে এসেছি। এখন মাইকেল রিকশা, টাঙ্গা আর লোকের ভীড় বাঁচিয়ে মদনপুরা রোড দিয়ে হোটেলের দিকে হাটে হাটে আবার কাশীর মেজাজটা ফিরে পেলাম। বড় রাস্তার গোলমাল এড়িয়ে হোটেল খাবার শর্টকাটের গলিটাতে ঢুকলাম আমরা তিনজনে। লালমোহনবাবু একটা ছাগলের ব্যাটার পিঠে ছাতা দিয়ে একটা ছোট খোঁচা মেরে বললেন, 'আমার একটা ব্যাপার কী জানেন ফেলুদা—কলকাতা ছেড়ে বাইরে কোথাও গেলেই সেই জায়গার মেজাজটা আমাকে কেমন যেন পেয়ে বসে। সেবার রাজস্থান গিয়ে খালি খালি নিজেকে রাজপুত বলে মনে হাঁচ্ছিল। অন্যমনস্ক হয়ে মাথার হাত দিয়ে পাগড়ির বদলে টোক ফীল করে রীতিমত চম্কে চম্কে উঠছিলাম।'

‘এখানে এসে কি জটার অভাব ফীল করে চম্কে চম্কে উঠছেন?’

‘অ যাতে গিয়ে যে একটু বৈরাগী-বৈরাগী ভাব হয় নি তা বলতে পারি না। আবার এই সব অলিগলিতে ঢুকলে মনে হয় কোমরে একটা ছোয়া থাকলে হাতলটাতে মাঝে মাঝে বেশ হাত বোলানো যেত।’

আমি কিন্তু কালকের সেই লোকটাকে আবার দেখেছি। আমি জানি শংকরী-নিবাস থেকে বেরোবার কিছু পরেই সে আমাদের পিছু নিয়েছে। কিন্তু কালকে ফেলুদার তালিলা ভাবের পর আজ আর কিছু বলতে পারছি না। সকালবেলা গলিতে বিস্তর লোক—কেউ স্নান করে ফিরছে, কেউ বাজার থেকে ফিরছে, কিছু বুড়ো দাওয়ার বসে আক্কা মারছে, এখানে ওখানে ব্যাটার দল হুইহুয়া করছে—তারই মধ্যে পিছন ফিরলে চাপা পায়জামার উপর গাড় বেগুনী চানর মর্দি দেওয়া লোকটাকে দেখতে পাচ্ছি আমাদের বিশ-বিশ হাত পিছনে সম্মানে আমাদের ফলো করে চলেছে।

লালমোহনবাবু বললেন, ‘আপনার এই গবেষণের মামলাটি বিলকণ ডিফিকাল্ট বলে মনে হচ্ছে মশাই।’

ফেলুদা বলল, ‘কোনো মামলা একটা বিশেষ অবস্থার পেশীহানির আগে সেটা সহজ কি কঠিন তা বোকা সম্ভব নয়। আপনার কি ধারণা সেই স্টেজ

‘পেঁপে গেছে?’

‘যায় নি বৃষ্টি?’

‘একেবারেই না।’

‘কিন্তু বিনি আসল ভিলেন, তাঁর পক্ষে তো ও জিনিস চুরি করার কোনো স্কেপই ছিল না।’

‘কাকে ভিলেন ভাবছেন আপনি?’

‘কেন, ওই যে নেঘরাম না মেঘলাল না কী নাম বললে। যাকে দেবলুপ্ত মহলিষাবার ওখানে।’

‘আপনার কি ধারণা মেঘরাজ গৃধ্র চুরি করার জন্য নিজেই পাঁচিল উপকূলে ঘোষল বাড়িতে ঢুকবেন?’

‘এজেন্ট লাগাবে বলছেন?’

‘সেটাই স্বাভাবিক নয় কি? আর তা ছাড়া ও শামিয়ে গেছে বলে যে সে-ই চুরি করেছে এমন তো নাও হতে পারে।’

লালমোহনবাব, একটুক্ষণ চুপ করে হঠাৎ যেন শিউরে উঠে বললেন, ‘ওরকম কাঁধ দেখিনি মশাই। না জানি সামনের দিক থেকে কি রকম দেখতে। ওর মাথায় এক জোড়া শিং লাগিয়ে বিশ্বনাথের গলিতে ছেড়ে দিলে নিশ্চয়ই চুঁ মারবে।’

ক্যালকাটা লজে ঢুকে সামনেই আশিসঘর। ম্যানেজারের চেয়ার ছাড়া আরো তিনটে চেয়ার আর একটা বোর্ডিং আছে। সেগুলোতে দু-তিনজন করে নিরঞ্জনবাবুর আলাপী লোক প্রায় সব সময়ই বসে আচ্ছা মারে। অজ্ঞ ঢুকে দেখলাম নিরঞ্জনবাবুর উল্টো দিকে একজন প্যান্ট-শার্ট পরা বেশ জোয়ান লোক বসে চা খাচ্ছেন, আর হাত নেড়ে নিরঞ্জনবাবুকে কী যেন বোঝাচ্ছেন। আমাদের ঢুকতে দেখেই ম্যানেজার মশাই পানমুখে একগাল হেসে বললেন, ‘এই শু—ইনি আপনার জন্য প্রায় কুড়ি মিনিট বসে। আলাপ করিয়ে দিই—সাব-ইন্সপেক্টর তেওয়ারি—আর ইনি—’

নিরঞ্জনবাবু পর পর আমাদের তিনজনের নাম বলে বললেন, ‘ভয় নেই—হিস্কী বলতে হবে না—ইনি দাঁকা বাংলা বলেন।’

তেওয়ারি ফেল্দার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন। চোখের কোণে হাসি এই এলো বলে, আর ফেল্দার চোখে ভ্রুকুটি, সেটাও মনে হচ্ছে একটা হাসির অপেক্ষায় রয়েছে।

‘নে কি মশাই—ফেল্দার ভ্রুকুটি হাওয়া—আপনি এলাহাবাদে ছিলেন না?’

দারোগা সাহেব ঝকঝকে দাঁত বার করে হেসে ফেল্দার হাত ধরে

কুকুনি দিয়ে বললেন, 'আমি শিওর ছিলাম না আপনি চিনবেন কি না।'

'চেনা মশাকিল। গোঁফটা যা ছিল তার চার ভাগের এক ভাগ হয়েছে গেছে। রোগাও হয়েছেন বেশ খানিকটা।'

ভট্টলোক ফেলদার সমান লম্বা আর গড়নেও ফেলদারই মতো ছিমছাম। বছর দু-এক আগে এলাহাবাদে ফেলদার একটা কেস পড়েছিল। পুলিশ পাঁচে পড়ে গিয়েছিল, কিন্তু ফেলদা দু-দিনের মধ্যে সমস্যার সমাধান করে দিয়ে চার দিনের ভিতর কলকাতায় ফিরে এসেছিল। বুকলাম সেইবারই তেওয়ারির সঙ্গে আলাপ হয়।

'আমি মিস্টার ঘোষালের কাছে গিয়েছিলান কাল রাতে আপনি চলে আসার পর। তখনই শুনলাম আপনি এসেছেন। আর কালকাটা লঞ্চে আছেন।'

নিরঞ্জনবাবু চায়ের অর্ডার দিয়েছেন, আমরা তিনজনে কললাম। ফেলদা মিস্টার নিম্বাস ফোনে বলল, 'হাক্!—মিস্টার ঘোষাল পুলিশের কথা বলতে আমার একটা দুশ্চিন্তা থাকছিল: এখন আপনাকে দেখে অনেকটা হালকা লাগছে। আপনার সঙ্গে ক্র্যাশ হবে না। আর মনে হয় দুটো মাথা এক করলে বোধ হয় কাজের সুবিধেই হবে। বেশ গোলমালে বাপার—তাই না মশাই?'

তেওয়ারি একটা শুকনো হাসি হেসে বললেন, 'ইন ফ্যাক্ট ইট ইজ সো গোলমালে যে আমি তো আপনাকে এলাম বারন করতে।'

'কেন বলুন তো?'

'মগনলাল যে বেপারে আছে, সে বেপারে এই হচ্ছে আমার আভভাইস। আপনি দুদিন গেলেন মিস্টার ঘোষালের বাড়ি, তার জন্য আমার খুব জাওনা হচ্ছে। আপনাকে খুব সাওয়ান থাকতে হবে। ওর স্পাই আর ভাড়াটে গুন্ডা সারা বেনারস শহরে ছড়িয়ে আছে।'

হরকিষণ চা নিয়ে এল। ফেলদা চিন্তিতভাবে একটা কাপ তুলে নিয়ে বলল, 'কিন্তু মগনলাল যে এ বাপারে সত্যিই জড়িত সে সম্বন্ধে আপনি এত নিশ্চিত হয়েছেন কি করে?'

মিস্টার তেওয়ারি ভুরুটা কুচকে বাঁ হাতের আঙুলগুলো দিয়ে টেকিলের উপর কয়েকটা টোকা মেরে বললেন, 'আমরা যে লাইনে ইনভেস্টিগেশন করছি, তাতে মগনলালকে একবারে বাদ দেওয়া যায় না। ওর মতো কার্নিং লোক আর নেই।'

'আপনার কোন লাইনে তদন্ত চালাচ্ছেন সেটা.....'

'বলছি আপনাকে। আপনার কাছে আমি কিছুই লুকাব না। ঘোষাল-বাড়ির সবাইয়ের সঙ্গে আপনার আলাপ হয়েছে কি?'

'চাকর-বাকর বাসে আর মোটামুটি সবলের সঙ্গেই হয়েছে।'

'শশীবাবুকে দেখেছেন তো?'

‘হ্যাঁ, দেখেছি বই কি। আজই সকালে তার সঙ্গে কথা হয়েছে।’
‘ওর ছেলেটিকে দেখেছেন নিশ্চয়ই।’

‘হ্যাঁ—সেও তো কাজ করছিল।’

‘কিন্তু শশীবাবু আরেকটি ছেলে আছে সেটা জানেন?’

‘এ খবরটা অবিদ্য অমরা কেউই জানতাম না।’

‘এ ছেলেটির নাম নিতাই। ডেরি ব্যাড টাইপ। অঠারো বছর বয়স, আর এ বয়সে যত শত্রুপ দোষ থাকতে পারে সবই আছে। আমরা এখনো কোনো প্রমাণ পাইনি, কিন্তু ধরুন, যদি সে মগনলালের খপ্পরে পড়ে থাকে—’

ফেলুদা হাত তুলে বলল, ‘বুকেছি। মগনলাল নিতাইকে হাত করবে, নিতাই হয় তার বাপকে না হয় দাদাকে হুমকি দিয়ে তাদের সিঁদুক খুলিয়ে গুলে চুরি করাবে।’

‘এগজ্যাক্টলি,’ বললেন মিস্টার তেওয়ারি। ‘নিতাইয়ের কাপারটা জানার পর থেকেই মনে হচ্ছে একটা রাস্তা পাওয়া গেছে। আমার অ্যাডভাইস আপনি এখন চূপচাপ থাকুন। মসেরা টাইমে বেনারসে অনেক কিছু দেখবার আছে—সেই সব দেখুন, কিন্তু ঘোষালবাড়িতে বেশী খড়গাত করবেন না।’

ফেলুদা অল্প হেসে চারে চুমুক দিয়ে একেবারে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল।

‘আপনারা মহালিবাবা সম্বন্ধে কোনো তদন্ত করার প্রয়োজন বোধ করছেন না?’

তেওয়ারি হাতের কাপটা টেবলের উপর রেখে একটা প্রাণখোলা হাসি হেসে বলল, ‘আপনারা এর ভিতরেই মহালিবাবা দর্শন করে গেছে? কী মনে হল?’

‘তদন্তের কথা যখন তুললাম, তখন বুঝ বে একটা ভিত্তি লাগেনি মনে সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।’

‘সে তো আপনার কথা হল, কিন্তু আপনি তার চরিত্রের দেখেছেন? আপনি ইন্ভেস্টিগেশনের কথা বলছেন—খোলাখুলিভাবে কিছু করতে গেলে ভয়রা আমাদের আস্ত রাখবে?’

‘কথাটা বলে মিস্টার তেওয়ারি আড়চোখে নিম্ননবাবুর দিকে চাইতে তুললোক হাত তুলে বলে উঠলেন, ‘আমার দিকে কী দেখছেন মশাই! আমাদের ভিত্তি মানে কী? ভিত্তিটাই কিছু না—মহালিবাবা হলেন আমাদের হুকে ফেলা একঘেরে জীবনে সামান্য একটু ব্যতিক্রমের ছিটেফোটা—বাস্।’

ফেলুদা বলল, ‘একটা জিনিস আপনি করতে পারেন মিস্টার তেওয়ারি—হিরিশ্বার আর এলাহাবাদে খবর নিয়ে দেখতে পছন্দ সেখানে গুপ্ত মাস্থ্যানেকের মধ্যে মহালিবাবা নামে কোনো সিঁদুকদুয়ের আবির্ভাব ঘটেছিল

কি না।

ভোরি গুড়। এটা করতে কোনো অসুবিধা নেই। আমি দু-দিনের মধ্যে আপনাকে ইনফরমেশন এনে দেব।

দারোগা সাহেব বাড়ি দেখে উঠে-পড়লেন। দরজার মূখে ভুল্লোক ফেল্দার পিঠ চাপড়ে বললেন, 'একদিন চৌকে আমাদের খানায় আসুন না। কি রকম কাজ হচ্ছে দেখে বান। আর—' তেওয়ারি গম্ভীর—'আমি আপনাকে শিরিয়াসলি বলছি—আপনি বত ইচ্ছে হলেই করুন, কিন্তু এ বেপারে জড়বেন না।'

দুপুরের ডাল ভাত কপির তরকারি মাছের কোল আর দুইয়ের মধ্যে জিলিপি খেয়ে আমরা হোটেল থেকে বেরিয়ে পান কিনলাম। লালমোহন-বাবুকে এমনিতে কখনো পান খেতে দেখিনি; এখানে দেখলাম সাত রকম মশলা দেওয়া রূপার তবক দিয়ে মোড়া একটা প্রকাণ্ড পান চার আঙুল দিয়ে ঠেলে মূখের ভিতর পুরে দিবা চিবোতে লাগলেন। আমরা কোনো বিশেষ জায়গায় যাবো বলে বেরিয়েছি কিনা জানি না, কারণ ফেল্দা কিছু বলেনি। লালমোহনবাবু একবার আমার কানের কাছে মূখ এনে ফিসফিস করে বললেন, 'তোমার দাদা বোধ হয় সেই হালদুইকরের দোকানে গিয়ে রাবাড়ি খাবেন।' আমার ধারণা কিন্তু অন্য রকম—যদিও সেটা আমি মূখে প্রকাশ করলাম না। ফেল্দাকে অনুসরণ করে আমরা হোটেলের উল্টো দিকে একটা গলিতে ঢুকে এগিয়ে চললাম।

একটু এগিয়ে বৃকতে পাওয়ায় এদিকটায় বাঙালীর নামগন্ধ নেই। লালমোহনবাবু চান্দরটিকে ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে বললেন, 'আপনি চোখ, কান আর নাকের কথা বললেন, কিন্তু টেমপারেচারের কথা ভেবে বললেন না। এদিকটায় বেশ শীত শীত লাগছে মশাই।'

দু-দিকে তিন তলা চার তলা বাড়ি উঠে গেছে, আর তার মধ্যে দিয়ে একেবকে চলেছে গলি। দূরের আলো প্রায় পৌঁছায় না বললেই চলে। ফেল্দা বলল বেনারসের গলির বেশির ভাগ বাড়িই নাকি দেড়শো থেকে দুশো বছরের পুরোনো। রাস্তার দু-দিকের দেয়ালে যেখানে সেখানে ছবি আঁকা—হাতি, ঘোড়া, বাঘ, টিয়া, ঘোড়সওয়ার। কারা কখন একেছে জানি না, কিন্তু দেখতে-বেশ লাগে। মাঝে মাঝে এক একটা হাতে-লেখা হিন্দি বিজ্ঞাপন—তার মধ্যে 'নওজোয়ান বাড়ি' সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে।

এতক্ষণ চারিদিকে বেশ চূপচাপ ছিল—এবার ক্রমে ক্রমে কানে নানারকম নতুন শব্দ আসতে আরম্ভ করল। তার মধ্যে সব ছাপিয়ে উঠছে ঘণ্টার শব্দ। ঘণ্টার ফাঁকগুলো ভরিয়ে রেখেছে যে শব্দটা ভাকেই বলা হয় কোলাহল।

ফেলুদা বলে এই কোলাহল জিনিসটা বুঝ মজার। হাজার লোক এক জায়গায়
সকলকে, সবাই নিজের মতো সাধারণভাবে কথাবার্তা বলছে, কেউ গলা তুলছে
না, অথচ সব মিলিয়ে যে শব্দটা হচ্ছে তাতে কান ফেটে যাবার ছোঁগাড়।

এরই মধ্যে বেশ কয়েকটা ঘাড় আমাদের সামনে পড়েছে, আর প্রতিবারই
লালমোহনবাবু বলে উঠেছেন, 'ওই দেখুন, মেঘরাম!' শেষটায় ফেলুদা বলতে
বাধ্য হল যে তার ধারণা মেঘরামের চেয়ে ঘাড় জিনিসটা অনেক বেশী নিরীহ
এবং নিরাপদ।—'আমি মশাই একজন ডাকসাইটে প্রতিদ্বন্দ্বী কল্পনা করে মনে
উৎসাহ আনার চেষ্টা করছি, আর আপনি বার বার ঘাড়ের সঙ্গে তুলনা করে
তাকে খাটো করছেন!'।

চোখ, কান আর নাককে একসঙ্গে আক্রমণ করতে বিশ্বনাথের গলির মতো
অবস্থা কিছু আছে কিনা জানি না। এখানে এসে আর নিজের ইচ্ছেমতো হাঁটা
যায় না; ভীড় যে দিকে নিরে যায় সেই দিকে যেতে হয়। আমরাও এগিয়ে
চললাম ভীড়ের মধ্যে। 'দর্শন হবে বাবু?' বাবু বিশ্বনাথ দর্শন হবে?
পাঞ্জারা চারিদিক থেকে ছেঁকে ধরেছে। ফেলুদা নির্বিকার। আমরা তিনজনেই
ভাদের কথায় কান না দিয়ে যমদুর পারি ধাক্কা বাঁচিয়ে পকেট বাঁচিয়ে রাস্তার
পিছল জায়গাগুলো বাঁচিয়ে এগিয়ে চললাম। লালমোহনবাবুর মনে যতই
ভক্তিভাব জাগুক না কেন, ওর চোখ কিন্তু চলে গেছে মন্দিরের সোনার মোড়া
চূড়ার দিকে। একবার ফেলুদাকে কী যেন প্রশ্নও করলেন চূড়ার দিকে
আকর্ষণ দেখিয়ে। গোলমালে কী বললেন শুনতে পেলাম না, তবে 'ক্যারেট'
কথাটা কানে এল। চূড়ার দিকে চাইতে গিয়েই চোখে পড়ল আকাশে দশ-
বারোটা চিল চকর দিচ্ছে, আর তারই এক পাশে একটা লাল-সাদা পেটকাটি
ঘুড়ি গৌর থেকে মন্দিরের পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ফেলুদাও ঘুড়িটাকে দেখেছে।

আমরা দুজন ফেলুদারই পিছন পিছন আরো খানিকটা এগিয়ে গেলাম—যদি
আবার ঘুড়িটাকে দেখা যায়। হ্যাঁ—ওই ত আবার দেখা যাচ্ছে—লাল-সাদা
পেটকাটি। ওই তো উপর দিকে উঠল, আর ওই তো আবার গৌর বেয়ে নিচের
দিকে নেমে একটা চরতলা বাড়ির পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'মোস্ট ইন্টারেস্টিং...'

চাপা গলায় বললেও, ফেলুদার ঠিক পাশেই থাকায় ওর কথাটা আমি
শুনতে পেলাম।

লালমোহনবাবু বললেন, 'শুধু ইন্টারেস্টিং কেন বলছেন মশাই—আমার
কাছে তো ডিস্টার্বিং বলেও মনে হচ্ছে। মানে, ঘুড়িটার কথা বলছি না।
চারদিকে এত দড়ি আর জড়ির মধ্যে মেঘরামের কত স্পাই ঘোরাফেরা করছে
ভাবতে পারেন? একটি লোক তো আপনার দিক থেকে চোখ ফেরাচ্ছে না।

আমি আড়চোখে ওলট করে যাচ্ছি প্রায় তিন মিনিট ধরে।

ফেলুদা আকাশের দিক থেকে চোখ না নামিয়েই বলল, 'গোঁফ-দাড়ি-জটো-মস্টি-কম-ডুল, আর গায়ে টোটকা নতুন-কেনা হিন্দি নামাবলী তো?'

'ফুল মার্কস,' বললেন জটোরু।

আমরা আবার এগিয়ে গেলাম। সামনেই একটা বাড়ির পিছনে একটা সিঁদুর আর জ্বাফুলে বোঝাই দোকানের পাশে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। ফেলুদা তার সামনে এসে বেশ জোর গলায় বলল, 'জর বাবা বিশ্বনাথ!' আমার হাসি পেলেও একদম চেপে গেলাম।

বিশ্বনাথ থেকে আমরা সোজা চলে গেলাম জানবাপী। এখানেই অওরঙ্গ-জেবের মসজিদ, আর এখানেই সেই প্রকাশ্ত খোলা চাতাল। চাতালটার এসে আবার আকাশের দিকে চাইতে আর ঘুড়িটা দেখতে পেলাম না।

উত্তর দিকে যেখানে চাতালটা শেষ হয়েছে সেখান দিয়ে একটা সিঁড়ি নেমে গেছে রাস্তায়—কারণ চাতালটা রাস্তার চেয়ে প্রায় আট-দশ হাত উঁচুতে। ফেলুদা কী মতলবে বোরিয়েছে সেটা নিয়ে আমার মনে যে সন্দেহটা ছিল, এখন দেখলাম লালমোহনবাবুও সেই একই সন্দেহ করছেন।

'আপনি কি মশাই মেঘরামের বাড়ি যাবার ভাল করছেন নাকি?'

ফেলুদা বলল, 'আমার আরাধ্য দেবতা আর কে আছে বলুন। ক্রাইম না থাকলে তো ফেলু মিস্ত্রিরের রোগাগার বন্ধ হয়ে যাবে, সুতরাং এখানকার সবচেয়ে বড় জমিন্যালের মন্দিরটা একবার দেখে যাব না?'

দিনের বেলা চারদিকে শরৎকালের ঝলমলে রোদ আর লোকের ভিড় বলে হয়ত ফেলুদার কথায় অতটা শিউরে উঠলাম না; তবে ওই এক কথার বৃকের ঘাড়টার দম দেওয়া হয়ে গেছে, আর ধুকপুক শব্দ হয়ে গেছে।

এখানে গোলমাল কম, তাই লালমোহনবাবু পরের প্রশ্নটা গলা নামিয়ে করতে পারলেন।

'আপনার অস্ত্রটি সঙ্গে নিয়েছেন তো?'

'কোন অস্ত্রটার কথা বলছেন? রিভলভার নিইনি। বাকি তিনটে সব সমস্ত সঙ্গেই থাকে।'

লালমোহনবাবু জিজ্ঞাসা দৃষ্টিতে ফেলুদার দিকে চাইতে গিয়ে একটা হোঁচট খেয়ে কেনমতে সামলে নিয়ে আর কিছু বললেন না। ভদ্রলোকের বোঝা উচিত ছিল যে ফেলুদার তিনটে ম্বাতাবিক অস্ত্র হল ওর মস্তিস্ক, স্নায়ু আর মাংসপেশী। ওর মধ্য প্রথমটা অবিশিা আসল।

সিঁড়ি দিয়ে রাস্তার নেমে সামনেই একটা দ্রজির দোকান। দোকানের সামনেই বসে একটা লোক পারে করে সেলাইয়ের কল চালাচ্ছে। ফেলুদা তাকে জিজ্ঞাস করতেই লোকটা মগনলাল মেঘরামের বাড়ি বাতলে দিল। রাস্তাটা

ঘরে পদ দিকে কিছুদূর গেলেই বায়ে একটা মহাবীরের মন্দির পড়বে, তার দূটো বাড়ি পরেই মগনলালের বাড়ি। চেনা সহজ, কারণ সামনের দরজার দূ-দিকে দূটো শশস্ত্র প্রহরীর ছবি আঁকা রয়েছে।

‘ছবি ছাড়া এমনি প্রহরী নেই!’ ফেলুদা প্রশ্ন করল।

‘হ্যাঁ—তাও আছে।’

সোজা রাস্তা, এ-গালি ও-গালি ঘোরার ব্যতী নেই, তাই মগনলালের বাড়ি পেতে কোনোই অসুবিধা হয় না। এখানটায় সত্যি করেই বিশ্বনাথের ঘন্টার শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দই শোনা যায় না। আর দুপুরবেলা বনেই বোধ হয় গলিটা এত নিস্তব্ধ। বাড়ি তো নেই-ই, এমন কি হাগল কুকুর বেড়াল কিছু নেই।

মগনলালের বাড়ির দরজার দূ-দিকে তুলোয়ার উঠোন প্রহরীর ছবি আছে ঠিকই, কিন্তু জ্যান্ত প্রহরী কাউকে দেখা গেল না। অথচ দরজার পছা দূটোই হাঁ করে খোলা। ব্যাপারটা কী? লোকগুলো খেতে গেল নাকি? ফেলুদা নাক টেনে বলল, ‘খনি খাড়া হয়েছে নিমিট খানেক আগেই।’ তারপর এদিক ওদিক সেখে বলল, ‘আসুন। কেউ চ্যালেঞ্জ করলে বলব নতুন এসেছি, যানমন্দির ভেবে ঢুকোছি।’

ফেলুদাকে সামনে রেখে ঢুকে পড়লাম দরজা দিয়ে।

সর্বনাশ—এ কি মগনলালের বাড়ি, না গোয়ালঘর? অন্ধকার, সত্যিসেঁতে উঠোনে তিনটে জলজ্যান্ত গরু দাঁড়িয়ে নির্বিকারে জাবর কাটেছে, আমাদের দিকে ফিরে দেখবারও কোন আগ্রহ নেই তাদের। গরুগুলো বে রাত্রেও এখানেই থাকে তার চিহ্ন চারিদিকে ছড়িয়ে আছে।

ফেলুদা ফিসফিস করে বলল, ‘এ ব্যাপারটা এখানে খুব কমন। এই সব গলির বাড়িতে এক উঠোন ছাড়া আর খোলা জায়গা বলে কিছু নেই। অথচ দুধ ঘি না হলে এদের চলে না।’

আমাদের ডাইনে বায়ে উঁচু বারান্দা দূ-দিকেই দূটো দরজায় গিয়ে শেষ হয়েছে, দূটোর পিছনেই ঘরঘাটি অন্ধকার। আন্দাজে মনে হয় ওই অন্ধকারেই দোতলায় বাবার সিঁড়ি। বাড়িটা বে চারতলা সেটা বাইরে থাকতেই সের্বোচ্চ। উপর দিকে চাইলে লোহার গরাদের মধ্যে দিয়ে খোলা আকাশ দেখা যায়। গরাদের দরকার হয় বাদিরের উৎপাত থেকে রেহাই পাবার জন্য।

এর পরে কী করা উচিত ভেবে পাচ্ছি না, এমন সময় ডান দিকের বারান্দায়-
ক্রোধ গেল।

একটা লোক নিশেষে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে বাইরে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে দেখছে। মাঝবয়সী মাঝারি হাইটের লোক, গায়ে সবুজের উপর সাধা ঘাট-দেওয়া কুতী, মাথায় কাজ-করা সূদা কাপড়ের টুপি। এক জোড়া পদ,

গোফ ঠোঁটের দৃশ্য দিগে নেমে গালপাটো হতে হতে হয়নি।

লোকটো মূখ খুলল। গলার স্বর শুনলে মনে হয় অনেক দিনের পুরনো
করে যাওয়া গ্রামোফোন রেকর্ড থেকে কথা বেরোচ্ছে। ফেলদার দিকে তাকিয়ে
লোকটো যে কথাটা বলল সেটা হচ্ছে এই—

‘শেষজী আপসে মিলনা চাহতে হে’।

‘কোন শেষজী?’ জিগোস করল ফেলদা।

‘শেষ মগনলালজী’।

‘চলিয়ে’, বলে ফেলদা লোকটার দিকে পা বাড়াল।

ছয়

‘জয় বাবা বিশ্বনাথ!’

লালমোহনবাবুর মূখের দিকে চাইতে ওরসা পাচ্ছিলাম না, তবে ওর গলায় আওয়াজেই ওর মনের ভাবটা বেশ বুঝতে পারলাম।

‘আপনার এত ওরসা বিশ্বনাথের উপর?’

ফেলুদা এখনো কি করে হাসকভাবে কথা বলছে জানি না।

‘জয় বাবা ফেলুনাথ!’

‘দ্যাটস বেটার।’

এত উঁচু উঁচু পাথরের ধাপওয়ালা এত অন্ধকার সিঁড়ি এর আগে কখনো দেখিনি। যে লোকটা ডাক্তরে এসেছিল তার হাতে আলোটোলো কিছু নেই। লালমোহনবাবুকে বার-দু’এক ‘ব্র্যাক হোল’ কথাটা বলতে শুনলাম। ছেচমিশ ধাপ সিঁড়ি উঠে তিনতলায় শেঁছিলাম আমরা। লোকটা এবার সামনের একটা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল। আমরাও ঢুকলাম তার পিছন পিছন।

একটা ঘর, তারপর একটা সরু পাসেজ, আর তারপর আরেকটা ঘর শেরিয়ে একটা অন্ধকার বারান্দা দিয়ে বেশ খানিকদূর গিয়ে একটা নিচু দরজা পড়ল। লোকটা এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে ফিরে ডান হাত বাড়িয়ে দরজার ভিতর যাবার জন্য ইশারা করল। কথা না বললেও লোকটার মূখ থেকে বিড়ির কড়া গন্ধ পাচ্ছিলাম।

বে ঘরটার ঢুকলাম সেটা যে কত বড় সেটা তাকুনি বোকা গেল না, কারণ প্রথমে ঢুকে কয়েকটা বস্ত্রীই কাঁচ ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না। বুকলাম। কাঁচগুলো জানালায় লাগানো বলে ভাতে বাইরের আলো পড়েছে।

‘নোমোস্কার মিস্টার মিটার।’

খসখসে সগম্ভীর দানাদার গলাটা আমাদের সামনে থেকেই এসেছে। এবারে চোখ অন্ধকারে সরে এসেছে। একটা সাদা গদি দেখতে পাচ্ছি— আমাদের সামনে কিছুটা দূরে মেঝেতে বিছানো রয়েছে। তার উপরে চারটে সাদা তাকিয়া। একটার ভর দিয়ে আড় হয়ে বসে আছে একটা লোক, যার শূঁধু পিছন দিকটা আমরা সেদিন দেখেছি মইলিবারার ভক্তদের মধ্যে।

একটা খুঁট শব্দের সঙ্গে সিলিং-এ একটা বাতি জ্বলে উঠল। পিতলের
হলের গায়ে ফুটো ফুটো জাতির কাজ—সেটা হল বাতিটার শেড। ঘরের
চারদিক এখন খুঁটিনার আলোর নকশায় ভরে গেছে।

এখন সব কিছু দেখতে পাচ্ছি। মগনলাল মেঘরাজের ডুরুর নিচে গর্তে
বসা দেখে, তার নিচ ছোট্ট খাবড়া নাক, আর তার নিচে এক ছোড়া ঠোঁট,
যার উপরেরটা পাতলা আর নিচেরটা পুরু। ঠোঁটের নিচে খুঁটনিটা সোজা
নেমে এসেছে একেবারে আঁঙ্গুর পাঞ্জাবির গলা অবধি। পাঞ্জাবির বোতাম-
গুলো হাঁয়ের হলে আশ্চর্য হব না। এ ছাড়া বলমলে পাথর আছে দশটা
আঙুলের আটটা আঙুটিতে, যেগুলো এখন নমস্কারের ভঙ্গিতে এক জয়গায়
জড়ো হয়ে আছে।

‘বোসুন আপনারা। দাঁড়িয়ে কেনো?’

দিবি বাঙলা।

‘চাই তো গদিতে বসুন। আর নয়তো চেয়ার আছে। বাতে ইচ্ছা
বসুন।’

চেয়ারগুলো নিচু। গায়ে ফেলুদা বলেছিল ওগুলো নাকি গুজরাটের।
আমরা গদিতে না বসে চেয়ারেই বসলাম—ফেলুদা একটাতে আর আমি আর
লালমোহনবাবু আরেকটাতে।

মগনলাল সেইভাবেই কাত হয়ে থেকে বললেন, ‘আপনার সঙ্গে আলাপ
করার ইচ্ছা ছিল, তাবছিন্নাম আপনাকে ইনভাইট করে নিয়ে আসব। শুগওয়ানের
কৃপায় আপনি নিজেই এসে গেলেন।’ তারপর একটু হেসে বললেন, ‘আপনি
আমাকে চিনেন না, কিন্তু আমি আপনাকে চিনি।’

‘আপনার নামও আমি শুনছি’, ফেলুদা পালটা ভদ্রতা করে বলল।

‘নাও বলছেন কেন, বদনাম বলুন। সত্যি কথা বলুন!’

মগনলাল কথাটা বলে হো হো করে হেসে উঠলেন, আর তার ফলে তার
পানখাওয়া দাঁতগুলোতে আলো পড়ে চকচক করে উঠল। ফেলুদা চুপ করে
রইল। মগনলালের মাথাটা আমার দিকে ঘুরে গেল।

‘ইনি আপনার বাদার?’

‘কাজিন।’

‘আর ইনি? অ্যাকল?’

মগনলালের চোখে হাসি, চোখ ঘুরে গেছে জটায়ুর দিকে।

‘ইনি আমার বন্ধু। লালমোহন গাঙ্গুলি।’

‘ভেরি গুড! লালমোহন, মোহনলাল, মগনলাল—সব লাল, ‘লালে লাল—
এ’? কী বলেন?’

লালমোহনবাবু কিছুক্ষণ থেকে হাঁটু নাচিয়ে ‘আমি একটুও নার্ভাস

হুইনি', ডাথ দেখানোর চেষ্টা করছিলেন, এবার মগনলালের কথাটা শুনাই হাঁটু ধুটো খট্ খট্ শব্দ করে পরস্পরের সঙ্গে লাগিয়ে নাচানো বন্ধ হয়ে গেল।

এবার মগনলালের বাঁ হাতটা একটা থাম্পড়ের ভঙ্গিতে তাকিয়ার পিছনে নামাতেই ঠং করে একটা কলিং বেল বেজে উঠে লালমোহনবাবুকে বিষম খাইয়ে দিল।

'গলা সুস্থিয়ে গেলো?' বললেন মগনলাল।

বাঁ দিকে তাকিয়ে দেখি যে-লোকটা আমাদের উপরে নিম্নে এসেছিল সে আবার দরজার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

'সরবৎ লাও,' হুকুম করলেন মগনলাল।

এখন ঘরের সব জিনিসই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। মগনলালের পিছনের দেয়ালে দেবদেবীর ছবির গ্যালারী। ডান দিকে দেয়ালের সামনে ধুটো স্টীলের আলমারি। গদির উপরে কিছু খাতাপত্র, একটা বোধ হয় ক্যাশবাক্স, একটা লাল রঙের টেলিফোন, একটা হিল্লি খবরের কাগজ। এ ছাড়া তাকিয়ার ঠিক পাশেই রয়েছে একটা রূপোর পানের ডিবে আর একটা রূপোর পিকদান।

'ওয়েল মিস্টার মিস্তর'—মগনলালের স্থির দৃষ্টিতে আর হাসির নামগন্ধ নেই—'আপনি বনারস হিলিডের জন্যে এসেছেন?'

'সেটাই মূল উদ্দেশ্য ছিল।'

ফেলুদা সটান মগনলালের চোখের দিকে চেয়ে কথা বলছে।

'তা হলে—আপনি—টাইম—ওয়েন্ট—করছেন—কেন?'

প্রত্যেকটা কথা ফাঁক ফাঁক আর স্পষ্ট করে বলা।

'সারনাথ দেখেছেন? রামনগর দেখেছেন? দুর্গাবাড়ি, মানমন্দির, হিন্দু ইউনিভার্সিটি, বেগীমাধব ধ্বজা—এসব কিছুই দেখলেন না, আজ বিশ্বনাথজীর দরওয়াজার সামনে গেলেন, কিন্তু ভিতরে ঢুকলেন না, কার্চোরি গলিতে মিঠাই খেলেন না...ঘোষালবাড়িতে কী কাম আপনার? আমার বন্ধরা আছে আপনি জানেন? চৌতি ঘাটসে অস্‌সি ঘাট টিরিপ দিয়ে দেবো আপনাকে, আপনি চলে আসুন। গঙ্গার হাওয়া খেয়ে আপনার মনমেজাজ খুশ হয়ে যাবে।'

'আপনি ভুলে যাচ্ছেন—ফেলুদার গলা এখনো স্থির, যাকে বলে নিষ্কম্প—'যে আমি একজন পেশাদারী গোয়েন্দা। মিস্টার ঘোষাল আমাকে একটা কাজের ভার দিয়েছেন। সে কাজটা শেষ না করে ফুর্তি করার কোন প্রশ্ন আসে না।'

'কতো আপনার ফী?'

ফেলুদা প্রায়শই শব্দে কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইল। তারপর বলল,
'দ্যাট ডিপেন্ডস—'

'এই নিন!'

তাম্বল, দম-বন্ধ-করা ব্যাপার। মগনলাল ক্যাশবান্ন খুলে তার থেকে
একতালু একশো টাকার নোট বার করে ফেলুদার দিকে এগিয়ে দিয়েছে।

ফেলুদার চোয়াল শক্ত হয়ে গেল।

'বিনা পরিশ্রমে আমি পারিশ্রমিক নিই না মিস্টার মেঘরাজ!'

'বাহুরে বাঃ!—মগনলালের পান-খাওয়া দাঁত আবার ফেরিয়ে গেছে—
'আপনি পরিশ্রম করে কী করবেন? যেখানে চোরিই হল না, সেখানে আপনি
চোর পাকড়াবেন কী করে মিস্টার মিষ্টির?'

'চুরি হল না মানে?'—এবারে ফেলুদাও অবাক—'কোথায় গেল সে জিনিস?'

'সে জিনিস তো উমানাথ আমার কাছে বিক্রী করে দিয়েছে। তিস্ হাজার
ক্যাশ দিয়ে আমি সে জিনিস কিনে নিয়েছি!'

'কী বলছেন আপনি উলটো-পালটা?'

ফেলুদার বেপরোয়া কথায় আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেল। মিলিং-এর
স্বাভিটা থেকে একটা আলোর নকশা লালমোহনবাবুর নাক আর ঠোঁটের উপর
পড়েছে। বেশ বুদ্ধিলাম ওর ঠোঁট শূন্য হয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

মগনলাল ওর শেষ কথাটা বলে হেসে উঠেছিল, ফেলুদা কথাটা বলতেই
মনে হল একটা হাসির রেকর্ডের উপর থেকে কে যেন সাউন্ড-বক্সটা হঠাৎ
তুলে নিল। মগনলালের মুখ এখন কালবৈশাখীর মেঘের মতো কালো, আর
চোখ দুটো যেন কোটের থেকে বেরিয়ে এসে বুলেটের মতো ফেলুদাকে বিখতে
চাইছে।

উলটো-পালটা কে বলে জানেন? উলটো-পালটা বলে উলটো-পালটা
আদায়। মগনলাল বলে না। উমানাথের বেপার কী জানেন আপনি? তার
বেওয়ার বিষয় কিছ্ জানেন? উমানাথের দেমা কত জানেন? উমা নিজে
আমাকে ডেকে পাঠান জানেন? উমা নিজে সিন্দুক থেকে গণপতি চোরি
করেছে জানেন? আপনি চোর কি খরবেন মিস্টার মিষ্টির—চোর তো আপনার
মকেল নিজে!

ফেলুদা গম্ভীর গলায় বলল, 'আপনি কী বলতে চাচ্ছেন সেটা পরিষ্কার
হচ্ছে না মগনলালজী। নিজের জিনিস চুরি করবার সরকারী কোথায়? মোজা
সিন্দুক থেকে বার করে আপনার হাতে তুলে দিয়ে টাকাটা নিয়ে নিলেই ত
হতো!'

'কায় সিন্দুক? সিন্দুক তো ওর বাবার!'

'কিন্তু গণেশটা তো—'

‘গণেশ কার? ঘোষাল ফার্মিলির। ফার্মিলি তিন জলগায় ডাগ হয়ে গেছে। বড় ছেলে বিলাইতে ডাকটের—ছোট ছেলে উমানাথ কলকাতার কোমিক্যালিস—আর বাবা বেনারসের উকীল—এখন প্রাকটিস ছেড়ে দিয়েছেন। গণপতি ছিল অল আলং বাবার কাছে। গণপতির ইনস্ট্রুমেন্ট দেখবেন তো ওনাকে দেখুন। কডো টাকা কামারেছেন দেখুন, মেজাজ দেখুন, আরাম দেখুন। তার সিন্দুক থেকে গণেশ বার করে উমানাথ আমাকে বিক্রী করল—সে কথা সে বাপকে জানাবে কী করে? তার সাইস কোথায়?’

ফেলুদা ভাবছে। সে কি মগনলালের কথা বিশ্বাস করছে?

‘সিন্দুক থেকে কবে গণেশ নিলেন উমানাথবাব?’

মগনলাল তাকিয়াটো আরো বৃকের কাছে টেনে নিল।

‘শুনুন—অক্টোবর দশ তারিখ আমাকে ডেকে পাঠাল উমা। সেদিন কথা হল। আমি এগ্নি করলাম। আমার লাক্ ভি কুছ খারাপ আছে—আপনি হয়ত জানেন। लेकिन আমার টাকার অভাব এখনো হয়নি। আর উ গ্রীন ডায়মন্ডকে কত দাম জানেন? উমা জানে না। আমি বা পে করলাম তার চেয়ে অনেক বেশি। এনিওরে—দশ অক্টোবর কথা হল। উমা বলল আমাকে দো-তিন দিন টাইম দাও। আমি বললাম নাও। ফিফ্টিনথ অক্টোবর ইভনিং উমা আবার ফোন করল। বলল গণেশ আমার কাছে এসে গেছে। আমি বললাম তুমি চলে এসো মছলিবাবা দর্শন করতে। উমা এসে গেল। আমি এসে গেলাম। আমার কাছে ব্যাগ, উর প্যাকিটে ব্যাগ। উর ব্যাগে গণপতি, আমার ব্যাগে তিন-সও হান্ড্রেড-রুপি নোটস। দর্শন ভি হল, ব্যাগ বদল ভি হল। কাস্, বতম।’

মগনলাল যদি সত্যি কথা বলে থাকে, তা হলে বলতে হবে উমানাথবাব, আমাদের সাংঘাতিক ভাঁওতা দিয়েছেন আর নিজের মান বাঁচানোর জন্য একটা চুরির গল্প খাড়া করে ফেলুদাকে তদন্ত চালাতে বলেছেন। অবশ্য সেই সঙ্গে পলিশকেও ভাঁওতা দিয়েছেন। পুরো ব্যাপারটাই ফেলুদার পক্ষে পন্ড্রম হবে, আর পকেটে পরসাত আসবে না। কিন্তু মগনলালই বা ফেলুদার প্রতি এত সদয় হবে কেন?

আমি প্রায় চমকে উঠলাম যখন ফেলুদা ঠিক এই প্রশ্নটাই মগনলালকে করে বলল। মগনলাল তার চোখ দুটোকে আরো ছোট করে একটু সোজা হয়ে বসে বলল, ‘কারণ আমি জানি আপনি বুদ্ধিমান লোক। অর্ডিনারি বুদ্ধি না, একসট্রো-অর্ডিনারি বুদ্ধি। আপনি আরো কিছুদিন তদন্ত করলে যদি আসল বেপারটা বুকে ফেলেন, তখন উমারও মর্শকিল, আমারও মর্শকিল। আমাদের এই লেনদেনের বেপারটা তো ঠিক সিধা-সফা নয়—সে তো আপনি বুকের মিস্টার মিস্ত্রি!’

ফেলুদা চুপ করে আছে। তিন গেলাম সবুজ রঙের সরবত এসেছে—

আমাদের সামনে টেবিলের উপর রাখা। ফেলুদা একটা গেলাস হাতে তুলে নিয়ে বলল, 'গদেশটা তা হলে আপনার কাছেই আছে। সেটা একবার দেখা যায় কি? যেটার সঙ্গে এত রকম ইতিহাস জড়িত, সেটা একবার দেখতে' ইচ্ছা হওয়াটা স্বাভাবিক এটা আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন।'

মগনলাল মাথা নেড়ে বললেন, 'ভেরি সরি মিস্টার মিস্তির, আপনি ভো জানেন আমার এ বাড়িতে একবার রেড হয়ে গেছে। ও জার্নিস কি করে আমি এখানে রাখি বলুন। ওটা আমাকে একটা সেফ জায়গায় পাঠিয়ে দিতে হয়েছে।'

ফেলুদার পরের কথাতে ওর বেশরোমা ভাবটা আমার কাছে আবার নতুন করে কুটে বেরোল।

'তা পাঠিয়েছেন বেশ করেছেন, কিন্তু আপনি সত্যি বলছেন কিনা জানার জন্যও ত আমাকে অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে হবে মগনলালজী!—তাতে যদি আপনার কথা সত্যি বলে প্রমাণিত হয় তাহলে ত কথাই নেই, কিন্তু শরুন যদি তা না হয়?'

মগনলালের ডানার ঠোঁটটা বিস্মীভাবে নিচের দিকে কুলে পড়ল, আর তার ছুরুজোড়া আরো নেমে এসে চোখ দুটোকে অন্ধকারে ঠেলে দিল।

'আপনি আমার কথা বিস্বাস করছেন না?'

লালমোহনবাবু সরবতের গেলাসটা তুলেই আবার ঠক করে নামিয়ে রাখলেন। ফেলুদার হাতের গেলাস আন্তে আন্তে ঠোঁটের কাছে চলে গেল। সরবতে একটা চুমুক দিয়ে একদৃষ্টে মগনলালের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি নিজেই বললেন আপনারা আমি চিনি না। কী করে আশা করেন প্রথম আলাপেই আমি আপনার সব কথা বিশ্বাস করব? আপনি নিজেই কি সব সময় নতুন লোকের কথা বিশ্বাস করেন—বিশেষ করে যখন সে লোক দিনকে রাত করে বের?'

মগনলাল সেইভাবেই চোরে আছে ফেলুদার দিকে। একটা ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ শুনতে পাচ্ছি, যদিও সেটা কোথায় আছে তা জানি না।

এবার মগনলালের ডান হাতটা আবার ফেলুদার দিকে এগিয়ে এসে—তাতে এখনো সেই নোটের ভাড়া।

'তিন হাজার আছে এখানে মিস্টার মিস্তির। আপনি নিন এ টাকা। নিয়ে আপনি বিদ্রাম করুন, সফর্তি করুন আপনার কার্জিন আর আশ্চর্যকে নিয়ে।'

'না মগনলালজী, ওভাবে আমি টাকা নিই না।'

'আপনি কাজ চালিয়ে যাবেন?'

'যেতেই হবে।'

'ভেরি গুড।'

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে মগনলালের হাত আবার কলিং বেলের উপর

আছড়ে পড়ল। সেই লোকটা আবার দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। মগনলাল লোকটার দিকে না তাকিয়ে বলল, 'অজুনকো বোলাও—আউর তেরা নম্বর ককস লাও—আউর তরা।'

লোকটা চলে গেল। কী যে আনতে গেল তা ভগবান জানে।

মগনলাল এবার হাসিহাসি মুখ করে লালমোহনবাবুর দিকে চাইলেন। লালমোহনবাবুর ডান হাত এখনো সরবতের গেলাসটোকে ধরে আছে, বসিও সে গেলাস টেবিল থেকে এক ইঞ্চিও ওঠেনি।

'কেসো মোহনভোগবাবু, আমার সরবৎ পসিন্দ হল না?'

'না না—কংসর—ইয়ে, সরবত—মানে...' আরো বললে আরো কথার গুড়গোল হলে যাবে মনে করেই বোধহয় লালমোহনবাবু গেলাসটা তুলে ঢক্ ঢক্ করে দু'টোক সরবৎ খেয়ে ফেললেন।

'আপনি ঘাবড়াবেন না মোহনবাবু—উ সরবতে বিষ নেই।'

'না না—'

'বিশ আমি ধারাপ জিনিস বলে মনে করি।'

'নিশ্চয়ই—বিশ ইজ—আরেক ঢোক সরবৎ—ভেঙ্গি ব্যাঙ।'

'তার চেয়ে অন্য জিনিসে কাম দেয় বেশি।'

'অন্য জিনিস?'

'কী জিনিস সেটা এবার আপনাকে দেখাব।'

'খাখ?'

'কী হল মোহনভোগবাবু?'

'বিশ—মানে বিষম লাগল।'

খাইরে পায়ের শব্দ।

একটা অশুভ প্রাণী এসে ঘরে ঢুকল। সেটা মানুষ ও বটেই, কিন্তু এরকম মানুষ আমি কখনো দেখিনি। হাইটে পাঁচ ফুটের বেশি না, রোগা লিকলিকে শরীরের মাথা থেকে পা পর্যন্ত শিরা-উপশিরায় গিল্গিল করছে, মাথার চুলে কদম ছাঁট, কান দুটো খাড়া হয়ে বেরিয়ে আছে, চোখ দুটো দেখলে মনে হয় নেপালী, কিন্তু নাকটা খাঁড়ার মতো উঁচু আর ছুঁচোল। আরো একটা লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, লোকটার সারা গায়ে একটাও লোম নেই। হাত পা আর বুকের অনেকখানি এমনিতেই দেখা যাচ্ছে, কারণ লোকটা পরেছে একটা শতজিহ্ব হাতকাটা গেঞ্জী আর একটা বেগুনী মণ্ডের ময়লা হাফ প্যান্ট।

লোকটা ঘরে ঢুকেই মগনলালের দিকে ফিরে একটা স্যালুট করল। তারপর হাতটা পাশে নামিয়ে কোমরটাকে একটু ভাঁজ করে সামনের দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রইল।

এবার ঘরে আরেকটা জিনিস ঢুকল। এটাই নোখহর ভের 'নম্বর বাক্স'। দুটো লোক বাক্সটা বয়ে এনে গদির সামনে মেঝেতে রাখল। রাখার সময় একটা কনিষ্ঠ শব্দে বুদ্ধজাম ভিতরে মোহা বা পিতলের জিনিসপত্র আছে।

আরো দুটো লোক এবার একটা বেশ বড় কাঠের তক্তা নিয়ে এসে আমাদের পিছনের সরঞ্জামটা বন্ধ করে তার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল। এতক্ষণে মগনলাল আবার শ্ব্থ শ্বুললেন।

'নাইফ-থ্রোইং জানেন কী জিনিস মিস্টার মিস্টার? সার্কাসে দেখেছেন কখনো?'

'দেখিছি।'

সার্কাস আমি দেখিছি, কিন্তু নাইফ-থ্রোইং দেখিনি। ও-ই একবার বলেছিল ব্যাপারটা কিরকম হয়। একজন লোককে একটা খড়্গা করা তক্তার সামনে দাঁড় করিয়ে দূর থেকে আরেকটা লোক তার দিকে একটোর পর একটা ছোরা এমনভাবে মারতে থাকে যে, সেগুলো লোকটার গায়ে না লেগে তাকে ইঁপে খানেক বাঁচিয়ে তক্তার উপর গিয়ে বিধতে থাকে। সে নাকি এমন সাংঘাতিক খেলা যে দেখে লোম খাড়া হয়ে যায়। সেই খেলাই আজ দেখাবে নাকি এই অর্জুন?

ভেরো নম্বর বাক্স খোলা হয়েছে। ঘরে আরো দুটো ব্যক্তি জদলে উঠল। বাক্সে বোকাই করা কেবল ছোরা আর ছোরা। সেগুলো সবকটা ঠিক এক রকম দেখতে—সব কটার হাতির দাঁড়ের হাতল, সব কটার ঠিক একরকম নকশা করা।

'হরবনসপূরের রাজার প্রাইভেট সার্কাস ছিল, সেই সার্কাসেই অর্জুন নাইফ থ্রোইং-এর খেল দেখাত। এখন ও হামার প্রাইভেট সার্কাসে খেল দেখায়—হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ...'

বাক্স থেকে গদুনে গদুনে বারোটা ছোরা বার করে আমাদের সামনেই একটা শ্বেতপাখরের টোঁকলের উপর সাজিয়ে রাখা হয়েছে একটা খোলা জাপানী হাতপাখার মতো করে।

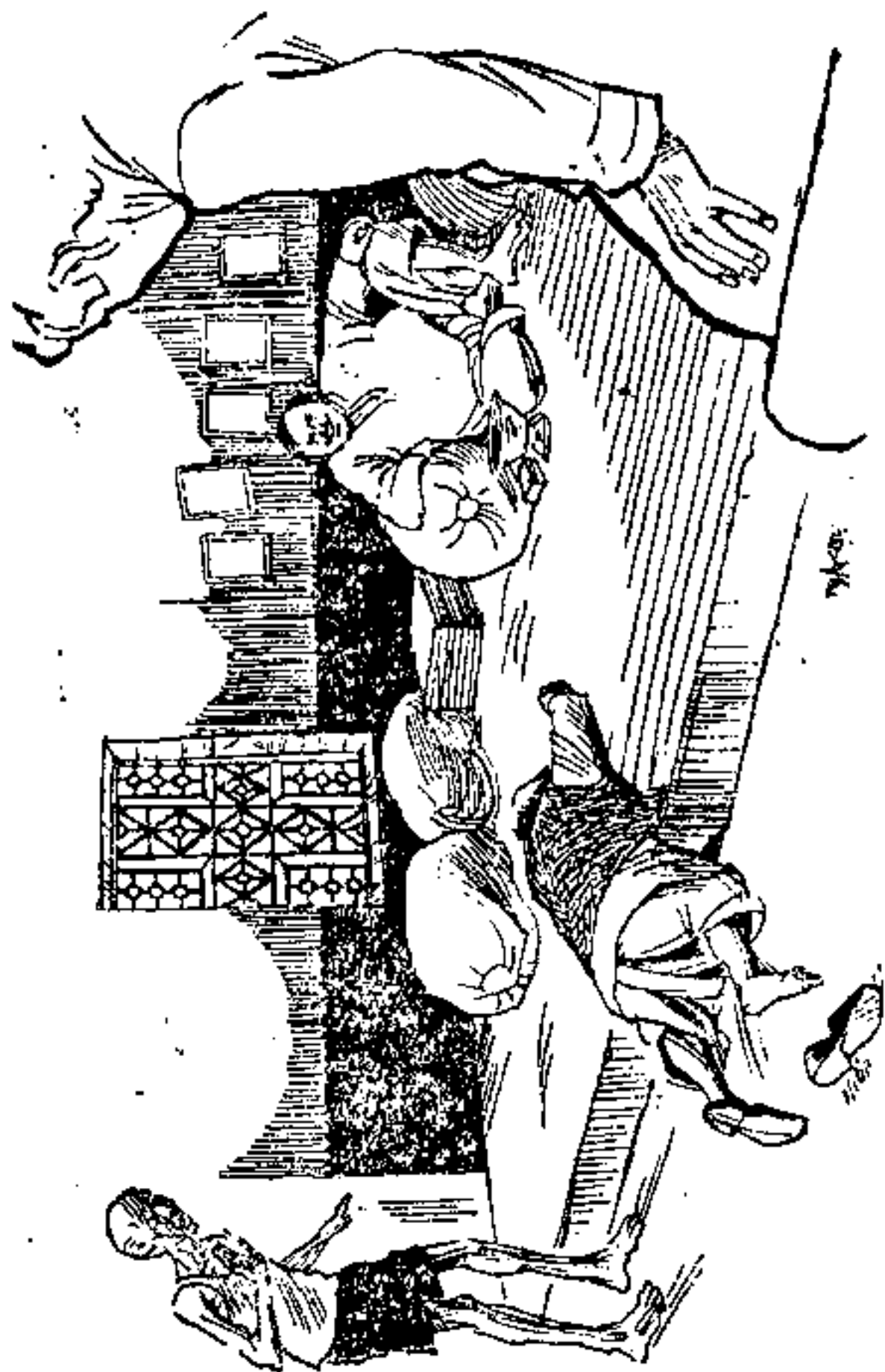
'আসুন আশ্চল।'

আশ্চল কথাটা শ্রুনে লালমোহনবাবু তিনটে জিনিস একসঙ্গে করে ফেললেন—হাতের কটকার গেলাসের অর্ধেক সরবত ঘটিতে ফেললেন, পেটে ঘর্ষি খাবার মতো করে সোজা থেকে সামনের দিকে কঁকে গেলেন, আর 'আঁ' বলতে গিয়ে 'গ্যা' বলে ফেললেন। পরে জিগোস করাতে বলেছিলেন উনি নাকি 'আঁ' আর 'গেল্‌ম' একসঙ্গে বলতে গিয়ে গ্যা বলেছিলেন।

এবার ফেল্‌মার ইম্পাত-কঠিন গলার স্বর শোনা গেল।

'ওকে ডাকছেন কেন?'

মগনলালের হাসির চোটে তার কন্‌ই আরো ইঁপে ভিনেক ভাকিয়ার ভিতর



চুকে গেল।

ওকে ডাকব না ত কি আপনাকে ডাকব মিস্টার মিট্র? আপনি তত্ত্বের সামনে দাঁড়ালে খেল দেখবেন কী করে?...আপনি এ ব্যাপারে কিছু বলবেন না মিস্টার মিট্র। আমার কথা বিস্ময়স না করে আপনি আমাকে অনেক অপমান করলেন। আপনি জানবেন যে চাকু ছাড়াও অন্য হাতিয়ার আছে আমার কাছে। ওই ঘুলঘুলির দিকে দেখুন—দো ঘুলঘুলি, দো পিস্তল আপনার দিকে পয়েন্ট করা আছে। আপনি ঝামেলা না করেন ত আপনার কোনো ক্ষতি হবে না। আপনার বন্দুর ভি কোনো ক্ষতি হবে না। অর্জুনের জবাব নেই, আপনি দেখে নেবেন।

ঘুলঘুলির দিকে চাইবার সাহস আমার নেই। লালমোহনবাবুর দিকেও চাইতে ইচ্ছা করছিলাম না, কিন্তু চাপা মিহি গলায় ওর একটা কথা শুনে না চেয়ে পারলাম না। ভয়লোক হাতল ধরে চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে কথটা বলছেন, তার ফাঁকে ফাঁকে ওর হাটুতে হাটু লেগে খটখট শব্দ হচ্ছে।

‘বেঁচে থাকলে...পপ্-প্লেটের আর...চি-হি-হিস্তা নেই।’

দুজনে লোক এসে লালমোহনবাবুকে দু দিক থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে তক্তাটার সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। লালমোহনবাবু চোখ বুজলেন।

তারপর আমার পিছন দিকে যে জিনিসটা ঘটে সেটা আর আমি দেখতে পারিনি। ফেলুদা নিশ্চয়ই দেখেছিল, কারণ না দেখলে নিশ্চয়ই ঘুলঘুলি থেকে পিস্তলের গুলি এসে ওর বুকে বিধত। আমার শব্দ শুনেই বস্ত্র বরফ হয়ে গিয়েছিল। আমার চোখ ছিল সামনের টেবিলের দিকে। তার উপর থেকে একটা একটা করে ছুরি তুলে নিচ্ছে অর্জুনের হাত, আর তার পরেই সে ছুরি ঘাটাং শব্দ করে তক্তার কাঠ ভেদ করে ঢুকছে।

ক্রমে শেষ ছুরিটা তোলা হয়ে গিয়ে টেবিল খালি হয়ে গেল, আর ঘাটাং শব্দ, আর অর্জুনের ফৌস ফৌস করে দম ফেলার শব্দ, আর মগনলালের ঘন ঘন ‘বহুৎ আচ্ছা’ ধেমে গিয়ে রইল শব্দ, অদৃশ্য ঘাড়ের টিক টিক আর বিশ্বনাথের ঘণ্টার ঢং ঢং শব্দ। আর তার পরে হল এক ভাস্কর্য কাণ্ড।

লালমোহনবাবু দরজার দিক থেকে ফিরে এসে অর্জুনের হ্যান্ড শেক করে ‘থ্যান্ক ইউ ম্যার’ বলেই অজ্ঞান হয়ে হুর্মাড়ি থেয়ে মগনলালের গদির উপর পড়ে সেটার অনেকখানি জায়গা ঘামে ভিজিয়ে চপচপে করে দিলেন।

সাত

দুটো বাজে। আকাশে মেঘ। দশম্বসোয় ঘাটে এখন লোক নেই বললেই চলে। আমরা তিনজন জলের দারে বসে আছি ঘাটের সিঁড়ির উপর। মগন-লালের ঘরে বিভীষিকাময় ঘটনাটার পর প্রায় এক ঘণ্টা কেটে গেছে। মগন-লালের লোকই লালমোহনবাবুর জ্ঞান ফিরিয়ে এনেছিল চোখে মূখে জলের কাপটা দিয়ে। তারপর মগনলাল নিজে দুধের সঙ্গে ব্র্যান্ডি মিশিয়ে খাইয়ে লালমোহনবাবুকে চাপা করে ফেলেছিল, 'আম্বল, ইউ আর এ ব্রেড ম্যান।' তারপর থেকে লালমোহনবাবু কথাটা আর বিশেষ বলছেন না, কেবল ফেল্দুদাকে একবার জিগেস করেছেন তার মাথার চুল সব পেকে গিয়েছে কিনা। তাতে আমরা দুজনেই তাকে আশ্বাস দিয়েছি যে নতুন করে একটি চুলও পাকেনি।

মগনলালের হাবভাবে স্পষ্টই বোকা গিয়েছিল যে ফেল্দুদা তদন্ত চালাতে গেলেই সে খতম হয়ে যাবে—হয় ছুরিতে, না হয় গুলিতে। অবিশ্য শেষ পর্যন্ত ফেল্দুদা একটা কনসেশন আদায় করে নিয়েছে; সে আয়ে একটি বার ঘোমালবাড়িতে যাবে, কারণ হঠাৎ ভুব মেরে গেলে সেটা তার সম্মানের পক্ষে অত্যন্ত হানিকর হবে। যাওয়ার ব্যাপারে দেরি করে লাভ নেই, কাজেই সেটা আজই বিকেলে সেয়ে ফেলতে হবে। মগনলাল আমাদের বিদায় সেবার আগে স্পষ্ট কথাটা শাসিয়ে দিয়েছে—'আপনি জেনে রাখবেন মিস্টার মিস্টার যে আপনি বাড়ুবাড়ি যা করবেন তা আট ই-ওর ওন রিস্ক। আর আপনার উপর নজর রাখা বেওম্বা আমার আছে সেটাও আপনি জানবেন।'

এটা বসতে খারাপ লাগছে যে এখন পর্যন্ত মগনলালই ফেল্দুদার উপর টেকা মেয়ে আছে। এটা আমি জানি যে যতই ডাকসাইটে প্রতিশ্রুত হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত প্রতিবারই ফেল্দুদার জয় হয়েছে। কিন্তু এটাও ঠিক যে মগনলাল মেথরাজের মতো সাংঘাতিক প্রতিশ্রুতীর সামনে এর আগে ফেল্দুদাকে কখনো পড়তে হয়নি।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে গঙ্গার দিকে চেয়ে থেকে ফেল্দুদা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'গাশশটা ঘোমাল বাড়িতে রয়ে গেছে রে—তাতে কোনো সমস্যা নেই। নইলে লোকটা আমাকে তদন্ত বন্ধ করার জন্য এতগুলো টাকা অফার

করে না। কিন্তু কথা হচ্ছে—সেটা কোথায়? সেটা কেন এখনো পর্যন্ত মগনলালের নাগালের বাইরে? কখন কীভাবে সেটা সে হাত করার কথা ভাবছে? আর সব শেষে আরো দুটো প্রশ্ন—কে সেটা সিন্দুক থেকে সরাল, এবং ওবাড়ির কার সঙ্গে মগনলালের যোগসাজশ রয়েছে?

ফেলুদা পকেট থেকে তার খাতাটা বার করে মিনিট পাঁচেক উল্টে-পালটে দেখল। বদুতে পারছি ইতিমধ্যে সেটাকে বেশ কিছু নতুন জিনিস লেখা হয়েছে, কিন্তু সেটা যে কী তা এখনো জানি না। লালমোহনবাবুকে লক্ষ্য করছি মাঝে মাঝে শিউরে উঠছেন, আর নিষেধ শরীরের এখানে ওখানে হাত বুলিয়ে দেখছেন। তিনি যে অকৃত আছেন সেটা বোধহয় এখনো ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না।

আমরা যখন ঘাট থেকে উঠলাম তখনো আকাশ ছাই রঙের মেঘের ঢুকবোতে ছেয়ে আছে। আকাশটা দেখতে গিয়েই লাল-সাদা পেটকাটি ঘড়িটার দিকে চোখ গেল। ফেলুদাও দেখেছে, কারণ ওর দিগ্ভি-ওঠা থেমে গেল।

ঘড়িটা উড়ছে যে বাড়িটার মাথার উপর সেটা আমাদের চেনা বাড়ি। এটা সেই লালবাড়ি—যার ছাতে শহতান সিংকে ক্যাপ্টেন স্পাকের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল। বাড়ির ছাতে কে? শহতান সিং না? হ্যাঁ—কোনো সন্দেহ নেই। এ হল রুকুর বন্দু সুরঘ। সে এক দৃষ্টিতে আকাশের ঘড়িটার দিকে চেয়ে রয়েছে।

এবার ঘড়িটা গোঁচ থেকে সূতোর টানে নিচের দিকে নেমে এল। সুরঘের জন হাতটা একটা ঝটকা দিয়ে উপর দিকে উঠল। তার ফলে একটা চিল শূন্যে উঠে ঘড়িটার পিছন দিকে চলে গেল।

এবার বদুলাম চিলটা একটা সূতোর সঙ্গে বাঁধা, আর সূতোটা ধরা সুরঘের হাতে।

সেই সূতো ধরে সুরঘ টান দিলে, আর তার ফলে বন্দী ঘড়িটা তার ছাতে চলে আসছে।

গোধূলিরার মোড়ে একটা দোকানে বসে চা খেয়ে আমরা যখন শংকরী নিবাসে পৌঁছলাম তখন প্রায় চারটে বাজে। চিলোচন পাণ্ডে সেলাম ঠুকে ফটক খুলে দিল। আমরা গাড়িবারান্দার পৌঁছানর আগেই সকালেরই মতো বিকাশবাবু বাইরে বেরিয়ে এসে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন।

‘কী খবর? এনি প্রোগ্রেস?’

‘উহু’ ফেলুদা বলল। ‘শহর দেখে বেড়লাম সারা দিন।’

‘ওরা ত সব বেরিয়েছেন।’

উমানাথবাবুর গাড়িটা দেখাছিলাম না। তাছাড়া বাড়িটা দেখেও কেমন

জানি খালি খালি মনে হচ্ছিল।

‘কোথায় গেছেন?’ ফেলুদা জিজ্ঞাস করল।

‘সারনাথ। আজও কিছু আশীর্বাদজন এসেছেন বাইরে থেকে। দপ্তরে খাওয়া-দাওয়া সেজে দুটো গাড়ি বোকাই করে বোঝিয়েছেন সব, ফিরতে সম্ভব হবে।’

‘রুকুও গেছে?’

‘না। রুকুর সারনাথ দেখা হয়ে গেছে। ও গেছে টারজান দেখতে ওর এক মামার সঙ্গে।’

আসবার সময় রাস্তার দেয়ালে বিজ্ঞাপন দেখেছি বটে। সেই আদিকালের ছবি—আমার জন্মের আগে, ফেলুদার জন্মের আগে, এমন কি লালমোহন-বাবুর জন্মের আগে—টারজান দি এপ ম্যান।

‘আমায় ঘরে এসে বসবেন একটু?’ বিকাশবাবু প্রশ্ন করলেন।

ফেলুদা বলল, ‘আগে একবার ছাতে যাব—যদি সম্ভব হয়।’

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ—আপনার জন্য এ বাড়ির সব দরজা খোলা।’

সামনের দরজা দিয়ে ঢুকেই চণ্ডীপাঠের আওয়াজ পেলাম। সেটা পুজোমন্ডপ থেকে আসছে জানি, কিন্তু এত জোরে আওয়াজ ত কাল পাইনি। জান দিকে চাইতেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। সিঁড়ির পিছনের দরজাটা আঁক খোলা, আর সেটা দিয়ে শিশি পুজোর জায়গাটা দেখা যাচ্ছে। আমরা চার জনেই দরজাটার দিকে এগিয়ে গেলাম। দূর থেকেই দেখা যাচ্ছে শশীবাবু এক মনে তুলি চালিয়ে যাচ্ছেন।

‘কালই ত শশীবাবুর কাজ শেষ’, বলল ফেলুদা।

‘হ্যাঁ’ বললেন বিকাশবাবু, ‘ভদ্রলোকের জ্বর এখনো সম্পূর্ণ সারেনি, তাও এক নাগাড়ে তুলি চালিয়ে যাচ্ছেন।’

ছাত দেখা মানে যে আসলে রুকুর ঘর দেখা সেটা আগেই আন্দাজ করেছিলাম। সেদিন সকালে এ ঘরে রোদ ছিল না, আজ পশ্চিমের জানালা দিয়ে ঝলমলে রোদ এসে চারিদিকের ছড়ানো জিনিসের উপর পড়েছে।

আমি ভেবেছিলাম আজ যখন রুকু নেই তখন ফেলুদা হয়ত তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান চালাবে, কিন্তু তার পরেই মনে হল মগনলালের হুমকির কথা। বেশিক্ষণ শংকরী-নিবাসে থাকাটাই ফেলুদার পক্ষে বিপজ্জনক। তাছাড়া বেশি অনুসন্ধানের দরকার হল না, কারণ ফেলুদা যেটা খুঁজছিল সেটা ঘরে ঢুকেই পেয়ে গেল।

আজই বিকেলে সন্ধ্যের ফাঁসে বন্দী হতে দেখেছি এই লাল-সাদা পেটকাটিটাকে। মেঝের উপর লাটাই-চাপা অবস্থায় পড়ে আছে ঘুড়িটা; সেটার উপর যে উৎপাত হয়েছে সেটা দেখলেই বোকা যায়; কাল আর ও ঘুড়ি

আকাশে উড়বে না।

ফেলুদা লাটাইটা তুলতেই একটা জিনিস চোখে পড়ল।

ঘুড়ির সাদা অংশটাতে নীল পেনসিল দিয়ে হিন্দি অক্ষরে কী যেন লেখা রয়েছে। দুটো জায়গায় আলাদা করে লেখা।

কাছ থেকে পড়ে বসতে পারলাম ভাষাটা বাংলা। বোধহয় সুরব বাংলা পড়তে পারে না বলেই বুকুকে এটা করতে হয়েছে।

একটা লেখা হল এই—

‘আমি বন্দী। সব ঠিক আছে হা হা। আবার বিকেলে। ইতি ক্যাপ্টেন স্পার্ক।’

অন্যটা হল—

‘টারজন দেখতে ঝাম্ছি। আবার কাল সকালে। ইতি ক্যাপ্টেন স্পার্ক।’

‘বাপরে বাপ!’ বলে উঠলেন লাগিমোহনবাবু। ‘কোন জগতে বাস করে মশাই এ ছেলে?’

ফেলুদা ঘুড়িটাকে আবার ঠিক মতইভাবে ছিল সেইভাবে রেখে বলল, ‘সহস্য রোমাণ্ড সিরিজের জগৎ। শিশুমনের উপর আপনাদের বইয়ের কী প্রভাব তার স্পষ্ট নিদর্শন এটা।’

আমরা বুকুর ঘর থেকে নিচে ফিরে এলাম। বিকাশবাবু চায়ের কথা আগেই বলে দিয়েছিলেন, তার ঘরে গিয়ে বসতেই ভরস্বাক্ষর ট্রে নিয়ে ঢুকল।

ঘরটা বেশ বড়। একদিকে খাট, অন্যদিকে একটা কাজের টেবিলের সামনে একটা চেয়ার। এ ছাড়াও বসবার জন্য একটা সোফা রয়েছে। ফেলুদা টেবিলের সামনের চেয়ারটায় বসল, আমরা দু’জন সোফাতে, আর বিকাশবাবু খাটে। পাশের বৈঠকখানার ঘড়িতে মোলায়েম সূরে ৫২ ৫২ করে চারটে বাজল; শুনলেই বোঝা যায় জাত ঘড়ি।

‘মিস্টার ঘোষালের কোমিকালের ব্যবসা কিরকম চলে?’ ফেলুদা প্রশ্ন করল।

‘ভালোই ত।’ বিকাশবাবু যদি প্রশ্নটা শুনে অবাক হয়ে থাকেন ত সেটা তার রুথায় কিছুর বোঝা গেল না—‘অবিশ্যি মাঝে-মধ্যে যে স্ট্রাইক ইত্যাদি হয় না তা নয়। তা সে কোন ব্যবসায় হয় না বলুন!’

‘হুঁ...’

ফেলুদা হঠাৎ হাতের কাপটা রেখে উঠে পড়ে বলল, ‘একবার বৈঠকখানাটা দেখতে পারি?’

‘নিশ্চয়ই।’

আমরা চারজনই চা খাওয়া বন্ধ রেখে বৈঠকখানায় গিয়ে হাজির হলাম। বিকাশবাবুর ঘর থেকে বৈঠকখানায় বাবার কোনো দরজা নেই; যেতে হলো

আগে একটা বারান্দা পড়ে।

‘সেদিন মগনলাল আর উমানাথবাবু কোথায় বসেছিলেন সেটা জানতে পারি?’

বিকাশবাবু দুটো মৃদুমুখী লোফা দেখিয়ে দিলেন।

‘ওদিকে কি ঘর? না আরেকটা বারান্দা?’

আমরা যে বারান্দা দিয়ে ঢুকলাম সেটা পূর্ব দিকে; ফেলুদা দক্ষিণ দিকের দুটো; পর্দা দেওয়া দরজার দিকে দৌঁখিয়ে প্রশ্নটা করল।

‘ওদিকে দুটো দরজার পিছনে দুটো ঘর। একটা বড় কভার্ড আর্গিস ঘর ছিল; অন্যটায় মেকেলরা অপেক্ষা করত।’

আমরা দুটো ঘরের ভিতরেই ঢুকে মিনিটখানেক করে থেকে আবার বিকাশবাবুর ঘরে ফিরে এলাম। এবার ফেলুদা জিগোস করল, ‘গণেশটা কি কলকাতায় থাকত, না এখানে?’

‘এখানে’, বিকাশবাবু বললেন, ‘এটা যাওয়ার মিস্টার ঘোষালের যত না কষ্ট হয়েছে, তার চেয়ে ঢের বেশি কষ্ট হয়েছে ঠর বাবার। ঠর মন ভালো করার জন্যই মিস্টার ঘোষাল এতটা ইয়ে হয়ে পড়েছেন।’

ফেলুদা ইতিমধ্যে বিকাশবাবুর টেবিলের উপর থেকে ট্রানজিস্টারটা হাতে তুলে নিয়েছে। প্রাকারি সাইজের মার্কি রেডিও, চামড়ার খোলস দিয়ে ঢাকা। ফেলুদা নবটা ঘরে ঘোরাতে সুইচের কোনো আওয়াজ হল না। তারপর সেটা উল্টো দিকে ঘোরাতে খট করে একটা শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফেলুদার ডুর্, কুচকে গেল।

‘একি, আপনার রেডিও ত খোলা ছিল।’

‘তাই—তাই বুঝি?’

বিকাশবাবুর চেহারাটা বে ঠিক কি রকম হোল সেটা আমার পক্ষে লিখে বোঝান ভীষণ শক্ত। শব্দে এটা পরিষ্কার মনে আছে যে বিকাশবাবু খাটের ডান্ডাটায় হেলান দিতে যাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় সুইচের আওয়াজটা হওয়া মাত্র পিঠ সোজা হয়ে গিয়ে হেলান দেওয়া বন্ধ হয়ে গেল।

এদিকে ফেলুদা রেডিওর পিছনে ব্যাটারির খোপের দরজাটা খুলে ফেলেছে। আড়চোখে দেখলাম বিকাশবাবু একটা চোক গিললেন। তিনটে ব্যাটারি রেডিওটার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল।

‘আপনার ব্যাটারি ত লীক করেছে’, ফেলুদা বলল, ‘বিশ কিছদিন হল এর আর ফুরিয়েছে বলে মনে হচ্ছে।’

বিকাশবাবু চুপ।

‘রেডিও আপনি শোনেন নিশ্চয়ই, কিন্তু গত বেশ কদিন আর শোনা হয়নি। কেন বলেন ত?’

কোনো উত্তর নেই।

‘আপনি যদি কিছু না বলেন, তাহলে আমাকেই বলতে দিন।’ ফেল্দুদার গলায় আমার খুব চেনা একটা খারালো সুর শুনতে পাচ্ছি।—‘সেদিন মগনলালের কথা শোনার সৌভ আপনি সামলাতে পারেননি, তাই না? রেডিও কামিয়ে দিয়ে আপনি নিঃশব্দে চলে গিয়েছিলেন ওই দক্ষিণের বাতাসে। পরজার পাশে আড়ালে দাঁড়িয়ে আপনি বৈঠকখানার কথাবার্তা শুনছিলেন। আপনি জানতেন মগনলাল মিস্টার ঘোষালকে শাসিয়ে গেছেন। আপনি জানতেন মগনলাল মিস্টার ঘোষালকে চিশ হাজার টাকা অফার করেছেন গণেশটার জন্য। তাই না কি?’

বিকাশবাবুর মাথা হেঁট হয়ে গেছে। সেই অবস্থাতেই তিনি মাথা নেড়ে ‘হ্যাঁ’ বললেন।

‘এবার আরেকটা প্রশ্নের ঠিক-ঠিক জবাব দিন ত’—ফেল্দুদা ব্যাটারিগুলো টেবিলের নিচে ওয়েস্টে পেপার বাস্কেটে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। ‘সেদিন অম্বিকাবাবুর ঘরের সিন্দুক থেকে গণেশ ছুরি যায়—অর্থাৎ পনেরই অক্টোবর—সেদিন আপনি সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা থেকে সাড়ে আটটা পর্যন্ত কী করছিলেন? আপনি রেডিও শোনেননি, কারণ রেডিও তার পাঁচ দিন আগেই—’

‘বলছি, বলছি—আমাকে বলতে দিন।’—বিকাশবাবু যেন মরিয়া হয়ে বলে উঠলেন। ফেল্দুদা কথা বন্ধ করে বিকাশবাবুর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বিকাশবাবু ধম নিয়ে যেন বেশ কয়েকটা তার কথাগুলো বলতে শুরু করলেন—

‘সেদিন মগনলালের হুমকি শোনার পর থেকেই আমার মনে ভীষণ একটা উৎকণ্ঠার ভাব ছিল। রোজই মনে হচ্ছিল একবার সিন্দুক খুলে দেখি গণেশটা আছে কিনা। কিন্তু সে সন্ধ্যোগ প্রথম এল সেদিন মিস্টার ঘোষাল মহলিখাবাবুকে দেখাতে গেলেন। তাঁনি যাবার দশ মিনিটের মধ্যেই আমি অম্বিকাবাবুর ঘরে ঘাই। দেয়াল থেকে চাবি বার করি, করে সিন্দুক খুলি।’

‘তারপর?’

ফেল্দুদাকে প্রশ্নটা করতেই হল, কারণ বিকাশবাবুর কথা শুনে গিয়েছিল।

‘সিন্দুক খুলে কী দেখলেন আপনি?’ ফেল্দুদা আবার প্রশ্ন করল।

বিকাশবাবু ফ্যাকাশে মুখ করে ফেল্দুদার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘দেখলাম—গণেশ নেই।’

‘গণেশ নেই?’ অবিশ্বাসে ফেল্দুদার ভুরু ভীষণভাবে কুঁচকে গেছে।

বিকাশবাবু বললেন, ‘আমি জানি আপনি আমার কথা বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু আমি শপথ করে বলছি যে সেদিন আমি সিন্দুক খোলার আগেই গণেশ ছুরি হয়ে গিয়েছিল। আমি যে কেন একথাটা এতদিন আপনাকে বলিনি সেটার কারণ আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন মিস্টার মিস্ত্রি। সত্যি বলতে কি,

আমি যে কী অদ্ভুত মানসিক অবস্থার মধ্যে রওঁছি সেটা আপনাকে বলে
বোঝাতে পারব না।

ফেলুদা আবার চায়ের কাপটা তুলে নিচ্ছে।

‘ও সিদ্ধকটা কি এমনিতে প্রায়ই খোলা হয়?’ ফেলুদা প্রশ্ন করল।

‘একবারেই হয় না। আমি কতদূর জানি, এবার উমানাথবাবু আমার পুরের
দিনই একবার খোলা হয়েছিল—কিছু পুরোন দলিল নিয়ে বাপ আর ছেলের
মধ্যে আলোচনা ছিল। এ ছাড়া খুব সম্ভবত আর একদিনও খোলা হয়নি।’

ফেলুদা চুপ করে বসে আছে। বিকাশবাবুর অবস্থা খুবই শোচনীয় বলে
মনে হচ্ছে। প্রায় দু’মিনিট এইভাবে থাকার পর উল্লোক আর না পেরে বললেন,
‘আপনি কি আমার কথা বিশ্বাস করলেন না মিস্টার মিস্টার?’

ফেলুদার গলার স্বর এবার রীতিমত রুদ্ধ।

‘আই আম্ম সরি মিস্টার সিংহ—কিন্তু যারা প্রথমবারেই সত্যি কথাটা
বলেন না, তাঁদের উপর থেকে সম্ভেদটা সহজে মূছে ফেলা যায় না।’



তাঁটি

পরদিন সকালে উঠে দেখি আকাশ মেঘে ছেয়ে আছে। টিপ টিপ করে বৃষ্টিও পড়ছে, আর রাস্তার অবস্থা দেখলে বোঝা যায় যে সারারাত এই ভাবেই বৃষ্টি পড়েছে। আমি সাড়ে ছটয়া উঠেছি। লালমোহনবাব, তখনও বিছানায় শুয়ে গড়িমসি করছেন। চার নম্বর ঘাটে খালি, কারণ সেই মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ কালকেই চলে গেছেন। ফেলুদা যে কখন উঠেছে জানি না। প্রথমে ভেবেছিলাম যে ও বেরিয়ে গেছে, তারপর বারান্দার বেরিয়ে দেখি ও এক কোণে রেলিং-এর উপর পা তুলে চেয়ারে বসে স্নোটবকের পাতা ওলটাচ্ছে। পায়ের পাতাটা যে বৃষ্টিতে ভিজছে সেদিকে ওর খেয়ালই নেই। ওর পাশে তেপায়া টেবিলের উপর একটা খালি চায়ের কাপ, চারমিনারের খোলা প্যাকেট, আর একটা ছোট পাথরের বাটি—যেটাকে ও অ্যাশ-ট্রে হিসেবে ব্যবহার করছে। বৃষ্টির দিনেও যে ঘাটে ধাবার লোকের অভাব হয় না সেটা রাস্তার দিকে চাইলেই বোঝা যায়। আর শব্দেরও কোনো কর্মতি নেই। অবিশ্যি এটা আমি জানি যে এ ধরনের গোলমালে ফেলুদার চিন্তার কোনো ব্যাঘাত হয় না। একবার ওকে জিজ্ঞাস্য করাতে ও বলোঁছিল, 'চিন্তা যদি গভীর হয় তাহলে আশেপাশের গোলমাল তার তলা অবধি পৌঁছতে পারে না। কাজেই, তুই যেটাকে ডিসটর্বেন্স ভাবিস, সেটা আমার কাছে আসলে ডিসটর্বেন্স নয়।'

লালমোহনবাব পৌনে সাতটায় বিছানা ছেড়ে উঠে বললেন, 'যখন দেখলাম আমার সর্বস্বের ছোরা বিধে রয়েছে, আর আমি সেইভাবেই রহসা-রোমাঞ্চ সিরিজের অ্যাপিসে লেখার শ্রুফ আনতে গিয়েছি, আর পাবলিশার হেমবাব বলছেন--আপনার ছদ্মনামটা চেন্ন কর জটায়ু থেকে সজারু করে দিন--দেখাবন বইয়ের কটতি বেড়ে গেছে।'

আমরা দুজনে যখন হুটুখ ধুয়ে চা খাচ্ছি, তখন ফেলুদা বারান্দা থেকে ধরে এসে বলল, 'লালমোহনবাব, আপনার কোনো বইয়েতে ঘুড়ির সাহায্যে মেসেজ পাঠানোর কোনো ঘটনা আছে?'

লালমোহনবাব আক্ষেপের সঙ্গে মাথা নেড়ে বললেন, 'না মশাই, থাকলে ও ঘুড়িই হতুম। ওটা যন্দুর মনে পড়ে নিশাচরের একটা বই থেকে নেওয়া। বোধহয় "মানুষের রক্তমাংস"।'

‘নিশাচর কে?’

‘ওটা কিতাব চাকলাদারের ছদ্মনাম। রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজেরই আরেকজন লেখক। বলছি না—আপনাদের রুকুসবাজী ওই সিরিজ একেবারে গুলে খেয়েছে।’

‘আপসোস হচ্ছে! ফেলুদা খাটে বসে বলল—‘এতটা ভুল-ভালিলা করা উচিত ছিল না আপনাদের ওই সিরিজটাকে। ইয়ে—এক থেকে দশের মধ্যে একটা নম্বর বলুন ত।’

‘সাত।’

‘হু...। শতকরা সত্তর ভাগ লোক ওই নম্বরটা খাবে।’

‘তাই যদি?’

‘আর এক থেকে পাঁচের মধ্যে জিগোস করলে কলবে তিন, আর ফুল জিগোস করলে গোলাপ।’

সাড়ে আটটার সময় হোটেলের চাকর হরাকিবণ এসে খবর দিল ফেলুদার ফোন এসেছে। শব্দে বেশ অবাক হলাম। কে ফোন করছে এই সকালবেলা? একবার ভাবলাম ফেলুদার সাথে বাই নিচে, কিন্তু এক দিকের কথা শব্দে বিশেষ কিছু বোঝা যাবে না বলে দৈর্ঘ্য ধরেই বসে রইলাম। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফেলুদা ফিরে এসে বলল, ‘তেওয়ারি ফোন করেছিল। প্রয়াগ বা ইন্দিয়ারে গন্ত কয়েক মাসের মধ্যে কোনো নামকরা নতুন বাবাজীর আবির্ভাব ঘটেনি। নো মর্ছলিবাবা, নাথিং।’

‘বোঝো! ইনি তাহলে ফোর-টুয়েন্টি?’ বললেন লালমোহনবাবু।

‘সেরকম ত অনেক বাবাজীই, লালমোহনবাবু; কাজেই তার জন্য এ’কে আলাদা করে ভব’না করার কিছু নেই। এই প্রভারণার পিছনে আর কোনো গুপ্ত সিনস্টার অভিসন্ধি লুকিয়ে আছে কিনা সেইটেই হচ্ছে প্রশ্ন।’

‘আপনি কি জোড়া-তদন্তে জড়িয়ে পড়ছেন নাকি মশাই?’

‘জোড়া কথাটার গুটো মানে হয় জানেন ত? জোড়া মানে ডবল আকার জোড়া মানে যুগ্ম। এক্ষেত্রে জোড়া মানে যে কী সেটা এখনো ঠিক জানি না।’

‘তেওয়ারি আর কিছু বললেন না?’—আমি জিগোস না করে পারলাম না। ফেলুদা প্রায় চার মিনিটের মতো টেলিফোনে কথা বলেছে, কিন্তু আমাদের এসে যেটা বলল তাতে এক মিনিটের বেশি লাগার কথা না।

ফেলুদা চিত হয়ে বিছানায় শব্দে পড়ে বলল, ‘রায়বেরিলির জেল থেকে হস্তা তিনেক আগে এক জালিয়াত পালিয়েছে। এখনো নিখোঁজ। চেহারার বর্ণনা মর্ছলিবাবার সঙ্গে খানিকটা মিলে, যদিও দাড়ি-গোফ নেই, আর এতটা কালো না।’

‘তা সে ত মশাই মেক-আপের ব্যাপার’, বললেন লালমোহনবাবু, ‘একবার

দিনের বেলা কাছ থেকে ভালো করে দেখে এলে হয় না? ঘাটে গিয়ে বসে থাকলেও তা হয়। বাবা ঘাটে যান নিশ্চয়ই।’

‘সে গুড়ে বাসি। শব্দ সন্ধ্যায় দর্শন দেন, ব্যক্তি সময়টা দরজা বন্ধ করে নিজের ঘরে বসে থাকেন। সেখানে অভয় চক্কোতি ছাড়া আর কারো প্রবেশ নেই। বাওয়া-দাওয়া সব এই একই ঘরে—আর নাওয়াটা মাইনাস।’

আমরা দুজনেই অবাক। বাবাজী স্নান করেন না?

‘এসব তেওয়ারি বললেন?’—লালমোহনবাবু প্রশ্ন করলেন।

‘এত কথা হল তোমার সঙ্গে?’—আমি জুড়ে দিলাম।

ফেলুদা আমার দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে তিনবার মাথা নেড়ে বলল, ‘পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষায় ফেল। তুই বারান্দার গেট আর লক্কাকরলি না যে আমার ভিক্তে পাঞ্জাবি আর পায়জামা দড়িতে কলছে? ঘরে বসে কাপড় ভেঙ্গে শূনেছিস কখনো?’

আমি চুন মুখে চুপ ঘেরে গেলাম।

ফেলুদা এবার যা বলল তা এই—ও চারটেই উঠে সাড়ে চারটের আগে ক্রেদার ঘাটে পেঁচে অভয় চক্কোতির জন্য অপেক্ষা করে শেষটায় তার দেখা পেয়ে তার সঙ্গে আলাপ করে।—‘একবারে মাটির মানুষ। না, মাটি ভুল হল; মোমের মানুষ। গলেই আছেন। আমাকেও গলার অভিনয় করতে হল। বুদ্ধো মানুষের সঙ্গে ছল করতে ভালো লাগছিল না, কিন্তু এসব ব্যাপারে গোয়েন্দার কিছুটা নিয়ম না হলে চলে না। ঠিক আছেই বাবাজীর হ্যাঁকিটস জানলাম। স্নান করেন না শূনে বোধহয় অজান্তে আমার নাকটা সিঁটকে গেস্‌ল, তাতে বললেন—“মলে বখন মরলা নেই, তখন দশটা দিন গারে জল না ছোঁয়ালে ক্ষতি কী বাবা? জলেরই ত মানুষ, জল থেকেই ত উঠেছেন, আবার জলেই ত ফিরে যাবেন।”—গায়ের আঁশটে গন্ধ কিনা সেটা আর জিগোস করলাম না। একটি চেঙ্গা নাকি রোজ সকালে আসে একবার করে—মাছের অঁশি দিয়ে যায়, যেগুলো সন্ধ্যাবেলা বিলি হয়। অভয়বাবু ঘাট থেকে চলে যাবার পরও আমি কিছুক্ষণ ছিলাম। এক পাণ্ডা ওখানে ছাতার তলায় বসে, নামে লোকনাথ। সেদিনের ঘটনাটা দেখেছিল, যদিও গোড়ার দিকটা মিস্‌ করেছে। সে যখন এসেছে তখন বাবাজীর স্নান হয়েছে। পাণ্ডাকে দেখে তার নাম ধরে ডেকে অনেক কিছু বলেছে। বাবাজী যদি ফোর-টুয়েন্টি হয়েও থাকেন, ঠিক যে একটি তুখোড় ম্যানেজার রয়েছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।’

‘তিনি অভয় চক্কোতি নন?’

লালমোহনবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

‘না। অভয় চক্কোতি মশাই নিখাদ সঙ্কলন যান্ত্রিক। ঠিক মনে সংশয় ঢোকানর চেষ্টা করেছিলাম। বললাম—প্রশ্ন থেকে সত্যিই কাশী আসাটা প্রশ্ন অবিশ্বাস্য।’

নয় কি?—তাতে বললেন, “সাধনার কী না হয় বাবা।”—এদের বিশ্বাসের ক্ষোভেই ত এই ঐশ্বরিক যুগেও কাশী আজও কাশী। দেখবে চাঁদের মাটির নিচে মানুষের বসবাসের ব্যবস্থা হয়ে গেলেও কাশী কাশীই থেকে যাবে।’

সাড়ে চারটে নাগাত বৃষ্টি থেমে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। পাঁচটার সময় আমরা তিনজন হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লাম। আজকে ফেলুদা পুরোনো টুরিস্ট, কারণ তার কাঁধে ক্যামেরা ঝুলছে। এই দুদিন এটা ওর সন্টেকেসেই বন্ধ ছিল। ফেলুদা আর লালমোহনবাবু, দুজনেরই ইচ্ছে আজ কচোরি গলিতে হনুমান হালুইকরের দোকানে গিয়ে রাবাড়ি খাবে। আমারও যে ইচ্ছে সেটা বোধহয় না বললেও চলবে।

বিশ্বনাথের পাশেই কচোরি গলি। এত বছর পরেও তার চেনা দোকানটা খুঁজে সন্ধান করতে ফেলুদার কোনো অসুবিধা হল না। দোকানের সামনে বেশি পাতা রয়েছে, তাতে বসে মাটির ভাড়ি থেকে রাবাড়ি খেতে খেতে লালমোহনবাবু সব্ব বলছেন ‘রাবাড়ির আবিষ্কারটা টেলিফোন-টেলিগ্রাফ আবিষ্কারের চেয়ে কিসে কম মহান?’—এমন সময় কালকের সেই লোকটাকে দেখলাম বিশ-ত্রিশ হাত দূরে একটা দোকানের পাশে আমাদের দিকে শিঁঠ করে দাঁড়িয়ে আরেকজন লোকের সঙ্গে কথা বলছে। মগনলালের ব্যাপারটা মাঝে মাঝে মন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করি, ফেলুদা ওর কথা না মেনে একটা বেচাল চাললে কী সাংঘাতিক ব্যাপার হতে পারে সেটাও না-ভাবার চেষ্টা করি, কিন্তু ওই কোলা গোর্খওয়াল লোকটা আবার সব মনে করিয়ে দিচ্ছে। মাই হোক, রাবাড়িটা এত বেশি ভালো যে মগনলালের চেহারাটা মনে পড়া সত্ত্বেও মুখের স্বাদ নষ্ট হল না।

ফেলুদা বা মনের অবস্থা তাতে ও যে খুব বেশিক্ষণ এই ঘিঁজি গলিতে থাকতে পারবে না সেটা আমি আগেই জানতাম। কচোরি গলি থেকে বেরিয়ে মদনপুরা রোড ধরে গোখরুলিয়ার মোড় ছাড়িয়ে আমরা বাঙালী-টোলার দিকে হাঁটতে আরম্ভ করলাম। দুদিন ধরেই এদিকের রাস্তাগুলো বেশ চেনা হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে হাঁটিছি, ফেলুদা এদিক ওদিক দেখছে, দু-একবার ক্যামেরার শাটারের শব্দও পেয়েছি। আমি মাঝে মাঝে শিঁহন ফিরে দেখছি সেই লোকটা এখনো আমাদের ফলো করছে কিনা; কিন্তু বড় রাস্তা পড়ে অবধি তার আর কোনো পাতা পাইনি। শেষটার ফেলুদাকে বাধ্য হয়েই বলতে হয়, ‘তোমার কি ধারণা মগনলাল আমাদের উপর নজর রাখার জন্য মাত্র একটি লোক অ্যাপয়েন্ট করেছে?’

এর পর আমি আর পিছনে তাকাইনি।

ওই যে সেই অ্যালুমিনিয়ামের বাসনের দোকান। ওর পরের বাঁ দিকের

মোড়টা নিতে হয় অন্তর চরিত্রবর্তী'র বাড়ি যাবার জন্য।

'মিস্টার মিস্তির! প্রদোষবাদ।'

পিছন থেকে ডাক। তিনজনেই থামলোয়। গলাটো অচেনা। দুটি ডব্ললোক, হয়েস বোশ না—একজনের চোখে চশমা, মুখে হাসি। ইনিই বোধহয় ডেকেছিলেন।

'আপনার হোটেলে গিয়েছিলাম খোঁজ করতে', ডব্ললোক বললেন।

'কী ব্যাপার?' ফেলুদা জিগোস করল।

'আমরা বেঙ্গলী ক্লাবের তরফ থেকে আসছি। আমার নাম সঞ্জয় রায়—ইনি গোকুল চ্যাটার্জি। ইয়ে—আপনাকে কিন্তু আসতে হবে। মানে আপনাদের তিনজনকেই। আমাদের ক্লাবে থিয়েটার আছে—পরশু—সন্তমীর দিন।'

'কাবুলিওয়াল্লা?'

'আপনি জানেন?' ডব্ললোক দুজনই অবাক এবং খুশি।

'আপনারা মিস্টার বোখালকে নৈমন্তিক করতে গেলেন না?'

'ওরে বাক্য—আপনি দেখছি সবই জানেন, হেঃ হেঃ!'

'উনি ত জানবেনই', অন্য ডব্ললোকটি সর্দি হওয়া গলায় হেসে বললেন। গোয়েন্দা হিসাবে ফেলুদার খ্যাতি বেঙ্গলী ক্লাবে পৌঁছে গেছে।

'আপনাদের কার্ডটা নিরঞ্জনবাবুর কাছে রেখে এসেছি। যাবেন কাইন্ডলি। আমরা সবাই কিন্তু এক্সপেক্ট করে থাকব।'

'বেশ ত, অন্য কোনো জরুরী ব্যাপারে জড়িয়ে না পড়লে নিশ্চয়ই যাব।'

'জড়িয়ে মানে আপনি কি এখানেও কোন—?'

সঞ্জয় রায় আর গোকুল চ্যাটার্জির মাথা একসঙ্গে সামনের দিকে ক'কে এল। ফেলুদা এরকম অবস্থায় পড়লে একটা হাসি ব্যবহার করে যেটার তিনবক্য মানে হয়—হ্যাঁ, না, আর হতেও পারে। এখানেও তাই করল। হাসির মানেটা না বুঝলে বোকা হতে হয়, তাই সঞ্জয় রায় আর গোকুল চ্যাটার্জি দুজনেই 'বুড়ে ফেলোছি' ভাবের একটা হাসি হেসে আবার কাবুলিওয়াল্লা দেখতে যাবার অনুরোধ জানিয়ে চলে গেলেন।

রাস্তা আর দোকানের বাতি সব জ্বলে গিয়েছে, আকাশের রং রঙের রু থেকে পার্ম্যানেন্ট রু ব্র্যাকের দিকে যাচ্ছে, কীর্তি'রাম ছোট্টরামের পানের দোকানে এই মাত্র ট্রান্সমিস্টার খোলাতে লতা মঙ্গেশকর সাইকেল রিকশার পার্ক-পার্কানির মধ্যে পাল্লা দিতে শুরু করেছে, এমন সময় ফেলুদা অ্যানাউন্স করল যে তার ভক্তির জেগেছে, একবার মহালিবার দর্শন না পেলেই নয়।

টেলিফোনে লেন্সে থ্রি পয়েন্ট ফাইভে হাফ সেকেন্ড একস্পোজার দিয়ে ফেলুদা ডব্লদের পিছনে দাঁড়িয়ে আমার কাঁধে ক্যামেরা রেখে 'স্ট্যাচু' হয়ে

থাক' বলে মহলিবারে একটা ছবি তুলল। আর ভয়ের ভীড় সেদিনের চেয়েও বেশি—বোধহয় বাবাকী পাঁচদিন পরে চলে যাচ্ছেন বলে। মগনলানকে দেখলাম না। হয়ত এখনো আসেন নি—কিন্তু রোজ আসেন না। আনন্দ মিনিট কয়েক থেকে আবার বেরিয়ে পড়লাম।

জল পিকে মোড় নিয়ে একটা নতুন গলিতে এসে সামনে একটা কালো গরুকে রাস্তা ব্লকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে লালমোহনবাবু একটা ছোট কান্না কেনে দেখে গেলেন।

'কী হল?' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

'ওটার হাইটে কত হবে কান্না তা'

'কেন?'

'এক্সিন্সাম ইন্সটিটিউশনে হাইজাম্পের রেকর্ড' ছিল মশাই আমার। ডানপা একবার ভেঙে হয়ে বাঁ হাঁটুটা...'

'আসুন আমার সঙ্গে।'

ফেলুদা এগিয়ে গিয়ে গরুটার পালকায় দু'তিনটে অলতো চাপক দিতেই সেটা খুটে খুটে লম্বা করে একপাশে সরে গেল, আর আমরাও তিনজনে দাঁড়া পাশ কাটিকে বেরিয়ে গেলাম।

'কোথায় যাচ্ছি মশাই আমরা?'—অরো মিনিটে পাঁচক অলিখালিতে হঠাৎ পল লালমোহনবাবু প্রশ্নটা করলেন।

'জানি না।'

আমি আর লালমোহনবাবু শব্দপত্রের দিকে চাইলাম। সব সময় যে চাইলেই এ-ওর মধ্য দেখতে পাচ্ছি তা নয়, কিন্তু ঠিক এই সময়টোতে একটা রাস্তার আলো মাথার উপর এসে পড়ল লালমোহনবাবুর ভাবাচাকা খাকী খুঁতে অসুবিধা হল না।

'উদ্দেশ্যহীন ভাবে হাঁটলেও অনেক সময় মাথা খেলেন, কাল ফেলুদা, এখানে মাথা খোলচোই উদ্দেশ্য।'

'খুঁজে কী?'

একটা ইন্দুর যদি ফলস্বরূপ হত যেত তাহলে বোধহয় লালমোহনবাবুর প্রশ্নটা এই ভাবেই করত। ফেলুদা কী উত্তর দিত জানি না, কারণ ঠিক এই সময়ে একটা ঘটনা ঘটেছে আমাদের ঘনটা ওনা দিকে চলে গেল।

এতক্ষণ এ-মোড় ও-মোড় ধরে আমরা যে পলিটার পেটেরেছিলাম সেটা একটু বিশেষ রকম নিজস্ব। কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত অলপশব্দে বাড়িরদোর ভিতর থেকে মানুষের গলার দ্বব পেরোছি, বাচ্চের কান্নার শব্দ পেরোছি, ব্রেডিও থেকে সানের আওয়াজ পেরোছি। এবারের গলিটার দ্বব থেকে ভেসে আসা মাল্যের দ্ববটা ছাড়া আর কোনো শব্দই নেই। একটু এগোতে শোনা গেল

তার সঙ্গে আরেকটা শব্দও একটানা এক তালে হয়ে চলেছে—ধপ্ ধপ্ ধপ্ ধপ্ ধপ্ ধপ্...

মালমোহনবাবু আমাদের দৃষ্ণনের মাঝখানে হাঁটিছিলেন; শব্দটা শুনে দুদিকে হাত বাড়িয়ে আমাদের কোটের আশ্রিত হয়ে মৃদু টান দিয়ে হাঁটার স্পীড কমিয়ে দিলেন। তারপর ফিস্ ফিস্ করে বললেন, 'হাইলি সাস্পিশাস।'

ফেলুদা নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'এটা সাস্পিশাস কিছু না; পানের ভবক তৈরি হচ্ছে। সাস্পিশাস হচ্ছে ওইটে।'



এবার দেখলাম একটি লোককে আমাদের থেকে হাত পঁচাত্তর ধরে। সে একটা মোড় ঘুরে সবেমাত্র এ গলিটার ঢুকেছে।

লোকটা এগিয়ে এসে আমাদের দেখেই যেন থমকে দাঁড়িয়ে গেল। তার মুখে আলো পড়েনি, তাই এতদূর থেকে তার চেনা ধাবে না। রাস্তার

আলোটা তার পিছন দিকে। সেই আলো তার পিঠে পড়তে একটা প্রকাণ্ড লম্বা ছায়া সার। গলি জুড়ে প্রায় আমাদের পা অবধি পৌঁছে গেছে।

ছায়াটা অশ্রুতভাবে দুলাচ্ছে। লোকটা মাভাল নাকি?

ফেলুদা টেলিফোনটো সমেত ক্যামেরাটো চোখে লাগাল।

‘শশীবাবু।’

নামটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই ফেলুদা বিদ্যুৎবেগে দৌড়ে গেল সামনের দিকে। তিনজন প্রায় একসঙ্গেই গিয়ে পৌঁছলাম শশীবাবুর কাছে। ঠিকরে বেরিয়ে আসা চোখে চেয়ে আছেন শশীবাবু ফেলুদার দিকে, তার ঠোঁট পুটো ফাঁক দেখে মনে হয় তিনি কিছু বলতে চাইছেন।

‘কিছু বলবেন?’—ফেলুদা ঝুঁকে পড়ে চাপা গলায় জিজ্ঞাস করল।

‘হাঁ...হাঁ...’

‘কী হয়েছে শশীবাবু? কী বলতে চাইছেন আপনি?’

‘সিং...সিং...সিং।’

শশীবাবুর দেহটা সামনের দিকে এলিয়ে পড়ল।

তার পিঠে আলো পড়েছে।

সেই আলোতে দেখলাম শশীবাবুর পিঠে একটা ক্ষত থেকে রক্ত বেরিয়ে তার পাঞ্জাবির অনেকখানি ভিজিয়ে দিয়েছে।

নয়

‘গোয়েন্দাগিরি ছেড়ে দেব রে।’

ফেলুদা এ ধরনের কথা আগে কোনদিন বলেনি, কিন্তু এবার যে অবস্থায় পড়েছে, তাতে এটা বলা বোধহয় খুব অস্বাভাবিক নয়।

আজ সস্তমী। সেমিবার। এখন সকাল। শশীবাবু খুন হয়েছেন দুদিন আগে। আমরা সকালে চা রুটি ডিম খাওয়া সেরে আমাদের হোটেলের ধরে যে যার খাটে বসে আছি। একটুক্ষণ আগে তেওয়ারি ফোন করে জানিয়েছেন যে শশীবাবুর ছোট ছেলে নিতাইকে নাকি আরেস্ট করা হয়েছে। নিতাই খারাপ ছেলে এটা আগেই শুনছি। তার সঙ্গে নাকি বাপের অনবরত খিটিখিটি লাগত। শশীবাবু নাকি প্রায়ই ওকে পুলিসে ধরিয়ে দেবার ভয় দেখাতেন। তাই ছেলের পক্ষে শেষ পর্যন্ত বাপকে খুন করাটা অস্বাভাবিক নয়। নিতাই কিন্তু খুন স্বীকার করেনি। সে নাকি সেদিন সন্ধ্যাবেলা চৈতগঞ্জের একটা সিনেমায় হিন্দি ছবি দেখছিল। তার মাটির পকেটে টিকিটের আখানা পাওয়া গেছে। যে ছুরি দিয়ে শশীবাবুকে খুন করা হয়েছিল সেটা নাকি পাওয়া যায়নি।

মৃত্যুর দিন সন্ধ্যা ছটার মধ্যে শশীবাবু চকুদানের কাজ শেষ করে দেন। বিকাশবাবু পুলিসকে বলেছেন যে কাজটা শেষ করেই শশীবাবু বিকাশবাবুর কাছে যান হোমিওপ্যাথিক ওষুধ চাইতে, কারণ তার নাকি আবার নতুন করে জ্বর এসেছিল। বিকাশবাবু ওষুধ দেন, শশীবাবু তখনই ওষুধ খেয়ে বাড়ি যাবার জন্য বেরিয়ে যান। পথেই তাকে খুন করা হয়।

‘যাকে যাকে বোধহয় এ ধরনের একটা ধাক্কা খাওয়া ভালো।’—ফেলুদা এবার কথা বলছে। আমি জানি কথাটা ঠিক আমাদের উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে না। ফেলুদা যেটা করছে তাকে ইংরেজিতে বলে থিংকিং অ্যুলাউড।—‘বেশ লাগছে নিজেকে একটা নাধারণ নতনের মানুষ বলে মনে করতে।—লালমোহন-বাবু, আজ কাবুলিওয়ালার দেখতে যাকেন ত? এরা শুনেনি বৈশ ডালো অভিনয় করে।’

‘হ্যাঁ তা আপনি গেলে, মানে আপনি যদি...’

‘আর কাল যাব টারজন। পরশু জঙ্গীর; তরশু রফু চকর। আর

দুর্গাবাড়িতেও একবার দেখিবে আনন্দের আগনাদেয়। দেখবেন ওখানকার বদ্বির-
গুলো ফেল্‌ মিষ্টারের চেয়ে অনেক বেশি বদ্বিমান।

সত্যি সম্ভাব্যেই আমরা কাবুলিওয়ালা দেখতে বেশলী ভাবে হাজির
হলাম, আর সত্যিই দেখলাম ওরা বেশ ভাল আকর্ষণ করে।

পরদিন মহাশয়ী! সকালে ঠাকুর দেবতে বেরোন হল। ঘোষাল বাড়ি
জাড়াও আরো অন্য বাড়িতে পূজো হয়। গোটে পাঁচেক ঠাকুর দেখে আমরা
দুর্গাবাড়িতে গেলাম। লালমোহনবাবু মন্দিরের বাইরে রইলেন, কারণ বদ্বির
জিনিসটা নাকি ঠর বাঁচার বাইরে ভালো লাগে না। বললেন, 'বাসদেব, বদ্বি
—বাস্মানিদেব যে কেন জানোয়ারটাকে জাতে তুলেছেন তা আজ পর্যন্ত
বদ্বিতে পারলাম না। যারা লাঠির খোঁচা না খেলে মাচতে পারে না তারা করবে
সেতুবন্দন? ছোঃ!—আর আমার গল্পপোকে বলা হয় গাজাবদ্বি।'

দুর্গারে মিষ্টার ঘোষাল ঠুদের বাড়িতে থেতে বসেছিলেন; ফেল্‌দা
হোটেল থেকে ফোন করে বিকাশবাবুকে আপলজি জানিয়ে দিল। আমরা
হোটলেই থেলাম। ফেল্‌দা দুবেলাই হাঙের রুটি খায়। আজ হঠাৎ এক-
গাদা ভাত খেয়ে বিছানায় শুয়ে এক ঘুমে সাড়ে চারটে বাজিয়ে দিল। পরে
বুঝেছিলাম যে হাঙের আগে প্রকৃতির যে এতটা মাদামারা ডাব হয়, এ হল
তাই; কিন্তু ফেল্‌দাকে কখনো এরকম আকাজে আর কিম্বদা অবস্থায়
দেখিনি বলে এমনটা ভীষণ খারাপ লাগেছিল।

লালমোহনবাবু অবিশ্য ঠিক আকাজে ছিলেন না; তাঁর খাতায় তিনি
একটা গল্পের খসড়া আকাজ করে দিয়েছেন গতকাল থেকে। দু লাইন লিখছেন
আর সীলিং-এর দিকে চাইছেন। খালি একবার আমার দিকে ফিরে বললেন,
'মুন্সুতে কী অভ্যাসে হুন্স-উ নীর্-উ আসছে কলবে কাই-ভলি?'

শেষ পর্যন্ত টারজান সি এপ ম্যানও যাওয়া হল, কিন্তু ফেল্‌দার আর
পুরো ছবিটা লেখা হল না। পুরো কেন বলছি—মেটো-গোন্ডউইন মেটারের
নামের পর ছবির নামটা হবে পর্দায় পড়েছে, এমন সময় ফেল্‌দা দেখি সীট
ছেড়ে উঠে পড়েছে।

'তোপ্‌সে, তোরা থাক। আমার একটু কাজ আছে।'

কিছু কলার আগেই ফেল্‌দা হাওয়া।

আমরা মনের অবস্থা অসুস্থ। ছবিটাও ভালো লাগছে, ফেল্‌দার মধ্যে
হঠাৎ কেন জানি উৎসাহ জেগে উঠেছে, সেটাও ভালো লাগছে, অথচ ও যে
কিসের জন্য চলে গেল সেটা ভেবে পাচ্ছি না।

আটটার সময় ছবি শেষ হল; রিকশা নিয়ে হোটেল ফিরলাম মেটা
অটোটা। ঘরে এসে দেখি ফেল্‌দা বাটে বসে খাতা খুলে ভীষণ মনোযোগ
দিয়ে কি সব খেন হিসাব করছে। আমাদের দেখে বলল, 'তোরা খেয়ে নিস।

আমার জন্য এক পেরালা কফি পাঠিয়ে দিতে বলছি।”

‘তুমি খাবেই না?’

‘পেট ভরা। ভাতাড়া ডেওয়ারির কাছ থেকে একটা জরুরী টেলিফোন আসছে।’

আজ অষ্টমী বলে হোটেলে লুচি মাংস ছিল, রাগাও ডালো হয়েছিল, কিন্তু পাছে ডেওয়ারির ফোন আসার আগে খাওয়া শেষ না হয় তাই সব কিছু গোপ্যাসে গিলতে হল।

ফোনটা এল আমাদের খাওয়া শেষ হওয়ার প্রায় আধ ঘণ্টা পরে। এবার আমি ফেলদুদার কাছে না থেকে পারলাম না। ফেলদুদা বা বলল তা হচ্ছে এই—

‘বলুন মিস্টার ডেওয়ারি...হ্যাঁ, ভোরি গুড...না না, এখন কিছু করবেন না, একদম শেষ মূহুর্তে...হ্যাঁ, সেইজন্যই ত গোড়ায় এত গন্ডগোল লেগেছিল...হ্যাঁ—আর ইয়ে—ওই বাড়িটার খোঁজ করেছিলেন?...ভোরি গুড...ঠিক আছে, কাল দেখা হবে...গুড নাইট।’

লালমোহনবাবু আমায় সঙ্গে নিচে যাননি। সিনেমা থেকে ফেরার পথেই আমাকে বলছিলেন, ‘তোমার দাদার আজকের তিড়িবাঁজির ঠেলার আমার প্লটের খেই হারিয়ে গেছে; আবার নতুন করে সব সাজাতে হবে।’ ঘরে ফিরে এসে দেখি তিনি খাতা খুলে মূখ বেজার করে বসে আছেন। ফেলদুদা ফিরে এসে একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘরের মধ্যেই পানচারি শুরু করে দিল।

লালমোহনবাবু খাতা বন্ধ করে বললেন, ‘খুব খারাপ হচ্ছে এটা, জানেন ত? না পারছি আমার গল্প এগোতে, না পারছি আপনার কেসের সঙ্গে পাল্লা দিতে। এদিকেও একটু ছিটেফোটা ছাড়ুন। আমাদেরও ত ব্রেন বলে একটা জিনিস আছে। একটু খাটোবার সুযোগ দিন!’

‘কোনো আপত্তি নেই’, ফেলদুদা একটা ধোঁয়ার রিং ছেড়ে বলল, ‘আপনাকে পাঁচটা মৃত্যু দিচ্ছি, তা দিয়ে আপনি কত খুশি জন্ম বুনুন!’

‘মৃত্যু?’

‘আফ্রিকার রাজা, শশীবাবুর সিং, হাঙরের মূখ, এক থেকে দশ, আর মগনলালের বজরা!’

লালমোহনবাবু কিছুক্ষণ ফেলদুদার দিকে চেয়ে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ‘তার চেয়ে বললেই পারতেন চন্দ্রবিন্দুর চ, বেড়ালের ডালবাখ, আর রুমালের মা। সে বরং চের সহজ হত।’

‘কিন্তু একটা কথা আমাদের দিতে হবে আপনাদের’—ফেলদুদা হঠাৎ সিরিয়াস—‘কাল থেকে আর কোনো ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন করতে পারবেন না।’

‘একটা করেই বা জবাব শুন্য—আবার প্রশ্ন?’

ফেলুদা লালমোহনবাবুর মসিকতা অগ্রাহ্য করে বলে চলল, 'কাল থেকে
আমাকে হয়ত মাঝে মাঝে ধেরোতে হতে পারে, তবে আপনাদের সঙ্গে না।
আপনারা দু'জনে যেখানে খুশি যেতে পারেন; আমার মনে হয় না তাতে কোনো
বিস্ক আছে। যদি তেমন বুঝি তাহলে আগে থেকেই বাইরে যেতে বারণ করব।
...আর লালমোহনবাবু সত্যি জানেন ত?'

'সত্যি—?'

'জলে ঢোকে ভেসে থাকতে পারেন ত?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ—ফটিং-ফোরে হেঁদোতে—'

'ওতেই হবে।—অবিশিা সত্যিয়ার যে প্রয়োজন হবেই তা বলছি না।'

পরের দিন নবমী। সকালে তা খেয়ে আমি আর লালমোহনবাবু বেরিয়ে
পড়লাম। ফেলুদা বলল ও হোটেলেরই থাকবে, কারণ ফোন আসতে পারে।
লালমোহনবাবুর একা চড়ার শখ—এদিকে কাশীতে আজকাল ঘোড়ার গাড়ি
মানে বেশির ভাগ চাওয়া। অনেক খুঁজে শেষে একটা একা পাওয়া গেল।
সোনারপুরা রোড দিয়ে হিন্দু ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত গিয়ে দুর্গাবুড় রোড
দিয়ে ফেরার পথে মন্দির মসজিদ প্রাসাদ বা কিছ, পড়ে সব দেখে সাড়ে
এগারোটোর সময় আমরা হোটেলের ফিরে এসে দেখি ফেলুদা কালিশ বুকের
তলার রেখে খাটের ওপর শুয়ে খুব মন দিয়ে তার তোলা কয়েকটা ছবির
কোয়ার্টার সাইজ এনলার্জমেন্ট দেখছে। পরশু বেঙ্গলী ক্লাবে যাবার পথে ও
কিউন ফোটো শটেরসে ওর ফিল্মটা দিয়ে গিয়েছিল।

বিকেলের দিকে তেওয়ারির টেলিফোন এল; ফেলুদা মিনিট দু'জকের
মধ্যেই কথা শেষ করে উপরে চলে এল। বাড়িতে বলে থাকতে ভালো লাগছিল
না, তাই আমি আর লালমোহনবাবু মনিকর্ণিকার শ্মশান সেথে এসাম।
লালমোহনবাবু যাবার ও ফেরার পথে বার তিনেক বললেন, 'আজ আর কেউ
ফলো করছে বলে মনে হচ্ছে না।'

ফিরে এসে শুনলাম ফেলুদা হোটেলেরই ছিল। শকেরদী-নিবাস থেকে
বিকাশবাবু ফোন করেছিলেন; মিস্টার ঘোষাল জানতে চেয়েছেন ফেলুদা হাল
ছেড়ে দিয়েছে কিনা।

'তুমি কি বললে?' আমি জিজ্ঞাস করলাম।

... উত্তর এল, 'না।'

পরদিন ভোর ছটায় উঠে দেখি ফেলুদা নেই। বিছানা পরিপাটি করে চাদর
দিয়ে ঢাকা, তার উপর ছাই ফেলার সেই পাথরের বাটি, আর তার তলায় এক
টুকরো কাগজ। তাতে লেখা—'ফোন করব।'

তার মানে আমাদের হোটেলেরই অপেক্ষা করতে হবে। তাতে আপত্তি নেই,

কেবল ফেলুদা যেন নিরাপদে থাকে, খুব বেশি রকম বেশরোয়া কিছুর করে না বসে। ফেলুদা যদিও এ বিষয়ে কিছু বলেনি, কিন্তু আমার বিশ্বাস শশীবাবুকে মগনলালের লোক খুন করেছে। শশীবাবু নিশ্চয়ই ফেলুদার চেয়ে বড় শত্রু নয় মগনলালের। তাহলে ফেলুদাকেই বা—

আর ভাবব না। যা থাকে কপালে। কেবল মনে সাহস রাখতে হবে।

এ খাবার সময় লালমোহনবাবু বললেন, ‘মগনলাল সৌদিন গণেশের কথা যা বললেন, সেটা তোমার দাদা বিশ্বাস করে হাত পা গুটিয়ে নিলেই পারতেন।’

আমি বললাম, ‘গুটিয়ে ত নিয়েই ছিল; হঠাৎ সৌদিন সিনেমা দেখতে গিয়ে কী যে হল।’

‘শেষটায় টারজানে যে এরকম সর্বনাশ করবে তা কে জানত বল।’

দুপুর পর্যন্ত ফেলুদার কোনো ফোন এল না। খাবার পরে লালমোহনবাবু আর কিছু করার না পেয়ে শেষটায় গণেশ চুরি সম্পর্কে ওর নিজের কী ধারণা সেটা আমার বললেন।

‘বুঝলে ভাণেশ, গণেশটা আসলে চুরিই যায়নি। ওটা অশ্বকাবাবু আফিং-এর খোঁকে সিঁদুক থেকে বার করেছেন, আর তারপর নেশা কেটে খাবার পর ওটার কথা বেমানাম ভুলে গেছেন।’

আমি বললাম, ‘কিন্তু তাহলে এখন সেটা আছে কোথায়?’

‘ওর ভালতলার চাঁটটা দেখেছ? ওর পায়ের চেয়ে চাঁট জোড়া কতখানি বড় সেটা লক্ষ্য করেছ? একজন বড়ো মানুষ চাঁট পায়ের দিকে যত্ন থাকলে কে আর চাঁট খুলে তার ভেতরে সাঁচ করতে যাবে বল?’

আমার একটু সন্দেহ হল। বললাম, ‘আপনার নতুন গল্পে এরকম একটা ব্যাপার থাকছে বুঝি?’

লালমোহনবাবু হঠাৎ হেসে বললেন, ‘ঠিক ধরেছ। তবে আমার গল্পে গণেশের বদলে একটা দু’ হাজার ক্যারেটের হীরে।’

‘দু’ হাজার!—আমার চক্ চড়কগাছ।—‘পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হীরে স্টার অফ আফ্রিকা, কত ক্যারেট জানেন?’

‘কত?’

‘পাঁচশো। আর কোহিনূর হল মাত্র একশো দশ।’

লালমোহনবাবু গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললেন, ‘দু’ হাজার না হলে গল্প জমবে না।’

দিকেরে সাড়ে চারটার সময় হরকিষণ এসে বলল আমার টেলিফোন এসেছে। বাড়ির খতো ছুটে নিচে গিয়ে নিরঞ্জনবাবুর অ্যাসিসট্যান্টের হাত থেকে ফোনটা প্রায় ছিনিয়ে নিলাম।

‘কে, ফেলুদা?’

‘শোন’,—গম্ভীর চাপা গলা—‘খুব মন দিয়ে শোন। দশাশ্বমেধের দক্ষিণে
এক ঠিক পরের ঘাট হল মুনশী ঘাট, আর তার পরে হল রাজা ঘাট। শুনছি?’

‘হ্যাঁ হ্যাঁ।’

‘মুনশী আর রাজার মাঝামাঝি একটা নির্দিষ্ট জায়গা আছে। একটা
ঘাটের ধাপ শেষ হয়ে আরেকটার ধাপ যেখানে শুরু হচ্ছে তার মাঝামাঝি।

‘বুঝছি।’

‘দেখাবি বৈদ্যনাথ মালসার একটা বিজ্ঞাপন আছে হিন্দিতে লেখা, পাথরের
দেয়ালের গায়ে। আর তার নিচেই একটা মস্ত বড় চোখো খুঁপারি।’

‘বুঝছি।’

‘তোরা দুজন এখানে গিয়ে পৌছাবি ঠিক সাড়ে পাঁচটায়। খুঁপারিটার
সামনে অপেক্ষা করবি। আমি ছটা নাগাত পৌছব।’

‘বুঝছি।’

‘আমি ছদ্মবেশে থাকব।’

কথাটা শুনে আমার বুকটা এমন খড়াস করে উঠল যে আমি কিছু বলতেই
পারলাম না। ফেলুদার ছদ্মবেশ মানে নাটকের ক্লাইমাক্স।

‘শুনছি?’

‘হ্যাঁ হ্যাঁ।’

‘আমি ছটা নাগাত তোদের মীট করব।’

‘ঠিক আছে।’

‘না আপা পৰ্বন্ত অপেক্ষা করবি।’

‘ঠিক আছে। তুমি ঠিক আছ ত?’

‘ছাড়ছি।’

খুঁট শব্দে ওদিকের টেলিফোনটা রাখার সঙ্গে সঙ্গে ফেলুদা ফোন অব্যবহা-
র কুয়াশার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দশ

দশমবর্ষমেধে আজ দশের দিন ভীড় হবে বলে আমরা ঠিক করলাম অভয় চক্রবর্তীর বাড়ির রাস্তা দিয়ে আগে কেদার ঘাট যাবো। সেখান থেকে সিন্ধু ঘরে উত্তরে হটিলে প্রথমেই গড়বে রাজা ঘাট। লালমোহনবাবু আজ সকালে হোটেলের কাছেই একটা ডাক্তারি দোকান থেকে খোল অঙ্করের নামওয়ালার কাঁ একটা বাড়ি কিনে এনে এরই মধ্যে দ্বার দড়ো করে খেয়ে নিয়েছেন। বললেন গতকাল রাতে নাকি ঠর আঘাত অবস্থায় বার বার দাঁত কপাটি লেগে যাচ্ছিল, এখন সেটা একদম সেরে গেছে।

সাহস যে খানিকটা বেড়েছে সেটা বুকলাম বড় রাস্তা থেকে মোড় ঘুরে প্রথম গলিটায় ঢুকেই। সামনেই একটা বাড়ি—গরু নয়, বাড়ি—রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে ঘাড় বোঁকিয়ে দেখছে। লালমোহনবাবু সটান এগিয়ে গিয়ে ‘আই বড, হ্যাট হ্যাট’ বলে সেটাকে ঠেলা মেরে সরিয়ে পাশ কাটিয়ে দিবা চলে গেলেন। আমি ভয় পাইনি, তবে মজা দেখবার জন্য দাঁড়িয়েছিলাম; লালমোহনবাবু আমাকে ‘এসো তপেশ, কিচ্ছু বলবে না’ বলে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন।

অভয়বাবুর বাড়ির বাইরে আর ভিতরে বেশ ভীড় দেখলাম। কেন ভীড় সেটা ভাবতে গিয়েই খেয়াল হল যে আজই ত মর্ছলিবাবার চলে যাবার দিন। আমরা এসেছি তৃতীয়াতে, আর আজ হল দশমী। যাক, তাহলে ভাসান ছাড়াও একটা বড় ঘটনা আছে আজকে।

বাইরে যারা দাঁড়িয়েছিলেন তার মধ্যে আমাদের হোটেলের এক যুগ্মচেনা ভদ্রলোককে দেখে তাঁকে জিজ্ঞাস করলাম মর্ছলিবাবা কেদারঘাট থেকে যাবেন কিনা। ভদ্রলোক বললেন, ‘না—বোধহয় দশমবর্ষমেধ।’ তাহলে আমাদের একটু দূরে থেকে দেখতে হবে ঘটনাটো। লালমোহনবাবুর ভাতে আপ্যায়িত নেই। বললেন, ‘ভদ্রদের চাপে চিড়ে-চাপটা হয়ে দেখার চেষ্টা একটু দূর থেকে দেখা ডের ভাল।’

কেদার ঘাট থেকে উত্তর দিকে হটি শুরু করে মিনিট পাঁচেক লাগল রাজাঘাট পৌঁছতে। ঘন্টার পাশে সারি সারি উঁচু বাড়ি থাকার জন্য এদিকটা থেকে রোদ সরে যায় অনেক আগেই। বর্ষার পরে চল এগিয়ে এসেছে,

বাড়ির ছায়া জলের কিনারা ছাড়িয়ে অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে। কিছুক্ষণ পরে আর শ্রোদ থাকবেই না। আর তার পরেই ঝপ করে নামবে অন্ধকার। ঘাটের পাশে এক জায়গায় সারি সারি নৌকো, তার উপরে ঢাঙা বাঁশের মাথায় কাভিক মাসের বাতি জ্বলছে। উত্তরে বোধহয় দশাশ্বমেধ ঘাট থেকেই একটা শব্দের ঢেউ ভেসে আসছে—বুঝতে পারছি বহু লোকের ভীড় জমেছে সেখানে। তার মধ্যে ঢাকের শব্দ পাচ্ছি, আর মাঝে মাঝে পটকার শব্দ আর হাউইয়ের হুশ।

রাজা ঘাটের ধাপ শেষ হয়ে ভিজে মাটি শব্দ হল। মিনিট খানেক হাঁটার পর বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়ল। বৈদ্যনাথ সালসা। প্রায় এক-মানুষ বড় বড় এক-একটা হিন্দি অক্ষর। পরে ফেলুদাকে জিগোস করাতে ও বলেছিল সালসা কথাটা নাকি পোতুগীজ; ওটার মানে হল একরকম রক্ত পরিষ্কার-করা ওষুধ।

জায়গাটা সত্যি খুব নিরিবিলা। শব্দ তাই না—এখান থেকে দশাশ্বমেধ দিবা দেখা যাচ্ছে। ঘাটের ধাপে মানুষের ভীড় আর জলে নৌকো আর বজরার ভীড়।

‘দুর্গা মাস্কী জয়!’

একটা ঠাকুর ভাসান হয়ে গেল। বজরার মাথায় তুলে খানিকটা নদীর ভিতরে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিলেই হল। দূর নৌকো ফাঁক করে ভাসান দেওয়ার ব্যাপার এখানে নেই।

য়েগে চলে গেল, কিন্তু ঘাটের গন্ডগোল এখন বেড়েই চলবে। ছ’টা বাজতে কুড়ি। লালমোহনবাবু হাতের ঘড়িটা দেখে সবে বলেছেন ‘তোমার দাদার টেলিফোনসটা থাকলে খুব ভালো হত’, এমন সময় একটা নতুন চিংকার শোনা গেল—

‘গুরুজী কি জয়! মহলিবাবা কি জয়! গুরুজী কি জয়!’

বেনারসের ঘাটে একরকম আটকোনা বদরুজ থাকে, যার উপর অনেক সময় ছাতার তলায় পান্ডারা বসে, পালোমানরা মদ্যুর ভাঁজে, আবার এখান সাধারণ লোকও বসে। আগাদের ঠিক সামনেই হাত পঁচাত্তর দূরে সেইরকম একটা বদরুজ জল থেকে চার-পাঁচ হাত উঁচুতে উঠে রয়েছে—সেটা এখন খালি। সেইরকম বদরুজ দশাশ্বমেধে অনেকগুলো আছে। তার মধ্যে যেটা আমাদের দিকে, তার উপর কিছু লোক এতক্ষণ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। ‘গুরুজী কি জয়’ শব্দেই তাদের মধ্যে একটা ব্যস্ত ভাব দেখা গেল। তারা এখন সবাই ঘাটের সিঁড়ির দিকে চেয়ে রয়েছে।

এখান দেখলাম একটা প্রকাণ্ড দল সিঁড়ি দিয়ে নেমে বদরুজের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। দলের মাথায় যিনি রয়েছেন তিনি আর কেউ নন—মহলিবাবা। টকটকে লাল লুঙ্গীটা এখন মালকোচা দিয়ে ধুতির মতো করে

পরা : গারের লাল চাদরের উপর হলদে রঙ দেখে বুঝলাম বাবা অনেক গাঁদা ফুলের মাথা পরে আছেন।

বুড়ুজ্ঞ এবার প্রায় খালি হয়ে গেল। শুধু দু'জন মইল, তারা বাবার হাত ধরে তাকে উপরে তুলল। বাবার মাথা এখন সবাইয়ের উঁচুতে।

বাবা এবার দু' হাত তুললেন উভয়ের দিকে ফিরে। কী বললেন, বা কিছ্ বললেন কিনা সেটা এতদূর থেকে বোঝা গেল না।

এবার বাবা হাত তোলার অবস্থাতেই বুড়ুজ্ঞের উল্টোদিকে এগিয়ে গেলেন। বাবার সামনে এখন গম্ভা। পিছন থেকে আবার জয়ধ্বনি উঠল—'জয় মহালি-বাবা কী জয়!'

সেই জয়ধ্বনির মধ্যে বাবা গম্ভায় আপ দিলেন।

একটা অশ্রুত আওয়াজ উঠল ভক্তদের মধ্যে। লালমোহনবাবু সেটাকে 'সম্মুখের বিলাপ' বললেন। বাবাকে কিছ্ক্ষ জলের মধ্যে সাতরাতে দেখা গেল। তারপর তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। লালমোহনবাবু বললেন, 'দু'ব সাতারের পেঁছে যাবে পাটনা—কী খিলিং ব্যাপার ভাবতে পার?'

আরো একটা খিলিং ব্যাপারে আমাদের প্রায় হার্টফেল হয়ে বাবার অবস্থা হল যখন দশাশ্বমেধ ঘাট থেকে চোখ ঘুরিয়ে দেখি এই ফাঁকে কখন জানি একটি লোক এসে আবিহা অশ্বকারে নিঃশব্দে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। লোকটার বাঁ হাতে একটা বাঁশের লাঠি। মাথায় পাগড়ি, যুখে গৌফ-দাড়ি, গারের লম্বা সার্ভের উপর ওয়েস্ট কোর্ট, নিচে পায়জামা, আর তারও নিচে একছোড়া ডাকসাইটে কার্বাল জুতো।

কাবুলিওয়াল।

কাবুলিওয়াল। জান হাতটা অল্প তুলে আমাদের আশ্বাস দিল।

ফেলদা। কাবুলিওয়ালার ছদ্মবেশে ফেলদা। এই মেক-আপই সেদিন ব্যবহার করেছিল বেঙ্গলী ক্রায়েম ত্রিদিব ঘোষ।

'ওয়ার্ডার—'

লালমোহনবাবুর প্রশংসা হালপথে প্রায়িয়ে দিল ফেলদার ঠোঁটের আঙ্গুল।

কী ঘটতে যাচ্ছে জানি না, ছদ্মবেশের কী দরকার জানি না, অপরাধী কে বা কারা জানি না, ওক ফেলদা যদি চূপ করতে বলে তাহলে চূপ করতে হবেই। এটা আশিও জানি, আর লালমোহনবাবুও আশ্বিনে জেনে গেছেন।

ফেলদা এক দুপ্টে চেয়ে রয়েছে দশাশ্বমেধ ঘাটের দিকে। আমাদের চোখও সেইদিকে চলে গেল।

দূর থেকে একটা বজরা ভেসে আসছে ঘাটের দিকে। তার মাথায় একটা বাঁতি জ্বলছে। বড় বজরা। বজরার ছাতে চার পাঁচজন লোক। কাউকেই চেনা যায় না। এতদূর থেকে সম্ভব নয়।

‘দুর্গা যাত্রিক জয়! দুর্গা যাত্রিক জয়!’

আরেকটা প্রতিমা আসছে ঘাটে। সিঁড়ি দিয়ে নামানো হচ্ছে। হ্যাঙ্কাক লণ্ঠনের আলো পড়ে ঠাকুর মাঝে মাঝে বজমল করে উঠছে। দূর থেকেও চিনতে অসুবিধা নেই। এটা ঘোষালদের ঠাকুর।

ফেলুদার সঙ্গে আরো পাথরের মতো দাঁড়িয়ে বিসর্জন দেখতে লাগলাম।

বিরাত প্রতিমা বজরার মাথায় চড়ে গেল। বজরা এগোতে শুরু করল আরো গভীর জলের দিকে।

তারপর দেখলাম প্রতিমাটা একবার ঋকি দিয়ে উপরে উঠে চিত হয়ে বজরার পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল। রূপাং শব্দটা এলো কিছু পরে—যেমন ক্রিকেট মাঠে বল মারাটা চোখে দেখার কিছু পরে শব্দটা আসে।

হঠাৎ মনে হল শশীবাবুর তুলির টান এখন জলের তলায়। হয়ত এর মধ্যেই সব ধূয়ে মূছে গেছে।

মহলিষাবাকে দেওয়া গাঁদা ফুলের মালাগুলো এখন ভেসে বাজে আমাদের সামনে দিয়ে।

যে বজরাটা দূর থেকে নদীর ধার দিয়ে আসছিল, সেটা এখন দৃশ্যবধে ধাঁড়িয়ে আমাদের দিকে আসছে।

মগনলালের বজরা। মগনলালের বিশাল দেহটা দেখতে পাচ্ছি বজরার ছাভে। সে বাণু হয়ে বসে আছে, সঙ্গে আরো চারজন লোক।

ফেলুদার ডান হাতটা তার কোমরের কাছে, বাঁ হাতটা এখনো লাঠিটাকে ধরে আছে। আলো কমে এসেছে, কিন্তু তাও আমি বাঁশের একটা গাঁটের নিচে মূঠো করে ধরা বাঁ হাতটা দেখতে পাচ্ছি।

সেদিনের গলিতে শোনা ধূপ ধূপ শব্দটা আবার শুনতে পাচ্ছি। এখন সেটা হচ্ছে আমার বৃকের ভিতরে।

আমার গলা শুকিয়ে আসছে।

আমার চোখ ওই বাঁ হাতটা থেকে সরতে পারছি না।

ফেলুদার বাঁ হাতের কড়ে আঙুলের নখটা লম্বা।

কাবুলিওয়ালার বাঁ হাতের কড়ে আঙুলের নখটা কাটা।

ফেলুদার বাঁ হাতের কবজির কাছে একটা তিল।

কাবুলিওয়ালার বাঁ হাতের কবজির কাছে কোনো তিল নেই।...

এ লোকটা ফেলুদা নয়।

কে এসে দাঁড়িয়েছে কাবুলিওয়ালার সঙ্গে আমাদের পাশে?

লালমোহনবাবু কি জামেন তাঁর পাশে কে দাঁড়িয়ে আছে?

তিনি কি বুঝেছেন ও ফেলুদা নয়?

বজরাটা আমাদের সামনের বৃক্কের কাছাকাছি চলে এসেছে। এখান থেকে

বদরুজ্জট প্রায় পঁচিশ গজ দূরে। বজরা এখন তারও প্রায় পঁচিশ গজ উত্তর দিকে। ব্যবধান কমে আসছে।

কাবুলিওয়ালারা আমাদের ইশারা করল খুপারিটার ভিতর ঢুকে যেতে। লালমোহনবাবু নিজে ঢুকে আমার হাত ধরে টেনে নিলেন। এক হাতের বেশি গভীর নয় খুপারিটা। আমরা এখান থেকে সবই দেখতে পাচ্ছি, যদিও বাইরের লোকে আমাদের দেখতে পাবে না।

বজরা এবার থামো-থামো।

বদরুজ্জের ঠিক পিছনে জলে কী যেন নড়ছে।

একটা লোকের শব্দ মাথাটা জলের উপর উঠল। লালমোহনবাবু হাতটা বাড়িয়ে আমার কোটের আঁস্তিনটা খামচে ধরলেন।

একটা লোক বজরা থেকে প্রায় নিঃশব্দে জলের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল।

লোক নয়—ছোকরা।

বদরুজ্জ বন্দু সুরষ।

সুরষ সাতেরে এগিয়ে এলো বদরুজ্জের দিকে।

বদরুজ্জের পিছনে জল থেকে এবার লোকের মাথাটা উঠতে শব্দ করে কাঁধ অবধি বেরিয়ে এল। একি স্বপ্ন, না সত্যি? ও যে মহলিবাবা! দু'হাতে জাপটে কী যেন ধরে আছে। সুরষ তার দিকেই এগিয়ে এসেছে। বজরার হাতের লোকেরা ওদের দুজনের দিকেই দেখছে।

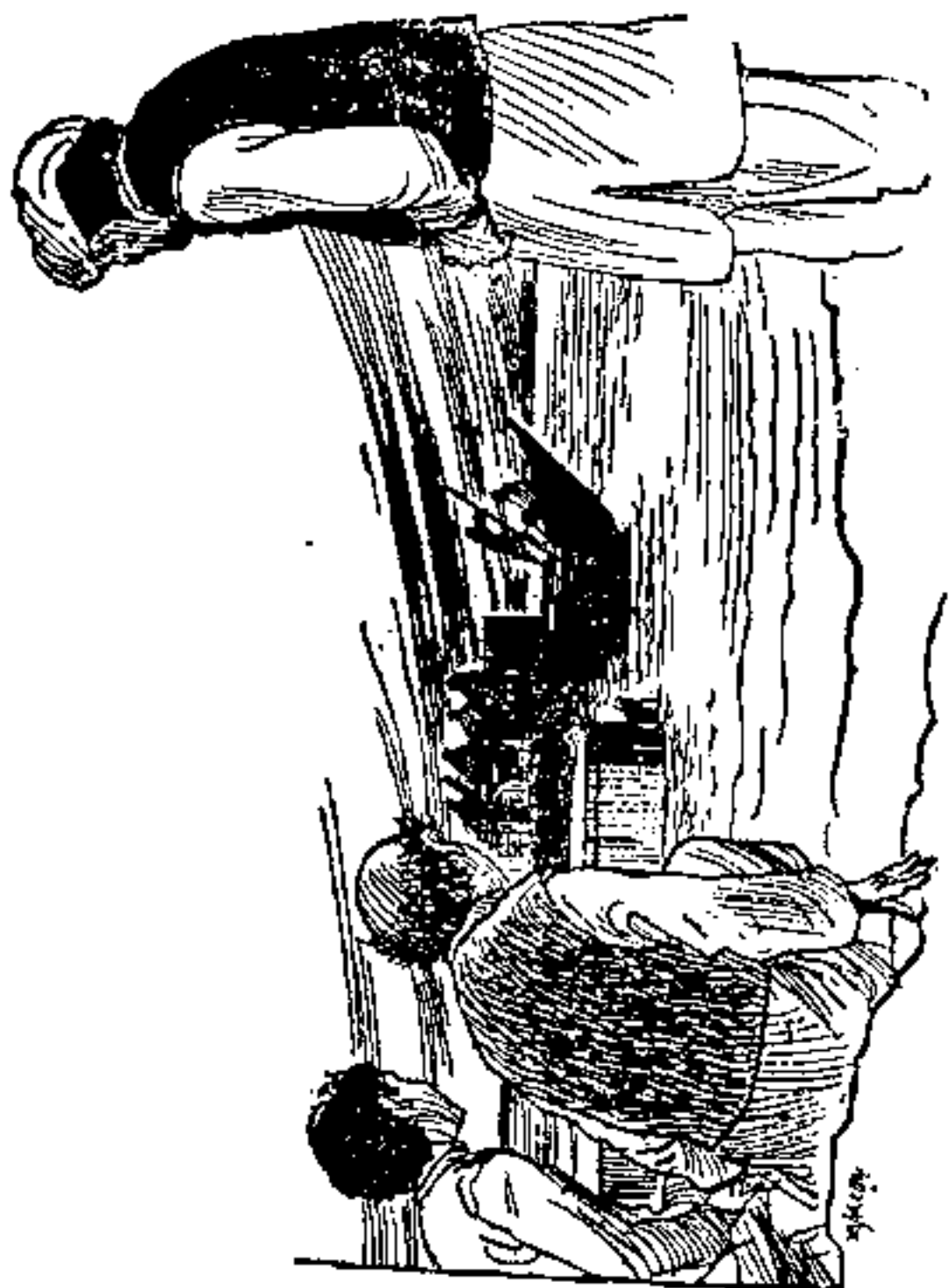
এবার আরেকটা—একটা নয়, পর পর দুটো—ধাঁধা লাগানো জিনিস ঘটল। মহলিবাবা তার হাত থেকে এবড়ো-থেবড়ো বলের মতো জিনিসটা ছুড়ে ঘাটের দিকে ফেলে দিল, আর সঙ্গে সঙ্গে কাবুলিওয়ালারা হাতের লাঠিটা ছুড়ে ফেল দিয়ে বিদ্যাস্থেগে সামনের দিকে ছুটে গিয়ে জিনিসটা বাঁ হাতে তুলে নিয়ে ডান হাতে পকেট থেকে রিভলবার বার করে বজরার দিকে তাক করে দাঁড়াল।

সেই মূহুর্তেই যগনলাল এক লাফে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই দেখলাম তারও হাতে একটা রিভলভার এসে গেছে। তার পাশে লোকগুলোও উঠে দাঁড়িয়েছে, আর মনে হচ্ছে ওদের হাতেও অস্ত্র রয়েছে।

এদিকে আমাদের মাথার উপরেও পায়ের শব্দ পাচ্ছি। ধূপ ধাপ করে দু'দু'তিনটে সশস্ত্র পুলিশ বোধহয় বৈদ্যনাথ মালসার পিছনের চক্করটা থেকে লাফিয়ে আমাদের দু'পাশে পড়ল।

তারপরেই শব্দ হল কান ফাটানো গুলির শব্দ। একটা গুলি আমাদের খুপারির ঠিক পাশে দেয়ালের গায়ে লাগল। জবম দেয়ালের গুঁড়ো গম্ভীর হাওয়ার সোজা এসে ঢুকল লালমোহনবাবুর নাকের ভিতর।

‘হ্যাঁজো!’



ওদিকে মগনলালের হাত থেকে রিভলভারটা ছিটকে বেরিয়ে গেছে। আর তার পরেই এক তাম্বুর ব্যাশার। ওই হিপোপটেমাসের মতো লোকটা বজরার টেন্টোদিকে ছুটে গিয়ে এক বিকট চিৎকার দিয়ে হাত দুটো মাথার উপর তুলে একটা বিগাট লাক নিয়ে গণ্ডায় পড়ে চতুর্দিকে জলের ফোয়ারা ছিটিয়ে দিল।

কিন্তু কোনো লাভ নেই। দুটো নৌকো এরই মধ্যে বজরার পাশে এসে পড়েছে, তাতে পুলিশ বোকাই।

আর মহলিাবাবা?

তিনি সূর্যকে বগলদাবা করে জল থেকে উঠে আসছেন।

এবার তিনি কাবুলিওয়ালার দিকে ফিরে বললেন, 'থ্যাক ইউ, ডেওয়ারিজনী।'

আর কাবুলিওয়ালা মহলিাবাবার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে তাকে জল থেকে টেনে তুলে বলল, 'থ্যাক ইউ, মিস্টার মিস্তর।'

আমি আর লালমোহনবাবু মাটিতে বসে পড়লাম; না হলে হরত মাথা ঘুরে পড়ে যেতাম।

সূর্য একজন পুলিশের হাতে চলে গেল। ফেলুদা কাছে আসতে যত্নলব্ধ তার মেক-আপটা কী অসাধারণ হয়েছে—যদিও এখন শরীরের কোনো কোনো জায়গায় কালো রঙের ফাঁক দিয়ে চামড়ার আসল রংটা বেরিয়ে পড়েছে।

'স্বভাবের মতো লাগছে না রে তোপসে?'

'ওয়ার্ডারফুল।'—বললেন লালমোহনবাবু।

ফেলুদা এবার ডেওয়ারির দিকে ফিরে বলল, 'আপনার লোককে বলে দিন ত—কীশে তোরা লে আর আমার জামাকাপড়গুলো রয়েছে—চট করে নিয়ে আসুক।'

এগার

১১

বিজয়া দশমী, রাত পোনে দশটা। ঘোষাল বাড়ির একতলার বৈঠকখানা।
যারা ঘরে রয়েছেন তাঁরা হলেন—গোয়েন্দা প্রদোষ মিত্র, লালমোহন গাঙ্গুলি,
সাবে-ইনসপেক্টর ডেওয়ানি, অম্বিকা ঘোষাল, উমানাথ ঘোষাল, উমানাথদাব্দ
শ্রী, বুদ্ধিগণীকুমার ঘোষাল, বিকাশ সিংহ, আর আরো সব যারা বাইরে থেকে
এসেছেন বাসের নাম জানি না, আর আমি—ভূপেশব্রজ মিত্র। এ ছাড়া ঘরের
দরজার বাইরে থেকে উঁকি মারতে দেখছি তিনজন লোককে—দারোগ্যান
ছিলোচন পাণ্ডে, বেরারা বৈকুণ্ঠ আর বড়ো চাকর ভরস্বাজ।

কোলাকুলি শেষ, মিষ্টি শেষ—অন্তত প্লেটে শেষ, যদিও কারুর কারুর
চোয়াল এখনো নড়ছে। যেমন ফেলদার! ঠাকুর ডাসান হয়ে যাবার পর বাড়ির
লোকের মন খারাপ হয়ে যায়; এখানেও তাই হয়েছিল। কিন্তু এখন আবার
এক ঠাকুর চলে গিয়ে আরেক ঠাকুর ঘিরে পাবার আশায় সকলের মূখেই বেশ
একটা হাসিহাসি উঠেজনার ডাব। এটা বলে রাখি যে গণেশ পাওয়া গেছে
কিনা সেটা কিন্তু এখনো জানা যায়নি। যেটা জানা গেছে সেটা হল মহলিাবাবার
ঘটনা। আজ বিকেল চারটের সময় ভক্তের দল আসার আশ্বস্তি আগে অভয়বাবুর
বাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকে পুন্ডিস মহলিাবাবাকে অ্যারেস্ট করে।
বাবাজী আসলে ছিলেন সেই রায় বেরিলীর জেল থেকে পলাতক জালিয়াত।
তা ছাড়াও তিনি ছিলেন মগনলালের একজন স্যাণ্ডাং। তার আসল নাম নাকি
পূরন্দর রাউত, বাড়ি পুর্নিয়া। লোকটা অনেকদিন কলকাতায় ছিল, মন-
মেষ্টের তলায় হাত, সাকাইয়ের খেলা দেখানো থেকে শুরু করে অনেক
রকমের অদ্ভুত কাজ করে শেষটার জালিয়াতি ধরে। অ্যারেস্টের এক ঘণ্টার
মধ্যে বেঙ্গলী ক্রাভের কাছে থেকে ধার করা মেক-আপের সরঞ্জামের সাহায্যে
মহলিাবাবার চেহারা নিয়ে ফেলদা ভক্তদের সামনে হাজির হয়। তার আগেই
অবিশী পূরন্দর রাউত পুন্ডিসের চাপে পড়ে সব কথা ফাঁস করে দিয়েছিল।
আজ গঙ্গার ঘাটে বে দূর্ঘর্ষ নাটকটা মগনলাল স্ক্যান করেছিল সেটাও
পূরন্দর বলে দিয়েছিল। আসলে মহলিাবাবাকে মগনলালই খাড়া করেছিল।
তার পিছনে যে কি সাংঘাতিক শয়তানি ফন্দি ছিল সেটা পরে ফেলদার
কথা থেকে জানা যায়।

সবাই মৃদু বন্ধ করে উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে আছে, সকলেরই দৃষ্টি ফেলদুদার দিকে। লালমোহনবাবু যে কেন মাঝে মাঝে হেসে উঠছেন জানি না; হয়ত বিকাশবাবু ওকে জোর করে সিম্ধি খাইয়েছেন বলে। সিম্ধি খেলে নাকি হাসি পায়।

ফেলদুদা জল ধরে হাতের কাঁচের গেলাসটো আওরাজ বাঁচিয়ে খুব সাবধানে পিতলের কাশ্মিরী টেবিলটার উপর রেখে বলল, ‘মগনলালই মছলিবাবার সৃষ্টিকর্তা একথা আমি আপনাদের আগেই বলেছি। মছলিবাবা অন্তর্ধানী, মছলিবাবা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী—এধরনের কয়েকটা ধারণা রটতে পারলেই কার্যসিদ্ধি হয়। কেনার ঘাটে মছলিবাবাকে এনে ফেলার আগে অভয় চক্রবর্তী এবং লোকনাথ পাণ্ডা সম্বন্ধে দু’একটা কথা জেনে নেওয়া মগনলালের মতো লোকের পক্ষে কিছুই কঠিন ছিল না। বাকি কাজটা সম্ভব হয়েছিল অভয়বাবুর অন্ধ ভক্তির জোরে এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের বিশ্বাসের জোরে।’

ফেলদুদা থামল। লালমোহনবাবু হাসবার জন্য মাথা পিছনে হোলিয়ে মৃদুটা খুলতেই আমি ওর কনুইয়ে খোঁচা মেরে ওকে থামলাম। ঘরের আর প্রত্যেকটি লোক হাঁ করে ফেলদুদার কথাগুলো গিলছে। ফেলদুদা বলে চলল—

‘মগনলালের সঙ্গে সম্প্রতি তার বাড়িতে বসে আমার কিছু কথা হয়েছিল। মগনলাল বলেছিল গণেশটা তার কাছে আছে, এবং উমানাথবাবু নিজে নাকি সেটা তাকে বিক্রী করেছেন।’

‘আঁ!’—জুখ রাঙিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন উমানাথ ধোবাল। ‘আপনি বিশ্বাস করেছিলেন তার কথা?’

‘রহস্যের একটা নতুন দিক হিসাবে কথাটা শুনতে যে খুব আকর্ষণ লেগেছিল তা বলব না। কিন্তু পরমহুঁত্রেই যখন মগনলাল তদন্ত বন্ধ করার জন্য আমাকে একটা মোটা ঘুস অফার করলো, তখন মনে একটা ঝটকা লাগল। বন্ধ করার একটা কারণ অবিশ্যি মগনলাল বলেছিল, কিন্তু সেটা আমার কাছে খুব বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়নি। তার কথা সত্যি হলে বরং আপনি আমাকে ঘুস অফার করতে পারতেন—কারণ কেঁচো খুঁজতে সাপ বোঁরিয়ে গেলে সেটা আপনার পক্ষে মোটেই সুবিধের হত না। অথচ আপনি আমাকে নিজে থেকে অনুসন্ধান চালাতে বলেছেন।’

‘নিজে থেকে’, প্রতিধ্বনি করলেন লালমোহনবাবু, ‘হাঃ হাঃ—নিজে থেকে!’ ফেলদুদা লালমোহনবাবুর পাগলামো অগ্রাহ্য করে বলে চলল—

‘তখনই আমার প্রথম সন্দেহ হয় যে তাহলে হয়ত গণেশটা আপনাদের বাড়িতেই কোথাও রয়ে গেছে, এবং মগনলাল কোনো উপায়ে কোনো একটা সময়ে সেটা পাবার আশা করছে। বাড়িতে রয়েছে, অথচ সিন্দুকে নেই—

তাহলে সেল কোথায় জিনিসটা? সেই সঙ্গে আবার এটাও মনে হল যে এ বাড়ির সঙ্গে মগনলালের একটা যোগসূত্র না থাকলে সেই বা কী করে আশা করছে গণেশটা পাবার?

‘এই সব যখন ভাবছি, তখন একটা কারণে হঠাৎ সন্দেহটা গিয়ে পড়ল মিস্টার সিংহের উপর; কারণ আমি জানতে পারলাম যে তিনি একটা জরুরী সভা আমার কাছ থেকে গোপন করে রেখেছিলেন। জেরার ফলে বিকাশবাবু স্বীকার করলেন যে তিনি দশই অক্টোবর লুকিয়ে লুকিয়ে মগনলালের সঙ্গে উমানাথবাবুর কথাবার্তা শুনছিলেন। শোনার পর থেকে তার মনে গণেশটা সম্পর্কে একটা উদ্বেগ থেকে যায়। মিস্টার ঘোষাল যেদিন মহালিষাবাবুকে দেখতে যান, সেদিন আর থাকতে না পেরে বিকাশবাবু দোতলায় অম্বিকাবাবুর ঘরে গিয়ে তাঁর দেয়াল থেকে চাবি নিয়ে সিন্দুক খোলেন। খুলে দেখেন গণেশ নেই।’

‘গণেশ তখনই নেই?’ অস্বাক হয়ে প্রশ্ন করলেন উমানাথবাবু। ‘তার মানে তার আগেই চুরি হয়ে গেছে?’

‘চুরি না’, ফেলুদা বলল। ফেলুদা উঠে দাঁড়িয়েছে—তার হাত পুটো প্যাণ্টের পকেটে। ‘চুরি না। একজন অত্যন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি গণেশটিকে মগনলালের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সেটিকে লুকিয়ে রেখেছিল।’

‘ক্যাপ্টেন স্পার্ক!’—বলে উঠল রুকুগাঁকুমার।

সবাইয়ের দৃষ্টি রুকুর দিকে ঘুরে গেল। সে ঘরের এক কোণে একটা দরজার পাশে পর্দা হাতে ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

‘ঠিক বলেছ। ক্যাপ্টেন স্পার্ক, ওরফে আমাদের রুকুবাবু।—আচ্ছা, ক্যাপ্টেন স্পার্ক, সেদিন যখন তোমার বাবার সঙ্গে একজন মোটা ভদ্রলোক এ ঘরে বসে কথা বলছিলেন—’

রুকু ফেলুদার কথা শেষ না হতেই চেঁচিয়ে উঠল—‘ডাকু গম্ভারিয়া!—ক্যাপ্টেন স্পার্ক তাকে বার হার বোকা বানাথ।’

‘সে যখন কথা বলছিল, তুমি কি তখন এই প্রশ্নের ঘর থেকে শুনছিলেন?’

রুকু তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, ‘শুনছিলাম ত। আর তখনই ত সিন্দুক খুলে গণেশ নিয়ে লুকিয়ে রাখলাম। না হলে ত ও নিলে নিত।’

‘ভেরি গুড’, ফেলুদা বলল। তারপর অন্যদের দিকে ফিরে বলল, ‘আমি ক্যাপ্টেন স্পার্ককে গণেশের কথা জিজ্ঞাস করেছিলাম। তাতে ও বলেছিল গণেশ পাওয়া যাবে না। কারণ সেটা রয়েছে অ্যাটিকার এক রাজার কাছে। কথাটার মানে আমি তখন বুঝতে পারিনি। শেষে বুঝলাম একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে—পয়তাল্লিশ বছরের পুরোন টার্জনের একটা ফিল্ম দেখতে গিয়ে।’

ফেলুদা খামতেই চারিদিক থেকে—সে কি! আ! টার্জনের ছবি? ইজাদি

অনেকগুলো প্রশ্ন একসঙ্গে শোনা গেল। ফেলুদা সরাসরি উত্তর না দিয়ে আবার রুকুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ক্যাপ্টেন স্পার্ক', টোরজানের ছবির একেবারে শুরুরটা কি সেটা মনে করে বলতে পার ভূমি।'

'পারি', বলল রুকু, 'মোটো-গোল্ডউইন-মেয়ার প্রজেক্টস—'

'ঠিক কথা—মিস্টার তেওয়ারি, দেখুন ড আদরা মোটো-গোল্ডউইনের খেলা কিছু দেখাতে পারি কিন্ন।'

তেওয়ারি তার চেয়ারের নিচ থেকে একটা খবরের কাগজের মোড়ক নিয়ে সেটা খুলে তার থেকে একটু অশুভ জিনিস বার করে ফেলুদার দিকে এগিয়ে দিল। তার উপরে বিজলীর ক্যাডের আলোটা পড়তেই বুঝলাম সেটা একটা জলে নষ্ট হয়ে যাওয়া মাটির তৈরি হাঁ-করা সিংহের মাথা। ফেলুদা মাথাটা হাতে তুলে ধরে বলল, 'এই দেখুন আফ্রিকার পশুরাজ তথা দুর্গার বাহনের মাথা। এই সিংহের হাঁ-য়ের মধ্যে গণেশ লুকিয়ে রেখেছিল ক্যাপ্টেন স্পার্ক। তার ধারণা ছিল বিসর্জনের পর গণেশ ভাসতে ভাসতে চলে যাবে সমুদ্রে, আর সেখানে একটি হাঙর সেটাকে গ্রাস করবে, আর স্পার্কই আবার সেই হাঙরকে হারপুন দিয়ে মেরে গণেশটাকে পুনরুদ্ধার করবে। তাই না, ক্যাপ্টেন স্পার্ক?'

'তাই ভ', বলল রুকু।

'আর মহলিাবাবর প্ল্যান ছিল তিনি ঠাকুর ডাসানের আগে নিজে জলে ঝাঁপ দেবেন। তারপর কিছু দূর সাঁতরে গিয়ে আবার ডুব সাঁতরে ফিরে আসবেন ঘাটের দিকে—এসে নৌকোর আড়ালে অপেক্ষা করবেন। তারপর ডাসানের পরমহুতের আবার ডুব দিয়ে সিংহের মাথাটি চাড় দিয়ে খুলে নিজে চলে যাবেন মুনশীঘাট আর রাজঘাটের মাঝামাঝি একটা নির্জন জায়গায়। ততক্ষণে মগনলালের বজরাও এসে যাবে সেইখানে। বাস্—বার্ক কাজ ড সহজ।'

উমানাথবাবু বললেন, 'কিন্তু বাবাজী যে দসেরার দিনে যাবেন, সে ত তার ভক্তরাই ঠিক করে দিয়েছিল। আর গণেশ কোথায় আছে সে খবরই বা বাবাজী জানবেন কী করে? আর মগনলালই বা জানবে কী করে?'

'দুটোর উত্তরই ব'ব সহজ', বলল ফেলুদা। 'তৃতীয়ার দিনে বাবাজী তার ভক্তদের জিগোস করেন এক থেকে দশের মধ্যে একটা নম্বর বলতে। ষষ্ঠারীতি অধিকাংশ উত্তরই হয় সাত। এটাই নিয়ম। ফলে হয়ে গেল তিনে সাতে দশ—অর্থাৎ দসেরা। আর সিংহের মুখে গণেশ লুকোনোর কথাটা ক্যাপ্টেন স্পার্ক সবাইকে না বললেও, তার কথা সুরমকে নিশ্চয়ই বলেছিল, তাই না, ক্যাপ্টেন স্পার্ক?'

রুকু স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে, তার ডুবু কুঁচকে গেছে। সে ছোট করে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বুদ্ধিয়ে দিল।

ফেলুদা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'শরতান সিং সত্যিই শরতান সিং।'

সূর্যের পুরো নাম সূর্যলাল মেঘরাজ। সে মগনলালের ছোট ছেলে। যাকে বলে বাপকা বেটো। থাকত মানসিংগরের কাছে মগনলালের দুটো বাড়ির একটাতে। ওঁর খার্মিলি থাকত। অন্যটার থাকত মগনলাল নিজে। সূর্যই তার বাপকে বরটা দেয়, এবং তার পরেই মগনলাল তার বিরাট চক্রান্তটি খাড়া করে।

‘বিশ্বাসঘাতক!’—বলে উঠল রুকু।

এতক্ষণে আশীষকান্নাব্দ মূখ খুললেন—

‘সিংহের মাথাটা শু টেঁকরের উপর রেখে দিয়েছে, কিন্তু গণেশ কই?’

ফেল্দুদা মাথাটাকে আবার হাতে তুলে নিল। তারপর তার হাঁ-করা মূখের ভিতর হাত ঢুকিয়ে চান দিয়ে যে জিনিসটা বার করল সেটা গণেশ নয় মোটেই। সেটা তার আঙুলের ডগায় লেগে থাকা চটচটে একটা সাদা জিনিস।

‘ক্যান্টন স্পার্ক’ গণেশটাকে আটকাতে একটা আশ্চর্য সহজ উপায় বার করেছিল।

‘চিকলেট!’—বলে উঠল রুকুগণীকুমার।

‘হ্যাঁ, চুইং গাম’, বলল ফেল্দুদা, ‘সেই চুইং গামের খানিকটা এখানে রয়ে গেছে, কিন্তু গণেশ আর এখানে নেই।’

ফেল্দুদার এই এক কথাতেই ঘোষাল বাড়ির সকলের মূখ কালো হয়ে গেল। উমানাথবাবু কপাল চাপড়ে বলে উঠলেন, ‘তাহলে এত করে কী হল মিস্টার মিস্তির? গণেশই নেই?’

ফেল্দুদা সিংহের মাথাটা আরেকবার নার্মিয়ে রেখে বলল, ‘আমি আপনাদের আশায় ঠান্ডা জল ঢেলে দেবার জন্য আপনাদের এখানে ডাকিনি, মিস্টার ঘোষাল। গণেশ আছে। সেটা কোথায় কলার আগে আমি আপনাদের একটি ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। আপনাদের একজন খুব পরিচিত ব্যক্তির মৃত্যুর কথা। শশীভূষণ পাল।’

‘তাকে ত তার ছেলে মেরোছে’ বলে উঠলেন উমানাথবাবু, ‘সেই নিয়েছে নাকি গণেশ?’

‘বাস্তব হবেন না’, বলল ফেল্দুদা, ‘আমার কথাটা আগে শুন দিয়ে শুনুন। আমি যা বলতে যাচ্ছি সেটা প্রমাণ সাপেক্ষ, এবং সে প্রমাণ আমরা পাব বলেই আমার বিশ্বাস।’

ঘরের প্রত্যেকটি লোক আবার স্তব্ধ হয়ে ফেল্দুদার দিকে দেখছে। লাল-মোহনবাবু আর জোরে হাসছেন না, কিন্তু সব সময়েই তার মূখে হাসি লেগে রয়েছে। আর কেন জর্নি মাঝে মাঝে জান হাত দিয়ে নিজের কপালে চাঁটি মারছেন।

ফেল্দুদা বলল, ‘সিংহের মূখের মধ্যে যদি গণেশ লুকোন থাকে তাহলে সেটা দেখে ফেলার সবচেয়ে বেশি সুযোগ ছিল শশীবাবুর। বিশেষ করে

যেদিন তিনি সিংহের মূর্ধের বাইরে এবং ভিতরে তুলির কাজ করছিলেন সেইদিন। অর্থাৎ পঞ্চমীর দিন। অর্থাৎ যেদিন তিনি খুন হন। সেদিন আপনারা সম্ভাব্য বাড়ি ছিলেন না মনে আছে কি? ত্রিলোচন বলেছে আপনারা বিশ্বনাথের নন্দিরে আরাতি দেখতে গিয়েছিলেন।

উমানাথবাবু মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন। ফেলুদা বলল, 'আমরা পূর্লিসের কাছ থেকে জেনেছি যে শশীবাবু সেদিন আবার অসুস্থ বোধ করলে তার কাজ শেষ করে বিকাশবাবুর কাছে ওষুধ চাইতে গিয়েছিলেন। একথা বিকাশবাবুই পূর্লিশকে বলেছিলেন। শশীবাবু ওষুধ নিয়ে বাড়ি চলে যান। আমরা ত্রিলোচনের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি যে শশীবাবু যাবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিকাশবাবুও বেরিয়েছিলেন। তিনি কেন বেরিয়েছিলেন সেটা তাঁকে জিজ্ঞাস্য করতে পারি কি?'

বিকাশবাবু গাভীর গলায় বললেন, 'এটা জিজ্ঞাস্য করার কারণ কী বুঝতে পারছি না। বাই হোক, মিস্টার মিস্তির যে প্রশ্নটা করলেন তার উত্তর হচ্ছে—আমি সিগারেট কিনতে বেরিয়েছিলাম।... আরো কিছু প্রশ্ন আছে কি মিস্টার মিস্তির?'

'হ্যাঁ, আছে।—সিগারেট কিনে বাড়ি ফিরতে এক ঘণ্টার উপর সময় লাগল কেন আপনার, বিকাশবাবু?'

'তার কারণ আমি গঙ্গার ঘাটে একটু হাওয়া বেতে গেললাম। কোন্ ঘাট জানতে চান ত ভাও বলছি। হরিশ্চন্দ্র। সোনারপুরা রোডের ডাক্তার অশোক নস্তুর সঙ্গে সেখানে দেখা হয়, মিনিট দশেক কথাও হয়। তাকে জিজ্ঞাস্য করে দেখতে পারেন।'

'আপনার হরিশ্চন্দ্র ঘাটে হাওয়ার ব্যাপারটা আমি অবিশ্বাস করছি না বিকাশবাবু। আপনার সেখানে যাবার একটা বিশেষ কারণ ছিল। সেটায় আমার আসছি একুনি; তার আগে ক্যাপ্টেন স্পার্ককে আমার আরেকটা প্রশ্ন আছে। ক্যাপ্টেন স্পার্ক, তুমি কি তোমার অ্যানিস্ট্যান্ট খুঁদে রক্তিতকে বলেছিলেন সিংহের মূর্ধে গণেশ লুকিয়ে রাখার কথা?'

'ও ও বিশ্বাসই করিনি', বলল রুকু।

'জানি। সেইজন্যই ও সিন্দুক খুঁজে দেখতে গিয়েছিল রুকুর কথা সত্যি কিনা।' যখন দেখল সত্যি, তখন থেকেই ওর লোভ হয় গণেশটার উপর। সেটা আপনিই চলে আসে ওর হাতে যখন শশীবাবু গণেশটা পেয়ে বাড়িতে আর কাউকে না পেয়ে বিকাশবাবুর হাতে সেটা জমা দিতে চায়। কিন্তু বিকাশ সিংহ ও জিনিসটা এভাবে পেতে চাননি! শশীবাবু যে পরের দিনই সব কথা ফাঁস করে দেকেন! তাকে খতম না করতে পারলে ত বিকাশবাবুর উদ্দেশ্য সিন্ধি হয় না। তাই তিনি শশীবাবুকে ধাওয়া করেন। খাবার পথে ত্রিধর

ভায়াইটি স্টোরস থেকে একটি ছোরা কেনেন। তাই দিয়ে গণেশ মহম্মার অম্বকার গলিতে শশীবাবুকে নিঃসমভাবে হত্যা করেন; তারপর হরিশ্চন্দ্র ঘাটে গিয়ে রক্তাক্ত ছুরিটা গঙ্গায়—

‘মিথো! সর্বৈব মিথো! প্রত্যেকটা কথা মিথো!’—বিকাশবাবুর এরকম অদ্ভুত চেহারা কোনোদিন দেখব কল্পনা করিনি। তার চোখ দুটো আর কপালের রং দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে—‘গণেশ যদি আমি নেব ত সে গণেশ কোথায়? কোথায় সে গণেশ?’

‘আর একদিন পরে হলে হয়ত সে গণেশ থাকত না। আপনি নিশ্চয়ই মগনলালকে বিক্রী করে দিতেন। কিন্তু পুজোর কটা দিন আপনার বাড়ি থেকে বেরোন সম্ভব হয়নি—তাই আপনাকে গণেশ লুকিয়ে রাখতে হয়েছিল।’

‘মিথো কথা!’

‘তেওয়ারিঙ্গী!’ ফেলুদা দারোগা সাহেবের দিকে হাত বাজাল। তেওয়ারি এবার আরেকটা জিনিস ফেলুদার হাতে তুলে দিল।

বিকাশবাবুর রোডিও।

ফেলুদা রোডিওটাকে চিত্ত করে ব্যাটারির খুপির ঢাকনাটা খুলে তার ভিতরে হাত ঢুকিয়ে টেনে বার করল একটা লম্বা হীরে-বসানো আড়াই-ইঞ্চি সোনার গণেশ।

পরমুহূর্তেই অম্বিকাবাবুর বিশাল তালতলার চাঁটের একটা পাটি গিয়ে সজোরে আছাড় খেল বিকাশবাবুর গালে।

সবশেষে শুনলাম রক্তুর রিনরিনে চিংকার—

‘বিশ্বাসঘাতক! বিশ্বাসঘাতক! বিশ্বাসঘাতক!’



হোষালগের বাড়িতে তারিফ আর ভূরিভোজ ছাড়া আর যে জিনিসটা পাওয়া গেল, সেটা রয়েছে এখন ফেলুদার পকেটে একটা খামের মধ্যে: আমরা মদনপুরা রোড দিয়ে হেঁটে বাড়ি ফিরাছি। লালমোহনবাবুর সিঁখির নেশা জুটেছে কিনা জানি না। হতে পারে ফেলুদার চোখ রাঙানি আর আমার চিমটিক চোটে তিনি নিজেই সামলে রেখেছেন।

কীর্তিৰাম ছোট্টরামের পানের দোকানের সামনে থামতে হঠাৎ আবার বেসামান্যভাবে হেসে উঠলেন লালমোহনবাবু।

‘কী হল মশাই’, ফেলুদা বলল, ‘আপনাকে রাঁচি পাঠাতে হবে নাকি? এত বড় একটা ঘটনা আপনার হাস্যকর বলে মনে হচ্ছে?’

‘আরে দূর, মশাই’, লালমোহনবাবু কোনো রকমে হাসি ধামিয়ে বললেন,

কী হয়েছে সে তো জানেন না। রহস্য রোমাঞ্চ সিরিজের তেঁষটি নম্বর বই—
রক্ত-হীরক রহস্য বাই জটায়ু—সোঁদিন দেখলুম রক্তুর তাকে। হিরো একটা
হাঁরে লুকিয়ে রাখছে হাঁ-করা এক কুমীরের নট্যচুর মূখের মতো—ভিলেন যাতে
না পায়। ভাবতে পারেন; আমারই লেখা বই আর আমিই কিনা ফেল মেয়ে
গেলুম, আর ফেলু মিস্তির হয়ে গেলেন হিরো!

ফেলুনা কিছুক্ষণ লালমোহনবাবুর দিকে চেয়ে রইল। তারপর বলল,
'আপনি ভুল করছেন লালমোহনবাবু। তার চেয়ে বরং বলুন আপনি
আপনার কলমের জোরে এমন একটি রহস্য ফেঁসেছেন যে বাস্তবে তার সামনে
পড়ে ফেলু মিস্তিরের গোয়েন্দাসিরি ছেড়ে দেবার উপক্রম হয়েছিল। কাজেই
আপনিই বা হিরো কম কিসে?'

নাও রক্ত মশলাওয়ালা ভবক দেওয়া পানটা চার আঙুলের ঠেলা দিয়ে
মুখে পুরে লালমোহনবাবু বললেন, 'যা বলেছেন মশাই—জটায়ুর জবাব নেই।'

মুখ্যমন্ত্রী

২০০
এ৩ ক্রঃ



বোম্বাইয়ের বোম্বেটে

লালমোহন গাঙ্গুলী ওরফে জটায়ু-র হাতে মিষ্টির বাস্ক দেখে বেশ অবাক হলাম। সাধারণত ভদ্রলোক যখন আমাদের বাড়িতে আসেন তখন হাতে ছাতা ছাড়া আর কিছু থাকে না। নতুন বই বেগোলে বইয়ের একটা প্যাকেট থাকে অবিশ্য, কিন্তু সে তো বছরে দুবার। আজ একেবারে মির্জাপুর স্ট্রীটের হালের দোকান কল্লোল মিষ্টান্ন ভান্ডারের পাঁচশ টকা দামের সাদা কার্ড বোর্ডের বাস্ক, সেটা আবার সোনালী ফিতে দিয়ে বাঁধা। বাস্কের দুপাশে নীল অক্ষরে লেখা 'কল্লোলস্ ফাইভ মিক্স সুইটমিটস'—মানে পাঁচ-মেশালী মিষ্ট। বাস্ক খুললে দেখা যাবে পাঁচটা খোপ করা আছে, তার একেকটাতে একেকরকমের মিষ্ট। মাথেরটার থাকতেই হবে কল্লোলের আবিষ্কার 'ডায়মন্ড'—হীরের মতো পলকাটা রূপের তবক দেওয়া রস ভগ্না কড়া পাকের সন্দেশ।

এমন বাস্ক লালমোহনবাবুর হাতে কেন? আর ও'র মুখে এমন কেজো-ফতে হাসি হাসি ভাবই বা কেন?

ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে বাস্ক টেবিলে রেখে চেয়ারে বসতেই ফেলদা বলল, 'বোম্বাইয়ের সুখবরটা বুদ্ধি আজই পেলেন?'

লালমোহনবাবু প্রশ্নটা শুনে অবাক হলেও তাঁর মুখ থেকে হাসিটা গেল না, কেবল ভুরু দুটো ওপরে উঠল।

'কী করে বুঝলেন, হে হে?'

'সাইরেন বাজার এক ঘণ্টা পরে যখন দেখছি আপনার হাতঘড়ি বলছে সোয়া তিনটে, তার মনেই টাটকা আনন্দের আতিশয্যে ঘড়িটা পরার সময় আর ওটার দিকে চাইতেই পারেন নি।—স্প্রিং গেছে, না দম গেছে?'

লালমোহনবাবু তাঁর নীল রূপারের খসে পড়া দিকটা রোম্যান কারদায় বা কাঁধের উপর ফেলে দিয়ে বললেন, 'পাঁচশ চেয়েছিলুম; তা আজ ভোরে ঘুম ভাঙতেই চাকর এসে টেলিগ্রাম ধরিয়ে দিলে। এই ধো!'

লালমোহনবাবু পকেট থেকে একটা গোলাপী টেলিগ্রাম বার করে পড়ে শোনালেন—

'প্রোভিডেন্সার উইলিং অফার টেন ফর বোম্বাটে প্লীজ কেবল কনসেন্ট।' আমি রিপ্লাই পাঠিয়ে দিয়ে এলুম—'হার্টিপলি সের্লিং বোম্বাটে ফর টেন টেক

ব্রেন্সিংস।’

‘দশ হাজার!’ ফেল্দুদার মতো মাথাটাণ্ডা মানুষের পর্যন্ত চোখ গোলগোল হয়ে গেল। ‘দশ-হাজারে গম্প বিক্রি হয়েছে আপনার?’

জটায়ু একটা হালকা মসৃণ হাঁস হাসলেন।

‘টীকটী হাতে আসেনি এখনো। ওটা কবে গেলেই পাব।’

‘আপনি কবে যাচ্ছেন?’ ফেল্দুদার চোখ আবার গোল।

‘শুধু আমি কেন? আপনারাও। গ্যাট মাই এক্সপেনস। আপনি ছাড়া ত এ গম্প দাঁড়াতেই না মশাই।’

কম্বাটা যে সতি সেটা ব্যাপারটা খুলে বললেই বোঝা যাবে।

জটায়ুর অনেক দিনের স্বপ্ন যে তার একটা গল্প থেকে সিনেমা হয়। বাঙলা ছবিতে পয়সা নেই, তাই হিন্দির দিকেই ও’র ঝোঁক বেশি। এবারে তাই কোমর বেঁধে হিন্দি সিনেমার গল্প লেখা শুরু করেছিলেন। বম্বের ফিল্ম লাইনে লালমোহনবাবুর একজন চেনা লোক আছে, নাম পল্লব ঘোষাল। আগে গড়পায়েই থাকত, লালমোহনবাবুর দূটো বাড়ি পরে। কলকাতার টালি-গঞ্জে তিনটে ছবিতে সহকারী পরিচালকের কাজ করে রোখের মাথায় বম্বে গিয়ে হাজির হয়। সেখানে এখন সে নিজেই একজন হিট ডিরেকটর।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ অবধি গিয়ে গল্প আর এগোচ্ছে না দেখে জটায়ু ফেল্দুদার কাছে আসেন। ফেল্দুদা তখন-তখনই লেখাটা পড়ে মন্তব্য করে—‘মামাপথে আটকে ভালোই হয়েছে মশাই। এ আপনার প’ডগ্রাম হত। বোম্বাই নিত না।’

লালমোহনবাবু মাথা চুলকে বললেন, ‘কী হলে নেবে মশাই বলুন ত। আমি ত ভেবেছিলুম খানকতক কারেন্ট হিট ছবি দেখে নিয়ে তারপর লিখব। দু’দিন কিউরে দাড়ালুম; একদিন পকেটমার হল, একদিন সোয়া ঘন্টা দাঁড়িয়ে জানলা অবধি পেঁছে শুনলাম হাউস ফুল। বাইরে টীকট ব্র্যাক হাঁজল, কিন্তু বারো টাকা খরচ করে শেষটার কোডোপাইরিং খেতে হবে সেই ভয়ে পিছিয়ে গেলুম।’

শেষে ফেল্দুদাই একটা ছক কেটে দেবে বলল লালমোহনবাবুর জন্য। বলল, ‘আজকাল ডবল রোলের খুব চল হয়েছে সেটা জানেন ত?’

লালমোহনবাবু ডবল রোল কী সেটাই জানেন না।

‘একই চেহারার দু’জন নায়ক হয় ছবিতে সেটা জানেন না?’ ফেল্দুদা প্রশ্ন করল।

‘খমজ ভাই?’

‘তাও হতে পারে, আবার আত্মীয় নয় অথচ চেহারায় মিল সেটাও হতে পারে। একই চেহারা, অথচ একজন ভালো লোক, একজন খারাপ লোক;

অথবা একজন শত্রু-সমর্থ, আর একজন গোবেচারা। সাধারণত এটাই হয়।
আপনি একটু নতুনভাবে এক কাঠি বাড়িয়ে করতে পারেন;—একটা ডবল
রেলের বদলে এক জোড়া ডবল রেল। এক নম্বর হিরো আর এক নম্বর
ভিলেন হল জোড়া, আর দুই নম্বর হিরো আর দুই নম্বর ভিলেন হল আরেক
জোড়া। এই দুই নম্বর জোড়া যে আছে সেটা গোড়ায় ফাঁস করা হবে না।
তারপর—

এখানে লালমোহনবাবু বাধা দিয়ে বললেন, ‘একটু বেশি জটিল হয়ে
যাচ্ছে না?’

ফেলুদা মাথা নেড়ে বলল, ‘তিন ঘন্টার মালমশলা চাই। আজকাল নতুন
নিয়মে খুব বেশি ফাইটিং চলবে না। কাজেই গম্প অন্যভাবে ফাঁসিতে হবে।
দেড় ঘণ্টা লাগবে জট পাকাতো, দেড় ঘণ্টা ছাড়াতো।’

‘তাহলে ডবল-রোলেই কার্ফিসিস্থি হয়ে যাবে বলছেন?’

‘তা কেন? আরো আছে। নোট করে নিন।’

লালমোহনবাবু সজ্জ্ব করে বুক পকেট থেকে লাল খাতা আর সোনালী
পেনসিল বার করলেন।

‘লিখুন—স্মারগলিং চাই—সোনা হীরে গাঁজা চরস, যা হোক: পাঁচটি গনের
সিচুরেশন চাই, তার মধ্যে একটি ভিক্সিমূলক হলে ভালো; দুটি নাচ চাই;
থান দুতিন পশ্চাম্ভাবন দৃশ্য বা চেজ-সিকুয়েন্স চাই—তাতে অন্তত একটি
দামী মোটরগাড়ি পাহাড়ের গা দিয়ে গড়িয়ে ফেলতে পারলে ভালো হয়;
অগ্নিকান্ডের দৃশ্য চাই; নায়কের গার্লফ্রেন্ড হিসেবে নায়িকা এবং ভিলেনের
গার্লফ্রেন্ড হিসেবে ভ্যাম্প বা খল নায়িকা চাই; একটি কণ্ঠব্যবোধসম্পন্ন
পুলিশ অফিসার চাই; নায়কের ফ্লাশব্যাক চাই; ক্রিমিক বিলিফ চাই; গম্প
বাত্তে ঝুলে না পড়ে তার জন্য দ্রুত ঘটনা পরিবর্তন ও দৃশ্যপট পরিবর্তন চাই;
বার কয়েক পাহাড় বা সমুদ্রের ধারে গম্পকে নিয়ে ফেলতে পারলে ভালো,
কারণ এক নাগড়ে স্টুডিওর ব্যয় পরিবেশে শূটিং চিত্র তারকাদের স্বাস্থ্যের
পক্ষে হানিকর।—বুঝছেন ত?’

লালমোহনবাবু ঝড়ের মতো লিখতে লিখতে মাথা নেড়ে হুঁই বুকিয়ে
দিলেন।

‘আর সব শেষে—এটা একেবারে মাস্ট—চাই হ্যাপি এন্ডিং। তার আগে
অবিশিষ্ট বার কয়েক কামার স্রোত বইয়ে দিতে পারলে শেক্ষেটা জমে ভালো।’

লালমোহনবাবু সেদিনই হাত বাধা হয়ে গিয়েছিল। তারপর গম্প নিয়ে
ঝাড়া দা মাসের ধনুতাদুর্ভাগ্যে ডান হাতের দুটো আঙুলে কড়া পড়ে গিয়ে-
ছিল। ভাগিন সে সময়টা ফেলুদার কলকাতার বাইরে কোনো কাজ ছিল না—

কেন্দার সরকারের রহস্যজনক খুনের তদন্তের ব্যাপারে ওকে সবচেয়ে বেশি দূর থেকে হয়োরছিল ব্যারাকপুর্—কারণ লালমোহনবাব্দ সস্তাহে দুবার করে ফেল্দাদার কাছছ এসে ধর্না দিচ্ছিলেন। তা সত্ত্বেও জটায়ুদর বর্টিশ নম্বর উপন্যাস 'বোম্বাইয়ের বোম্বেষ্টে' মহালয়ার ঠিক পরেই বেরিয়ে যায়। আর গল্পটা যে-রকম ঘড়িড়িয়েছিল, তা থেকে ছবি করলে আর যাই হোক, সে ছবি দেখে কোজোপাইরিন খেতে হবে না। হিন্দ ছবির মালমশলা থাকলেও তাত্ত হিন্দ ছবির ছেড়ে-দে-আ-কে'দে বর্টিচ বাড়াবাড়িটা নেই।

পান্ডুলিপি়র একটা কাঁপ পুলাক ঘোষালকে আগেই পাঠিয়েছিলেন লালমোহনবাব্দ। দিন দশেক আগে চিঠি আসে যে গল্প পছন্দ হয়েছে, আর খুব শিগরিগরই কাজ আরম্ভ করে দিতে চান পুলাকবাব্দ। চিত্রনাটা তিনি নিজেই করেছেন, আর হিন্দ সংলাপ লিখেছেন ত্রিভুবন গুপ্ত, যার এক একটা কথা নাকি এক-একটা ধারালো চাকু, সোজা গিয়ে দর্শকের বুকে বিধে হলে পায়রা উড়িয়ে দেয়। এই চিঠির উত্তরে লালমোহনবাব্দ ফেল্দাদাকে কিছু না বলেই তাঁর গল্পের দাম হিসেবে প'চিশ হাজার হাকেন, আর তার উত্তরেই আজকের টেলিগ্রাম। আমার মনে হল প'চিশ চেয়ে লালমোহনবাব্দ যে একটু বাড়াবাড়ি করেছিলেন সেটা উনি নিজেই বুঝতে পেরেছেন।

গরম চারে চুমুক দিয়ে আধবোজা চোখে একটা আঃ শব্দ করে লালমোহনবাব্দ বললেন, 'পুলাক ছোকরা লিখেছিল যে, গল্পটা বিশেষ চোজ করেনি; মোটামুটি আমি—ঘড়ি, আমরা, যা লিখেছিলাম—'

ফেল্দাদা হাত তুলে লালমোহনবাব্দকে ধামিয়ে বলল, 'আপনি বহুবচনটা না ব্যবহার করলেই খুশি হব।'

'কিন্তু—'

'আহাঃ - শেকসপিয়ারও ত অন্যর গল্পের সাহায্য নিয়ে নাটক লিখেছে, তাবলে তাকে কি কেউ কখনো "আমাদের হ্যামলেট" বলতে শুনেছে? কখনো না। উপাদানে আমার কিছুটা কন্ট্রিবিউশন থাকলেও, পাচক ত আপনি। আপনার মতো হাতের তার কি আর আমার আছে?'

লালমোহনবাব্দ কৃতজ্ঞতার কন অবধি হেসে বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।— যাই হোক, যা বলছিলাম। কেবল একটি মাত্র মাইনর চোজ করেছে গল্প।'

'কিরকম?'

'সে আর বলবেন না মশাই। তাজ্জব ব্যাপার। আপনি শুনেলেই বলবেন টেলিপ্যাথি। হয়েছে কি, আমার গল্পের ম্যাগলার টুনুটিগ্রাম ধ্বংসের বাস-স্থান হিসেবে একটা তেত্রাল্লিশ তলা বাড়ির একটা ফ্ল্যাটের উল্লেখ করেছিলাম। আপনি খুঁটিনাটির ওপর মজুর দিতে বলেন, তাই বাড়িটার একটা নামও দিয়ে-

ছিলুম—শিবাজী কাস্‌ল। বোম্বাই ত—তাই মহারাষ্ট্রের জাতীয় বীরপুরুষের নামে বাড়ির নামটা বেশ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মনে হয়েছিল। ওমা, পদলক লিখলে ওই নামে নাকি সত্যিই একটা উঁচু ফ্ল্যাটবাড়ি আছে, আর তাতে নাকি ওর ছবির প্রোডিউসার নিজেই থাকেন। বলুন, একে টেলিপ্যাঁথ ছাড়া আর কী বলবেন?’

‘কুং-ফু থাকছে, না বাদ?’ ফেলদা জিগোস করল।

আমরা তিনজনে একসঙ্গে এনটার দ্য ড্র্যাগন দেখার পর থেকেই লাল-মোহনবাবুর মাথায় ঢুকেছিল যে গল্পে কুং-ফু ঢোকাবেন। ফেলদার প্রশ্নের উত্তরে লালমোহনবাবু বললেন, ‘অলবৎ থাকছে। সেটার কথা আমি আলাদা করে জিগোস করেছিলাম; তাতে লিখেছে ম্যাড্রাস থেকে স্পেশালি কুং-ফু-র জন্য ফাইট মাস্টার আসছে। বলে নাকি হংকং-ট্রেনড।’

‘শুটিং শুরু কবে?’

‘সেইটে জিগোস করে আজ একটা চিঠি লিখছি। জ্ঞানার পর আমাদের যাবার তারিখটা ফিক্স করব। আমাদের—থুঁড়ি, আমার গল্পের শুটিং শুরু হবে, আর আমরা সেখানে থাকব না সে কী করে হয় মশাই?’

ভায়মন্ডা এর আগেও খেয়েছি, কিন্তু আজকে যতটা ভালো লাগল তেমন আর কোনদিন লাগেনি।

পরে রবিবার আবার লালমোহনবাবুর আবির্ভাব। ফেলদুদা আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিল ভদ্রলোককে অধিক খরচ অফার করবে, কারণ ওর নিজের হাতেও সম্প্রতি কিছু টাকা এসেছে। শুধু কেস থেকে নয়; গত তিন মাসে ও দুটো ইংরাজি বই অনুবাদ করেছে—উনিবিংশ শতাব্দীর দুজন বিখ্যাত পর্যটকের ভ্রমণ কাহিনী—দুটোই ছাপা হচ্ছে, আর দুটো থেকেই কিছু আগাম টাকা পেয়েছে ও। এর আগেও অবসর সময় ফেলদুদাকে মাঝে মাঝে লিখতে দেখেছি—কিন্তু আদা-নুন খেয়ে লিখতে লাগা এই প্রথম।

লালমোহনবাবু অবশ্য ফেলদুদার প্রস্তাব এক কথায় উড়িয়ে দিলেন। বললেন, 'খেপেছেন? লেখার ব্যাপারে আপনি এখন আমার গাইড অ্যান্ড গডফাদার। এটা হল আপনাকে আমার সমান্য দক্ষিণা।'

এই বলে পকেট থেকে দুটো মেনের টিকিট বার করে টেবিলের উপর রেখে বললেন, 'মঙ্গলবার সকাল দশটা প'রভালিশে ফ্লাইট। এক ঘণ্টা আগে রিপোর্টিং টাইম। আমি সোজা দমদমে গিয়ে আপনাদের জন্য ওয়েট করব।'

'শুটিং আরম্ভ হচ্ছে কবে?'

'বিস্মদবার। একেবারে ক্রাইম্যাকনের সান। সেই ট্রেন, মোটর আর বোড়ার ব্যাপারটা।'

এ ছাড়াও আরেকটা খবর দেবার ছিল লালমোহনবাবুর।

'কাল সন্ধ্যবেল্য আরেক ব্যাপার মশাই। এখানকার এক ফিল্ম প্রোডিউসার—ধরমতলায় আপিস—আমার পাবলিশারের কাছ থেকে ঠিকানা জোগাড় করে সোজা আমার বাড়িতে গিয়ে হাজির। সেও "বোম্বাইয়ের বোম্বেটে" ছবি করতে চায়। বঙ্গে বাঙলায় হিন্দি টাইপের ছবি না করলে আর চলছে না। গম্প বিক্রি হয়ে গেছে শুনে বেশ হতাশ হল। বইটা অবিশ্যি উনি নিজে পড়েন নি; ওর এক ভাগ্নে পড়ে ও'কে ধরেছে। আমি বোম্বাই না গিয়েই বইটা লিখেছি শুনে বেশ অবাক হলেন। আমি আর ভাঙলুম না যে মারে-র গাইড টু ইন্ডিয়া আর ফেলু মিস্তিরের গাইডেন্স ছাড়া এ কাজ হত না।'

'ভদ্রলোক বাঙালী?'

'ইয়েস স্যার। বারেন্দ্র। সন্ন্যাস। কথায় পশ্চিমা ট্রেন আছে। বললেন জন্মলগ্নে মানুষ। গায়ে উগ্র পারফিউমের গন্ধ। নাক জ্বলে যায় মশাই।'

পুরুষ মানুষ এভাবে সেন্ট মাথে এই প্রথম এক্সপেরিয়েন্স করলুম। যাই হোক, আমি চলে যাচ্ছি শুনে একটা ঠিকানা দিয়ে দিলেন। বললেন, "কোনো অসুবিধে হলে একে ফোন করতে পারেন। আমার এ বন্ধুটি খুব হেলপ্‌ফুল।"

কলকাতায় ডিসেম্বরে বেশ শীত পড়লেও বম্বেতে নাকি তেমন ঠান্ডা পড়ে না। আমাদের ছোট দুটো স্টুডেন্টসেই সব ম্যানেজ হয়ে গেল। মঙ্গলবার সকালে উঠে দেখি কুয়াশার রাস্তার ওপারে পল্টুদের বাড়িটা পর্যন্ত ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। শেলন ছাড়বে ত? আশ্চর্য, নটার মধ্যে সব সাফ হয়ে গিয়ে ঝক্‌ঝকে রোদ উঠে গেল। ভি আই পি রোডে এমনিতেই শহরের চেয়ে বেশি কুয়াশা হয়, কিন্তু আজ দেখলাম তেমন কিছু নয়।

এয়ারপোর্টে যখন পৌঁছলাম তখন শেলন ছাড়তে পঁচাত্তর মিনিট বাকি। লালমোহনবাবু আগেই হাজির। এমন কি বোর্ডিং কার্ডও দেখলাম উঁকি মারছে পকেট থেকে। বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, ফেল্দাবু—লম্বা কিউ দেখে ভাবলুম যদি জানলার ধারে সীট না পাই, তাই আগেভাগেই সেরে রাখলুম। এইচ রো—দেখুন হয়ত দেখবেন কাছাকাছি সীট পেয়ে গেছেন।'

'আপনার হাতে ওটা কী? কী বই কিনলেন?'

লালমোহনবাবুর বগলে একটা ব্রাউন কাগজের প্যাকেট দেখে আমার মনে হচ্ছিল উনি নিজের বই সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন ওখানে কাউকে দেবেন বলে। ফেল্দাবুর প্রশ্নের জবাবে ভদ্রলোক বললেন, 'কিনব কী মশাই; সেই সামান্য—সেদিন যার কথা বলেছিলাম—সে দিয়ে গেল এই মিনিট দশেক আগে।'

'উপহার?'

'নো সার। বম্বে এয়ারপোর্টে লোক এসে নিয়ে যাবে। আমার নাম-খাম তাকে জানিয়ে দিয়েছেন। কোন এক আত্মীয়ের কাছে যাবে এ বই।' তারপর একটু হেসে বললেন, 'ইয়ে—একটা বেশ আড্ডাভেঙারের গন্ধ পাচ্ছেন না?'

'পাওয়া মর্শাকিল', বলল ফেল্দাবু, 'কারণ ভারত কেমিক্যালস-এর গুল-বাহার সেন্টের গন্ধ আর সব গন্ধকে স্মান করে দিয়েছে।'

গন্ধটা আমিও পেয়েছিলাম। সামান্য মশাই এমনই সেন্ট মাস্ক—যে তার সুবাস এই প্যাকেটে পর্যন্ত লেগে রয়েছে।

'যা বলেছেন স্যার, হ্যাঃ হ্যাঃ', সাহা দিলেন জটিলদুঃ। 'জবে অনেক সময় শূনিচ এইভাবে লোকে উল্টোপাল্টা জিনিসও চলানু-দেখা।'

'সে ত বাটেই। বর্কিং কাউন্টারে ত নোটসই জাগানো আছে যে অচেনা লোকের হাত থেকে চাপান দেওয়ার জন্য কোনো জিনিস নেওয়াটা বিপজ্জনক। অধিশা এ ভদ্রলোককে টেকনিক্যালি ঠিক অচেনা বলা চলে না, আর প্যাকেটটাও

যে বইয়ের সেটা সম্ভেদ করার কোনো কারণ দেখছি না।

স্টেনে তিনজনে পাশাপাশি জায়গা পেলাম না; লালমোহনবাবু আমাদের তিনটে সারি শিখরে জানলার ধারে বসলেন। ছাইটে বলবার মতো ভেমন কিছু ঘটেইনি। কেবল লাউজম্পীকারে ক্যাপ্টেন দত্ত যখন বসছেন আমরা নাগপুরের উপর দিগন্ত ঘাচ্ছি, তখন পিছন ফিরে দেখি লালমোহনবাবু সীটে ছেড়ে উঠে স্টেনের ল্যাজার দিকটার চলেছেন। শেষটার একজন এয়ার হোস্টেস ওকে ধাক্কিয়ে উল্টো দিক দেখিয়ে দিতে ভুললোক আবার সারা পথ হেঁটে সোজা পাইলটের দরজা খুলে ককপিটে ঢুকে তক্ষুনি বেরিয়ে এসে জিভ কেটে বাঁ দিকের দরজা দিয়ে বাথরুমে ঢুকলেন। নিজের সীটে ফেরার পথে আমার উপর ঝুঁকে পড়ে কানে ফিস্ ফিস্ করে বলে গেলেন, 'আমার পাশের লোকটিকে এক কলক দেখে নাও। হাই-জ্যাকার হলে আশ্চর্য হব না।'

মাথা ঘুরিয়ে দেখে বুঝলাম জটায়ু অ্যাডভেঞ্চারের জন্য একেবারে হনো হয়ে না থাকলে ওরকম নিরীহ, নৈই-খুঁতনি মানুষটাকে কক্ষনো হাই-জ্যাকার ভাবতেন না।

স্যান্টা ক্লজ স্টেন ল্যান্ড করার ঠিক আগেই লালমোহনবাবু ব্যাগ থেকে বইটা বার করে রেখেছিলেন। ডায়েরিস্টিক লাউঞ্জে ঢুকে আমরা তিনজনেই এদিক ওদিক দেখছি, এমন সময় 'মিস্টার গ্যাংলুই?' শুনে ডাইনে ঘুরে দেখি গাঢ় লাল রঙের টোরলিনের সার্ট পরা একজন লোক মাদ্রাজী টাইপের এক ভুললোককে প্রশ্নটা করে তার দিকে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে চেয়ে আছে। ভুললোক একটু যেন বিরক্ত ভাবেই মাথা নোড়ে না বলে লোকটাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন, আর লালমোহনবাবুও বই হাতে লাল সার্টের দিকে এগিয়ে গেলেন।

'আই অ্যাম মিস্টার গ্যাংলুই অ্যান্ড দিস ইজ ফ্রম মিস্টার সান্যাল', এক নিশ্বাসে বলে ফেললেন জটায়ু।

লাল সার্ট বইটা নিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেলেন, আর লালমোহনবাবুও কতবা সেরে নিশ্চিন্ত হাত ঝাড়লেন।

আমাদের গাল বোঝাতে লাগল আধ ঘন্টা। এখন একটা বেজে কুড়ি, শহরে পৌঁছতে পৌঁছতে হয়ে যাবে প্রায় দুটে। পুঙ্ক ঘোষাল গাড়ির নম্বরটা জানিয়ে দিয়েছিলেন আগেই, দেখলাম সেটা একটা গেরুরা রঙের স্টার্ডার্ড। ড্রাইভারটি বেশ শৌখিন ও ফিটফট; হিন্দি ছাড়া ইংরেজিটাও মোটামুটি জানে। কলকাতার তিনজন আচেনা লোকের জন্য ভাড়া খাটতে হচ্ছে বলে কোনোরকম বিরক্তির ভাব দেখলাম না। বরং লালমোহনবাবুকে যেরকম একটা সেলাম ঠুকল তাতে মনে হল কাজটা পেয়ে সে কৃতার্থ। ড্রাইভারই খবর দিল যে

শহরের ভিতরেই শালিমার হোটেলে আমাদের থাকার বন্দোবস্ত হয়েছে, আর পুলকবাবু বিকেল সড়ে পাঁচটার সময় হোটেলে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন। গাড়ি আমাদের জন্য রাখা থাকবে, আমরা যখন খুঁশি যেখানে ইচ্ছা যেতে পারি।

ফেলদা অবিশ্বাসে এখানে আসবার আগে ওর অভ্যাস মতো বম্বে সম্বন্ধে পড়াশুনা করে নিয়েছে। ও বলে কোনো নতুন জায়গার আসার আগে এ জিনিসটা করে না নিলে নাকি সে জায়গা দূরেই থেকে যায়। মানুষের যেমন একটা পরিচয় তার নামে, একটা চেহারা, একটা চরিত্রে আর একটা তার অতীত ইতিহাসে, ঠিক তেমনি নাকি শহরেরও। বম্বে শহরের চেহারা আর চরিত্র এখনো ফেলদার জানা নেই, তবে এটা জানে যে শালিমার হোটেল হল কম্পাস কর্নারের কাছে।

আমাদের গাড়ি, হাইওয়ে দিয়ে গিয়ে একটা বড় রাস্তায় পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফেলদা ড্রাইভারকে উদ্দেশ্য করে বলল—‘উয়ো ঘো ট্যাক্সি হায় না—এম আর পি পি ফাইভ পি এইট—উস্কা পিছে পিছে চল্‌না।’

‘কী ব্যাপার মশাই?’ লালমোহনবাবু জিগোস করলেন।

‘একটা সামান্য কৌতূহল’, বলল ফেলদা।

আমাদের গাড়ি একটা স্কুটার আর দুটো অ্যাম্বাসাডারকে জাড়িয়ে ফিয়াট ট্যাক্সিটার ঠিক পিছনে এসে পড়ল। এবার ট্যাক্সিটার পিছনের কাঁচ দিয়ে দেখলাম ভিতরে কয় লাল টোপালিনের সার্ভে।

একটু যেন বুকটা কেঁপে উঠল। কিছুই হয়নি, কেন ফেলদা ট্যাক্সিটাকে ধাওয়া করছে তাও জানি না, তবে ব্যাপারটা আমার হিসেবের বাইরে বলেই যেন একটা রহস্য আর অজ্ঞেয়তার ছোঁয়া লাগল। লালমোহনবাবু অবিশ্বাসে আঙ্গুল ধরেই নিয়েছেন যে ফেলদার সব কাজের মানে জিগোস করে সব সময়ে সঠিক উত্তর পাওয়া যাবে না; যথাসময়ে আপনা থেকেই সেটা জানা যাবে।

আমাদের গাড়ি দাঁড়ি ট্যাক্সিটাকে চোখে রেখে চলেছে, আমরাও নতুন শহরের রাস্তাঘাট লোকজন দেখতে দেখতে চলেছি। একটা জিনিস বলতেই হবে—হিন্দি ছবির এত বেশি আর এত বড় বড় বিজ্ঞাপন আর কোম্পানি শহরের রাস্তার দোখানি। লালমোহনবাবু কিছুক্ষণ ধরে ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে সেগুলো দেখে বললেন, ‘সবাইয়ের নামই ত দেখছি, অথচ কাহিনীকল্পের নামটা যেন চোখে পড়ছে না। এরা কি গল্প লেখায় না কাউকে দিচ্ছে?’

ফেলদা বলল, ‘গল্প লেখক হিসেবে নাম যদি আঁগা করেন তাহলে বম্বে আপনার জায়গা নয়। এখানে গল্প লেখা হয় না, গল্প তৈরি হয়, মানুষ্যাকচার হয়—যেমন বাজারের আর পাঁচটা জিনিস মানুষ্যাকচার হয়। লাক্ষ সাবান

কে তৈরি করেছে তার সাক্ষ্য কি কেউ জানে?—কোম্পানির নামটা হয়ত জানে।
টাকা পাচ্ছেন, বাস্, স্বার্থটি বন্ধ করে বসে থাকুন। সম্মানের কথা ভুলে যান।'

'হুঁ...।' জাঙ্গমোহনবাবু বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। 'তাহলে মান হল
গিয়ে অঙ্গনার বেগলে, আর কস্বেতে হচ্ছে মানি?'

'হুজ্ কখা', বলল ফেলদুদা।

ফেলদুদা যে-এলাকাটাকে মহালক্ষ্মী বলে বলল, সেটা ছাড়িয়ে কিছুদূর
গিয়ে আমাদের মার্কামারা ট্যাক্সিটা একটা ডান দিকের বাস্তু ধরল। আমাদের
ড্রাইভার বলল যে শরলিমার হোটেল যেতে হলে আমাদের সোজাই যাওয়া উচিত।

ফেলদুদা বলল, 'আপ দাঁয়া চাঙ্গিয়ে।'

ডান দিকে ঘুরে মিনিট দু'এক যেতেই দেখলাম ট্যাক্সিটা বাঁ দিকে একটা
গেটের ভিতর ঢুকে গেল। ফেলদুদার নির্দেশে আমাদের গাড়ি গেটের বাইরেই
থামল। আমরা তিনজনেই গাড়ি থেকে নামলাম, আর নামার সঙ্গে সঙ্গেই
হি'ক করে একটা অদ্ভুত শব্দ করলেন।

কারণটা পরিষ্কার। আমরা একটা বিরাট ঢাঙা খাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছি,
তার তিন তলার হাইটে বড় বড় উ'চু, উ'চু কালো অক্ষরে ইংরাজিতে লেখা—
শিবাজী কাস্‌ল।

নামটা দেখে আমার এত অবাক লাগল যে, কিছুক্ষণ কোনো কথাই বলতে পারলাম না। 'এ যে টেলিফোনের ঠাকুরদাদা!'— বললেন লালমোহনবাবু।

ফেলুদা চুপ। দেখলাম ও শুধু বাড়িটাই দেখছে না, তার আশপাশটাও দেখছে। বাঁ দিকে পর পর অনেকগুলো বাড়ি, তার কোনোটাই বিশতলার কম না। ডানদিকের বাড়িগুলো নিচু আর পুরোনো, আর সেগুলোর ফাঁক দিয়ে পিছনে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে।

ড্রাইভার একটু খেন অবাক হয়েছে আমাদের হাবভাব লক্ষ করছিল। ফেলুদা তাকে অপেক্ষা করতে বলে সোজা গেটের ভিতর দিয়ে ঢুকে গেল। আমি আর লালমোহনবাবু বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলাম।

মিনিট তিনেক পরেই ফেলুদা বেরিয়ে এল।

'চলিয়ে শালিমার হোটেল।'

আমরা অস্বাভাবিক রঙের দিলাম। ফেলুদা একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'খুব সম্ভবত সেভেনটিন্স ফ্লোরে, অর্থাৎ আঠারো তলায়, গেছে আপনার বইয়ের প্যাকেট।'

'আপনি যে ভেলকি দেখালেন মশাই', বললেন লালমোহনবাবু, 'এই তিন মিনিটের মধ্যে অত বড় বাড়ির কোন তলায় গেছে লোকটা সেটা কেনে ফেলে দিলেন?'

'আঠারোতলায় গেছে কিনা জানবার জন্য আঠারোতলায় ওঠার দরকার হয় না। একতলার লিফ্টের মাথার উপরেই বোর্ড নম্বর লেখা থাকে। যখন পৌঁছলাম তখন লিফ্ট উঠতে শুরু করে দিয়েছে। শেষ যে নম্বরটার বাতি জ্বলে উঠল, সেটা হল সতেরো। এবার বুঝেছেন ত?'

লালমোহনবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'বুঝলুম ত। এত সহজ ব্যাপারটা আমাদের মাথায় কেন আসে না সেটাই ত বুঝি না।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই শালিমার হোটেলে পৌঁছে গেলাম। ফেলুদা আর আমার জন্য পাঁচতলায় একটা ডাবল রুম, আর লালমোহনবাবুর জন্য ওই একই তলায় আমাদের উলটো দিকে একটা সিঙ্গেল। আমাদের ঘরটা রান্ধার দিকে, জানালা দিয়ে নিচে চাইলেই অবিরাম বাড়ির স্রোত, আর সামনের দিকে চাইলে দুটো ঢাঙা বাড়ির ফাঁক দিয়ে দূরে সমুদ্র। বম্বে যে একটা গমগমে

খুন।’

‘সে কি!’—অজ্ঞাত তিনজনে প্রায় একসঙ্গে বলে উঠল। খ-য়ে হুস্বত অ’র ন—এই দুটো পর পর জুড়লে আপনা থেকেই যেন শিউরে উঠতে হয়।

‘আমি খরর পাই এই আশখন্টা আগে’, বললেন পুলকবাবু। ‘ও বাড়িতে ত আমার রেজদুলার যাতায়াত মশাই! মিস্টার গোরেও শিবাজী কাসলেই থাকেন—
হায়ো! স্বর ফেরে। সাথে কি আপনার গম্প বাড়ির নাম চেঞ্জ করতে হয়েছে! অ’র্বিশ্য উনি নিজে খুব মাইডিয়া’র লোক।—আপনারা বাড়ির ভেতরে গেসলেন নাকি?’

‘আমি গিয়েছিলাম,’ বলল ফেলুদা, ‘লিফটের দরজা অ’র্বাধ।’

‘ওরেব্বা! লিফটের ভেতরেই ত খুন। লাশ সনাক্ত হয়নি এখনো। দেখতে গুন্ডা টাইপ। তিনটে নাগাং ভাগরাজন বলে ওখানকারই এক বাসিন্দা তিন-তলা থেকে লিফটের জন্য বেল টেপে। লিফট ওপর থেকে নিচে নেমে আসে। ভদ্রলোক দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতে গিয়েই দেখেন এই ক’ন্ড। পেটে ছোরা মেরেছে মশাই। হরিবল ব্যাপার।’

‘এই সময়টায় লিফটে কাউকে উঠতে-টুঠতে দেখেনি কেউ?’ প্রশ্ন করল ফেলুদা।

‘লিফটের আশেপাশে কেউ ছিল না। তবে বিন্ডিং-এর বাইরে দু’জন ড্রাইভার ছিল, তারা এই সময়টায় পাঁচ-ছ’জনকে ঢুকতে দেখেছে। তার মধ্যে একজনের গায়ে লাল সার্ট, একজনের কাঁধে ব্যাগ আর গায়ে খয়েরি রঙের—’

ফেলুদা হাত তুলে পুলকবাবুকে থামিয়ে বলল, ‘ওই দ্বিতীয় ব্যক্তিটি স্বয়ং আমি, কাজেই আর বেশি বলার দরকার নেই।’

আমার বুদ্ধের ভিতরটা খড়াস করে উঠেছে। সর্বনাশ!—ফেলুদা কি খুনের মামলায় জড়িয়ে পড়বে নাকি?

‘এনিওয়ে’, আশ্বাসের সুরে বললেন পুলক ঘোষাল, ‘ও নিজে আপনি চিন্তা করবেন না। আপনিও না লজ্জা। আপনার গম্প শিবাজী কাসলে স্মাগলার থাকে লিখেছেন, তাতে আর ভয়ের কি আছে বলুন। বস্বেস কোন্ অ্যাপার্টমেন্টে স্মাগলার থাকে না? মিসায় আর কটাকে ধরেছে? এ তো সব খোঁসা ছাড়ুনো চলছে এখন, শাসি পেঁছাতে অনেক দেরি। সারা শহরটাই ত স্মাগলিং-এর উপর দাঁড়িয়ে আছে।’

ফেলুদাকে বেশ চিন্তিত মনে হচ্ছিল। তবে সে ভাবটা কেটে গেল আরেকজন লোকের আবির্ভাবে। দ্বিতীয় টোকার শব্দ হতে পুলকবাবুই চেয়ার ছেড়ে ‘এই বোধহয় ভিকটর’ বলে উঠে গিয়ে দরজা খুললেন। চাবুকের মতো শরীরওয়ালা মাঝারি হাইটের একজন লোক ঘরে ঢুকল।

‘পরিচয় করিয়ে দিই লালদা—ইনি হলেন ভিকটর পেরুমল—হংকং-ট্রেন্ড কুং-ফু এক্সপার্ট।’

ভদ্রলোক দিবা খোলতাই হেসে আমাদের সকলের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন।

‘ভাঙা ভাঙা ইংরিজি বলেন,’ পলকবাবু বললেন, ‘আর হিন্দি শু বটেই, যদিও ইনি দক্ষিণ ভারতের লোক। আর ইনি শুধু কুং-ফু শেখান না, এ’র স্টাশেটরও জবাব নেই। ঘোড়া থেকে চলন্ত ট্রেনের উপর লাফিয়ে পড়ার ব্যাপারটা হিরোর ভাইয়ের মেক-আপ নিয়ে ইনিই করবেন।’



আমার ভদ্রলোককে দেখে কেন জার্নি বেশ ভালো লেগে গিয়েছিল। হাসি-টার মধ্যে সত্যিই একটা খোলসা ভাব আছে। তার উপরে স্ট্যান্ডম্যান শুনে ভদ্রলোকের উপর একটা ভক্তিবাবুও জেগে উঠল। যারা সামান্য কটা টাকার জন্য দিনের পর দিন নিজেকে জীবন বিপন্ন করে, আর তার জন্য বাহুবা নিয়ে যায় প্রসি-দেওয়া হিরোগুলো, তাদের সাবাস বলতেই হয়।

ভিকটর পেরুমল বললেন তিনি শুধু কুং-ফু-ই শেখানেন না—‘আই নো মোক্কাইরি অলসো।’

মোক্কাইরি? সে আবার কী? ফেলদার যে এত জ্ঞান, ও-ও বলল জানে না; আর লালমোহনবাবুর কথা শুনে ছেড়েই দিলাম, কারণ উনি নিজের লেখা

ছাড়া বিশেষ কিছু প্রজেক্ট-টুডেন না।

পেরদুল বলল, মোক্কাইরি হচ্ছে নাকি এক-রকম ফাইটিং যেটা করার জন্য পা শুনো তুলে ধরে হটিতে হয়। এটা নাকি হংকং-এ চালু হয়েছে মাত্র মাস দুয়েক হলে, যদিও জন্মস্থান জাপান।

‘এটাও রয়েছে নাকি ছবিতে?’ লালমোহনবাবু যেন কিশিৎ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন। পদুলক ঘোষাল হেসে মাথা নাড়লেন। ‘এক কুং-ফু-র স্টেজাই আগে সামলাই। এগারোজন লোককে সকাল-বিকেল ট্রেনিং দিতে হচ্ছে সেই নভেম্বরের গোড়া থেকে। আপনি ত লিখে খাল্যাস, ঋত্বিক ত পোয়াতে হচ্ছে আমাদের। অর্বিশা আপনারা যে শূটিংটা দেখবেন তাতে কুং-ফু নেই। এতে দেখবেন স্টান্টম্যানের খেলা।...ক্লাস ছবি হবে আপনার গম্পা থেকে লালদা—কুছ পরোয়া নেই।’

পদুলক ঘোষাল আর ভিকটর চলে যাবার পর ফেলদা সোফা ছেড়ে উঠে গিয়ে জানালাটা খুলে দিল, আর সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার ট্র্যাফিকের শব্দ ঘর ভরে গেল। অর্বিশা পাঁচতলা হওয়াতে তার জন্য কথা বলতে অসুবিধা হচ্ছিল না। আসলে আমাদের কারুরই এয়ারকন্ডিশনিং-এর অভ্যাসও নেই, ভালোও লাগে না। বাইরের শব্দ আসুক; তার সঙ্গে খাঁটি বাতাসটাও ত ঢুকছে।

জানালা থেকে ফিরে এসে সোফায় বসে ফেলদা একটু যেন গম্ভীরভাবেই বলল, ‘লালমোহনবাবু, অ্যাডভেঞ্চারের গম্ভটা যেসকল উগ্র হয়ে উঠছে সেটা বেশ অস্বস্তিকর। আপনি ওই প্যাকেটটা চালানোর ভার না নিলেই পারতেন। আমি যদি তখন থাকতাম, তাহলে আপনাকে বারণ করতাম।’

‘কী করি বলুন,’ লালমোহনবাবু কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, ‘ভদ্রলোক বললেন, আমি এর পর যে গম্পাটা লিখব সেটা যেন ওঁর জন্য রিজার্ভ করে রাখি। তারপরে আর কী করে না বলি বলুন।’

‘বাগপারটা কী জানেন? এয়ারপোর্টে যখন সিকিউরিটি চেক হয়, তখন নিয়ম হচ্ছে প্যাসেঞ্জারের কাছে মোড়ক জাতীয় কিছু থাকলে সেটা খুলে দেখা। আপনাকে নিরীহ মনে করে আপনার বেলা সেটা আর করিনি। খুললে কী বেরোত কে জানে? ওই প্যাকেটের সঙ্গে যে ওই খুনের সম্বন্ধ নেই তা কে বলতে পারে?’

লালমোহনবাবু গলা খাঁকরে মিনমিন করে বললেন, ‘কিন্তু একটা বইয়ের প্যাকেটে আর...’

‘বই মানেই যে বই তা ত নাও হতে পারে। অংতির মধ্যে বিশ্ব রাখার ব্যবস্থা থাকত রাজন্যবাদশাসনের আমলে সেটা জানেন? সে তাংটিকে শব্দ

আংটি বললে কি ঠিক হবে? আংটিও বটে, বিষমধারও বটে!...যাক, আপনার কর্তব্য যখন নির্বিঘ্নে সারা হয়ে গেছে, তখন আপনার নিজের কোনো বিপদ নেই বলেই মনে হচ্ছে।'

'কেন?'' লালমোহনবাবুর মুখে এতক্ষণে হাসি ফুটেছে।

'বলছি বৈকি', ফেলুদা বলল। 'আর আপনার বিপদ মানে ত আমাদেরও বিপদ। এক সূত্রে বাঁধা আছি আমরা তিনজনায়। সুতোর টান পড়লে তিন-জনেই কাত।'

লালমোহনবাবু এক ঝটকায় খাট থেকে উঠে বাঁ পা-টেকে কুৎফুর মতো করে শূন্যে একটু লাথি মেরে বললেন, 'শ্রী চিত্তারন ফর দ্য শ্রী মাস্কেটিয়ারস! —হিপ হিপ—'

ফেলুদা আর আমি লালমোহনবাবুর সঙ্গে গলা মেলালাম—

'হুররে!'

সন্ধ্যা ছটা নাগাদ আমরা হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লাম। পারে হে'টে ঘুরে না দেখলে নতুন শহর দেখা হয় না এটা আমরা তিনজনেই বিশ্বাস করি। বোধপূর, কাশী, দিল্লি, গয়াটক—সব জায়গাতেই আমরা এ জিনিসটা করেছি। বম্বেতেই বা করব ন্ন কেন?

হোটেল থেকে বেরিয়ে ডানদিকে কিছু দূর গেলেই যাকে কম্পস কর্নার বলে সেখানে একটা দুর্দান্ত ফ্লাই-ওভার পড়ে। প্রকান্ড প্রকান্ড তাগড়ই আমার উপর দিয়ে ব্রিজের মতো রাস্তা, তার উপরেও ট্র্যাফিক, নিচেও ট্র্যাফিক। আমরা ব্রিজের তলা দিয়ে রাস্তা পেরিয়ে গিবস রোড দিয়ে দক্ষিণ দিকে চলেছি। ফেলুদা ডানদিকে দেখিয়ে দিল পাহাড়ের গা দিয়ে হ্যাংগিং গার্ডেনস যাবার রাস্তা। এই পাহাড়ের নামই মালাবার হিলস।

মাইলখানেক এগিয়ে যেতে সামনে সমুদ্র পড়ল। আপিস ফেরত গাড়ির স্রোত এঁড়িয়ে রাস্তা পেরিয়ে এক কোমর উঁচু পাথরের পাঁচিলের ধারে গিয়ে দাঁড়লাম। পাঁচিলের পিছন দিকে সমুদ্রের জল এসে আছড়ে আছড়ে পড়ছে।

রাস্তাটা বাঁদিক দিয়ে সোজা পূর্বে চলে গিয়ে গেলে হয়ে ঘুরে শেষ হয়েছে সেই একেবারে দক্ষিণে। যেখানের আকাশছোঁয়া বাড়িগুলো ব্যপসা হয়ে আছে বিকেলের পড়ন্ত রোদে। ওই ধনুকের মতো রাস্তাটা ন্যাক ম্যারিন ড্রাইভ।

লালমোহনবাবু বললেন, 'স্বাগতায়ই বলুন আর যাই বলুন—পাহাড় আর সমুদ্র মিলিয়ে বম্বে একেবারে চ্যাম্পিয়ন শহর মশাই।'

পাঁচিলের ধার দিয়ে আমরা ম্যারিন ড্রাইভের দিকে এগোতে লাগলাম। বাঁ দিক দিয়ে পিপাড়ের সারির মতো গাড়ি চলেছে। কিছুক্ষণ হাঁটার পর লালমোহনবাবু আরেকটা মন্তব্য করলেন।

‘এখানে বোধহয় সি এম ডি এ নেই; আছে কি?’

‘রাস্তায় খানাখন্দ নেই বলে বলছেন ত?’

‘এয়ারপোর্ট থেকে আসার সময়ই লক্ষ্য করছিলাম যে গাড়িতে চলেছি, অথচ লাফাচ্ছি না। অবিশ্বাস্য!’

কিছুক্ষণ থেকেই সমুদ্রের ধারে একটা জায়গায় ভিড় লক্ষ্য করছিলাম।

যেমন রবিবার আমাদের শহীদ মিনারের নিচে হয়, অনেকটা সেই রকম। আরো কাছে যেতে ফেলদা বলল জায়গাটার নাম চোপার্টি। এখানে রোজই নার্কি রথের মেলায় মতো ভিড় হয়। সারবাধা দোকান, দেখেই মনে হয় ফুচকা বা ভেলপদুরী বা আইসক্রীম বা ওই জাতীয় কিছু বিক্রী হচ্ছে।

তবে কাছে এসে বুদ্ধলাম আন্দাজে ভুল করিনি। মেলার মতো মেলা বটে। অর্ধেক বম্ব শহর ভেঙে পড়েছে এখানে। লালমোহনবাবু শিপিংরই রিচ ম্যান হচ্ছেন, তাই ও'র ঘাড় ভাঙতে দোষ নেই। তিনজনে হাতে ভেলপদুরীর ঠোঙা নিয়ে ভিড় আর হৈহুজোড় ছেড়ে এগিয়ে গিয়ে সমুদ্রের ধারে বালির উপর বসলাম। ঘড়িতে পোনে সাড়টা, কিন্তু এখনো আকাশে গোলাপী রঙ। আমাদের মতো অনেকেই বালির উপর বসে আরাম করছে। লালমোহনবাবু খাওয়া শেষ করে হাত নেড়ে একটা সংস্কৃত শ্লোক আঙুড়াতে গিয়ে থেমে গেলেন। বাঁ দিকে বসে থাকা লোকজনের মধ্যে কারুর হাত থেকে একটা খবরের কাগজ উড়ে এসে ভদ্রলোকের মূখের উপর লেপটে গিয়ে কথা কথ করে দিচ্ছে।

কাগজটা হাতে নিয়ে নামটা দেখে লালমোহনবাবু সব 'ইভনিং নিউজ' কথাটা বলেছেন, এমন সময় ফেলদা তাঁর হাত থেকে সেটা ছিনিয়ে নিল।

'নামটা পড়লেন, আর তার নিচে হেড-লাইনট' চোখে পড়ল না?'

আমরা তিনজনে একসঙ্গে কাগজটার উপর বুদ্ধকে পড়লাম। হেডলাইন হচ্ছে—'মার্ভার ইন ডাপার্টমেন্ট লিফ্ট', আর তার নিচেই যে খুন হয়েছে তার ছবি। যাক্—এ তাহলে আমাদের সালশার্ট নয়।

খবরে বলছে খুনটা হয়েছে দুটো থেকে আড়াইটার মধ্যে। খুনী এখনো ধরা পড়েনি, তবে পুর্লিশ অনুসন্ধান চালাচ্ছে। যে খুন হয়েছে তার নাম মঙ্গলরাম শেঠী। চোরাকারবারীদের সঙ্গে যুক্ত ছিল, বেশ কিছুদিন থেকেই পুর্লিশ খুঁজছে। লিফ্টে বেশ যত্নসহকারিত হয়েছিল তারও নার্কি প্রমাণ পাওয়া গেছে। ক্রায়ের মধ্যে নার্কি এক টুকরো কাগজ পাওয়া গেছে মৃতদেহের পাশে। কাগজে একজনের নাম ছিল। নামটা হচ্ছে—

'ও আঁ আঁ আঁ আঁ...'

একটা অদ্ভুত গোষ্ঠানি-গাইপের শব্দ লালমোহনবাবুর গলা দিয়ে বেরোল। ভদ্রলোক অজ্ঞান হয়ে যেতে পারেন মনে করে আমি ভাড়াটারিড্ ও'কে জাপটে করলাম। অবিশ্যি এরকম করার যথেষ্ট কারণ ছিল। ইভনিং নিউজ লিখছে চিরকুটে লেখা ছিল—'মিস্টার গাঙ্গুলী, ডার্ক, শার্ট, বক্স, মুসটাশ।'

খবরটা পড়া শেষ হওয়া মাত্র লালমোহনবাবু ফেলদার হাত থেকে কাগজটা খামচে ছিনিয়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে হাওয়ায় উড়িয়ে

নিলেন।

ফেলুদা বলল, 'এমন পরিষ্কার সমুদ্রতটটিকে আবর্জনা ভরিয়ে দিলেন?'

ভদ্রলোক এখনি ভালো করে কথা বলতে পারছেন না দেখে ফেলুদা এবার ধমকের সুরে বলল, 'আপনার কি ধারণা গোটা শহরের লোক আপনাকে দেখেই বুদ্ধে ফেলবে যে আপনিই হচ্ছেন এই ব্যক্তি?'

জালামোহনবাবু এতেও সান্দ্রনা পেলেন না। কোনরকমে ঢোক গিলে বললেন, 'কিন্তু—কিন্তু—এর মানেটা বুদ্ধছেন ত? কে খুন করেছে বুদ্ধছেন ত?'

ফেলুদা বেশ কয়েক সেকেন্ড চুপ করে একদৃষ্টে জালামোহনবাবুর দিকে চেয়ে থেকে মাথা নেড়ে বলল, 'জালামুদা, চার বছর আমার সংসর্গ-লাভ করেও মাথা ঠান্ডা করে ভাবতে শিখলেন না।'

'কেন, কেন—লাল শার্ট—?'

'লাল শার্ট কী? কাগজটা লাল শার্টেরই হাত থেকে লিফটে পড়েছে সেটা ধরে নিলেও তাতে কী প্রমাণ হচ্ছে? তার মানেই যে সে খুন করেছে তার কী প্রমাণ? আপনার কাছ থেকে প্যাকেট পাবার পর তার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক শেষ—এটা ত ঠিক? তাহলে কাগজেরও তার আর কোনো প্রয়োজন থাকে না। লিফটে ওঠার সময় সেটা পকেটে রয়ে গেছে দেখে সে সেটা লিফটেই ফেলে দিল—এমন ভাবতে খুব কষ্ট হচ্ছে কি?'

জালামোহনবাবু তবুও ঠান্ডা হলেন না। 'আপনি যাই বলুন, লাশের পাংশ যখন আমার নাম আর ডেসক্টিপশন লেখা কাগজ পেয়েছে, তখন আমার চরম ভোগান্তি আছে—এ আমি পুষ্ট দেখতে পাচ্ছি। রাস্তা একটাই। টাকে ত আর চুল গজাবে না, হাইটও বাড়বে না, আর কমপ্লেকশনও চেষ্টা হবে না। আছে এক গোর্ফ। আপনি যাই বলুন, এ গোর্ফ আমি কালই হাওয়া করে দেব।'

'আর হোটেলের লোকেরা কী ভাববে? তারা কি আর ইভনিং নিউজ পড়েনি ভেবেছেন? খুনের খবর শতকরা নব্বুই ভাগ লোকে পড়বে, মানুষের স্বভাবই ওই। আমার ধারণা আপনি গোর্ফ ছাটলে দৃষ্টিটা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহটা আরো বেশি করে আপনার উপর পড়বে।'

আকাশের জালটা যখন বেগুনী হয়ে শেষে পাংশবর্ণের দিকে যেতে শুরু করেছে, পশ্চিমের চেরা ঘেঘের ফাঁকে শূকতারাটা পূর্বের ম্যারিন ড্রাইভের হাজার আলোর মালার সঙ্গে একা পাল্লা দিতে গিয়ে ধুকপুক করছে, তখন আমরা উঠে পড়ে গা থেকে বালি ঝেড়ে আবার মানুষ আর দোকানের ভিড় পেরিয়ে বড় রাস্তায় গিয়ে একটা টার্মি ধরে হোটেলমুখা হলাম।

রিসেপশন কাউন্টারে চাবি চাইবার সময় দেখলাম লালমোহনবাবু হাতটা
যেদিকে বাড়ালেন, মূখটা তার উল্টোদিকে ঘুরিয়ে রাখলেন। কিন্তু তাতেও
রেহাই নেই, উল্টোদিকে লবিতে বসে সাতজন দেশী-বিদেশী লোকের তিন-
জনের হাতে ইভনিং স্ট্যান্ডার্ড। স্ট্যান্ডার্ডের সামনের পাতাতেও খনের খবর
আর মৃতদেহের ছবি। খবরের মধ্যে টেকো বেংটে গুফো রঙ-ময়লা মিস্টার
গাঙ্গুলীর উল্লেখ নেই এ হতেই পারে না।

লালমোহনবাবু শেষ পর্যন্ত আর গৌফটা কামাননি। রাতে ঘুম হয়েছিল কিনা জিজ্ঞাস্য করাতে বললেন যতবারই চোখ ঢুলে এসেছে ততবারই মনে হয়েছে ও'র ঘরটা লিফ্টের মতো ওঠানমা করছে, আর তার ফলে তন্দ্রা ছুটে গেছে।

পদ্মকবাবু কাল রাতেই ফোন করে বলেছিলেন আজ সকাল দশটায় এসে আমাদের স্টুডিওতে নিয়ে যাবেন। আমরা আটটায় ব্রেকফাস্ট সেরে রাস্তায় বেরিয়ে পেডার রোড দিয়ে খানিকদূরে হেঁটে একটা পানের দোকান থেকে দিবা মিঠে পান কিনে পৌনে নটায় হোটেলে ঢুকতেই কেমন যেন একটা চাপা উত্তেজনার ভাব লক্ষ্য করলাম।

কারণ আর কিছুই না, পুঁজি এয়েছে। একজন ইনস্পেক্টর গোছের লোক কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন, হোটেলের কর্মচারী একটা ইপিগত করতেই তিনি ঘুরে লালমোহনবাবুর দিকে চাইলেন। ইনস্পেক্টরের চাহনিতে যদিও কোনো হুমকির ভাব ছিল না, পাশে একটা খট শব্দ শুনে বুঝলাম লালমোহনবাবুর দুটো হাঁড়িতে ঠোকাঠুঁকি লেগে গেছে।

ইনস্পেক্টর হাসিমুখে লালমোহনবাবুর দিকে এগিয়ে এলেন। ফেলুদা শান্তভাবে লালমোহনবাবুর পিঠে একটা মৃদু চাপ দিয়ে বুঝিয়ে দিল—নার্ভাস হবেন না, ঘাবড়াবার কিছু নেই।

‘ইনস্পেক্টর পটবর্ধন। সি আই ডি থেকে আসছি। আপনি মিস্টার গাঙ্গুলী?’

‘হাঁয়েস।’

এই রে, লালমোহনবাবু ইংরিজি-বাংলা গুলিয়ে ফেলেছেন।

পটবর্ধন ফেলুদার দিকে চাইলেন।

‘আপনারা—?’

ফেলুদা পকেট থেকে ওর প্রাইভেট ইনভেসটিগেটর লেখা কার্ডটা বার করে দিল। পটবর্ধন সেটা পড়ে ফেলুদার দিকে একটা জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দিলেন।

‘মিস্টার? আপনিই কি এলোরার সেই মূর্তি চুরির—?’

ফেলুদা তার একপেশে হাসিটা হেসে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

‘জ্যাড টু মীট ইউ সার’ হাত বাড়িয়ে বললেন পটবর্ধন। ‘ইউ ডিড

‘এ ভোরি গুড় জব দেয়ার।’

ফেলদুদার বন্ধু বলে লালমোহনবাবুর খাতির বেড়ে গেল ঠিকই, কিন্তু জেরার হাত থেকে তিনি রেহাই পেলেন না। কথা হল হোটেলের ম্যানেজারের ঘরে বসে।

পটবর্ধন যা বললেন তাতে জানলাম যে মৃতদেহের গায়ে নাকি অনেক আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে, তবে খুনী এখনো ধরা পড়েনি। কিন্তু একজন লাল শার্ট পরা লোক যে এয়ারপোর্ট থেকে শিবাজী কাস্‌ল-এ এসেছিল সেটা পুর্লিশ বার করেছে ট্যাক্সিওয়ালাটার সম্বন্ধে বার করে। পুর্লিশের ধারণা এই লালশার্টই খুনী এবং তার পকেট থেকেই চিরকুটটা বেরিয়েছে। লালমোহনবাবুর কথা শুনে অবিশ্যি পটবর্ধনের ধারণা আরো বন্ধমূল হল। বললেন, ‘এটা বুদ্ধিতেই পারছিলাম যে লোকটা গাঙ্গুলী নামে কাউকে মারি করতে গিয়েছিল এয়ারপোর্টে। আমরা গতকাল সকাল থেকে দুপুরের মধ্যে বত পেলেন স্যান্টাক্রুজে নেমেছে তার প্রত্যেকটার প্যাসেঞ্জার লিস্ট দেখে ক্যালকাটা ফ্লাইটে গাঙ্গুলী নামটা পাই। তারপর এখানের প্রত্যেক হোটেলে খোঁজ করি। দেখলাম শালিমার হোটেলে দুপুরে এসেছেন মিস্টার এল গাঙ্গুলী।’

পটবর্ধনের আসল হেটা জানার ছিল সেটা হচ্ছে এই ব্যাপারে লালমোহনবাবুর ভূমিকাকে কী; অর্থাৎ ওই কাগজে তার নাম আর চেহারার বর্ণনা থাকবে কেন। লালমোহনবাবু মিস্টার সান্যালের ব্যাপারটা বলাতে পটবর্ধন বললেন, ‘হু ইন্ড দিস সানিয়াল? হাউ ওয়েল ডু ইউ নো হিম?’

লালমোহনবাবু যা বলবার বললেন। সান্যালের ঠিকানা জিজ্ঞাস করাতে বাধা হলেই বলতে হল উনি জানেন না।

সবশেষে ইনস্পেক্টর পটবর্ধন ঠিক ফেলদুদার মতো করেই সাবধান করে দিলেন লালমোহনবাবুকে। বললেন, ‘ঠিক এইভাবেই নিরীহ নির্দোষ লোকের হাত দিয়ে অজ্ঞবান চোরাই মাল পাচার হচ্ছে। কাঠমুন্ডু থেকে কিছু দামী মণিমুন্ডু এদেশে এসেছে বলে আমরা খবর পেয়েছি। শুনছি তার মধ্যে নাকি নানাসাহেবের বিখ্যাত নগ্নলিখা হারও আছে।’

সিপাহী বিদ্রোহের সময় একজন নানাসাহেব ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করত বলে ইতিহাসে পড়েছি। পটবর্ধন সেই নানাসাহেবের কথা বললেন কিনা জানি না।

‘আমরা বিশ্বাস এই প্যাকেটটোতেও কোনো চোরাই মাল ছিল।’ বললেন পটবর্ধন। ‘যে গ্যাঙ এটা কলকাতা থেকে পাঠিয়েছে তারই বিরুদ্ধে গ্যাঙের কেউ খবর পেয়ে শিবাজী কাস্‌লের আশেপাশে ঘুরঘুর করছিল। সেই লোকই লালশার্টকে অস্ত্রমগ্ন করে ফলে লালশার্টের হাতে তার মৃত্যু হয়।’

লালমোহনবাবু ধরেই মিসেয়েছিলেন যে তাঁর নাম লেখা কাগজ পদ্মিশের হাতে পড়াতে তাঁর হয় ফাঁসি না-হয় ব্যবসায়ীকন স্বাধীনতার হবেই। কেবল কয়েকটা উপদেশ-বাক্য শুনে ছাড় পেয়ে যাওয়াতে ভদ্রলোকের চেহারা নতুন জেঙ্গা এসে গেল।

পদ্মকবাবু দশটা বলে এলেন প্রায় এগারোটায়। পদ্মিশের ব্যাপারটা শুনে বললেন, 'আর বলবেন না—কাল কাগজ দেখেই বুকটা ছ্যাৎ করে উঠেছে। লালদুদার সঙ্গে নাম ভেরিফিকেশন সব মিলে যাচ্ছে, অথচ পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে রহস্য।'

সান্যালের ঘটনাটা শুনে বললেন, 'কোন সান্যাল বলুন ত? অহা সান্যাল? মাঝারি হাইট, চোখদুটো একটু বসা, খুতনিতে খাঁজ কাটা?'

'খুতনি ত দেখিনি ভাই। দাঁড় আছে। বোধহয় আগে রাখতেন না।'

'আমি দু'বছর আগের কথা বলছি। একই লোক কিনা জানি না। বোম্বেতে ছিল কিছুদিন। ছবিও প্রোডিউস করেছিল খান দু'এক। মার খেয়েছিল—বন্দুর মনে পড়ে।'

'লোক কিরকম?'

'সে খবর জানি না লালদুদা, তবে বদনাম শুনিনি কখনো।'

'তাহলে বোধহয় কাগজের প্যাকেটে কোনো গোলমাল নেই।'

'দেখুন লালদুদা, আজকাল নেহাৎ স্মার্টলিং-টাগলিং হচ্ছে বলে, নইলে আমরাও ত এককালে অনেক অচেনা লোকের হাত থেকে জিনিস নিয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পৌঁছে দিয়েছি। কই, কোনদিন ত কোনো গোলমাল হয়নি।'

যে গাড়িটা কাল ব্যবহার করেছিলাম, সেটাতেই আমরা চারজনে মহালক্ষ্মীর ফেরাস স্টুডিওতে গিয়ে হাজির হলাম। গাড়ি থেকে নামবার সময় পদ্মকবাবু বললেন, 'আগামী কালের শ্বুটিং-এ ট্রেনের ব্যাপারটায় রেল কোম্পানির লোকদের সঙ্গে ঠোকাঠুকি হচ্ছিল। খবরটা পেয়েই প্রোডিউসার রাষ্ট্রের মেন ধরে কলকাতা থেকে চলে এসেছেন। চলুন, আপনাদের সঙ্গে অলাপ করিয়ে দিচ্ছি।'

'কালকের শ্বুটিংটা হবে ত?' লালমোহনবাবুর গলায় আশঙ্কার সুর।

'শ্বুটিং-এর ফদার হবে লালদুদা, ঘাবড়াইয়ে মং।'

আমরা একটা ট্রেনের ছাতওয়ালা কামরখানার ঘরের মতো বিরাট ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। এখানেই শ্বুটিং হয়, আর আজ এখানেই চলেছে কং-ফুর ট্রেনিং। একটা প্রকাণ্ড গদির উপর ভিকটর পেরুমলের নির্দেশে একদল লোক লম্বাচ্ছে, পা ছুঁড়ছে, আঙাড়া খাচ্ছে। গদি থেকে হাত দশেক দূরে একটা বেতের চেয়ারে

বসে আছেন একজন বছর পঁয়তাল্লিশের ভদ্রলোক।

‘আলাপ করিয়ে দিই’ বললেন পদূলকবাবু, ‘ইনি হচ্ছেন আমাদের ছবির প্রযোজক মিঃ গোরে...মিস্টার গাঙ্গুলী, স্টোরি রাইটার—মিস্টার মিত্র, আর—তোমার নামটা কী ভাই?’

‘তপেশরঞ্জন মিত্র।’

মিঃ গোরেও দাঁক দুটো আপেলের মতো, মাথার ঠিক মাঝখানে একটা চকচকে টোক, আর চোখদুটো সামান্য কটা। ভুঁড়িটা নিশ্চয়ই ইদানীং হয়েছে, কারণ শব্দ করে এত টাইট জামা কেউ পরে না। পদূলকবাবু অলোপ করিয়ে দিয়ে হাওয়া, কারণ কালকের শর্টিং-এর নাকি অনেক তোড়জোড় আছে। বলে গেলেন, ‘দেড়টায় ফিরছি লালদা; আমার সঙ্গে লাগে যাচ্ছেন আপনার।’

গোরে আমাদের খুব খাতিরটাতির করে চেয়ার আনিয়ে বসতে দিলেন। নিজে লালমোহনবাবুর পাশে বসে বললেন, ‘আপনি এলেন বলে আমি খুব খুশি হলাম।’

‘সে কি, আপনি শু দিবা বাঙলা বলেন!’

লালমোহনবাবু বোধহয় তাঁর দশ হাজার পাণ্ডনার কথাটা ভেবেই একটু বেশি খুলে তারিফ করলেন।

‘আমার ফাদারের বিজনেস ছিল ক্যানিং স্ট্রীটে। প্রি ইয়ারস আই ওয়জ এ স্টুডেন্ট ইন ডন বস্কে। দেন ফাদারের ডেথ হল, আমি অক্সফোর্ডের কাছে চলে এলাম বুম্বই। সে তখন থেকেই আই আগ হিম্মার। লেকিন ফিল্ম লাইনে দিস ইজ মাই ফাস্ট ভেনচার।’

গোরে বাঙলা জানেন দেখেই বেখবর লালমোহনবাবু বেশ উৎসাহের সঙ্গে সন্মাল থেকে শুরু করে আজকের পদূলিশের জেরা অবধি সব ঘটনা ভ্রম-লোককে বলে ফেললেন। তাতে মিঃ গোরে চকচক শব্দ করে সহানুভূতি জানিয়ে বললেন, ‘আজকাল কাউকে বিসোয়াস করা যায় না মিস্টার গাঙ্গুলী। আপনি এমিনেন্ট রাইটার, আপনার হাতে চোরাই মাল পাচার হবে ভাবতে শব্দ লাগে।’

এবার ফেলদাও যোগ দিল কথায়।

‘আপনি শু শিবাজী কাস্লে থাকেন বলে শুনলাম।’

‘হাঁ। দুমাস হল আমি। হারিভল মার্চার। ইভনিং ড্রাইটে এসেছি আমি। বার্ড ফিরেছি রাত ইগারটা। অ্যাট দ্যাট টাইম অলসো স্কোর ওয়জ এ বিগ ক্লাউড ইন দ্য স্ট্রীট। হাই-ক্রাইজ বিল্ডিংয়ে খুনখারাবি হোনেসে বহুং হুজুং।’

‘ইয়ে—সেভেনটিনথ ফ্লোরে কে খাটক জানেন?’

‘সেভেনটিনথ...সেভেনটিনথ...’ ভদ্রলোক মনে করতে পারলেন না।
‘আমার চিনা আদমি এক হ্যাণ্ড এইটথ মে—এন সি মেহতা; আউর দে। মে
ডক্টর ডাক্তরদার। মাই ফ্রাট ইজ অন টুয়েলফথ ফ্লোর।’

ফেলদুদা আর কোনো প্রশ্ন করল না। মিঃ গোরেরও দেখলাম উঠি-উঠি
ভাব। বললেন বহুৎ বামেলায় প্রোডাকশন, সব সময় কিছ্ না কিছ্ কাঙ্
লেগেই থাকে। তাছাড়া কালকের শ্‌দুটিংটা সত্যিই এলাই ব্যাপার। মাথেরান
স্টেশন থেকে ভাড়া করা ট্রেন খাণ্ডালা আর লোনাউলির মাঝামাঝি লেভেল-
ক্রসিং-এ আসবে। মিঃ গোরে মাথেরানেই থাকবেন, কারণ রেঞ্জ কোম্পানিকে
পরসাকড়ি দেওয়ার ব্যাপার আছে। একটা পুরোনো আমলের ফাস্ট-ক্রাস
কামরা থাকবে ট্রেনে, মিঃ গোরে সেই কামরায় চেপেই শ্‌দুটিং-এর আয়গায়
আসবেন। ‘আমি খুব খুশি হব যদি আপনারা আমার সঙ্গে এসে লগ্ন
করেন। আপনারা ভেজিটোরিয়ান কি?’

‘নো নো, নন নন’ বললেন লালমোহনদাবু।

‘হোয়াট উইল ইউ হ্যাভ? চিকেন অর মটন?’

‘চিকেন হ্যাভ ইয়েসটারডে। মটনই হোক টুমরো; কী বলেন ফেলদুদাবু?’

‘তথাস্তু’, বলল ফেলদুদা।

ফেলদুদা মিস্টার গোরের সব কথাই শুনছিল, কিন্তু ভারি ফাঁকে ফাঁকে
ওর চোখটা যে বারবার কুং-ফুর দিকে চলে যাচ্ছিল সেটা আমি লক্ষ্য কর-
ছিলাম। ডিক্টর পেরুমলের ধৈর্য আর অধাবসায় দেখে সত্যিই অবাক হতে
হয়। বোঝাই যাচ্ছে ব্যাপারটাকে নিখুঁত না করে সে ছাড়বে না। যারা শিখছে
তাদের মধ্যে দু-একজন দেখলাম রীতিমত তৈরি হয়ে গেছে।

পেরুমলকেও দেখছিলাম কাজের ফাঁকে ফাঁকে ফেলদুদার দিকে দেখছে।
ফেলদুদার চাহনিতে তারিফের ভাবটা বোধহয় তাকে উৎসাহিত করছিল। গোরে
চলে যাবার পর পেরুমল ফেলদুদাকে ইশারা করে কাছে আসতে বলল। ফেলদুদা
হাতের সিগারেটটা ফেলে দিয়ে উঠে এগিয়ে গেল।

‘আইয়ে মিস্টার মিরা—ট্রাই কিজিয়ে—ইটস নট সো ডিফিকাল্ট।’

বার্কি যারা ট্রেনিং নিচ্ছিল তারা গদি ছেড়ে সরে গেল। পেরুমল একটা
ছোট্ট লাফের সঙ্গে অশ্রুত ভাবে ডান পা-টা মাথা অবধি তুলে সোজা সামনের
দিকে ছিটকে দিল। পারের সামনে কেউ থাকলে নির্বাণ ধরাশায়ী হত।
ফেলদুদা গদির উপর উঠে পাঁচ-ছ বার ছোট ছোট লাফ দিয়ে শরীরটাকে তৈরি
করে নিল। পেরুমল ফেলদুদা থেকে হাত চারেক দূরে দাঁড়িয়ে বলল, ‘আমার
দিকে ছোঁড় পা।’

পেরুমলের জানার কথা নয় যে এনটার দ্য ড্রাগন দেখার পর থেকে মাস

কয়েক ধরে প্রায়ই সকালে ফেলদুদা আমাদের বৈঠকখানায় কুং-ফু-র সঙ্গে হাত পা ছোঁড়া অভ্যাস করেছে। কুং-ফু ছাড়া এর পিছনে আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না ঠিকই, কিন্তু পা ছোঁড়ার কার্যপাটী রপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

ওয়ান-টু-থ্রী বজার সঙ্গে সঙ্গে ফেলদুদার ডান পা-টা হেয়ারাইজন্টালডাবে বিন্দুমুখে সামনের দিকে ছিটকে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে পেরুমলের শরীরটা পিছনে ছিটকে গিয়ে আহাড় খেলো গম্বির উপর—যদিও আমি জানি যে ফেলদুদার পা তার গায়ে লাগেনি।

ভারপর এইভাবে পাঁচ মিনিট ধরে চলল ভিত্তির পেরুমল আর প্রদোষ মিস্ত্রির কুং-ফু ডেমন্স্ট্রেশন। আগার দৃষ্টি চলে যাচ্ছিল পেরুমলের সকারেদদের দিকে—দেড় ঘাস ধরে লাফ কাঁপ করে যাদের জিভ বেরিয়ে এসেছে। এটা দেখে ভালো লাগল যে হিংসার চেয়ে প্রসংসার ভাবটাই তাদের মধ্যে বেশি প্রকাশ পাচ্ছে। পাঁচ মিনিটের শেষে যখন দুজনে হ্যান্ডশেক করে পরস্পরের পিঠ চাপড়াচ্ছে, তখন সকলে হাততালি দিয়ে উঠল।



দুইটা নাগাদ পলকবাবু আর সংলাপ-লেখক হিডুবন গুপ্তের সঙ্গে আমরা গুয়রলির কপার চিমানি রেস্টোরাশ্যে লাম্ব থেতে ঢুকলাম। দেখে মনে হয় ভিলথরার জায়গা নেই, কিন্তু পলকবাবু আমাদের জন্য একটা টেবিল আগে থেকেই রিজার্ভ করে রেখেছেন।

লালমোহনবাবু বললেন, ‘আমাদের ছবির নামটা কী হচ্ছে ভাই পলক?’

নামের কথাটা আঁবাঁশা আমারও অনেকবার মনে হয়েছে, কিন্তু জিগোস করার সুযোগটা আসেনি। ‘বোম্বাইয়ের বোস্বেটে’ নাম যে থাকবে না সেটা আমিও আন্দাজ করেছিলাম।

‘আর বলবেন না লালদুদা’, বললেন পলকবাবু। ‘নাম নিয়ে কি কম হুজুত গেছে? যা ভাবি তাই দেখি হয় হয়ে গেছে, না হয় অন্য কোনো পার্টি রোজিস্ট্রি করে বসে আছে। গুপ্তজিকে জিগোস করুন না কত বিনিস্ত রজনী গেছে ও’র নাম ভেবে বার করতে। শেষটায় এই তিনদিন আগে—যা হয় আর কি—হাই-ভোল্টেজ স্পার্ক।’

‘হাই-ভোল্টেজ স্পার্ক? ছবির নাম হাই-ভোল্টেজ স্পার্ক?’ লো-ভোল্টেজ গলার ম্বরে জিগোস করলেন জটায়ু।

পলকবাবু হো-হো করে হেসে চারিদিকের টেবিলের লোকদের মাথা আমাদের দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে বললেন, ‘মাথা খারাপ লালদুদা? ও নামে ছবি চলে? আমি ইনস্পিরেশনের কথা বলছি। জেট বাহাদুর।’

‘আঁ?’

‘জেট বাহাদুর। রাস্তায় ছেঁড়িৎ পড়ে যাবে আপনারা থাকতে থাকতেই। ভেবে দেখুন—আপনার গম্পের এর চেয়ে ভালো নাম আর খুঁজে পাবেন না। অ্যাকশন, স্পাইড, থ্রিল—জেট কথাটার মধ্যে আপনি সব পাবেন। প্লাস বাহাদুর। নাম আর কাস্টিং-এর জোরেই অল সার্কিটস সোল্ড।’

লালমোহনবাবু হামির ভোল্টেজটা যেন বাড়তে গিয়ে কমে গেল। বোখ-হয় ভাবছেন—শুধুই নাম আর কাস্টিং? গম্পের কি তাহলে কোনো দামই নেই?

‘আমার কোনো ছবি কি আপনারা দেখেছেন লালদুদা?’ বললেন পলকবাবু। ‘তীরন্দাজটা হচ্ছে লোটাসে। আজ ইডনিং শো-এ দেখে আসুন। আমি

ম্যানেজারকে বলে দেবে—তিনখানা সার্কলের টিকিট রেখে দেবে। ভালো ছবি—জুর্নাল করেছিল।’

আমরা পুলকবাবুর কোনো ছবি দেখিনি। লালমোহনবাবুর স্বাভাবিক কারণেই কৌতুহল ছিল, তাই যাব বলেই বলে দিলাম। বস্বেতে চেনাশোনা না থাকলে সম্ভ্য কাটানো ভারি মশকিল। গাড়িটা আমাদের কাছেই থাকবে—তাকে বললেই লোটারসে নিয়ে যাবে।

খাবার মাঝখানে রেস্টোরাণ্টের একজন লোক পুলকবাবুকে এসে কী জানি বলল। পুলকবাবুর যে এখানে যাতায়াত আছে সেটা ঢোকান সময় ওয়েটারদের মধ্যে হাসি দেখেই বুঝেছি। হিট ডিরেকটরের এ শহরে খুব খ্যাতির।

পুলকবাবু কথাটা শুনেই লালমোহনবাবুর দিকে ফিরলেন।

‘আপনার টেলিফোন জালদা।’

লালমোহনবাবু ভার্গিস পোলাওয়ের চামচটা মধ্যে পোরেন নি, তাহলে নির্বাণ বিষয় খেতেন। এ অবস্থায় চমকানোটা কেবল খানিকটা পোলাও চামচ থেকে ছিটকে টেবিলের চানরে পড়ার উপর দিয়ে গেল।

‘মিস্টার গেগে ডাকছেন’, বললেন পুলকবাবু। ‘হয়ত কিছু গুড নিউজ থাকতে পারে।’

মিনিট দুয়েকের মধ্যে টেলিফোন সেরে এসে লালমোহনবাবু আবার কাটা-চামচ হাতে তুলে নিয়ে বললেন, ‘চারটের সময় ভদ্রলোকের বাড়িতে যেতে বললেন। কিছু অর্থপ্রাপ্তি আছে বলে মনে হচ্ছে—হে হে।’

তার মানে আজ বিকেলের মধ্যে লালমোহনবাবুর পকেটে দশ হাজার টাকা এসে যাবে। ফেলুদা বলল, ‘এর পরের দিন লাগুটা আপনার ঘাড়ে। আর কপার-টপার নয়, একেবারে গোল্ডেন চিহ্নি।’

রুমালি রুটি, পোলাও, নারগিস কোফতা আর কুলপী খেয়ে যখন রেস্টোরাণ্ট থেকে বেরোলাম তখন প্রায় পৌনে তিনটে। পুলকবাবু আর মিস্টার গুস্তে স্ট্রীডিও চলে গেলেন। সংলাপ এখনো কিছু লিখতে বাকি আছে। প্রত্যেকটা সংলাপ শানিল্লি লিখতে হয় তো, তাই নাকি সময় লাগে, বললেন পুলকবাবু। গুস্তেজী চরুটের ফাঁক দিয়ে একটু হাসলেন। ভদ্রলোক সংলাপ লিখলেও নিজে সংলাপ খুবই কম বলেন সেটা লক্ষ্য করলাম।

আমরা পুনর্বার গাড়িতে উঠলাম। ‘শালিমার?’ ড্রাইভার জিজ্ঞাস করল।

ফেলুদা বলল, ‘বস্বে এসে গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া না দেখে যাওয়া যায় না।—চলিয়ে তাজমহল হোটেলকা পাস।’

‘বহুৎ আচ্ছা।’

ড্রাইভার বুঝেছিল আমাদের কোনো কাজ নেই, কেবল শহর দেখার ইচ্ছে,

তাই সে দিবা ঘুরিছে ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস, ফ্লোরা ফাউন্টেন, টেলিভিশন স্টেশন, প্রিন্স অফ ওয়েলস মিউজিয়ম ইত্যাদি দেখিয়ে পাড়ে তিনটে নাগাদ গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া সামনে পৌঁছল। আমরা গাড়ি থেকে নামলাম।

পিছনে আরব্য সাগর, তাতে গুণে দেখলাম এগারোটা ছোট বড় জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে। এখানে রাস্তাটা পেঙ্গল চওড়া। বাদিকে গেটওয়ের দিকে মৃদু করে ঘোড়ার পিঠে বসে আছেন ছত্রপতি শিবাজী। জানপাশে দাঁড়িয়ে আছে পৃথিবী-বিস্থৃত ভাজমহল হোটেল, যার ভিতরটা একবার দেখে না যাওয়ার কোন মানে হয় না, কারণ বাইরেটা দেখেই আমাদের চক্ষু চড়কগাছ।

ঠান্ডা লবিতে ঢুকে চোখে একেবারে টেরিয়ে গেল। এ কোন দেশে এলাম রে বাবা! এত রকম জাতের এত লোক একসঙ্গে কখনো দেখিনি। সাহেবদের চেয়েও দেখলাম আরবদের সংখ্যা বেশি। এটা কেন হল? ফেলুদাকে জিজ্ঞেস করতে বলল, এবার বেরুট যাওয়া নিষেধ বলে আরবরা সব বোম্বাই এসেছে ছুটি ভোগ করতে। পেট্রোলের দৌলতে এদের ত আর পরসার অভাব নেই।

মিনিট পাঁচেক পয়চারি করে আমরা আবার গাড়িতে এসে উঠলাম। যখন শিবাজী কাস্‌নের লিফ্টের বেল টিপছি তখন ঘড়িতে চারটে বেজে দ মিনিট।

টুরেলফথ ফ্লোর বা তেরোতলায় পৌঁছে লিফ্ট থেকে বেরিয়ে দেখি তিন দিকে তিনটে দরজা। মাকেরটার উপর লেখা জি গোরে। বেল টিপতে উর্দি-পর্যায় বেয়ারা এসে দরজা খুলে দিল।

‘অন্দর আইয়ে।’

বুঝলাম গোরে সাহেব চাকরকে আগেই বলে রেখেছিলেন আমাদের কথা।

ভিতরে ঢুকে ভদ্রলোককে চোখে দেখার আগে তার গলা পেলাম—‘আসুন, আসুন!’

এই বার দেখা গেল একটা সরু প্যাসেজের ভিতর দিয়ে তিনি হাসিমুখে এগিয়ে আসছেন আমাদের দিকে।

‘হাউ ওয়জ দি লাগ?’

‘ভেরি ভেরি গুড’ বললেন জটায়ু।

ভদ্রলোকের বৈঠকখানা দেখে তাক লেগে গেল। আমাদের কলকাতার বাড়ির প্রায় পুরো এক তলাটাই এই ঘরের মধ্যে ঢুকে যায়। পশ্চিম দিকটায় সারবাধা কাঁচের জানালা দিয়ে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। ঘরের আসবাবপত্রের এক-একটারই দাম হয়তো দু’ তিন হাজার টাকা, তাছাড়া মেঝে-জোড়া কার্পেট, দেয়ালে পের্‌স্টিং, সিলিং-এ কাঁড়-লস্টন—এসব ত আছেই। একদিকে দেয়াল-জোড়া বুকশেলফে দামী দামী বইগুলো এত ককরকে যে দেখলে মনে হয়

বুঝি এইমাত্র কেনা।

আমি আর ফেলুদা একটা পুরু গদিওয়ালা সোফাতে পাশাপাশি বসলাম, আর আমাদের ডানপাশে আরেকটা গদিওয়ালা চেয়ারে বসলেন লালমোহনবাবু। বসার সঙ্গে সঙ্গেই একটা বিশাল কুকুর এসে ঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমাদের তিনজনের দিকে মাথা ঘুরিয়ে দেখতে লাগল। লালমোহনবাবু দেখলাম ফ্যাকাশে হয়ে গেছেন। ফেলুদা হাত বাড়িয়ে ভুড়ি দিতে কুকুরটা ওর দিকে এগিয়ে এল। ও পরে বলোঁছিল যে কুকুরটা জাতে হল গ্রেট ডেন।

‘ডিউক, ডিউক!’

কুকুরটা এবার ফেলুদাকে ছেড়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। মিঃ গোরে



আমাদের বাসরে দিয়ে একটু ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন, এবার হাতে একটা খাম নিয়ে ঢুকে লালমোহনবাবুর অন্য পাশের চেয়ারে বসলেন।

‘আমি আপনার বেপারটা রোঁড়ি করে রাখব জেবেছিলাম,’ বললেন মিঃ গোরে, ‘কিন্তু তিনটা ট্রাংক কল এসে গেল।’

ভদ্রলোক খামটা লালমোহনবাবুকে দিকে এগিয়ে দিলেন। মনের জোরে হাত কাঁপা বন্ধ করে 'লালমোহনবাবু সেটা নিয়ে তার ভিতর থেকে টেনে বার করলেন একতৃষ্ণা একশো টাকার নোট।

'গিনতি করিয়ে দিন,' বললেন মিঃ গোরে।

'গিনত'।

আবার ভাষার গন্ডগোল।

'গিনবেন অলিবাং। দেয়ার শব্দ বি ওয়ান হান্ড্রেড নোটস দেয়ার।'

বে সময়ে লালমোহনবাবু গোনা শেষ করলেন, তার মধ্যে রূপোর টি-সেটে আমাদের জন্য চা এসে গেছে। খেয়ে বৃকলাম একেবারে সেরা দার্জিলিং টি।

'আপনার পরিচয় আভিতক মিলল না,' গোরে বললেন ফেলুদার দিকে চেয়ে।

ফেলুদা বলল, 'মিস্টার গাঙ্গুলীর ফ্রেন্ড—এই আমার পরিচয়।'

'নো স্যার,' বললেন গোরে, 'দ্যাট ইজ নট এনাক। ইউ আর নো অর্ডিনারি পারসন—আপনার চোখ, আপনার ভয়েস, আপনার হাইট, ওয়ক, বডি—নাথিং ইজ অর্ডিনারি। আপনি হামাকে যদি নাই বলবেন তো ঠিক আছে। লেকিন মিস্রফ মিস্টার গাঙ্গুলীর দোস্ত যদি বলেন, উভে হামি বিসোয়াস করব না।'

ফেলুদা অল্প হেসে চায়ে চমক দিয়ে প্রসঙ্গটা চেঞ্জ করে ফেলল।

'আপনার অনেক বই আছে দেখছি।'

'হাঁ—ব্যাট আই ডোন্ট রীড দেম! উসব কিতাব ওনলি ফর শো। তারাপোর-ওয়ান দুকানে বেগুলায় অর্ডার—এনি গুড বুক দ্যাট কামস আউট—এক কপি হামাকে পাঠিয়ে দেয়।'

'একটা বাংলা বইও চলে এসেছে দেখছি।'

ফেলুদার চোখ বটে। ওই সারি সারি বিলিতি বইয়ের মধ্যে পনের হাত দূর থেকে ধরে ফেলেছে বে, একটা বই বাংলা।

মিঃ গোরে হেসে উঠলেন। 'শব্দ বাংলা কেন মিঃ মিটার, হিন্দি, মারাঠী, গুজরাটি, সব আছে। আমার এক আদমি আছে—বাংলা হিন্দি গুজরাটি তিন ভাষা জানে; ওই তিন ভাষায় নভেল পড়ে হামাকে সিনপসিস করে দেয়। মিঃ গাঙ্গুলীর কিতাব কে-ভি আউটলাইন পঢ়িয়েছি আমি। ইউ সি, মিস্টার মিটার, ফিল্ম বানানেকে লিয়ে তো—'

ঘরে টেলিফোন বেজে উঠেছে। মিঃ গোরে উঠে গেলেন। দরজার পাশে একটা তেপায়া টেবিলে রাখা সাদা টেলিফোন।

'হ্যালো...হাঁ...হোল্ড অন।—আপনার টেলিফোন, মিস্টার গাঙ্গুলী।'

লালমোহনবাবুকে বার বার এভাবে চমকাতে হচ্ছে—আশা করি তাতে ও'র

হার্ট-টার্টের কোনো ক্ষতি হচ্ছে না।

‘পুলকবাবু কি?’ টেলিফোনের দিকে ব্যথার পথে ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন।

‘নো সার’, বললেন মিঃ গোরে। ‘আই ডোন্ট নো দিস পারসন।’

‘হ্যালো।’

ফেলুদা আড়চোখে দেখছে লালমোহনবাবুর দিকে।

‘হ্যালো...হ্যালো...’

লালমোহনবাবু ভাষাচ্যাকা ভাব করে আমাদের দিকে চাইলেন।

‘কেউ বলছে না কিছুর।’

‘লাইন কাট গিয়া হোগা,’ বললেন মিস্টার গোরে।

লালমোহনবাবু মাথা নাড়লেন। ‘অন্য সব শব্দ পাচ্ছি টেলিফোনে।’

এবার ফেলুদা উঠে গিয়ে লালমোহনবাবুর হাত থেকে টেলিফোনটা নিয়ে নিল।

‘হ্যালো, হ্যালো...’

ফেলুদা মাথা নেড়ে কোন ঝেঁঝে বলল, ‘ছেড়ে দিয়েছে।’

‘আশ্চর্য’, বললেন লালমোহনবাবু, ‘কি হতে পারে বলুন ত?’

‘ও নিজে চিন্তা করবেন না, মিস্টার গান্ধুলী’, বললেন মিঃ গোরে। ‘বোম্বাই শহরে এইরকম হামেশা হয়।’

ফেলুদার দেখাদেখি আমরাও চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লাম। লালমোহনবাবুর পকেটে এত টাকা বলেই বোধ হয় রহস্যজনক ফোনের ব্যাপারটা ওঁকে ততটা ভাবাল না। বেশ নিশ্চিতভাবেই ভদ্রলোক পরের কথাটা বললেন মিঃ গোরেকে।

‘আমরা আর পুলকবাবু ফিল্ম দেখতে যাচ্ছি লোটায়ে।’

‘হাঁ, হাঁ যাবেন বৈকি। ভেরি গুড ডিরেকটর পুলকবাবু। জেট বাহাদুর ভি বকস অফিস হিট হোগা জরুর।’

দরজার মূখ পর্যন্ত এলেন মিঃ গোরে। ‘ডোন্ট ফরগেট অ্যাবাউট লাস্ট টুমরো। ট্রানসপোর্ট আছে ত আপনাদের সঙ্গে?’

আমরা আশ্বাস দিলাম যে সকাল থেকে রাত অবধি গাড়ির ব্যাবস্থা করে দিয়েছেন পুলকবাবু।

বাইরে বেরিয়ে এসে লিফটের বেস্তান টিপে ফেলুদা বলল, ‘ম্যান কাকে বলে দেখলেন ত লালমোহনবাবু?’

‘দেখলাম কি মশাই, তার খানিকটা ত আমার পকেটেই রয়েছে।’

‘নাস্য, নাস্য। লাস্ট টাকাও এদের কাছে নাস্য। টিকিট দিলে খসিদ লিখিয়ে নিল না সেটা দেখলেন ত? তার মানে আপনার পকেটটা কালো হয়ে গেছে

কিন্তু। অর্থাৎ এই আগন্তিক অশ্বকারে পদার্পণ শূন্য।

ঘড়াং শব্দে লিফ্টটা উপরের কোনো ফ্লোর থেকে নেমে এসে আমাদের সামনে থামল।

‘সে আগন্তিক বাই বলুন ফেলদাবাদ, পকেটে টাকা এলে তা সে কালোই হোক, আর—’

ফেলদাদা লিফ্টে ঢোকার জন্য দরজা খুলেছিলেন, আর তার ফলেই জটায়ুর কথা বন্ধ।

লিফ্টের ভিতর থেকে এক বলক উগ্র গন্ধ। গুলবাহার সেন্ট। এ গন্ধ আমরা তিনজনেই চিনি; বিশেষ করে লালমোহনবাবু।

টিপ্ টিপ্ বুদ্ধে ফেলদাদার পিছন পিছন লিফ্টে ঢুকে গেলাম।

আমি একটা কথা না বলে পারলাম না।

‘গুলবাহার সেন্ট মিঃ সান্যাল ছাড়াও ভারতবর্ষের অনেকেই নিশ্চয়ই ব্যবহার করে।’

ফেলদাদা কথাটার জবাবের বদলে গম্ভীরভাবে সতের নম্বর বোতাম টিপল। আমরা আরো পাঁচতলা ওপরে উঠে গেলাম।

অন্যান্য ভলার মতোই সতেরো নম্বরেও তিনখানা ঘর। বাঁ দিকের দরজায় লেখা এইচ হেকরথ। ফেলদাদা বলল, জার্মান নাম। ডান দিকের দরজায় লেখা এন সি মানসুখানি। নির্ঘাৎ সিগ্নি নাম। মাঝখানের দরজায় কোনো নাম নেই। ‘ফ্ল্যাট খালি’ বললেন লালমোহনবাবু।

‘নাও হতে পারে’ বলল ফেলদাদা। ‘সবাই দরজায় নাম লাগায় না। ইন ফ্যাক্ট, আমার বিশ্বাস এ ফ্ল্যাটে লোক রয়েছে।’

আমরা দুজনেই ফেলদাদার দিকে চাইলাম।

‘যে কলিং বেলের বোতাম ব্যবহার হয় না, তাতে খুলো জমে থাকা উচিত। অথচ এটা ভালো করে কাছ থেকে দেখুন, আর অন্য দুটোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।’

কাছে গিয়ে দেখেই বুঝলাম, ফেলদাদা ঠিক বলেছে। দিবা চকচক করছে বোতাম, খুলোর লেশমাত্র নেই।

‘টিপবেন নাকি?’ কাঁপা গলায় প্রশ্ন করলেন লালমোহনবাবু।

ফেলদাদা অবিশিয়া বোতাম টিপল না। তার বদলে যেটা করল, সেটা আরো অনেক বেশি তাজ্জব ব্যাপার।—মাটিতে উপড় হয়ে সটান শূন্যে নাকটা লাগিয়ে দিল দরজার নিচে আধ ইঞ্চি ফাঁকটাতে। তারপর বার দুয়েক জোরে নিশ্বাস টেনে উঠে পড়ে বলল, ‘কড়া কফির গন্ধ।’

তারপর যেটা করল, সেটাও অদ্ভুত। লিফট ব্যবহার না করে আঠারো তলা

থেকে সিঁড়ি ধরে নামতে শুরু করল। প্রত্যেক তলাতেই খেমে প্রায় আধ মিনিট ধরে ঘুরে ঘুরে কী যে দেখল তা ওই জানে।

সব সেরে নিচে যখন নামলাম তখন ঘড়িতে পাঁচটা বেজে দশ।

কেশ বদ্বতে পারছি যে বম্বে এসে আমরা একটা প্যাঁচালো রহস্যের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি।

‘আপনার একটু জেরা করলে আপনার আপত্তি হবে না অশা করি।’

কথাটা বলল ফেলুদা, লালমোহনবাবুকে উদ্দেশ্য করে। মিনিট দশেক হলো শিবাজী কাস্‌ল থেকে ফিরেছি—রিসেপশনে থকর পেয়েছি যে এই আধ ঘন্টা আগে—তার মানে যখন আমরা শিবাজী কাস্‌লের সিঁড়ি দিয়ে নামছিলাম তখন—লালমোহনবাবুর একটা ফোন এসেছিল; কে করেছিল তা জানা নেই।

‘আসলে পদূলকই বারবার করছে,’ বললেন লালমোহনবাবু। ‘পদূলক ছাড়া আর কেউ হতে পারে না।’

এখন আমাদের ঘরে বসে ফেলুদার প্রশ্নটা শুনে লালমোহনবাবু বললেন, ‘পদূলিশের জেরাতেই যখন ড্রাইং কালারসে বেরিয়ে এলুম, তখন আর আপনার জেরায় কী আপত্তি থাকতে পারে?’

‘আচ্ছা, মিঃ সান্যালের প্রথম নামটা ত আপনার জানা নেই।’

‘না মশাই, ওটা জিগোস করা হয়নি।’

‘লোকটার একটা পরিষ্কার বর্ণনা দিন তা। আপনার বইয়ে সেরকম আধা-খাঁচড়া বর্ণনা থাকে সেরকম নয়।’

লালমোহনবাবু গলা খাকরিয়ে ডুবু কুঁচকোলেন।

‘হাইট...এই ধরুন গিয়ে—’

‘আপনি কি একটা মানুষের হাইটটাই প্রথম দেখেন?’

‘তা তেমন তেমন লম্বা বা বেঁটে হলে—’

‘ইনি কি খুব লম্বা?’

‘তা অবিশ্যি না।’

‘খুব বেঁটে?’

‘না, তাও অবিশ্যি না।’

‘তাহলে হাইট পরে। আগে মদুখ বলুন।’

‘সন্ধ্যাবেলায় দেখেছি; আমার বাইরের ঘরের বাল্‌বটা আবার চম্‌জিগ পাওয়ারের।’

‘তাও বলুন।’

‘চওড়া মদুখ। চোখ. আপনার—ইয়ে, চোখে চশমা; দাড়ি আছে, চাপ দাড়ি, গোঁফ আছে—দাড়ির সঙ্গে জোড়া—’

‘ফ্রেন্ডকাট?’

‘এই সেরেছে। না, তা বোধ হয় না। খুলেপির সঙ্গেও জোড়া।’

‘তারপর?’

‘কাঁচাপাকা মেশানো চুল। ডান দিকে—না না, বাঁ দিকে সিঁথি।’

‘দাঁত?’

‘পারিস্কার। ফল্‌স-টীথ ব্রশ ত মনে হল না।’

‘গলার স্বর?’

‘মাঝারি। মানে, মোটাও না সরুও না।’

‘হাইট?’

‘মাঝারি।’

‘ভদ্রলোক আপনাকে একটা ঠিকানা দিয়েছিলেন না? বম্বের? বলেছিলেন ‘অসুবিধা হলে একে ফোন করবেন—বেশ হেল্পফুল?’

‘দেখেছেন! বেমালদু ভুলে গেসলদু! আজ যখন পুর্লিথ জেরা করল তখনও বলতে ভুলে গেলদু।’

‘আমাকে বললেই চলেবে।’

‘দাঁড়ান, দেখি।’

লালমোহনবাব্দ মানিবাগ থেকে একটা ভাঁজকরা নীল কাগজ বার করে ফেলদাকে দিলেন। ফেলদা সেটা খুব ঘন দিগে দেখল, কারণ পেথাটা মিঃ স্যানালের নিজের। তারপর কাগজটা আবার ভাঁজ করে নিজের ব্যাগের মধ্যে রেখে দিয়ে বলল।

‘তোপ্‌সে, নম্বরটা চা তো—টু ফাইভ থ্রি ফোর ওয়ান এইট।’

আমি অপারেটরকে নম্বর দিয়ে দিলাম। ফেলদা ইংরাজিতেই কথা বলল।

‘হ্যালো, মিস্টার দেশাই আছেন?’

আচ্ছা ফ্যাসাদ। এই নম্বরে মিঃ দেশাই বলে কেউ নাকি থাকেই না। যিনি থাকেন তাঁর পদবী পারেখ, আর গত দশ বছর তিনি এই নম্বরেই আছেন।

‘লালমোহনবাব্দ, ফেলদা ফোনটা রেখে বলল, ‘স্যানালকে আপনার নেকসট গল্প বিক্রী করার আশা ছাড়ুন। লোকটি অত্যন্ত গোলমেলে এবং আমার বিশ্বাস আপনি যে প্যাকেটটি বয়ে আনলেন সেটিও অত্যন্ত গোলমেলে।’

লালমোহনবাব্দ মাথা চুলকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বহাছেন, ‘সত্যি বলতে কি মশাই, লোকটিকে আমারও কেন জানি বিশেষ সর্দিবধের বলে মনে হয়নি।’

ফেলদা হুর্মাকি দিগে উঠল।

‘আপনার ওই কেন জানি কথাটা আমার মোটেই ভালো লাগে না। কেন সেটা জানতে হবে, বলতে হবে। চেষ্টা করে দেখুন ত পারেন কিনা।’

লালমোহনবাবুর ষোল্লিখিত ফেল্দদার কাছে ধমক খাওয়ার অভ্যাস আছে। এটাও জানি যে উর্নি সেটা ঘাই-ড করেন না, কারণ ধমক খেয়ে খেয়ে ঠুর লেখা যে অনেক ইমপ্ৰুড করে গেছে, সেটা উর্নি নিজেই স্বীকার করেন।

লালমোহনবাবু সোজা হয়ে বসলেন। 'এক নম্বর, লোকটা সোজাসৃজি দুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে না। দুই নম্বর, সব কথা অভ গজা নামিয়ে বগার কী-দরকার তাও জানি না। যেন কোনো গোপন পরামর্শ করতে এসেছেন। তিন নম্বর...'

দুখের বিষয়, তিন নম্বরটা যে কী সেটা লালমোহনবাবু অনেক ভেবেও মনে করতে পারলেন না।

সাড়ে ছটায় লোটারসে ইভনিং শো, তাই আমরা ছ'টা নাগাত উঠে পড়লাম। আমরা মানে আমি আর লালমোহনবাবু। ফেল্দদা বলল যাবে না, কাজ আছে। ব্যাগের ভিতর থেকে ওর সবুজ নোটবইটা বেরিয়ে এসেছে, তাই কাজটা যে কী সেটা বুঝতে ব্যাকি রইল না।

ওয়ার্লিতে ফিরে যেতে হল আমাদের, কেননা সেখানেই লোটারস সিনেমা। লালমোহনবাবুর বেশ নার্ভিস অবস্থা: পলকবাবু কেমন পরিচালক সেটা 'তীরন্দাজ' ছবি দেখেই মালুম হবে। বললেন, 'তিনটে ছবি যখন পর পর হিট করেছে, তখন একেবারে কি আর ওয়াক-থু হবে? কী বল ভূপেশ?'

আমি আর কী বলব? আমি নিজেও ত ঠিক ওই কথাটা ভেবেই মনে জোর আনছি।

পলকবাবু মানেজারকে বলতে ভোলেন নি: রয়েল সার্কলে তিনটে সীট আমাদের জন্য রাখা ছিল। এটা ছবির রিপিট শো, তাই হলে এমনিতেই অনেক সীট খালি ছিল।

ইন্টারভ্যালের আগেই বুঝতে পারলাম যে 'তীরন্দাজ' হচ্ছে একেবারে সেল্ট পার্সেণ্ট কোডোপাইরিন-মার্কা ছবি। এর মধ্যেই অন্ধকারে বেশ কয়েকবার আমরা দুজনে পরস্পরের দিকে মুখ চাওয়াচাও'র করেছি। হারিস পাচ্ছিল, আবার সেই সঙ্গে জেট বাহাদুরের কী অবস্থা হবে, আর তার ফলে জটায়ুর কী অবস্থা হবে সেটা ভেবে কন্টও হ'চ্ছিল। ইন্টারভ্যালে বাতি জ্বললে পর লালমোহনবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'গড়পারের ছেলে তুই অ্যান্ডিন এই করে চুল পাকালি?' তারপর একটা গ্যাপ দিয়ে আমার দিকে ফিরে বললেন, 'ফি পল্লোর পাড়ায় একটা করে থিয়েটার করত: যন্দুর মনে পড়ছে কি কম ফেল :—তার কাছ থেকে আর কী আশা করা যায় বল ত?'

ইন্টারভ্যালের শেষে বাতি নেভার সঙ্গে সঙ্গে আমরা হল ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। ভয় ছিল, পলকবাবু বা তার দলের কেউ যদি বাইরে থাকে; কিন্তু সে-

রকম কাউকে দেখলাম না।

‘যদি জিগ্যেস করে ত বলে দেব ফাস্ট ক্লাস। পকেটে কয়করে নোটগুলো না থাকলে মনটা সত্যিই ভেঙে যেত তাপেশ।’

গাড়িটা হাউসের সামনেই উল্টোদিকের ফুটপাথে পার্ক করা ছিল। লাল-মোহনবাবু সেদিকে না গিয়ে একটা দোকানে ঢুকে এক ঠোঙা ডালমোড়, দু’ প্যাকেট মাংসারামের বিস্কুট, ছটা কমলালেবু আর এক প্যাকেট প্যারির লজগুস কিনে নিলেন। বললেন, হোটেলের ঘরে বসে বসে হঠাৎ হঠাৎ খিদে পায়, তখন এগুলো কাজে দেবে।

দুজনে দুহাত বোঝাই প্যাকেট নিয়ে গাড়িতে উঠলাম, আর উঠেই বাঁই করে মাথাটা ঘুরে গেল।

গাড়ির ভিতরে গুলবাহার সেন্টের গন্ধ।

আসার সময় ছিল না; এই দেড় ঘণ্টার মধ্যে হয়েছে।

‘মাথা ঝিম ঝিম করছে তাপেশ,’ বললেন লালমোহনবাবু। ‘এ ভূতের উপদ্রব ছাড়া আর কিছুই না। সামান্য খুন হয়েছে, আর তার সেন্টমাথা ভূত আমাদের ঘাড়ের চেপেছে।’

আমার মনে হল—বাড়ে নয়, গাড়িতে চেপেছে; কিন্তু সেটা আর বললাম না।

ড্রাইভারকে জিগ্যেস করাতে সে বলল, সে বেশিরভাগ সময় গাড়িতেই ছিল, কেবল মিনিট পাঁচেকের জন্য কাছেই একটা রেডিও-টেলিভিশনের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ফুল খিলে হয় গুলশন গুলশন দেখেছে। হ্যাঁ, গন্ধ সেও পাচ্ছে বৈকি, কিন্তু গাড়ির ভিতরে কী করে এমন গন্ধ হয় সেটা কিছুতেই তার মগজে ঢুকছে না। ব্যাপারটা তার কাছেও একেবারেই অজব।

হোটেলের ফিয়ার এসে কথটা ফেলুদাকে বলতে ও বলল, ‘রহস্য এখন জাল বিস্তার করে, তখন এইভাবেই করে লালমোহনবাবু। এ না হলে জাত-রহস্য হয় না, আর তা না হলে ফেলু মিতিব্রের মস্তিষ্কপুষ্টি হয় না।’

‘কিন্তু—’

‘আমি জানি আপনি কী প্রশ্ন করবেন লালমোহনবাবু। না, কিংবা এখনো হয়নি। এখন শুধু জালের ক্যারেকটারটা বোঝার চেষ্টা করছি।’

‘তুমি বোরিয়েছিলে বলে মনে হচ্ছে?’—আমি খাঁ করে একটা গোরেন্ডা-মার্কী প্রশ্ন করে বসলাম।

‘সাবাস তোপ্‌সে। তবে হোটেল থেকে বেরোইনি। এটা নিচে রিসপশনেই দিল।’

ফেলুদার পাশে একটা ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনসের টাইমটেবল ছিল, সেটা

দেখেই আমি প্রশ্নটা করেছিলাম।

‘দেখাচ্ছিলাম কাঠমুন্ডু থেকে ক’টা ফ্লাইট কলকাতায় আসে, আর কখন আসে।’

কাঠমুন্ডু বলতেই একটা জিনিস ফেলদাদাকে জিগোস করার কথা মনে পড়ে গেল।

‘কিন্তু ইনস্পেক্টর পটবর্ধন যে নানা-সাহেবের কথা বলেছিলেন, সেটা কোন নানাসাহেব?’

‘ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি নানাসাহেবই বিখ্যাত।’

‘যিনি সিপাহী বিদ্রোহে ব্রিটিশদের সঙ্গে লড়েছিলেন?’

‘লড়েওছিলেন, আবার তাদের কাছ থেকে আত্মরক্ষার জন্য দেশ ছেড়ে পালিয়েওছিলেন। হাজির হয়েছিলেন গিয়ে একেবারে কাঠমুন্ডু। সঙ্গে ছিল মহামুন্ডা ধনরত্ন—ইনকুর্ভিং হীরে আর মন্ডোয় গাথা একটি হার—স্বার নাম নওলাখা। সেই হার শেষ পর্বন্ত চলে যায় নেপালের জং বাহাদুরের কাছে। তার পরিবর্তে জং বাহাদুর দুটি গ্রাম দিয়েছিলেন নানা সাহেবের স্ত্রী কাশী-বাইকে।’

‘এই হার কি নেপাল থেকে চুরি হয়ে গেছে নাকি?’

‘পটবর্ধনের কথা শুনে তু তাই মনে হয়।’

‘আমি কি ওই হারই পাচার করে বসলুম নাকি মশাই?’ লালমোহনবাবু তারম্বরে চেঁচিয়ে প্রশ্নটা করলেন। ফেলদাদা বলল, ‘ভেবে দেখুন। ইতিহাসে হীরের অঙ্করে লেখা থাকবে আপনার নাম।’

‘কিন্তু...কিন্তু...সে তো তাহলে যথাস্থানে পৌঁছে গেছে। সে জিনিস দেশ থেকে বাইরে যায় কি না যায় সে ত দেখবে পুলিশ। আপনি কী নিয়ে এত ভাবছেন? আপনি নিজেই কি এই স্মাগলারদের—’

ঠিক এই সময়ই টেলিফোনটা বেজে উঠল। আর লালমোহনবাবুর দিকেই ওটা ছিল বলে উনি তুলে নিলেন।

‘হ্যালো—হ্যাঁ, মানে ইয়েস—স্পীকিং।’

লালমোহনবাবুরই ফোন। বোধ হয় পদলকবাবু। না, পদলকবাবু না। পদলকবাবু এমন কিছু বলতে পারেন না যাতে লালমোহনবাবুর মুখ অতটা হাঁ হয়ে যাবে, আর টেলিফোনটা কাঁপতে কাঁপতে কান থেকে পিছিয়ে আসবে।

ফেলদাদা ভদ্রলোকের হাত থেকে ফোনটা নিয়ে একবার কানে দিয়ে বোধহয় কিছু না শুনতে পেয়েই সেটাকে যথাস্থানে রেখে দিয়ে প্রশ্ন করল, ‘সান্যাল কি?’

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলতেও যেন কষ্ট হল ভদ্রলোকের। বৃকলাম্য মাস্‌লগদলো ঠিকভাবে কাজ করছে না।

‘কী বলল?’ আবার ফেলদা।

‘বলল—’ লালমোহনবাবু গা-ঝাড়া দিয়ে মনে সাহস আনার চেষ্টা করলেন।

বলল—‘মু-মুখ খুললে পেপু-পেট ফাঁক করে দেবে।’

‘থাক—ভালো কথা।’

‘আঁ!’—বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে ফেলদার দিকে চাইলেন লালমোহনবাবু। আমার কাছেও এই অবস্থায় ফেলদার হাঁপ ছাড়াটা বেয়াড়া বলে মনে হচ্ছিল। ফেলদা বলল, ‘শুধু গুলবাহারের গন্ধে হচ্ছিল না। ক্রু হিসেবে ওটা বড্ড পলকা। এমনকি লোকটা সত্যি করে বম্ব্বে এসেছে না অন্য কেউ সেন্টটা ব্যবহার করছে, সেটাও বোঝা যাচ্ছিল না। এখন অন্তত শিগুর হওয়া গেল।’

‘কিন্তু আমার পেছনে লাগা কেন?’

মরিয়া হয়ে প্রশ্নটা করলেন লালমোহনবাবু।

‘সেটা জানলে ত বাজিমান্ত হয়ে যেত লালমোহনবাবু। সেটা জানার জন্য একটু ধৈর্য ধরতে হবে।’

লালমোহনবাবু ডিনারে বিশেষ সুবিধে করতে পারলেন না, কারণ ঠুঁর নাকি একদম খিদে নেই। ফেলুদা বলল তাতে কিছু এসে যাবে না, কারণ দুপুরে কপার চিমনিতে পেট পুজোটা ভালোই হয়েছে। সত্যি বলতে কি, আমাদের মধ্যে লালমোহনবাবুই সবচেয়ে বেশি খেয়েছিলেন।

খাওয়ার পর গতকাল তিনজনেই বেরিয়ে গিয়ে পান কিনেছিলেন। আজ লালমোহনবাবু কিছুতেই বেরোতে চাইলেন না। বললেন, 'ওই ভিড়ের মধ্যে কে যাচ্ছে মশাই? সান্যালের লোক নির্ঘাৎ হোটেল ওরচ করতে, বেরোলেই চাকর।'।

শেষ পর্যন্ত ফেলুদাই বেরোল, লালমোহনবাবু আমাদের ঘরে আমার সঙ্গে বসে রইলেন, আর বারবার খালি বলতে লাগলেন, 'কী কুক্ষণেই বইয়ের প্যাকেটটা নিয়েছিলাম।' ক্রমে বর্তমান সংকটের মূল কারণ খুঁজতে খুঁজতে 'কী কুক্ষণেই হিন্দি ছবির জন্য গল্প লিখেছিলাম', আর সব শেষে 'কী কুক্ষণেই রহস্য উপন্যাস লিখতে শুরু করেছিলাম' পর্যন্ত চলে গেলেন।

'আপনার একা শূতে ভয় করবে না ত?' ফেলুদা পান বিলি করে জিগোস করল। লালমোহনবাবু কোনো উচ্চবাচ্য করছেন না দেখে ফেলুদা আশ্বাস দিয়ে বলল, 'আমাদের ঘর থেকে বেরিয়েই প্যাসেজের ধারে একটা ছোট ঘর আছে দেখেছেন ত? ওখানে সব সময় বেয়ারা থাকে। হোটেলে সারারাত কেউ না কেউ জেগে থাকে। এ তো আর শিবাজী কাস্‌ল না।'

শিবাজী কাস্‌ল নামটা শুনে লালমোহনবাবু আরেকবার শিউরে উঠলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত মনে সাহস এনে দশটা নাগাত গুডনাইট করে নিজের ঘরে চলে গেলেন।

সারাদিন বসে চলে বেড়ানোর চেয়েও পলকবাবুর ছবির অর্ধেক দেখে অনেক বেশি কাহিল লাগছিল, তাই জটায়ু চলে যাবার ঘিনিট দশেকের মধ্যেই শূয়ে পড়ল। ফেলুদা যে এখন শোবে না সেটা জানি। ওর নোটবুকটা খাটের পাশেই টেবিলের উপর রাখা রয়েছে, সারাদিন খেপে খেপে তাতে অনেক কিছু লেখা হয়েছে, হয়তো আরো কিছু লেখা হবে।

আমি অনেকদিন চেষ্টা করেছি রাশি বিছানায় শূয়ে চোখ বুজে খেয়াল রাখতে ঠিক কোন সময় ঘুমটা আসে, কিন্তু প্রতিবারই পরদিন সকালে উঠে

বুঝেছি যুমটা কখন জানি আমার অজানতেই এসে গেছে। আরও কখন ঘুমিয়েছি সেটা টের পাইনি। যুমটা ভাঙল দরজায় ঘন ঘন ধাক্কা, আর সেই সঙ্গে বোতাম টেপের চ্যাপ শব্দ। উঠে দৌঁধ ফেলদার ল্যাম্প তখনো জ্বলছে আর বালিশের পাশ রাখা আমার ঘড়িতে বলছে পৌনে একটা। ফেলদা দরজা খুলতেই হুমড়ি দিয়ে প্রবেশ করলেন জটায়ু।

লালমোহনবাবু হাঁপালেও তিনি যে খুব ভয় পেয়েছেন সেটা কিন্তু মনে হল না। আর যে-কথাটা বললেন ঘরে ঢুকেই, সেটাও ভয়ের কথা নয়।

‘কেলেক্টারিয়াস ব্যাপার মশাই!’

‘আগে খাটে এসে বসুন’, বলল ফেলদা।

‘দূর মশাই, বসব কি—এই দেখুন—কাটমন্ডুর কী মহামূল্য ধনরত্ন আমার হাত দিয়ে পাচার করা হচ্ছিল।’

লালমোহনবাবু ফেলদার সামনে যেটা এগিয়ে ধরলেন সেটা একটা বই। ইংরিজি বই, আর নামকরা বই; ল্যান্সডাউনের মোড়ের দোকানে একটা রাখা ছিল সেদিনও দেখেছি। বইটা হল খ্রীস্টবিশ্বের জেথো দ্য লাইফ ডিভাইন।

ফেলদারও চোখ কপালে উঠে গেছে।

‘তার উপর আরও বাঁধাইয়ের গন্ডগোল’, বললেন লালমোহনবাবু। ‘প্রথম প্রশ্ন পাত্রের পর কয়েকটা পাতা পরস্পরের সঙ্গে স্কেটে আছে। এ বই না দেখে কিনলে ত পুরো টাকাটা ডেড লস্ মশাই। প্যাঁড়চেরীর বাইন্ডার এরকম কীটা কাজ করবে ভাবতে পারেন?’

‘তাহলে সেদিন কী দিলেন লালসার্টের হাতে?’ জিজ্ঞাস করল ফেলদা।

‘জানেন কী দিলুম, ভাবতে পারেন? আমার নিজের বই মশাই, নিজের বই!—বোম্বাইয়ের বোম্বেটে! পুনরুৎপাদিত পান্ডুলিপি কপি পাঠিয়েছিলুম, তাই এবার ভাঙলুম এক কপি ছাপা বই দেব—উইথ মাই ট্রেসিংস অ্যান্ড মাই অটোগ্রাফ। আরো তিন কপি রয়েছে এখনো আমার ব্যাগে, প্রত্যেকটি ব্রাউন কাগজে মোড়া। আমার ভক্ত ত সারা ইন্ডিয়াতে ছড়িয়ে রয়েছে—তাই ভাবলুম, বম্বে যাচ্ছি, যদি এক-আধজননের সঙ্গে অলাপটোলাপ হয়ে যার, তাই সঙ্গে এনেছিলুম, আর তারই একটা কপি—হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ!’

এত হালকা লালমোহনবাবুকে অনেকদিন দেখিনি।

বইটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে ফেলদা বলল, ‘কিন্তু সান্যালক্সে টেলিফোনে হুমকি দিল সেটা কী ব্যাপার? এর সঙ্গে লাইফ ডিভাইন-খবর আছে কি?’

লালমোহনবাবু এতেও দমলেন না।

‘কে বলল সান্যাল? টেলিফোনে অন্ত গলা চেল্ল’ যায় নাকি? কোনো উটকো বদমাস রসিকতা করছে হয়ত। বোম্বাইতে যদি ভীরন্দাজ ছবি হিট

হতে পারে ত সবই হতে পারে।’

‘আর গাড়িতে গুলবাহার সেন্ট?’

‘ওটা ওই জুইভারই মাথে। কিরকম টোঁরর কাহার দেখেছেন? শৌখীন লোক। ধরা পড়ে অপ্রস্তুত হয়ে স্বীকার করলে না।’

‘তাহলে আর কী, নিশ্চিন্তে ঘুমোন গিয়ে।’

কস আর বলতে। মাথাটা ধরেছিল বলে ব্যাগটা খুলেছিলুম কোডে-পাইরিনের জন্য, আর তাতেই এই হাইভোলটেজ আবিষ্কার। যাক, রহস্য যখন মিটেই গেল, তখন আপনিও বরং একটু আধ্যাতিক বিষয় অধ্যয়নে মনো-নিবেশ করুন। বইটা রেখে গেলুম। গুড নাইট।’

লালমোহনবাবু চলে গেলেন, আর আমিও আবার জায়গায় এসে শলাম।

‘যে লোক অরবিব্দের বইয়ের বদলে জটায়ুর বই পেল তার মনের অবস্থা কী হবে ফেলদা?’

‘খপ্‌চুরিয়াস’, বালিশে মাথা দিয়ে বলল ফেলদা। মাথার পিছনের ব্যাতিটা ও জর্দালিয়েই রাখল। দেখে হাসি পেল ফেলদা তার সবুজ নোটবই সরিয়ে রেখে অরবিব্দের লাইফ ডিভাইনের পাতা ওলটাল।

আমার বিশ্বাস ঠিক ওই সময়টাতেই আমার চোখ ঘূমে বন্ধ হল।

বসে থেকে পূর্ণা বাবার পথে খান্ডালা আর লোনার্ডলির মাঝামাঝি একটা লেভেল ক্রসিং-এর কাছে আমাদের যেতে হবে শূটিং দেখতে। ছবির এগারোটা ক্রাইম্যান্সের শেষ ক্রাইম্যান্স দৃশ্য তোলা হবে আজ। একদিনে কাজ শেষ হবে না, পর পর আরো চারদিন যেতে হবে সবাইকে। আমরা ঠিক করেছি আজ যদি ভালো লাগে তাহলে বাকি ক'দিনও যাব। ট্রেনটা এই পাঁচদিনই পাওয়া যাবে, প্রতিদিনই ঠিক একটা থেকে দুটো—অর্থাৎ এক ঘণ্টার জন্য। ডাকাত-দলের ঘোড়া আর হিরোর লিংকন কনভারটিব্ল থাকবে সারাদিনের জন্য। ভিলেন ইঞ্জিন ড্রাইভারের জায়গা দখল করে ট্রেন চালিয়ে নিয়ে চলেছে, সেই ট্রেনেরই একটা কামরায় হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে রয়েছে হিরোইন আর তার কাকা। মোটরে করে হিরো ট্রেনের উদ্দেশে যাওয়া করছে। এদিকে হিরোর যে যমজ ভাই—যাকে ছেনোবেলায় ডাকাতের ধরে নিয়ে গিয়েছিল, আর যে, এখন নিজেই ডাকাত—সে আসছে ঘোড়া করে দলবল নিয়ে ট্রেনটাকে আটক করবে বলে। মোটরে হিরো এসে পেরীছানর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ডাকাত ভাই ঘোড়া থেকে চলন্ত ট্রেনে লাফিয়ে পড়ে। এঞ্জিনের ভিতর ফাইট হয়, ভিলেন-ড্রাইভার খতম হয়। সেই সময় মোটরে করে হিরো এসে পড়ে, আর তারপর... বাকি অংশ রূপালী পর্দায় দেখিবেন। আসলে শেষটা নাকি তিনরকম ভাবে তোলা হবে, তারপর পর্দায় দেখে যেটা বেশ ভালো লাগে সেটা রাখা হবে।

পুলকবাবু সকালে তিন মিনিটের জন্য ঢুঁ মেরে গেছেন। আমাদের ব্যবস্থা সব ঠিকঠাক ছেনে বসলেন, লালদা, আপনাকে দেখেই বুকতে পারছি তীরন্দাজ আপনায় খুব ভালো লাগেছে।

আসলে লালমোহনবাবু সকাল থেকেই রাস্তারের ঘটনাটা ভেবে ক্ষণে ক্ষণে আপন মনে হেসে ফেলেছিলেন: পুলকবাবুর সামনে সেই হাসিটাই অবশ্যি পড়েছিল। এখন পুলকবাবুর কথা শুনে আরো জোরে হেসে বসলেন, ‘ওঃ—গড়পারের ছেলে—তুমি দ্যাখলে ভাই—হ্যাঃ!’

ফিরতে রাত হবে, তাই ফেলদা বলল হাত-বাগগুলো সঙ্গে নিয়ে নিতে। কালকের কেনা কমলালেবু, বিস্কুট, লজগুদস ইত্যাদি ভিন্ন বাগে ভাগ করে নেওয়া হল, আর লালমোহনবাবুর ক্যাশ দশ হাজার টাকা মানেজারের ভিস্মায় সিদ্দুকে রেখে রসিদ নিয়ে নেওয়া হল। ‘কী জানি বাবা,’ ভদ্রলোক বললেন,

ফিল্মের ডাকাতির দলে আসল ডাকাতও যে ঢুকে পড়বে না এক-আধটা তার কী গ্যারান্টি?

ফেলদুদা সকালে একবার বেরিয়েছিল, বলল ওর সিগারেটের স্টক নাকি ফুরিয়েছে, যেখানে যাচ্ছি সেখানে কাছাকাছির মধ্যে নাও পাওয়া যেতে পারে। ও ফ্লোর দশ মিনিটের মধ্যে আমরা রওনা দিয়ে দিলাম। আজও দেখলাম গাড়িতে গুলবাহারের গন্ধ কিছুটা রয়ে গেছে।

বন্দে থেকে থানা স্টেশন প্রায় পঁচিশ কিলোমিটার। সেখান থেকে রাস্তা ডাইনে ঘুরে ন্যাশনাল হাইওয়ে ধরে পদ্মার দিকে চলে গেছে। এই রাস্তায় আশি কিলোমিটার গেলেই খান্ডালা। আজ দিনটা ভালো, আকাশে টুকরো টুকরো মেঘ হাওয়ার তেজে তরতর করে ভেসে চলেছে, তার ফাঁক দিয়ে ফাঁক দিয়ে রোদ বেরিয়ে বোম্বাই শহরটাকে বার বার ধুয়ে দিচ্ছে। পদ্মকবাবু বলে গেছেন শূটিং-এর জন্য এটা নাকি আইডিয়াল ওয়েদার। লালমোহনবাবুর আশি আজকে সব কিছুই ভালো লাগছে। খালি খালি বললেন, 'বালিত বাবার আশ মিতে গেল মশাই। বাসে লোক বুলছে না সেটা লক্ষ্য করেছেন? ও—কী সিভিক সেন্স এদের!'

থানা পৌছতে লাগল প্রায় এক ঘণ্টা। এখন সোয়া নটা। হাতে সময় আছে, তাই আমরা তিনজন আর ড্রাইভার ম্বরুপলাল একটা চায়ের দোকানের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে এলাচ দেওয়া চা খেয়ে নিলাম।

থানা ছাড়বার কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখলাম আমরা ওয়েস্টার্ন ঘাটস-এর পাহাড়ের পাশ দিয়ে চলেছি। টেনলাইন আর এখন আমাদের পাশে নেই; সেটা থানার পরেই উত্তরে ঘুরে চলে গেছে কল্যাণ। কল্যাণ থেকে আবার দক্ষিণে ঘুরে সেটা মাথেরান হয়ে যাবে পদ্মা, মাকপথে পড়বে আমাদের লেভেল ক্রসিং।

পথে লালমোহনবাবুর গলায় কমলালেবুর বিচি আটকে গিয়ে বিষম জগা ছাড়া আর কোনো ঘটনা ঘটেনি। ফেলদুদার মনের অবস্থা কী সেটা ওর মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল না। ও গম্ভীর মানেই যে চিন্তিত, সেটা ফেলদুদার বেলায় খাটে না এ আমি আগেও দেখেছি।

সড়ে কারোটা নাগাদ খান্ডালা ছাড়িয়ে মাইলখানেক যেতেই সামনে দূরে রাস্তার ধারে একটা জয়গায় মনে হল যেন মেলা বসেছে। তারপর মনে হল, মেলায় এত গাড়ি থাকবে কেন? আরো কাছে যেতে গাড়ি আর মানুষ ছাড়া আরেকটা জিনিস চোখে পড়ল, সে হচ্ছে ঘোড়া। এবারে বুঝলাম ভিড়টা আসলে হচ্ছে ছোট বাহাদুরের শূটিং-এর দল। সব মিলিয়ে অন্তত শ'খানেক লোক, স্বাক্ষপার্টের ক্যামেরা আলো রিফ্লেক্টর সতরঞ্চি—সে এক এলাহি ব্যাপার।

আমাদের গাড়িটা একটা আশ্বাসডর আর একটা বসের মাঝখানে একটা

ফাঁক পেয়ে তার ভিতরে ঢুকে থেমে গেল। আমরা নামার সঙ্গে সঙ্গেই পলক-
বাবু এগিয়ে এলেন—তার মাথায় একটা সাদা ক্যাপ আর গলায় কুলোন একটা
দুরনীনের মতো যন্ত্র।

‘গুড মর্নিং! সব ঠিক হয়?’

আমরা তিনজনেই মাথা নেড়ে হায়স জানিয়ে দিলাম।

‘শুনুন—মিস্টার গোরের ইনস্ট্রাকশন—উনি মাথেরাঙ্গে আছেন যেখান থেকে
ট্রেন আসছে। রেল কোম্পানির কর্তাদের সঙ্গে কথাবার্তা আছে; কিছু
পেয়েও আছে বোধহয়। উনি ট্রেনের সঙ্গেই চলে আসবেন, অথবা মোটরে
করে আসবেন। আপনারা ট্রেনটা এলেই খবর পেয়ে যাবেন। মোট কথা, উনি
আসুন বা না আসুন, আপনারা ফাস্ট ক্লাসে উঠে পড়বেন। অল ক্রিয়ার?’

‘অল ক্রিয়ার,’ বলল ফেলুদা।

বোম্বাইয়ের ফিল্ম জাহানে যে এত বাঙালী কাজ করে এটা আমার ধারণা
ছিল না। তার মধ্যে কেউ কেউ যে ফেলুদাকে চিনে ফেলবে তাতে আর আশ্চর্য
কী? ক্যামেরাম্যান দাশু ঘোষের সঙ্গে পরিচয় হতেই তার চোখ কুঁচকে গেল।

‘মিস্টার? আপনি কি ডিটেক—?’

‘ধরেছেন ঠিক, কিন্তু চেপে রাখুন,’ বলল ফেলুদা।

‘কেন মশাই? আপনি শু আমাদের প্রাইড। সেবারে এলোরার মূর্তি’ চুরির
ব্যাপারটা—’

ফেলুদা আবার ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ভদ্রলোককে থামাল।

দাশুবাবু এবার গলা নামিয়ে বললেন, ‘আবার কোনো তদন্ত-টদন্ত করছেন
নাকি এখানে?’

‘অজ্ঞে না’, ফেলুদা বলল, ‘শ্রেফ বেড়াতে এসেছি আমার এই বন্ধুটির
সঙ্গে।’

দাশু ঘোষ একুশ বছর বয়সে থেকেও নিয়মিত বাঙালী উপন্যাস পড়েন,
এমন কি জটায়ুর বইও পড়েছেন দুর্ভাগ্যে। এ দৃশ্যে অর্ধাশা উনি ছাড়া
আরো দুজন ক্যামেরাম্যান কাজ করছেন; তাঁরা অবাঙালী। পলকবাবুর চাবুক
অ্যাসিসট্যান্টের দুজন বাঙালী। হাঁরা আগুটিং করবেন তাঁদের মধ্যে অর্ধাশা
কেউই বাঙালী নেই। অর্জুন মেরহোত্রা ছাড়া আরে আছেন ইন্ডিয়ানবেশী
মিকি। শব্দ মিকি; পদবী ব্যবহার করেন না। বোম্বাইয়ের উন্নীত ভিলেনের
মধ্যে টপ, একসঙ্গে সাইট্রিশটা ছবি সই করেছেন, যদিও তার মধ্যে উন্নীতশটার
গম্পা চেপে করে ফাইটের সংখ্যা কমতে হচ্ছে। ডাগো/জেট বাহাদুর-এ মাত্র
চারটে ফাইট, না হলে পলকবাবু আর মিস্টার গোরের সঙ্গে মাথা চুলকোতে হত।

এসব খবর আমাদের দিলেন প্রোডাকশন ম্যানেজার সুদর্শন দাস। ইনি



উড়িষ্যার লোক, অনেকদিন যম্বেতে রয়েছেন। তবে এ ছবিটা হয়ে গেলেই নাকি কটক ফিরে গিয়ে নিজে ওড়িয়া ছবি পরিচালনা করবেন।

ফেলদা ইতিমধ্যে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেছে আরেকটা জটলার দিকে। সেখানে ডাকাতের দলকে মেক-আপ করে পোশাক পরানো হচ্ছে। একজন ডাকাতের সঙ্গে ফেলদাকে দাঁকা বাঁচাং করতে দেখে একটা অবাধ হয়েই এগিয়ে গেলো। তারপর ডাকাতের গলা শব্দে বুকলো—ওমা, এ যে কুং-ফু এক্সপার্ট ভিক্টর পেরুমল। হিরোর যমজ ভাইয়ের মেক-আপ করা হয়েছে তাকে। ছুটপুট ছোড়া থেকে লাফিয়ে চলন্ত ট্রেনের ছাতে পড়তে হবে, তারপর ছ'টা কামরার ছাদের ওপর দিয়ে ছেঁটে গিয়ে একেবারে এগজিনে পৌঁছে ভিলেন-বেশী দাঁককে ঘায়েল করতে হবে। তারপর হিরো আর তার বিশ-বছর-না-দেখা ডাকাত-বনে-যাওয়া ভাইয়ের মধ্যে হাই-ভোল্টেজ সংঘর্ষ।

লালমোহনবাবু এই এলাহি কাপার দেখে কেমন জ্ঞানি চুপ মেরে গেছেন, যদিও ভেবে দেখলে তাঁর ফর্তি হবার কথা, কারণ তাঁর গল্পকে ঘিরেই এত

হৈ-হল্লা। বললেন, ‘একটা গম্প লিখে এতগুলো লোককে এত হ্যাঙ্গাম এত পারিশ্রম এত খরচের মধ্যে ফেলিচি এটা ভাবতে একটা পিকিউলিয়ার ফিলিং হচ্ছে ভবেশ। এক এক সময় নিছেকে রীতিমত শক্তিশালী বলে মনে হচ্ছে। মাঝে মাঝে আবার গিলটি মনে হচ্ছে; আবার সেই সঙ্গে এও মনে হচ্ছে যে এরা লেখককে কোনো সম্মান দেয় না। ক’টা লোক এখানে জটারদুর নাম জানে সেটা বলতে পার?’

আমি সান্দ্বনা দেবার জন্য বললাম, ‘ছবি যদি হিট হয় তাহলে নিশ্চয়ই জ্ঞানবে।’

‘আশা করি!’—দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন লালমোহনবাবু।

যেসক ডাকাতের মেক-আপ হয়ে গেছে তাদের মধ্যে কয়েকজন ছোড়ার পিঠে চেপে ছুটোছুটি আরম্ভ করে দিয়েছে। ঘোড়াগুলো একটা বিশাল বটগাছের তলায় ডগড়া হয়ে ছিল। গুণে দেখলাম সব শূন্য নটা।

মিনিট খানেকের মধ্যেই নীল কাচ ভোলা একটা প্রকাণ্ড সাদা লিংকন কনভারটিবল গাড়িতে হিরো আর ভিলেন এসে হাজির হল। হিরোইনের দরকার লাগবে না, কারণ ট্রেনের কামরায় বন্দী অবস্থায় তার শটগুলো ন্যাক নটুডিওতে ভোলা হবে। সেটা এক হিসেবে ভালো। এই দুই পুরুষ তারকা গাড়ি থেকে নামতেই চারিদিকে যা শোরগোল পড়ে গেল, হিরোইন থাকলে না জানি কী হত।

সুদর্শনবাবু চা এনে দিয়েছিলেন, আমরা খাওয়া শেষ করে পেয়াদা ফেরত দিচ্ছি এমন সময় বাজখাই গলায় লাউডস্পীকারের হাঁক শোনা গেল—‘ট্রেন কামিং! ট্রেন আতি হ্যায়! এভরিবডি রেডি!’

ঝড়ঝড় শব্দের সঙ্গে কালো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আটটা বোগি সমেত পুরোন টাইপের এঞ্জিনটা বন্ধন লেভেল ক্রাসিং-এর কাছে এসে দাঁড়ান তখন ঘড়িতে ঠিক একটা বাজতে পাঁচ মিনিট। ফান্ট ক্রাস কামরা যে মাত্র একটাই, আর সেটাও যে পুরোন ধাঁচের, সেটা দূর থেকেই বন্ধতে পারছি। অন্য কামরা-গুলোতে মাথেরনে থেকেই প্যাসেঞ্জার বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে ছেলেকেমেয়ে বড়োবড়ো সবরকমই আছে। ট্রেন স্বামীর সঙ্গে সঙ্গেই পুলকবাবুর ব্যস্ততা একেবারে সপ্তমে চড়ে গেছে। তিনি একবার এ কামেরা থেকে ও কামেরায় ছুটে যাচ্ছেন, একবার হিরো থেকে ভিলেন, একবার এ-অ্যাসিসট্যান্ট থেকে ও-অ্যাসিসট্যান্ট। লালমোহনবাবু পর্বন্ত বলতে বাধ্য হলেন, 'না মশাই, শব্দ টাকা দিয়ে ছবি হয় না এটা বোঝা যাচ্ছে।'

হিরোর গাড়ি রোঁড, কালো চশমা পরে স্ট্রিয়ারিং ধরে বসে আছে অজ্ঞান মেরহোত্রা, পাশে তার নিজের মেক-আপম্যান আর দুজন ছোকরা টাইপের লোক, বোধহয় চামচা-চামচা হবে। অজ্ঞানের সামনে একটা হুডখোলা জুঁপে তেপায়া স্ট্যান্ডের উপর ক্যামেরাও রোঁড। ভিকটর সমেত ডাকাতের দল ঘোড়ার পিঠে আগেই এগিয়ে গেছে। তারা চলন্ত ট্রেন থেকে সিগন্যাল পেলে একটা বিশেষ পাহাড়ের বিশেষ জায়গা থেকে নেমে এসে ট্রেনের পাশে পাশে দৌড় আরম্ভ করবে। ভিলেন মিকিকে দেখলাম পুলকবাবুর একজন সহকারীর সঙ্গে এঞ্জিনের দিকে এগিয়ে গেল।

আমাদের কী করা উচিত ঠিক বন্ধতে পারছি না। কারণ মিঃ গোরের দেখা নেই। তিনি ট্রেনেই এসেছেন কিনা সেটাও বন্ধতে পারছি না।

ভিড় পালা হয়ে গেছে অথচ আমাদের দিকে কেউ আসছে না দেখে লালমোহনবাবুর উসখুসুনি আরম্ভ হয়ে গেল। বললেন, 'ও ফেলদাবু, এরা কি ভুলে গেল নাকি আমাদের?'

ফেলদা বলল, 'একটিই মাত্র প্রথম শ্রেণীর কামরা; কথা মতো সেটাতে গিয়েই ওটা উচিত আমাদের। দেখি আরো দু মিনিট।'

দু মিনিটের আগেই, এঞ্জিন থেকে দুটো হুইসল শোনা গেল, আর কসি গুহুতেই সন্দর্শন দাশের হাঁক।

'এই যে, আপনারা চলে আসুন, চলে আসুন!'

আমরা হাতে ব্যাগ নিয়ে দৌড় দিলাম। সুদর্শনবাবু আমাদের ফাস্ট ক্লাশের দরজা অবধি পৌঁছে দিলেন। বললেন, 'আমি ত কিছুই জানতাম না। এইমাত্র একজন লোক এসে খবর দিলে—বললে গোরে সাহেব অধঃশটার মধ্যেই এসে পড়বেন। প্রথম শটের পর ট্রেন আবার এইখানেই ফিরে আসবে।'

কামরায় উঠে দেখি একটা বোম্বার উপর একটা বড় জলের ফ্লাস্ক, আর সাফারি রেস্টোর্যান্টের নাম লেখা চারটে সাদা কাগজের বাস্ক। অর্থাৎ আমাদের লাগু। এত ব্যস্ততার মধ্যেও উদ্ভুলোকে য়ে আশ্চর্য খেয়াল সেটা নবীকার করতেই হবে।

আরেকটা হুইসেলের সঙ্গে একটা বার্কুনি দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল। আমরা তিনজনে জানালা দিয়ে বাইরের কান্ডকারখানা দেখবার জন্য ভৈরি হলাম। একেবারে নতুন অভিজ্ঞতা, তাই মনে একটা বেশ রোমাণ্ড ভাব হাঁচ্ছিল।

গাড়ি ক্রমশ স্পীড নিয়েছে। ডান পাশ দিয়ে রাস্তা গেছে, সৈনিকের বোম্বটেই বসেছি আমরা তিনজন। বার্দিকে পাহাড় পড়বে, অর্থাৎ সেটা হল ডাকাতের দিক। ডান দিকটা হিরোর দিক।

আরো একটু স্পীড বাড়ার পর ডান দিকের রাস্তা দিয়ে প্রথমে ক্যামেরা সমেত জীপ, তারপর হিরোর গাড়ি আসতে দেখা গেল। এখন অবশ্য হিরো ছাড়া গাড়িতে আর কেউ নেই। ক্যামেরার মুখটাও যে তার দিকেই ঘোরানো সেটা বুদ্ধিতে পারলাম। যিনি ছবি তুলছেন তিনি ছাড়া আরো তিনজন লোক রয়েছেন, তার মধ্যে একজন হল পলকবাবুর অ্যাসিস্ট্যান্ট। সে হাতে একটা চোঙা নিয়ে তার ভিতর নিয়ে হিরোকে 'ডাইনে তাকাও' 'বঁয়ে তাকাও' ইত্যাদি নির্দেশ দিচ্ছে।

আর দুটো ক্যামেরার একটার সঙ্গে পলকবাবু রয়েছেন—সেটা রয়েছে ট্রেনেই একটা কামরার ভিতর। তৃতীয় ক্যামেরাটা রয়েছে ট্রেনের পিছন দিকের শেষ কামরার ছাতে।

হিরো তেমন জোরে গাড়ি চালাচ্ছে না দেখে আমার মনটা দমে গিয়েছিল, কিন্তু ফেলদা বলল ওটা ছবিতে নাকি জোরেই মনে হবে, কারণ ক্যামেরা স্পীড কমিয়ে শটটা নেওয়া হচ্ছে।

'তাছাড়া যতটা আস্তে ভাবছি ততটা আস্তে কিন্তু যাচ্ছে না গাড়িটা, কারণ আমাদের ট্রেনটাও ত চলেছে সঙ্গে সঙ্গে, আর চলেছে বেশ জোরেই।'

ঠিক কথা। এটা আমার খেয়াল হয়নি।

কিছুক্ষণের মধ্যে ক্যামেরা আর হিরোর গাড়ি আমাদের কামরা ছাড়িয়ে চলে গেল। পুরোন কামরা, তাই জানালার গরদ নেই; গলা বাড়িয়ে আরো কিছুক্ষণ দেখার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু ফেলদা বাধা দিয়ে বলল, 'জট কাহাদুর ছবি



দেখতে গিয়ে যদি পর্দায় দেখিস তুই গলা বাড়িয়ে শব্দটিং দেখাছিস, সেটা কি শব্দ ভালো হবে।’

লোভ সংবরণ করে উলটো দিকের জানালার ধারে বসব বলে সীট ছেড়ে দাঁড়িয়েছি, ঠিক সেই সময় নাকে গন্ধটা এল।

ফেলদা দেখি আর আমার পাশে নেই। তার দৃষ্টি বাথরুমের দরজার দিকে, সে এক লাফে উল্টোদিকে চলে গেছে, তার ভান হাত কোর্টের পকেটে।

‘বন্দুক বার করে লাভ নেই মিস্টার মিষ্টার।’ অলরেডি একটি রিভলবার আপনার দিকে পয়েন্ট করা রয়েছে।’

এবার দেখলাম পাহাড়ের দিকের দরজাটা খুলে গেল। একজন লোক হাতে একটা রিভলভার নিয়ে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে দরজার মুখেই দাঁড়িয়ে বইল। একে কি দেখছি আগে? হ্যাঁ—এইত সেই লালসার্ট! কিন্তু আজ এর পোষাক অন্য, আর চেহারাও যে হিংস্র ভাব দেখাচ্ছে সেটা সেদিন এয়ার পোটে দেখিনি। আজ এই অবস্থায় দেখে বুঝছি লোকটা একেবারে নিখাদ খুনে। তার হাতের রিভলভারটা তাগ করা রয়েছে সোজা ফেলদার দিকে।

এবার বাথরুমের দরজাটা অল্প ফাঁক অবস্থা থেকে পুরো খুলে গেল, আর সেই সঙ্গে কামরাটা গুলবাহারের গন্ধে ভরে গেল।

‘সান...সান...’

লালমোহনবাবুর শরীর কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেছে।

‘সান্যালই বটে.’ বললেন আগন্তুক, ‘আর আপনার সঙ্গেই আমার আসল দরকার, মিঃ গাঙ্গুলী। বইয়ের প্যাকেটটা নিশ্চয়ই ফেলে রেখে আসেননি। ব্যাগটা খুলুন, খুলে বার করে দিন। না-দিলে কী ফল হবে সেটা আর নাই বললাম।’

‘প্যা-প্-প্যাকেট...’

‘কী প্যাকেটের কথা বলছি বুঝেছেন নিশ্চয়ই। আপনারই বই আপনার হাতে নিশ্চয়ই তুলে দিয়ে আসিনি সেদিন এয়ারপোটে। বার করুন, বার করুন।’

‘আপনি ভুল করছেন। প্যাকেট ও’র কাছে নেই, আমার কাছে।’

ট্রেনের শব্দের জন্য সকলকেই চেঁচিয়ে কথা বলতে হচ্ছে, কিন্তু ফেলদার গম্ভীর গলা চাপা অবস্থাতেই ট্রেনের শব্দ ছাপিয়ে সন্যাসের কানে পৌঁছেছে, কারণ চশমার পিছনে ভ্রুলোকের সোথ দৃটো জড়লে উঠেছে।

‘লাইফ ডিভাইনের এতগুলো পাতা নষ্ট করে আপনার ঐশ্বর্য কিছু বাড়ল কি?—ফেলদার গলার স্বর এখনো ধীর, কথাগুলো মাপ্য।

‘নিশ্চয়’, গুলজাটার দিকে আঙুল দৃষ্টি দিয়ে খসখসে গলায় বললেন সান্যাল,

‘ইয়ে আদমি কোই ভি খুঁজুড় করনেসে ইনকো খতম কর না...হাত তুলে রাখুন, মিস্টার মিস্তার!’

‘আপনার খুঁজুড়টা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না কি?’ ফেলুদা বলল। ‘আপনি যে জিনিষটাই খুঁজছেন সেটা পেলেই শু আর আমাদের ছেড়ে দেবেন না। খতম আমাদের এগার্নিতেই করবেন। কিন্তু ট্রেন থামলে পর আপনার কী দশা হবে সেটা ভেবে দেখেছেন?’

‘ভেরি ইজি,’ দাঁত বের করে বিদ্রী়া হেসে বললেন মিঃ সান্যাল, ‘আমাকে আর কে চেনে বলুন! এত প্যাসেঞ্জার রয়েছে ট্রেনে, তার মধ্যে মিশে যেতে পারব না? আপনাদের লাশ পড়ে থাকবে, আমি বাইরে বেরিয়ে অন্য কানায় চলে যাব। ভেরি ইজি, ইজন্ট ইট?’

ফেলুদার সঙ্গে অনেক রকম সংকটের মধ্যে পড়ে আমার সাহস বেড়ে গিয়েছে ঠিকই, কিন্তু একটা কারণে এই মূহুর্তে সাহস আমার অনেক ডেস্টো সম্বন্ধে বার বার আমার সমস্ত শরীর ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছিল। কারণ আর কিছুই না—ওই নিশ্চয়। এরকম একটা নিষ্ঠুর খুঁজে চেহারা গল্পেই পড়া যায়। কামরার বন্ধ দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, গায়ের ফিনফিনে ফুলকারি করা শার্টটা খোলা জানলা দিয়ে আসা হাওয়াতে ফুরফুর করছে, ডান হাতটা ট্রেনের ঝাঁকুনিতে দুললেও রিভলভারটা ঠিকই ফেলুদার দিকে ভাগ করা রয়েছে।

সান্যাল এক পা এক পা করে এগিয়ে এলেন। নাক জ্বলে যাচ্ছে সেন্টের গন্ধে। সান্যালের দৃষ্টি ফেলুদার ব্যাগের দিকে। এয়ার ইন্ডয়ার ব্যাগ, ফেলুদার সামনেই সিটের উপর রাখা। লালমোহনবাবুর কী অবস্থা জানি না, কারণ তিনি এখন আমার পিছনে। ট্রেনের আওয়াজের মধ্যেও ওঁর হাঁপানির টানের মতো নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

ট্রেন ছুটে চলেছে। তার মানে শূঁটিংও হয়ে চলেছে নিশ্চয়ই। মিঃ গোরে কী সাংঘাতিকভাবে আমাদের ভোবালেম সেটা উনি জানেন কি?

সান্যাল সীটে বসে ব্যস্ততার ক্যাচ টিপলেন। ঢাকনা খুলল না। ব্যস্ত চাবি লাগানো।

‘চাবি কোথায়? এটার চাবি কোথায়?’

মিঃ সান্যালের সমস্ত মুখ অসহিষ্ণু রাগে কুঁচকে গেল।—‘কোথায় চাবি!’

‘পকেটে,’ শাস্তভাবে জবাব দিল ফেলুদা।

‘কোন পকেটে?’

‘ডান!’

আমি জানি ওই পকেটেই ফেলুদার রিভলভার।

সান্যাল উঠে দাঁড়ালেন। রাগে ফুলছেন তিনি। কয়েক মূহুর্ত যেন

কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তারপর—

‘ভূমি এসো!’—আমার দিকে ফিরে গর্জিয়ে উঠলেন মিঃ সান্যাল।

ফেল্দাদাও আমার দিকে চাইল। ইশিগতে যুবল্যাম সে আমাকে সান্যালের আদেশ পালন করতে বলছে।

যখন ফেল্দাদার দিকে এগোচ্ছি, তখন টেনের শব্দ ছাড়া আরেকটা শব্দ কানে এল। ঘোড়ার খুরের শব্দ। এর মধ্যে কখন যে বাঁদিকে পাহাড় এসে গেছে তা খেয়ালই করিনি। ফেল্দাদার পকেটে যখন হাত ঢোকাচ্ছি তখন দেখলাম



পাহাড়ের গা দিয়ে ধুলো উড়িয়ে ডাকাতির দল নামছে।

রিডলভারের পাশে হাতড়াতেই চাবি ঠেকল হাতে।

‘দিয়ে দে।’

আমি চাবি দিয়ে দিলাম মিঃ সান্যালকে। ফেল্দাদার হাত দুটো এখনো মাথার উপর।

সান্যাল বাজের তালায় চাবি লাগিয়ে ঘোরালেন। বাস খুলে গেল। লাইফ

ডিভাইন উপরেই রাখা। স্বাক্ষর থেকে বই বোঁরিয়ে এল।

জানালার ঠিক বাইরেই ঘোড়ার খুঁর। একটা নয়—অনেকগুলো—তীরবেগে নেমে আসছে পাহাড়ের গা বেয়ে, ছুটে চলেছে স্ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।

সানরল সেইসে হাতে নিয়ে কয়েকটা পাতা উলটিয়ে যেখানে পেঁপীছিলেন তার ক্ষেত্রে আর উলটোন যায় না। কারণ সেগুলো পরস্পরের সঙ্গে সাঁটা। এবার উলটোনোর বদলে সানরল একটা অদ্ভুত কাজ করলেন। পাতার মাঝখানটা খামচিয়ে সেটাকে ছিঁড়ে ফেললেন, আর ফেলতেই তার তলায় একটা চৌকো খোপ বোঁরিয়ে পড়ল। পাতাগুলোর মাঝখানটা একসঙ্গে কেটে ফেল খোপটা তৈরি করা হয়েছে।

খোপের ভিতর দৃষ্টি দিতেই সানরলের মূখের অবস্থা দেখবার মতো হল। উনি ভিতরে কী আশা করেছিলেন জানি না, এখন বেরোল খান আশেটক সিগারেটের পোড়া টুকরো, ডজন কানেক পোড়া দেশলাই আর বেশ খানিকটা সিগারেটের ছাই।

‘কিছু মনে করবেন না,’ বলল ফেলুদা, ‘ওটাকে ছাইদান হিসাবে ব্যবহার করার জোভ সামলাতে পারলাম না।’

এবারে সানরল এত জোরে চ্যাটলেন যে মনে হল সমস্ত স্ট্রেন ওর কথা শুনবে।

‘বেয়াদাবির আর জারগা পাওনি? ভেতরের আসল জিনিস কোথায়?’

‘কী জিনিসের কথা বলছেন আপনি?’

‘স্কাউন্ডল!—তুমি জান না কিসের কথা বলছি?’

‘নিশ্চয়ই জানি, তবু আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই!’

‘কোথায় সে জিনিস?—আবার গর্জিয়ে উঠলেন মিঃ সানরল।

‘পকেটে!’

‘কোন পকেটে?’

‘বাঁ পকেটে!’

ডাকাতের দল এখন জানালার ঠিক বাইরে, কারণ পাহাড় আরো কাছে চলে এসেছে। ধুলো এসে ঢুকছে আমাদের কানায়।

‘ইউ দেয়ার!’

আমি জানি আমার উপর আবার হুকুম হবে।

‘হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কি—যাও, হাত ঢোকাও!’

আবার আদেশ মানতে হল।

এবার পকেট থেকে যে জিনিস বেরোল তেমন জিনিস আমি কোনোদিন হাতে ধরিনি। হাঁসে আর মন্তব্য দিয়ে গাঁথা এই আশ্চর্য হার রাজা-বাদশাদের

হাতেই মানায়।

‘দাও ওটা আমাকে।’

মিঃ সান্যালের চেখে জ্বলজ্বল করছে, কিন্তু এবার রাগে নয়, উল্লাসে, লোভে।

আমার হাত সান্যালের দিকে এগিয়ে গেল। ফেল্দুদার হাত মাথার উপর তোলা। লালমোহনবাবুর মুখ দিয়ে গোঙানির মত শব্দ বেরোচ্ছে। ডাকাতির দল—

দড়াম্!

একটা ভারি শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কামরাটা যেন একটু কেঁপে উঠল, আর তার পরেই দেখলাম নিম্মো কামরার মেঝেতে গড়াগড়ি দিচ্ছে, কারণ একজোড়া পা জানালা দিয়ে ঢুকে সটান সজোরে লাগি ফেরেছে তার গায়ে! ফলে নিম্মোব হাতের রিভলভার ছুটে গিয়ে সিলিং-এর বাতির কাচ চুরমার করে দিল, আর সেই সঙ্গে ফেল্দুদারও হাতে বিদ্যুৎবেগে চলে এল তার নিজের রিভলভার।

এবারে পাহাড়ের দিকের দরজাটা আবার খুলে গেল, আর সেই দরজা দিয়ে ডাকাতির বেশে যিনি ঢুকলেন তাকে আমরা তিনজনেই খুব ভালো করে চিনি।

‘থ্যাঙ্ক ইউ, ভিকটর,’ বলল ফেল্দুদা।

সান্যাল সীটের উপর বসে পড়েছেন। এবার কাপড়নিটা রাগের নয়, ভয়ের, কারণ তিনি জানেন তিনি জ্বর, তাঁর আর পালবার পথ নেই।

এদিকে শ্রুটিং-এ গন্ডগোল ব্যর্থ কেউ নিশ্চয়ই চেন টেনে দিয়েছে, কারণ ট্রেনটা যেভাবে থামল সেটা চেন টানলেই হয়।

থামার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই শোরগোল শুনতে পেলাম। একই লোকের নাম ধরে অনেক চীৎকার করছে।

‘ভিকটর! ভিকটর! কোথায় গেল, ভিকটর?’

পুলকবাবুর গল্যা। যত গন্ডগোল তত ভিকটরকে নিয়েই, কারণ তার লাফিয়ে পড়ার কথা ছাড়ে, আর সে কিনা সোজা এসে ঢুকেছে আমাদের কামরায়।

ফেলুদা! দরজা খুলে মুখ বার করে পুলকবাবুকে ডাকলেন।

‘এই যে মশাই, এদিকে।’

ভিকটরকে হস্তদস্ত হয়ে আমাদের কামরায় উঠে এলেন। দেখে মনে হল তাঁর শেষ অবস্থা, কারণ শুনছি এই ধরনের একটা শটে গন্ডগোল হওয়া মানে প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা জলে যাওয়া।

‘ব্যাপার কী, ভিকটর? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?’

‘আপনার ছবিতে জেট বাহাদুর আখ্যা একমাত্র ভিকটর পেরুমলই পেতে পারে পুলকবাবু।’

‘তার মানে?’ পুলকবাবু অবাক হয়ে দেখলেন ফেলুদার দিকে। তার ফ্যালফ্যালে ভাবটার মধ্যে এখনো যথেষ্ট পরিমাণে বিরাগিত মেশানো রয়েছে।

‘আর সমাগলারের পার্টটা পরমেশ কাপুরকে না দিয়ে আপনার একে দেওয়া উচিত ছিল।’

‘কী সব উলটোপালটা বকছেন? ইনি কে?’ পুলকবাবু মিঃ সান্যালের দিকে চেয়ে জিগোস করলেন।

ইতিমধ্যে জানদিকের রাস্তায় দুটো নতুন গাড়ির আবির্ভাব হয়েছে—একটা পলিশ জীপ আর একটা পলিশ ভান। জীপটা আমাদের কামরার পাশেই এসে থামল। তার থেকে নামলেন ইনস্পেকটর পটবর্ধন।

এইবার পুলকবাবুর প্রশ্নের উত্তরে ফেলুদা মিঃ সান্যালের দিকে এগিয়ে গিয়ে দুই টানে তাঁর দাড়ি আর গোঁফ, আর আরো দুই টানে তাঁর পরচুলা আর

চশমাটা খুলে ফেলে দিয়ে বলল—

‘আপনার গা থেকে গুলবাহারের গন্ধটাও টেনে খুলে ফেলতে পারলে খুশি হতাম মিস্টার গোরে, কিন্তু ওই একটা ব্যাপারে ফেলু মিস্তিরও অপারেশন।’

* * *

‘প্রোডিউসার মিসার ধরা পড়লে ছবি বন্ধ হয়ে যাবে এ কথা আপনাকে কে বললে লালদা?’

প্রশ্নটা করলেন পুলকবাবু। লালমোহনবাবু কিছুই বলেননি, কেবল ঘাড় গোঁজ করে গম্ভীর হয়ে বসে ছিলেন; যদিও এটা ঠিক যে গম্ভীর হবার একটা কারণ হল জেট বাহাদুরের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা।

‘জেট বাহাদুরকে কেউ রুখতে পারবে না লালদা,’ বললেন পুলকবাবু। ‘গোরে চুলোয় থাক, গোপ্পায় থাক, হাজতে থাক, যেখানে খুশি থাক—প্রোডিউসার ত আর বম্বেতে একটা নয়। চুনি পাংগোলি ত এক বছর থেকে আমার পেছনে লেগে আছে—দেখবেন আপনারা থাকতে থাকতেই নতুন ব্যানারে আবার কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে।’

আজকের শর্টিং অফিশি সেই দেড়টায় বন্ধ হয়ে গেছে। গোরে আর নিম্মোর হাতে হাতকড়া পড়েছে, নানাসাহেবের নওলাখা হার পুলিশের জিম্মায় চলে গেছে। আজ যে এরকম একটা ঘটনা ঘটতে পারে সেটা ফেলুদা আগেই বুঝে ছিল, আর তাই ও সকালে সিগারেট কিনতে যাবার নাম করে ইনস্পেক্টর পটবর্ধনের সঙ্গে দেখা করে পুলিশের ব্যবস্থা করে এসেছিল। গোরে নাকি এককালে একটানা বারো বছর কলকাতায় ছিল, শব্দ ডন বম্বে নয়, সেন্ট জর্জভিয়ার্সেও পড়েছে—তাই বাংলাটা সে ভালোই জানে—যদিও বম্বেতে সে মচরাচর হিন্দি, মারাঠী আর ইংরেজিটাই ব্যবহার করে।

আমরা বসে আছি খান্ডালা ডাকবাংলোর বরান্দায়। চমৎকার পাহাড়ে জারুগা, বাতাসে রীতিমত ঠান্ডার আমেজ। বম্বের অনেকেই নাকি খুজিলায় চোখে আসে। সাফারির মার্টিন দো পে'য়াজি আর নান খাওয়া হয়ে গেছে, আগেই, এখন বিকেল সাড়ে চারটে, তাই চা আর পকৌড়া খাচ্ছে সকলে।

আমাদের টেবিলে আমরা তিনজনই বসেছি। পুলকবাবু ছিলেন এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে, এইমাত্র উঠে মেরহোবার টেবিলে চলে গেলেন। অর্জুন মেরহোবার একটু খেন মনমরা ভাব; তার একটা কারণ হলত এই যে, আজকের হিরো হচ্ছে নিঃসন্দেহে প্রদোষ মিস্তির। ইতিমধ্যে অনেকেই ফেলুদার সই নিয়ে গেছে, এমনকি ডিলেন মিকি পর্যন্ত।

সেকেন্ড হিরো ভিকটর পেরুমল ভাত্তেও কোনো মনেই নেই। ফেলুদা ভিকটরকে আগে থেকেই তালিম দিয়ে রেখেছিল। বজাঁছিল—ঘোড়া নিয়ে যখন ট্রেনের ধারে পৌঁছাবে, তখন ফাস্ট ক্লাস কামরার দিকে একটু চেঁখ রেখো। গোসমালার সঙ্গে সোজা দরজা দিয়ে ঢুকে এসো, ফেলুদার দু'হাত মাথার উপর তুলে দেবেই ভিকটর ধরে ফেলেছে গন্ডগোলের ব্যাপার। আশ্চর্য, এত বড় একটা কাজ করেও তার কোন তাপ-উত্তাপ নেই। সে এরই মধ্যে আবার বাংলার সামনের মাঠে তার লোকজন নিয়ে ওয়ান-টু-থ্রী করে কুং-ফু অভ্যাস শুরু করে দিয়েছে।

‘কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে কি—’

লালমোহনকরব্দ এই এতক্ষণে প্রথম মুখ খুললেন। ফেলুদা ঠাট্টা করে মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, ‘ব্যাপারটা হচ্ছে কি, আপনি এখনও সেই ভীমারে সেই ভীমারে—তাই ত?’

জটায়ু একটা গেলেকচার হার্সি হেসে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বোঝালেন।

ফেলুদা বলল, ‘আপনার মনের অশ্বকর দূর করা খুব কঠিন নয়। তবে তার আগে গোরে লোকটাকে একটু বুঝতে হবে, তাহলেই তার কার্যকলাপটা বোধগম্য হবে।’

‘প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে সে আসল স্মাগলার, কিন্তু ভেতর ধরেছে সম্ভ্রান্ত ফিল্ম প্রোডিউসারের। আপনার গল্প থেকে সে ছবি করছে। গল্পে আপনি শিবাজী কাস্লে স্মাগলারেরা থাকে বলে লিখেছেন। স্বভাবতই গোরে তাকে বিচলিত হয়ে পড়ে। তার মনে প্রশ্ন জাগে—আপনি শিবাজী কাস্লে সম্বন্ধে কতদূর কী জানেন, কারণ সে নিজে স্মাগলার আর তার বাস-স্থানও শিবাজী কাস্লে। এইটে জানার জন্য সে সান্যাল সেজে আপনার বাড়ি গিয়ে হাজির হয়। আপনার সঙ্গে আলোচনা করে সে বোঝে যে উয়ের কোনো কারণ নেই। আপনি অত্যন্ত নিরীহ নির্লিপ্ত মানুষ এবং শিবাজী কাস্লে-এর ব্যাপারটা আপনার কাছে একেবারেই কাল্পনিক। সেই সময় তার মাথায় আসে আপনার হাত দিয়ে বইয়ের পকেটে মওলাখা হার পাচার করার আইডিয়া। মনেটা গোরে পাঠাচ্ছিল তারই এক গ্যাঙের লোককে—যে খুব সম্ভ্রান্ত থাকে শিবাজী কাস্লেরই সন্তের নম্বর তুলার দু'নম্বর ফ্রাটে। আপনি যদি ধরা পড়েন, তাহলে দোষ দেবেন সান্যালকে, গোরেকে নয়—তাই ত? অর্থাৎ সান্যালকে খাড়া করে গোরে নিজে থাকছে সেফসাইডে।’

এদিকে হয়ে গেল গন্ডগোল। আপনি পঞ্চাশ লাখ টাকার হারের বদলে চালান করে বসলেন আপনারই পাঁচটাকা দম্মের বই। সেই বইয়ের পকেট নিয়ে লালসার্ট অর্থাৎ নিম্নো শিবাজী কাস্লের লিফট দিয়ে উঠছিল সন্তের

তলায় ; সেই সময় গোরেরই কোন প্রতিশ্রুতী গ্যাঙের লোক নিম্নোকে আক্রমণ করে প্যাকেট আদায় করার জন্য। নিম্নো ভাকে খুন করে প্যাকেট স্বাস্থ্যস্থানে চালান দিয়ে গ্যা ঢাকা দেয়। এদিকে প্যাকেটে যে হার নেই সে খবর পেতেই গোরেরকে চলে আসতে হল। সে ত বুঝেছে কী হয়েছে। তার এখন দুটো কাজ করতে হবে। এক, হার ফিরে পেতে হবে ; দুই, আমাদের খতম করতে হবে। তার একমাত্র ভরসা যে আমরা লাইফ ডিভাইনের রহস্য ভেদ করে হারটা পুনর্লিঙ্গের হাতে জমা দিইনি। গোরে এসেই বুঝল যে সান্যালের পুনরবিবর্তনের প্রয়োজন হবে। সান্যালই যখন মালটা পাঠিয়েছিল, তখন সান্যালকেই সেটা পুনরুদ্ধার করতে হবে, তাহলে গোরের নিজের উপর কোন সন্দেহ পড়বে না।

‘কিন্তু গুলবাহার--’

‘বলছি, বলছি—সব বলছি। গুলবাহার সেন্টের ব্যবহারটা গোরের শয়-জানি বৃদ্ধির আশ্চর্য উপহার। এটার জন্য সে কলকাতা থেকেই তৈরি হয়ে ছিল। সান্যাল মানেই গুলবাহার, আর গুলবাহার মানেই সান্যাল—এ ধারণাটা অন্তত আপনার মনে কখনো মূল হয়ে গিয়েছিল—তাই নয় কি?’

‘হ্যাঁ—তা একরকম হয়েছিল বৈকি।’

‘বেশ। এবার মনে করে দেখুন—সেদিন গোরে আমাদের বৈঠকখানায় বাসিয়ে কিছুক্ষণের জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল—ভাবটা যেন আপনার জন্যে টাক আনতে গিয়েছে—কেমন?’

‘ঠিক।’

‘সেই ফাঁকে লিফ্টে ঢুকে দু’ফোঁটা গুলবাহার সেন্ট ছিটিয়ে দেওয়া কি খুব কঠিন ব্যাপার? উপর থেকে নিচ পর্যন্ত সব ক’টা তলা শূন্যেও যখন কোনো সেন্টের গন্ধ পেলাম না, তখনই বুঝলাম যে গন্ধটা রয়েছে শুধু লিফ্টের ভিতর। অর্থাৎ সেটা হচ্ছে মানুষের গ্যা থেকে নয়, এসেছে সেন্টের শিশি থেকে। ঠিক সেইভাবেই লোক লাগিয়ে লোডাস সিনেমার সাহনে গাড়ির জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে কয়েক ফোঁটা সেন্ট গাড়ির সিটে ছিটিয়ে দেওয়াও অতি সহজ ব্যাপার।’

ফেলুদা বৃদ্ধিয়ে দিলে সত্যিই সহজ। জলমোহনবাবুও যে ব্যাপারটা বুঝেছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু তবু তার মুখে হাসি ফুটেছে না দেখে বেশ অবাক লাগল। সেটা যে শেষ পর্যন্ত পুঞ্জীকৃতবাবুর একটা কথায় ফুটেবে সেটা কী করে জানব?

চা শেষ করে যখন শহরে ফেরার তোড়জোড় চলছে, সূর্যটা পাহাড়ের পিছনে নেমে যাওয়ার ইঠাৎ ঠান্ডা বেড়ে মাঝে মাঝে বেশ কাঁপানি লাগিয়ে

দিচ্ছে, তখন দেখি পুজুর্কিবাবু আমাদের দিকে বাস্তভাবে এগিয়ে আসছেন।

‘জালদা, জেট স্বাহাদুরের বিজ্ঞাপন পড়ছে শরুদুরবার—কিন্তু তার আগে একটা ব্যাপার জেনে নেওয়া দরকার।’

‘কী ব্যাপার ভাই?’

‘স্বাস্থ্যের কোন নামটা যাবে—আসল না নকল?’

‘নকলটাই আসল ভাই,’ একগাল হেসে বললেন লালমোহনবাবু, ‘বানান হবে জে এ টি এ ওয়াই ইউ।’

॥ শেষ ॥

মুদ্রা করে দায়

২০০
১৩ বিং



গোমাইপুর গ্রন্থাগার

গোসাঁইপুর সরগরম

‘গোসাইপুরে আপনার চেনা একজন কে থাকেন না?’ রহস্য-রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক জটায়ু ওরফে লালমোহন গাঙ্গুলীকে জিজ্ঞাস করল ফেলুদা।

আমরা, প্রী মাস্কেটিয়ারস্, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখে হাটতে হাটতে একেবারে গঙ্গার ধারে পৌঁড়ে গেছি। প্রিন্সেসপ ঘাটের কাছে যে গোস্বজ-ওয়ালা ঘরটা আছে সেটার মধ্যে বসে চান্দচুর আর গঙ্গার হাওয়া খাচ্ছি। সময় হচ্ছে বিকেল পাঁচটা, তারিখ অক্টোবরের তেরই। আমাদের সামনেই জলের মধ্যে একটা বস্কা ভাসছে, সেটার ব্যবহার কী সেট! লালমোহনবাবুকে বুঝিয়ে দিয়ে ফেলুদা প্রশ্ন করল। ভদ্রলোক বললেন, ‘আছে বৈ কি। তুলসী-বাবু। তুলসীচরণ দাশগুপ্ত। এথিনিয়ামে অঙ্ক আর জিয়োগ্রাফি পড়াতেন। রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিটে থাকতেন, এখন রিটার্নের করে চলে গেছেন গোসাইপুর। ওখানে পৈতৃক বাড়ি আছে। ভদ্রলোক ত কতবার আমাকে যাবার জন্য লিখেছেন। আমার বিশেষ সন্তু, জানেন ত? নিজেও গল্প-টল্প লেখেন, ছোটদের জন্য। সন্দেহ গোটা দুই বোরিয়েচে।—কিন্তু হঠাৎ গোসাইপুর কেন?’

‘ওখানে থেকে একটা চিঠি এসেছে। লিখেছেন জীবনলাল মল্লিক। শ্যাম-লাল মল্লিক, তস্য পুত্র জীবনলাল। বংশ-পরিচয় তৃতীয় খণ্ড খুলে দেখলাম গোসাইপুরের ভূমিদার ছিলেন এই মল্লিকরা।’

ফেলুদা থামল। কারণ একটা জাহাজ প্রচণ্ড জোরে ভেঁা দিয়ে উঠেছে। আজই সকালে গোসাইপুরের চিঠিটা এসেছে সেটা জানি। যদিও ভাতে কী লেখা ছিল জানি না। চিঠিটা পড়ে ফেলুদা একটা চরমিনার ধরিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে ছিল সেটা লক্ষ্য করেছিলাম।

‘কী লিখেছেন ভদ্রলোক?’ লালমোহনবাবু জিজ্ঞাস করলেন।

‘লিখেছেন তাঁর পিতাকে নাকি কেহ বা কাহারো হত্যা করার সংকল্প করেছে। আমি গিয়ে যদি ব্যাপারটার একটা কিনারা করতে পারি তাহলে উনি বিশেষ কৃতজ্ঞ বোধ করবেন, এবং আমাকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদান করবেন।’

‘চলুন না মশাই’, বললেন লালমোহনবাবু। ‘বেশ ত ঝাড়াঝাপটা এখন : আমার নতুন বই বোরিয়ে গেছে। আপনার হাতেও ইমিডিয়েট কিছু নেই, তাছাড়া হিঙ্গল-দিঙ্গল ত অনেক হল, এবার স্বানবদলের জন্য পল্লীগামটা বন্দ

কী? কাছেই সেগাইপুর্নটিতে শূর্নিচি বিরাট মেলা হয় এই সময়টাতেই। চলুন স্যার, বেরিয়ে পড়ি।’

‘ওঁদের বাড়িতে নাকি থাকার অসুবিধে আছে, তাই মাইল তিনেক দূরে শ্রীপুরে কোন্ এক চেনা বাড়িতে আমার ব্যবস্থা করবেন বলেছেন। সাইকেল রিক্সাতে যাতায়াত। আমার মনে হচ্ছিল গোসাইপুরেই থাকতে পারলে সুবিধে হত। তাই আপনার বন্ধুটির কথা জিজ্ঞেস করলাম।’

‘আমার বন্ধু উইল বি ডাম গ্লাড। আর আপনি যাচ্ছেন শুনলে ত কথাই নেই। উনি আপনার দারুণ ভক্ত।’

‘আর কার কার ভক্ত সেটা জেনে নিই।’

লালমোহনবাবু এই খোঁচা-দেওয়া প্রশ্নটাকেও সিরিয়াসলি নিয়ে বললেন, ‘জগদীশ বোসের নাম করতে শূর্নিচি এককালে, বলতেন অত বড় মনীষী পৃথিবীতে নেই; আর গোবরবাবুর কাছে বোধহয় ছেলেবেলা কুণ্ডলী শিখেছে; আর—’

‘আর, ওই যথেষ্ট।’

* * *

গোসাইপুর সেতে গেলে কাটোয়া জংশনে নেমে বাস ধরতে হয়। কাটোয়া থেকে সাত মাইল; তার মানে বড় জোর আধ ঘণ্টা। শ্যামলাল তস্য পুত্র জীবনলালকে ফেলুদা লিখে দিয়েছিলেন আমরা আসছি বলে, আর বলেছিল গোসাইপুরেই আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। এদিকে তুলসীবাবু ঘণ্টায়ুর চিঠি পাওয়া মাত্র উত্তর দেন। ‘শুধু যে খুঁশ হয়েছেন তা নয়, লিখেছেন ‘গোসাইপুর সাহিত্য সংঘ’ ফেলুদা আর লালমোহনবাবুকে একটা জয়েন্ট সংবর্ধনা দেবার আয়োজন করতে চান। লালমোহনবাবুর একেবারেই আপত্তি ছিল না, কিন্তু ফেলুদা কথাটা শুনেই চোখ রাঙিয়ে বলল, ‘দেশে ক্রাইম বন্ধ হয়ে গেলে গোয়েন্দার হাঁড়ি চড়ে না। কী অবস্থায় কাজ করছি সেটা বুঝতে পারছেন? এতে আমার সংবর্ধনার কী আছে মশাই? আর বলে দিন যে আমার পরিচয়টা দয়া করে যেন গোপন রাখেন, নইলে তদন্তের ব্যরোটা বেজে যাবে।’

লালমোহনবাবুকে বাধ্য হয়েই আদেশ পালন করতে হল। তবে এটাও লিখলেন যে সংবর্ধনা নিতে ওঁর নিজের কোনো কথা নেই। এই অনুষ্ঠানের কথা ভেবেই বোধহয় উনি নীল সূতোর চিকনের কাজ করা একটা মলমলের পাঞ্জাবী সংগ নিলেন।

তুলসীবাবু জানিয়ে রেখেছিলেন যে গোসাইপুর্ গ্রামে ঢোকবার মূখে যোগেশের মর্দার দোকানে তিনি আমাদের জন্য অপেক্ষা করবেন। সেখান থেকে তাঁর বাড়ি দশ মিনিটের হাঁটা পথ।

কাটোরা থেকে বাস ধরে গোসাইপুর্ যাবার পথে একটা পালকি সেখে বেশ অস্বাচ্ছন্দ লাগল। ফেলুদা আর লালমোহনবাবুও দেখলাম যাড়ু ফিরিয়ে কিছুক্ষণ দেখল পালকিটাকে। 'কোন সেক্টরিতে এসে পড়লাম মশাই,' বললেন লালমোহনবাবু, 'গোসাইপুর্ বিজলি পৌছেচে ত? এতটা অঙ্গ পাড়াগাঁ বলে ত আমার ধারণা ছিল না।'

বাসের কন্ডাক্টার যোগেশের দোকানের নাম জানে, তাকে বলা ছিল। ঠিক জায়গায় চেরা গলায় 'গোসাইপুর্, গোসাইপুর্!' বলে দুটো চীৎকার দিয়ে বাস থামিয়ে আমাদের নামিয়ে দিল। যে ভদ্রলোক লালমোহনবাবুর দিকে হাসি মুখে এগিয়ে এলেন তিনি যে এককালে ইন্সকুলমাস্টার ছিলেন সেটা আর বলে দিতে হয় না। ভদ্রলোকের হাতে তাঁম্প-মারা ছাতা, পায়ে রাউন কেড্‌স জুতো, চোখে চশমা, পরনে হাফ পাঞ্জাবী আর খাটো করে পরা ধুতি, আর বগলে একটা মাস্কাতার আমলের পুরোন ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ম্যাগাজিন। ফেলুদার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে ভদ্রলোক হেসে চোখ টিপে বললেন, 'আপনার আদেশ পালন করিচি—কোনো চিন্তা নেই। আপনি হলেন টুর্নিস্ট, হোল লাইফ ক্যানাডায় কাটিয়েছেন, দেশে ফিরে পাড়াগাঁ দেখার শখ হয়েছে। ভাবলুম আপনি যদি তদন্তের ব্যাপারেই এসে থাকেন, তাহলে তল্লাসীর জন্য এখানে-সেখানে ঘাপটি মারতে হতে পারে, কাজেই সেফ সাইডে থাকা ভালো। টুর্নিস্টদের উগ্র কৌতূহল থাকে সেটা সকলেই জানে।'

'আপনার বাড়িতে ক্যানাডা সম্বন্ধে তথ্যওরাল্য বই আছে আশা করি?' ফেলুদা হেসে বলল।

'কোনো চিন্তা নেই,' আবার বললেন তুলসীবাবু। তারপর লালমোহনবাবুর দিকে ফিরে বললেন, 'আর গাংগুলী ভার্য, তোমাকে কিন্তু একটু ব্যক্তি পোয়াতে হচ্ছে, তরশু অর্থাৎ শূকুরবার, আমাদের নিউ প্রাইমারি স্কুলে একটা ফাংশন অ্যারেঞ্জ করিচি। সুরেশ চাকলাদার উকীল প্রোয়োহিত্য করবেন। কিছু না—একটু নাচ গান, দুটো আবৃত্তি, দুটো ভাষণ এই আর কি। আমাদের পোস্টমাস্টার হরিহরের ছেলে বলদেব ভালো ছবি আঁকে, সে একটা মানচিত্র লিখেছে। ভাষাটা অবিশিষ্ট, হে হে, অমায়িক।'

'অসংকারের আবার বেশি বাড়াবাড়ি—' কাঁচা কলস্তার কিসে জানি ঠোঙর খাওয়াতে লালমোহনবাবুর কথা শেষ হল না। কিন্তু বাকিটা বুঝে নিয়েই তুলসীবাবু বললেন, 'তা এসব ব্যাপারে একটু ত বাড়াবাড়ি হবেই। আর

তোমার মতো সাক্ষ্যস্বাক্ষর অথবা আর ক'টা এসেছে বল এখানে। লাস্ট এসিটল পরীক্ষিত ছাউন্স—তাও সিকস্টি সেভেন।’

ফেলদা ব্রহ্মজ, ‘আসবার পথে একটা পার্কি দেখলাম। এদিকে এখনো পার্কি ব্যবহার হয় নাকি?’

‘কিন্তু পার্কি?’ তুলসীবাবু ছাতার বাড়িতে একটা বাছুরকে পথ থেকে সরিয়ে বললেন, ‘আপনি বিগত ষড়্দের কোন জিনিষটা চান বলুন। পাইক-



বরকন্দাজ? পাবেন। হুকোবরদার? পাবেন। টানা-পাখা? পাবেন। লম্প-পিদিম-পিলসুজ? পাবেন।—’

‘কিন্তু এখানে ও ইলেক্টিসিটি আছে দেখছি।’

‘সব জায়গাতেই আছে, কেবল যেখানে সব চাইতে বেশি থাকার কথা সেই-
থানেই নেই।’

‘কোথায় মশাই?’ লালমোহনবাবু প্রশ্ন করলেন।

‘মল্লিকদের বাড়ি।’

আমরা তিনজনেই অবাক হয়ে ভুল্ললোকের দিকে চাইলাম।

‘মল্লিক মানে শ্যামলাল মল্লিক?’ ফেলুদা জিগ্যেস করল।

‘ওই একটাই ত মল্লিক গোসাইপুত্র।’ এখেনকার জমিদার ছিলেন ঠা।
দুর্লভ মল্লিকের নামে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেত। শ্যামলাল তাঁর
ছেলে। জমিদারি উচ্ছেদ হবার পর কলকাতায় গিয়ে প্লাস্টিকের ব্যবসা করে
বিস্তর টাকা করিছিল। একদিন অন্ধকারে হাতড়ে ঘরের সুইচ জ্বালতে
গেস্‌ল, সুইচ বোর্ডে একটা খোলা তার ছিল, তাতে হাত লেগে যায়। এ সি
কারেন্ট মশাই, হাত আটকে গিয়ে হুন্স্‌পুল ব্যাপার। হাসপাতালে ছিল
বেশ কিছুদিন। বেরিয়ে এসে ব্যবসা ছেলের হাতে ভুলে দিয়ে গোসাইপুত্রের
চলে আসে। এসেই ইলেকট্রিক কানেকশন কেটে দেয়। শুধু সে হলে না
হয় তবু বোঝা যেত। সেই সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর সব কিছু বাতিল করে
দিয়েছে। চুরট ছেড়ে গড়গড়া ধরেছে; ফাউন্টেন পেন ব্যবহার করে না;
টুথব্রাসের বদলে দাঁতন। ইংরিজি বই যা ছিল বাড়িতে সব বেচে দিয়েছে,
নিজের গাড়িটা বেচ দিয়েছে, তার জায়গায় পালকি হয়েছে। একটা পুরনো ভাঙ্গা
পালকি বাড়িতেই ছিল, সেটাকে সারিয়ে নিয়েছে, তার জন্য চারটে বেহারা
বহাল হয়েছে। বিলিতি ওষুধ যা ছিল সব নর্দমায় ফেলে দিয়েছে; এখন
ওনারি কবরোজি। ফাঁকিভালে তারক কবরোজের কপাল ফিরে গেছে। আরো
কত কী যে করেছে তার হিসেব নেই। এখানে যখন এসেছেন তখন আলাপ
হবে নিশ্চয়ই; তখন সব জানতে পারবেন।’

‘আলাপ না হয়ে উপায় নেই,’ বলল ফেলুদা। ‘আমি এসেছি ঠা ছেলের
কাছ থেকে তলব পেয়ে।’

‘হ্যাঁ, তা ছেলে ক’দিন হল এসেছে কটে। কিন্তু রহস্যটা কী?’

‘শ্যামলাল মল্লিককে খুন করার চেষ্টা চলেছে বলে কোনো খবর আপনার
কানে এসেছে কি?’

তুলসীকান্দ কথটা শুনেন বেশ অবাক হলেন। ‘কই তেমন কিছু শুনিনি।
তা খুন করার কথাই যদি বলেন, তার জন্যে বাইরের লোকের দরকার কী?
ঘরেই ত রয়েছে।’

‘কিরকম?’

‘ওই যিনি আপনাকে তলব দিয়েছেন, তার সঙ্গে ব্যপের ত বনিবনা নেই
একদম। এখানে এলেই ত ঝগড়াঝাটি হয়। অধিকাংশ আমি জীবনলালকে
দোষ দিই না। গুরুকম উদ্ভট খেয়াল যে বাপের, তাকে কোন ছেলে মানবে
বলুন। জীবনলালকে ত এসে ওই বাড়িতেই থাকতে হয়। ওই ভূতের
বাড়িতে গাথা ঠিক রাখা খুব মর্শাকল।’

এক বিঘে জমিদারপুত্র তুলসীবাবুর কোঠাবাড়ি, বড় সন বঙ্গস নাকি প্রায় একশো। ব্যপ্তাঠাকুর দ্বজনেই মোজারি করতেন, চাঁড়টা ঠাকুরদাই বানিয়েছেন। তুলসীবাবুর স্ত্রী কলকাতাতেই মারা গেছেন। একটি মেয়ের নিয়ে হয়েছে, তার স্বামী লোহা-লকড়ের ব্যবসা করে অজিগগলে। দুই ছেলের একজনের সাইন পোর্টিং-এর ব্যবসা আছে কলকাতায়, আরেকজন ওষুধের সেলসম্যান। এখানে তুলসীবাবু একাই থাকেন।—‘তবে কী জানেন, পাড়া গাঁয়ে একা ঘনেন হয় না। এখানে সবাই পরস্পরের খোঁজখবর রাখে, রোজই দেখা হয়, মেলামেশাটা অনেক বেশি।’

বিকেল চারটে নাগাত তুলসীবাবুর বাড়িতে পৌঁছে হাত মুখ ধুয়ে প্রথমেই চায়ের আয়োজন হল। ফেলদা সঙ্গে ভালো চা এনেছিল, কারণ ওই একটা ব্যাপারে ও সত্যিই খুঁতখুঁতে। অবিশ্যি সে চা সকলেই খেলো, আর তার সঙ্গে চিড়ে-নারকেল। জোগাড়-মন্দ করল তুলসীবাবুর চাকর গণ্ণা।

একতলার দুটো ঘরের একটাতে তুলসীবাবু নিজে থাকেন, দোতলার ছাতে একটা বড় ঘর, তাতে তিনটে তক্তপোষ পেতে আমাদের জন্য বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এ ঘর নাকি তুলসীবাবুর মেয়ে-জামাই তাদের ছেলোপুলে নিয়ে বছরে একবার করে এসে থেকে যায়।

চা খেতে খেতে ফেলদা বলল, ‘আমাকে কিন্তু একবার ওই বিজলীহীন বাড়িতে যেতে হবে জীবনব্যবসায় সঙ্গে দেখা করতে। ওঁকে লিখে জানিয়েছি যে সাড়ে পাঁচটা নাগাত যাব।’

তুলসীবাবু বললেন, ‘তা বেশ ত, আমি পৌঁছে দেবখন। মল্লিকবাড়ি পাঁচ-সাত মিনিটের পথ। তবে গাঙ্গুলীভায়াকে আমি ছাড়িচ নে। আজ সম্ভবেলা কিছু লোক আসবে আমার এখানে। একটু সদালাপ করতে চান সাহিত্যিকের সঙ্গে। মিত্রের মশাই ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে আসবেন ত?’

‘কেন বলুন ত?’

‘একবার আশ্বারামবাবুর ওখানে আপনাকে নিয়ে যেতে চাই। উনি গোসাইপুরের একটি অ্যাটাকশন।’

‘আশ্বারামবাবু?’

‘আসল নাম অবিশ্যি মৃগেন ভট্টাচার্য। আশ্বা-টাক্সা নিয়ে চর্চা করেন তাই এখানকার কয়েকজন নাম দিয়েছে আশ্বারাম। আমি দিইনি কিন্তু! আমার ধারণা ভদ্রলোকের মধ্যে সত্যিই ইয়ে আছে।’

আশ্বা নিয়ে চর্চাটা যে কী সেটা আর জিগ্যেস করা হল না। কারণ ঠিক তখনই আবার দেখতে পেলাম পার্লিকটাকে। আমরা বাইরের দাওয়ায়

বসে চা-চিড়ে খাচ্ছিলাম, 'সামনেই রান্ধা, আর সেই রান্ধা দিয়েই পালকিটা আসছে। এবার দেখতে পেলাম যে ভিতরে একজন লোক বসে আছে।

'আরে, পালকিতে জীবনবাবু বসেই মনে হচ্ছে!' বললেন তুলসীবাবু। ভিতরের ভদ্রলোক পালকির দরজা দিয়ে বাইরে উঁকি মারছিলেন। বেহারা-গুলো ঠিক গল্পে ঘেরকম পড়া যায় সেইভাবে হুম্‌হাম শব্দ করতে করতে এগোচ্ছিল, এমন সময় শব্দের সঙ্গে সঙ্গে পালকিটাও থেমে গেল।

পালকি মাটিতে নামতেই তার ভিতর থেকে একজন বছর পঁয়ত্রিশের ভদ্রলোক বেশ কষ্ট করে বাইরে বোরিয়ে আরো খানিকটা কষ্ট করে উঠে



দাঁড়ালেন। সমস্ত ব্যাপারটা যেমানান, কারণ ভদ্রলোকের স্মার্ট কলকার্ডিয়া চেহারা, গায়ে বৃশ শার্ট আর টেরিলিনের প্যান্ট।

'মিস্টার মিস্ত্রি?' ফেলদার দিকে এগিয়ে এসে হাঁসি-মুখে প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোক।

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আমার নাম জীবনলাল মিস্ত্রি।'

বুঝেছি। ইনি আমার বন্ধু মিস্টার গাঙ্গুলী, আর এ হল আমার খুড়ভুতো ভাই ভাগ্যচাঁদ। তুলসীবাবুর সঙ্গে বোধহয় আপনার পরিচয় আছে।'

জীবনবাবু পালকিটাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'আমার বাড়ি মিনিট পাঁচেকের দূরত্ব পথ। আসবেন একবারটি? আপনাদের চা খাওয়া হয়েছে? একটু কথা ছিল।'

জ্যোতীমোহনবাবু রয়ে গেলেন, আমি আর ফেলুদা ভদ্রলোকের সঙ্গে মল্লিক-বাড়ি রওনা দিলাম। রাস্তা ছেড়ে একটা বাঁশ-বনে ঢুকে বুঝলাম এটা শর্টকাট। জীবনবাবু বললেন, 'কলকাতায় একটা টেলিফোন করার দরকার ছিল, তাই স্টেশনে যেতে হল।'

'পালকি ছাড়া গতি নেই বুঝি?'

জীবনবাবু ফেলুদার দিকে আড়চোখে চেয়ে বললেন, 'আপনাকে তুলসীবাবু বলেছেন বুঝতে পারছি।'

'হ্যাঁ, বলছিলেন ইলেকট্রিক শকের পরিণাম।'

'পরিণামটা গোড়ায় এত ভয়াবহ ছিল না, আক্রোশটা ছিল শুধু ইলেকট্রিসিটির বিরুদ্ধে। এখন কী দাঁড়িয়েছে সেটা আমাদের বাড়ি গেলেই বুঝতে পারবেন।'

'আপনি এখানে প্রায়ই আসেন?'

'দুমাসে একবার। আমাদের একটা ব্যবসা আছে, সেটা এখন আমাকেই দেখতে হয়। সেই নিয়ে কথা বলতেই আসি।'

'তাহলে ব্যবসায় এখনো ইন্টারেস্ট আছে আপনার ব্যবার?'

'মোটাই না। কিন্তু আমি সেটা চাই না। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছি যাতে উনি আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেন।'

'কোনো আশা দেখছেন কি?'

'এখনো না।'

মল্লিক বাড়িও যে অনেকদিনের পুরোনো সেটা বলে দিতে হয় না, তবে মেরামতের দরুন বাড়টাকে আর পোড়ো বলা চলে না। প্রাসাদ না হলেও, অট্টালিকা নিশ্চয়ই বলা চলে এ বাড়িকে। ফটক দিয়ে ঢুকে ডাইনে একটা বাধানো পুকুর, বাড়ির দুপাশের ফাঁক দিয়ে পিছনে গাছপালা দেখে মনে হয় ওদিকে একটা বাগান রয়েছে। পাঁচিলটা মেরামত হয়নি, তাই এখানে ওখানে ফাটল ধরেছে, কয়েক জায়গায় আবার দেয়াল ভেঙ্গেও পড়েছে।

ফটকে একজন দারোয়ান দেখলাম যার হাতে সড়কি আর ঢাল দেখে মনে হল কোনো ঐতিহাসিক নাটকে নামার জন্য তৈরি হয়েছে। সদর দরজার পাশেই ঠিক ওই রকমই হাসাকর পোষাক-পর্য একজন কক্সদাত্ত জীবন-বাবুকে দেখে এক পেছন্ন সৈলাম ঠুকল। এই থমথমে পরিবেশেও এই ধরনের সব অবিশ্বাস্য ব্যাপার দেখে হাসি পাচ্ছিল।

আমরা একতলাতেই বৈঠকখানায় ফরাসের উপর বসলাম। ঘরে চেয়ার নেই। দেয়ালে যা ছবি আছে সবই হয় দেবদেবীর, না হয় পৌরাণিক ঘটনার। দেয়ালের আলমারির একটা তাকে গোটা দশেক বাগুলা বই দেখলাম, বাকি তাকগুলো মনে হল খালি।

‘আপনাদের পাখা লাগবে কি? তাহলে দাসুকে লাগিয়ে দিই।’

এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি, এবার দেখলাম মাথার উপর ঝলরওয়ালা ডবল-গান্ধুর একটা কাঠের ডান্ডা থেকে ঝুলছে, আর ডান্ডাটা ঝুলছে সিলিং-এ দুটো আংটা থেকে। ডান্ডা থেকে দাঁড় বোরিয়ে বাঁ দিকের একটা দরজার উপর দেয়াল ফুড়ে বারান্দায় চলে গেছে। এই হল টানা-পাখা, যেটা টানা হয় বারান্দা থেকে, আর হাওয়া হয় ঘরে। অক্টোবর মাস, সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, তাই গরম নেই; পাখার আর দরকার হল না।

‘এটা কী জানেন?’

জীবনবাবু আলমারিটা খুলে তার থেকে একটা গামছা টাইপের চারকোণা কাপড় বার করে ফেলুদাকে দেখালেন। সেটার বিচ্ছেদ এই যে তার এক-কোণে গেরো দিয়ে বাঁধা রয়েছে একটা পাথরের টুকরো।

গামছাটা হাতে নিয়ে ফেলুদার ভুরু কুঁচকে গেল। সে পাথরের উল্টো দিকের কোণটা হাতে নিয়ে গামছাটাকে বার কয়েক শূন্যে ঘুরিয়ে বলল,



‘ভোপসে, উঠে দাঁড়া ত।’

আমি দাঁড়ালুম আর সেই সঙ্গে ফেলুদাও দাঁড়াল আমার থেকে হাত তিনেক দূরে। তারপর গামছা হাওয়ায় ঘুরিয়ে হাতে ধরা অবস্থাতেই জাল ফেলার মতো করে আমার দিকে ছুঁড়ে দিল, আর সঙ্গে সঙ্গে পাথরের দিকটা আমার গলায় পের্পিচিয়ে গেল।

ঠগী!' আমি বলে উঠলাম।

ফেলুদাই বলেছিল এককালে আমাদের দেশে ঠগীদের দস্তুর্গিরির কথা। তারা ঠিক এইভাবে পথচারীদের গলায় ফাঁস দিয়ে হ্যাঁচকা টানে তাদের খুন করে সর্বস্ব লুট করে নিভ।

ফেলুদা অবিশ্য গামছা ধরে টান দেয়নি। সে তক্ষুর্নি প্যাঁচ খুলে নিয়ে ফরাসে বসে বলল, 'এ জিনিস আপনি কোথায় পেলে?'

'মাঝ রাত্তিরে বাবার ঘরের জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলোঁছিল কেউ।'

'কবে?'

'আমি আসার কয়েকদিন আগে।'

'এত পাহারা সত্ত্বেও এটা হয় কি করে?'

'পাহারা?' জীবনধাবু হেসে উঠলেন। 'পাহারা ত শুধু পোষাকের বাহারে মশাই, মানদুগলো ত সব গেম্বো ভূত, কুঁড়ের হৃদ। আর তারাও ত বুঝতে পারে বাবুর ভীমরতি ধরেছে। কাজ যা করে সে ত শুধু নাম কা ওয়ান্ডে। নেহাৎ বাড়িতে ডাকাত পড়েনি তাই, নইলে বোঝা যেত কার দৌড় কতদূর।'

'এ বাড়িতে আর কে কে থাকেন জানতে পারি কি?'

'বাবা ছাড়া আর আছেন আমার বিধবা ঠাকুমা। তিনি প্রাচীন আমলের লোক তাই দিবি আছেন। তাছাড়া আছেন ভোলানাথবাবু। এঁকে রাজ্যের সরকার বলতে পারেন, ম্যানেজার বলতে পারেন—বাবার ফাইফরমাস খাটা, দেখাশোনা করা, সবই ইনি করেন। বাবার অসুখ-বিসুখ হলে কবিরাজ ডাকতে হয়, সেটিও ইনিই করেন। কোনো কাজে শহরে যাবার দরকার হলেও ইনিই যান। বাস—এছাড়া আর কেউ নেই। অবিশ্য চাকর আছে; একটি রান্নার লোক, দুটি দারওয়ান, একটি এমনি চাকর—এরা বাড়িতেই থাকে। পার্জিকর লোক আর পাণ্ডাওয়ালা কাছেই গ্রাম থেকে আসে।'

'এই ভোলানাথবাবু কোথাকার লোক? কদিন আছেন?'

'উনি এই গ্রামেরই লোক। আমাদের প্রজা ছিলেন। বাপ-ঠাকুর্দা চাষ-বাস করত। ভোলাবাবু নিজে ইস্কুলে পড়েছেন, বেশ বুদ্ধিমান ছেলে ছিলেন। এখন বয়স বাটের কাছাকাছি।'

'উনি কি আপনার পিতামহ?'

ফেলুদা দেয়ালে একটা ছবি দেখিয়ে প্রশ্ন করল। খিরাট এক জোড়া পাকানো গোর্ফ নিয়ে এক জমিদার বাঁ হাত শ্বেত পাথরের টেবিলের উপর রেখে ডান হাতে একটা রূপোয় বাঁধানো লাঠি ধরে চেয়ারে বসে আছেন। দেখলেই মনে হয় যাকে বলে দোদাঁড়প্রভাপ।

‘হ্যাঁ, উনিই দুর্জয় সিংহ।’

‘যাঁর নামে ওসে গরুতে এক ঘাটে জল খেত?’

জীবনবাবু হেসে উঠলেন।

‘কাজে অবিশিা এককালে থাকলেও, ঠাকুরদার আমলে ছিল না; তবে হ্যাঁ, ডাকসাইটে জমিদার ছিলেন ঠিকই। এবং শেমফুলি অত্যাচারী।’

একজন চকর একটা ষ্টেভে করে একটা পেয়ালা আর দুটো গেলাসে কী খেন নিয়ে এল।

‘তাহলে চায়ের পাট উঠিয়ে দেন নি আপনার বাবা?’

‘আলবৎ দিয়েছেন। এটা অবিশিা চা না, কফি। আমার নিজের একটি কাপ এবং একটিন নেসকাফে আমি সঙ্গে করে নিয়ে আসি। সকাল সন্ধ্য এক তলার বসে খাই। তাই আপনাদের জন্য গেলাস; কিছু মনে করবেন না।’

‘মনে করব কেন? এ তো খাঁটি মাদ্রাজি সিসটেম। কোমলা বিন্যাসে এই-ভাবে কাঁসার পাত্রে খেয়েছি কফি।’

দোতলা থেকে মাঝে মাঝেই একটা খটাস্ খটাস্ শব্দ পাচ্ছিলেন; সেটা যে কিসের শব্দ সেটা ফেলুদার প্রশ্ন থেকে বুঝতে পারলান্ন।

‘আপনার বাবা বুঝি খড়ম ব্যবহার করেন?’

জীবনবাবু একটু হেসে বললেন, ‘সেটাই স্বাভাবিক নয় কি?’

‘এই ঠগীর গামছা ছাড়া আর কী থেকে আপনার ধারণা হল যে আপনার বাবার জীবন বিপন্ন?’

জীবনবাবু এবার তাঁর পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে ফেলুদাকে দিলেন। তাতে গোটা গোটা পেনসিলের অক্ষরে লেখা—

‘তোমার পূর্বপুরুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তোমার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। অতএব প্রস্তুত থাক!’

‘এটা এসেছে ওই অক্টোবর, আমি আসার আগের দিন। পোস্ট করা হয়েছিল কাটোয়া থেকে। এখান থেকে যে-কেউ গিয়ে ডাকে ফেলে আসতে পারে।’

‘কিছু মনে করবেন না—পূর্বপুরুষের পাপটা কী সে ব্যাপারে কিছু আলোকপাত করতে পারলে সুবিধে হত।’

‘বুঝতেই তো পারছেন,’ বললেন জীবনবাবু, ‘একটা জমিদার বংশের ইতিহাসে অন্যায়ের ত কতরকম দৃষ্টান্ত থাকতে পারে। কোন পাপের কথা বলছে সেটা কী করে বলি বলুন। আমার ঠাকুরদাদা দুর্জয় মল্লিকই ত কতরকম অত্যাচার করেছেন প্রজাদের উপর।’

‘এটা পেয়ে পুঁলিশে খবর দিলেন না কেন?’

‘দুটো কারণে’, একটু ভেবে বললেন জীবনবাবু। ‘এক, এখানে আপনাকে কেউ চিনবে না, তাই যে-লোক হুমকি দিচ্ছে সে সাবধানতা অবলম্বন করার অতটা তাগিদ অনুভব করবে না। দুই, পুর্লিশ এলে প্রথমে আমাকে সন্দেহ করবে।’

আমরা দুজনে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলাম ভদ্রলোকের দিকে। জীবনবাবু বলে চললেন, ‘বাবার এই অদ্ভুত পরিবর্তনের পর থেকে আমার সঙ্গে তাঁর আর বান্দনা নেই। আমরা শহুরে মানুষ, বিজ্ঞানের অবদানগুলো অত সহজে বর্জন করা আমাদের চলে না মশাই। এটা ঠিক যে ইলেকট্রিক শকের ফলে বাবা মানসিক শকও পেয়েছিলেন সাংঘাতিক। ঘটনাটা ঘটে পাঁচ বছর আগে। আমি আর বাবা অপিস থেকে ফিরে একসঙ্গে বৈঠকখানায় ঢুকি। অন্ধকারে ব্যতি জ্বালাতে গিয়ে সুইচবোর্ডে একটা খোলা তারে বাবার হাত আটকে যায়। বাইরেই ছিল মেইন সুইচ, আমি দৌড়ে গিয়ে পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে অফ করি। তবু কেন জানি বাবার ধারণা হয় যে আমি ব্যাপারটা আরো তাড়াতাড়ি করতে পারতাম। সেই তখন থেকেই। যাই হোক, এখানে এলেই কথা কাটাকাটি হয়। একবার ত রেগে গিয়ে একটা জ্বলন্ত কেরোসিনের ল্যাম্প ছুঁড়ে ফেলে দিই। তার ফলে ফরাসে আগুন-টাগুন ধরে হুলস্থূল ব্যাপার। পাড়ারগাঁতে খবরটা রটে যায়। তারপর থেকে সবাই জানে শ্যাম মল্লিকের সঙ্গে তার ছেলের সাপে-নেউলে সম্পর্ক। কাজেই বৃদ্ধভেই পেরেছেন কেন পুর্লিশ ডাকনি। অবিশ্যি আপনাকে ডাকার আরেকটা কারণ হল আপনার স্বাতি। আর আমার বিশ্বাস একজন আধুনিক শহুরে লোক সমস্যাটা আরো ভালো বৃদ্ধভে পারবে।’

নেসকাফে শেষ হবার আগেই ঘরে ল্যাম্প চলে এসেছে। ওপরে পাঁচালিও বন্ধ হয়েছে। জীবনবাবু বললেন, ‘আপনি বাবার সঙ্গে কি একবার দেখা করতে চান?’

‘সেটা হলে মন্দ হত না।’

আমরা ফরাস ছেড়ে উঠে পড়লাম।

সামান্য কটা ল্যাম্প-লন্ঠনের আলোয় এত বড় বাড়ির অনেকখানি যে অন্ধকার থেকে যাবে তাতে আর আশ্চর্য কী? সিঁড়ি দিয়ে ঊঠার সময় জীবনবাবু পকেট থেকে ছোট্ট একটা টিচ বার করে জেতলে বললেন, ‘এটাও লুকিয়ে আনা।’

শ্যামলাল মল্লিক তাঁর নিজের ঘরে ফরাসে বসে স্তাক্ষরায় ঠেস দিয়ে গড়গড়ার নল হাতে নিয়ে বসে আছেন। জীবনবাবু আর নিচের ছবির দলভাব, এই দুজনের সঙ্গেই ভদ্রলোকের চেহারার মিল আছে। হয়ত

এই চেহারা দুলভ মল্লিকের গোফ জুড়ে দিলে এঁকেও ডাকসাইটে বলে মনে হয়। এই অবস্থায় দেখে ভয় করে না, যদিও কথা বললে গলার গম্ভীর স্বরে মনে হয় রাগলো। উত্তর করে হতে পারে।

‘আপনি এবার আসুন’, গম্ভীর গলায় বললেন শ্যামলালবাবু। যাকে কথাটা বুঝা হল তিনি ফরাসের এক কোণে বসে ছিলেন। জীবনবাবু তাকে কবিরাজ তারক চক্রবর্তী বলে পরিচয় করিয়ে দিলেন। রোগা ডিগ্‌ডিগে চেহারা, ঘন ভুরুর নিচে নাকের উপর পদ্রু কাচের চশমা, নাকের নিচে এক-জোড়া পদ্রু গোফ। তারক চক্রবর্তী নমস্কার করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।



মল্লিক

‘গোয়েন্দা দিয়ে কী হা?’ শ্যামলাল মল্লিক ফেলদার পরিচয় পেয়েই বিবর্তভাবে প্রশ্ন করলেন। ‘এই চক্রান্তের কিনারা গোয়েন্দার কম্মো নয়। আমার শত্রু আমার ঘরেই আছে একথা দুলভ মল্লিকের আশা বলে দিয়েছেন। সে কথা কাগজে লেখ আছে আমার কাছে। আস্তা ঠিকালেন। জ্যান্ত মানুষ সাহেবী কেতাষ পড়ে তার চেয়ে বেশি জানবে কী করে?’

জীবনবাবু দেখলাম কপাটো শব্দে কেমন জর্নি থতমত খেয়ে গেলেন।
বুঝলাম তিনি ঘটনাটা জানেন না।

‘আপনি কি মৃগশ্চক ভট্টাচার্যের বাড়িতে গিয়েছিলেন?’

‘আমি ধাব কেন? সে এসেছিল। আমি তাকে ডেকেছিলাম। আমাকে
এইভাবে বিব্রত করছে কে সেটা আমার জানার ছিল। এখন জেনেছি।’

জীবনবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, ‘কবে এসেছিলেন মৃগশ্চকবাবু?’

‘তুমি আসার আগের দিন।’

‘কই তুমি ত আমাকে বলনি।’

শ্যামলালবাবু কোনো উত্তর দিলেন না। তিনি কথার ফাঁকে ফাঁকে
সমানে গড়গড়া টেনে চলেছেন। ফেলুদা বলল, ‘দুর্লভ মল্লিকের আত্মা কী
লিখে গেছেন সেটা দেখা যায় কি?’

ভদ্রশ্রীক মুখ থেকে গড়গড়ার নল সরিয়ে লাল চোখ করে ফেলুদার
দিকে চাইলেন।

‘তোমার বয়স কত হল?’

ফেলুদা বয়স বলল।

‘এই বয়সে এত আত্মপর্থা হয় কি করে? সে লেখার আধ্যাত্মিক মূল্য
জান তুমি? সেটা কি যাকে-তাকে দেখাবার জিনিস?’

‘আমায় মাপ করবেন,’ ফেলুদা খুব শান্তভাবেই বলল, ‘আমি শুধু
জানতে চেয়েছিলাম আপনার সংকট থেকে কোনো মৃত্তির উপায় আপনার
পরলোকগত পিতা বলেছেন কিনা।’

‘সেটার জন্য কাগজটা দেখার কী দরকার? আমাকে জিগোস করলেই
ত হয়। মৃত্তির উপায় একটাই—শত্রুকে বিদায় কর।’

কয়েক মুহূর্ত সবাই চুপ। তারপর ধীরকণ্ঠে জীবনলাল বললেন,
‘তুমি তাহলে আমায় চলে যেতে বলছ?’

‘আমি কি তোমাকে আসতে বলেছি কোনোদিন?’

জীবনবাবু দেখলাম ছাড়বার পাত্র নন। বললেন, ‘বাবা, তুমি আমায়
চেয়ে ভোলানাথবাবুর উপর বেশি আস্থা রাখছ, বোধহয় তার পারিবারিক
ইতিহাসটা ভুলে যাচ্ছ। ভোলানাথবাবুর বাবা রাজনা দিতে জোরি করায়
দুর্লভ মল্লিকের স্নেহ গিয়ে তাঁর ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। আর—

‘মূর্খ!’ মল্লিকমশাই দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠলেন। ‘ভোলানাথ তখন
ছিল শিশু। ঘটনার ষাট বছরে সে প্রতিশোধ নেবে আমাকে হত্যা করে?
এমন কথা শুনলে লোকে হাসবে সেটা বুঝতে পারছ নাক?’

‘আমরা আর বসলাম না। চলুন, আপনাদের পেঁপে দিয়ে আসি,’ বাইরে

এসে বললেন জীবনবাবু 'আপনারা শর্টকাট চিনে ফিরতে পারবেন না।'

ফটক থেকে বেরিয়ে এসে ভদ্রলোক বললেন, 'আপনাকে ডেকে এনে আমি কামেলার মধ্যে ফেলতে চাইনি। আপনাকে যে-ভাবে অপমানিত হতে হল তার জন্য আমি অত্যন্ত লজ্জিত।'

ফেলুদাদের এসব ব্যাপারে লজ্জাবোধ থাকে না জীবনবাবু, বলল ফেলুদা। 'এখানে এসে আমার আদৌ আপশোষ হচ্ছে না। এ নিয়ে আপনি চিন্তাই করবেন না। আমার কেবল আপনার সম্বন্ধেই ভাবনা হচ্ছে। একটা কথা আপনার বোঝা উচিত। হুমকি চিঠি পড়ে ভোলানাথবাবুর কথা মনে হচ্ছে বলেই কিন্তু সন্দেহটা আরো বেশি করে আপনার উপর পড়ছে।'

'কিন্তু গামছা আর চিঠি বন্ধন আসে তখন ত আমি কলকাতায়, মিন্টার মিস্ত্রি।'

ফেলুদা একটা ছোট্ট হাসি দিয়ে বলল, 'আপনার যে কোনো অনুচর নেই গোসাইপুত্রে সেটা কী করে জানব জীবনবাবু?'

'আপনিও আমাকে সন্দেহ করছেন?' শুকনো ধরা গলায় প্রশ্ন করলেন জীবনবাবু।

'আমি এখনো কাউকেই সন্দেহ করছি না, কাউকেই নির্দোষ ভাবছি না। তবে একটা কথা আমি আপনাকে জিজ্ঞাস করতে চাই। ভোলানাথবাবু ফিরকম লোক?'

জীবনবাবু এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, 'অত্যন্ত বিশ্বস্ত। এটা স্বীকার না করে উপর নেই। কিন্তু তাই বলেই কি আমার উপর সন্দেহ পড়বে?' শেষ প্রশ্নটা মরিয়া হয়ে করলেন জীবনবাবু। ফেলুদা বলল, 'জীবনবাবু, এখন আমাকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে সমস্ত ব্যাপারটা দেখতে হবে। এ ছাড়া উপায় নেই। এবং আপনাকে ধৈর্য ধরতে হবে। এ ছাড়া আপনারও উপায় নেই। অপরাধীকে রক্ষা করার রাস্তা আমার জানা নেই। কিন্তু যে নির্দোষ তাকে আমি বাঁচাবই।'

এতে জীবনবাবু আশ্বস্ত হলেন কিনা সেটা অন্ধকারে তাঁর মুখ না দেখে বোঝা গেল না।

বাঁশবাটা ফুরিয়ে আসার মধ্যে ফেলুদা একটা প্রশ্ন করল জীবনবাবুকে।

'আপনার বাবা ত খড়ম ব্যবহার করেন; খালি পায়ে হাঁটোহাঁটি করেন কি কখনো—বাড়ির বাইরে?'

বাড়ির ভিতরেই করেন না কখনো, ত বাড়ির বাইরে! এটা অবিশ্য নতুন কিছু নয়। চিরকালের ব্যাপার।'

'পায়ের তলায় যেন মাটি দেখলাম। তাই জিজ্ঞাস করছি। আরেকটা

কথা—উনি মশারি ব্যবহার করেন না?’

‘নিশ্চয়ই। এখানে সবাই করে। করতেই হয়। কেন বলুন ত?’

‘আপনি বোধহয় ল্যাম্পের আলোয় ঠিক বুঝতে পারেন নি ; ওর সর্বঙ্গে অসংখ্য মশার কামড়ের চিহ্ন।’

‘তাই বুঝি?’ বুঝলাম জীবনবাবু খেয়াল করেননি। সত্যি বলতে কি আমিও করিনি। কিন্তু বাবা ত মশারি ব্যবহার করেন। মশারি ত সাহেবদের জিনিস না, ওতে আপত্তির কী আছে?’

‘তাহলে বোধহয় ফুটো আছে। একটু দেখবেন ত।’

তুলসীবাবু আর জটায়ু আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন ; এতক্ষণে ইলেকট্রিক লাইটে এসে খেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। লালমোহনবাবু বললেন, 'ভাবতে পারেন, এই গন্ডগ্রামে প্রায় বিশ জনের মতো লোক পাওয়া গেল যারা আমার ফিক্স্‌টি পারসেন্টের বোশ বই পড়েছে? অবশ্য সবাই যে কিনে পড়েছে তা নয় ; সিক্স্‌টি ফাইভ পারসেন্ট ইস্কুলের লাইব্রেরি থেকে নিয়ে পড়েছে। যারা কিনেছে তারা এসে বাইরে গই নিয়ে গেল।'

তুলসীবাবু ফেলদাকে বললেন, 'আপনার অপেক্ষাতেই বসে আছি। একবার আশ্রামের দর্শনটা করে নিন। বাদুড়েকালী না হয় কাল দেখা যাবে।'

'সেটা আবার কী?'

'গোসাইপুরের আরেকটি অ্যাট্রাকশন। আপনারা যে বাঁশবন দিয়ে এলেন, তারই ভেতরে একটি দুশো বছরের পুরোন পোড়ো মন্দির। বিগ্রহ নেই। বহুদিন থেকেই বাদুড়ের বাসা হয়ে পড়ে আছে। এককালে খুব জাঁকের মন্দির ছিল।'

'ভালো কথা, আপনার এই আশ্রামবাবুটি এ-গাঁয়েরই লোক?'

'না, তবে রয়েছেন এখানে অনেকদিন। বছর দুয়েক হল ভদ্রলোকের এই ক্ষমতা প্রকাশ পায়। তাছাড়া জ্যোতিষও জানেন। খুব নাম-ডাক। কলকাতা থেকে লোক এসে হাত-টাত দেখিয়ে যায়।'

'পরসো নেন?'

'তা হয়ত নেন। কিন্তু এখানের কারুর কছ থেকে কোনোদিন কিছু নিয়েছেন বলে শুনিনি। আখা নামান সোম আর শুক্রবারে : আজ শুধু দর্শনটা করিয়ে আনব।'

ফেলদা দর্শনের ব্যাপারে দেখলুম কোনো আপত্তি করল না। কারণ পরিষ্কার : সে বুকেছে মূগেন ভট্টাচার্য এখন তদন্তের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। আমরা বৌরিয়ে পড়লাম।

বাইরে গাছপালার ফাঁক দিয়ে এবাড়ি-ওবাড়ির বিজলী-আলো দেখা গেলেও অন্ধকারটা বেশ জমজমাট। চাঁদ এখনো ওঠেনি। ঝাঁঝি প্যাঁচা শেয়াল সব মিলিয়ে মনে হচ্ছিল এখানে শ্যাম মালিকের পার্লিক আর কেরোসিন ল্যাম্পই

মানায় বেশি। লালমোহনবাবু বললেন এর চেয়ে রহস্যময় আর রোমাঞ্চকর পরিবেশ তিনি আর দেখেন নি। বললেন, 'যে-উপন্যাসটার ছক কেটেচি সেটা গোয়াটেমালায় ফেলব ভাবচিলাম, এখন দেখছি গোসাইপূর প্রেফারেবল।'

'তাও ত ঠগীর ফাঁসটা দেখেন নি, তাহলে বুঝতেন রোমাঞ্চ কাকে বলে।'
'সে কী ব্যাপার মশাই?'

ফেলুদা সংক্ষেপে ঘটনাটা বলল। হুম্মকি চিঠির কথাটাও বলল। তুলসীবাবু মন্তব্য করলেন, 'মৃগেন ভট্টাচার্য যদি আত্মা আনিয়ে ওই কথাই বলে থাকে যে মল্লিক বাড়িতেই রয়েছেন শ্যাম মল্লিকের শত্রু তাহলে সেটা মানতেই হবে। আপনার সারা গাঁ চষে বেড়ানোর দরকার নেই।'

আমি মনে মনে বললাম—তুলসীবাবুর ভক্তির পাত্রের মধ্যে আরেকজন লোক পাওয়া গেল—আত্মারাম মৃগেন ভট্টাচার্য।

মৃগেনবাবুর বাড়িতেও দেখলাম ইলেকট্রিসিটি নেই। বোধহয় আবছা আলোয় আত্মা সহজে নামে তাই। ভদ্রলোকের চেহারাটা বেশ চোখে পড়ার মতো। দেখে বয়স বোঝার উপায় নেই। পাতলা চুলে পাক ধরেনি, যদিও চোখের কোলে আর খুঁতনির নিচে চামড়া কুঁচকে গেছে। নাক, চোখ, কপাল, পাতলা ঠোঁট, গায়ের রং সবই একেবারে কাশির ঢোলের পিঁণ্ডভের মতো। মানে যাকে বলে মার্কা মারা বামন। পায়ের গদালি দেখে মনে হল ভদ্রলোক এখন না হলেও এককালে প্রচুর হেঁটেছেন।

বিজলি না থাকলেও এখানে চেয়ার টেবিলের অভাব নেই। ভট্টাচার্য মশাই নিজে তক্তপোষে বসে আছেন, সামনে তিনটে টিনের আর একটা কাঠের চেয়ার ছাড়া দৃপাশে দুটো বেঞ্চ রয়েছে। ডান দিকের বেঞ্চিতে একজন বছর পঁচিশের ছেলে বসে একটা পুরোনো পার্জির পাতা উলটেছে। পরে জেনে-ছিলাম ও মৃগেনবাবুর ভাগনে নিজানন্দ, আত্মা নামানোর ব্যাপারে মামাকে সাহায্য করে।

তুলসীবাবু ভট্টাচার্য মশাইকে ডিপ্ করে একটা প্রশ্ন করে আমাদের দিকে দেখিয়ে বললেন, 'কলকাতা থেকে এলেন এঁরা। আমার বন্ধু। নিফেঁওলাম আপনার কাছে। গোসাইপূর কাকে নিয়ে গর্ব করে সেটা এঁদের জন্যে উচিত নয় কি?'

মৃগেশবাবু ঘাড় তুলে আমাদের দেখে চেয়ারের দিকে ছোঁখিয়ে দিলেন। আমরা তিনজনে বসলাম, তুলসীবাবু দাঁড়িয়ে রইলেন।

মৃগেশবাবু হঠাৎ টান হয়ে পশ্চাসন করে বসে জিঁহাট খানেক চোখ বন্ধে চুপ করে রইলেন। তারপর সেই অবস্থাতেই বসলেন, 'সম্ভাষণশী বন্ধুটি কোন জন?'

আমরা সবাই চুপঃ ফেলদার চোখ কুঁচকে গেছে। লালমোহনবাবু বললেন, 'আজ্ঞে ওই নামে ত কেউ—'

তুলসীবাবু ঠাট্টাটে আগুুল দিয়ে তাঁকে খামিয়ে দিলেন।

'প্রদোষ চন্দ্র মিত্র আমার নাম,' হঠাৎ বলে উঠল ফেলদা। সত্যিই ত!— প্রদোষ স্বামীর সন্ধ্যা, চন্দ্র হল শশী, আর মিত্র হল বন্ধু!

ভট্টাচার্য মশাই চোখ বুলে ফেলদার দিকে মুখ ঘোরালেন। তুলসীবাবু দেখি বেশ গর্ব-গর্ব ভাব করে ফেলদার দিকে চেয়ে আছেন।

'বুঝলে তুলসীচরণ,' বললেন ভট্টাচার্য মশাই। 'কিছুদিন পরে আর আমার প্রয়োজন হবে না। আমার নিজের মধ্যেই ক্রমে ঐকাল দর্শনের শক্তি জাগছে বলে অনুভব হচ্ছে। অবিশিষ্ট আরো কয়েক বছর লাগবে।'

'ও'র পেণাটা কী বলুন ত!' তুলসীবাবু ফেলদার দিকে দেখিয়ে প্রশ্নটা করলেন। ইতিমধ্যে একজন বাইরের লোক এসে ঢুকছে, তার সামনে ফেলদা যে গোয়েন্দা এই খবরটা বোঝিয়ে পড়লে মোটেই ভাল হবে না।

'সেটা আর বলার দরকার নেই,' বলল ফেলদা। তুলসীবাবুও নিজের অসাধনতার ব্যাপারটা বুঝে ফেলে জিভ কেটে কথা ঘুরিয়ে বললেন, 'শুদ্ধ-বাবু আরেকবার আপনার এখানে নিয়ে আসব ওঁদের। আজ কেবল দর্শনটা করিয়ে গেলাম।'

মৃগাক্ষবাবুর চোখ এখনো ফেলদার দিকে। একটু হেসে বললেন, 'সুক্ষ্ম সাল শস্যের কাজে এসেছেন আপনি, এ কথা বললে আপনি ছাড়া আর কেউ বুঝবে কি? আপনি অকারণে বিচলিত হচ্ছেন।'

ভদ্রলোকের কচ থেকে বিদায় নিয়ে বাইরে এসে ফেলদা বলল, চতুর লোক! এ'র পসার জমবে না ত কার জমবে?'

'সুক্ষ্ম সাল শস্য কী মশাই?' লালমোহনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন। 'সন্ধ্যা শশী বন্ধু ত তাও অনেক কষ্টে বুঝলাম—তাও আপনি নিজের নামটা বললেন বলে!'

'সুক্ষ্ম হল অণু, সাল—দন্ত্য স—হল সন, আর শস্য হল ধান। তিনে মিলে—'

'অনুসন্ধান!' লালমোহনবাবু ক্র্যাপ দিয়ে বলে উঠলেন, 'লোকটা শুধু গণনা জানে না, হে'রালিও জ্ঞান। আশ্চর্য!'

কে যেন এদিকেই আসছে—হাতের লন্ঠনটা দেবার ফলে তার নিজের ছায়াটা সারা রাস্তা ঝাঁট দিতে দিতে এগিয়ে আসছে! তুলসীবাবু হাতের টর্চ তুলে তার মুখে ফেলে বললেন, 'ভট্টাচার্যের ওখানে বুদ্ধি? কী ব্যাপার, ঘন ঘন দর্শন?'

ভদ্রলোক একটু হেঁ হেঁ ভাব করে কিছু না বলে আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন।

‘ভোলানাথবাবু,’ বললেন তুলসীবাবু, ‘ভট্টাচার্য মহাশয়ের লেটেষ্ট ভক্ত! মাঝে একদিন ওঁর বাড়িতে গিয়ে করে জানি আত্মা ন্যামিয়েছেন।’

রাতে তুলসীবাবুর দাওয়ায় বসে তিনরকম তরকারি, মৃগের ডাল আর ডিমের ডালনা দিয়ে দিবা ভোজ হল। তুলসীবাবু বললেন যে এখানকার টিউবওয়েলের জলটায় নাকি খুব খিদে হয়।

খাওয়া-দাওয়া করে বাইরের দাওয়ায় বসে তুলসীবাবুর কাছে ওঁর মাস্টারি জীবনের গল্প শুনে যখন দোতলায় শূতে এলাম তখন খাঁড়ি বগছে সাড়ে নটা, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন মাঝরাাত্রের। আমরা মাস্টারি সমেত বিছানাপত্র সব নিয়ে এসেছিলাম; ফেলুদা বলল ওডেমস মেখে শোবে, মাস্টারির দরকার নেই। আমি লক্ষ্য করেছি গত দেড় ঘণ্টায় ও একবার কেবল গঙ্গার রান্নার প্রশংসা ছাড়া আর কোনো কথা বলেনি। এত চট করে ওকে চিন্তায় ডুবে যেতে এর আগে কখনো দেখিনি। লালমোহনবাবু বললেন ওঁর সংবর্ধনার স্পীচটা তৈরি করে রাখতে হবে, তাই উনি একটা লণ্ঠন চেয়েছেন, কারণ ঘরে ব্যক্তি জ্বালিয়ে রাখলে আমাদের ঘরের ব্যাঘাত হবে।

আমি বিছানায় শুয়ে ফেলুদাকে একটা প্রশ্ন না করে পারলাম না।

‘তোমার নাম আর পেণ্ডা কী করে বলে দিল বল ত?’

‘আমার মনের অনেকগুলো প্রশ্নের মধ্যে ওটাও একটা রে তোপসে। তবে অনেক লোকের অনেক পিকিউলার ক্ষমতা থাকে যার কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।’

লালমোহনবাবু বললেন, ‘আমাকে এভাবে স্নেহ ইগনোর করল কেন বলুন ত?’

‘সারা গাঁয়ের লোক আপনাকে অভ্যর্থনা দিতে চলেছে, আর একটা লোক আপনার নামে হেঁয়ালি বণ্ডিল না বলে আপনি মূসড়ে পড়লেন?’

‘তাহলে বোধহয় আমার নাম থেকে হেঁয়ালি হয় না তাই!’

ফেলুদা দড়টো ধোঁয়ার রিং ছেড়ে বলল, ‘রক্তবরণ মৃৎধকরণ নদীপাশে যাহা বির্ণিধলে মরণ—কেমন হ’ল?’

‘কিরকম, কিরকম?’ বলে উঠলেন লালমোহনবাবু, ফেলুদা এত হাস করে ছড়টো বলেছে যে দৃষ্টির কেউই ঠিকমত ধরতে পারিনি। ফেলুদা আবার বলল—‘রক্তবরণ মৃৎধকরণ নদীপাশে যাহা বির্ণিধলে মরণ।’

‘দাঁড়ান, দাঁড়ান.....রক্তবরণ লাল, আর মৃৎধকরণ—’

‘মোহন!’ আমি ছোঁচিয়ে বলে উঠলাম।

‘ইয়েস, লালমোহন—কিন্তু গাঙ্গুলী?—ওহো, নদী হল গাঙ আর গুলি
বিশ্বে মরণ—ওহ, রিলিয়ান্ট মশাই! কী করে যে আপনার মাথায় এত
আসে জিনিষ। আপনি থাকতে সংবর্ধনাটা আমাকে দেওয়ার কোন মানেই
হয় না—অলো কথা, স্পীচটা তৈরী হলে একটু দেখে দেবেন ত?।

পরদিন সকালে গ্রামটা ঘুরে দেখে আমরা জাগরণী ক্লাবের বাড়িতে সিরাজদ্দৌলা নাটকের রিহার্শাল দেখতে গেলাম। ফেলদা অভিনেতাদের সঙ্গে আলাপ করে তাদের ক্যানেডিয়ান থিয়েটার সম্বন্ধে একটা ছোটখাটো বক্তৃতা দিয়ে ফেলল। সেখানেই আলাপ হল গোসাইপুত্রের একমাত্র মূর্ত্যভিনেতা বৈশীমাধবের সঙ্গে। বললেন শঙ্করবাব বিকেলে আমাদের বাড়িতে এসে তাঁর আর্ট দেখিয়ে যাবেন। 'দেখবেন স্যার, ফ্ল্যাট ছাতের উপর সিঁড়ি বেয়ে ওঠা দেখিয়ে দেব, ঝড়ের মধ্যে মানুষের অভিব্যক্তি কিরকম হয়, স্যাড থেকে ছ'রকম চেঞ্জের মধ্যে দিয়ে হার্পিতে নিয়ে যাওয়া সব দেখিয়ে দেব।'

বিকেলে সেগুনহাটের মেলা দেখতে গেলাম। সেখানে নাগরদোলায় চড়ে, চা চিকেন কন্ট্রোল্ট আর রাজভোগ খেয়ে, স্পাইডার লেডির বীভৎস ভেলকি দেখে, সাড়ে তেরো টাকার খুচরো জিনিস কিনে গোসাইপুত্র যখন ফিরলাম তখন ছটা বাজে। আকাশে আলো আছে দেখেই বোধহয় ফেলদা বলল একবার মল্লিকবাড়িতে জীবনবাবুর সঙ্গে দেখা করে যাবে। তুলসীবাবু বললেন বাড়ি গিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করবেন।

সদর দরজায় পৌঁছানোর আগেই জীবনবাবু বেরিয়ে এলেন ; বললেন ও'র ঘরের জানালা দিয়েই অনেক আগেই আমাদের দেখতে পেয়েছেন। তারপর ফেলদার প্রশ্নের উত্তরে বললেন যে নতুন কোনো খবর নেই। 'আপনাদের বাগানটা একটু দেখতে পারি?' 'নিশ্চয়ই,' বললেন জীবনবাবু, 'আসুন আমার সঙ্গে।'

বাগানটা অবিশ্য ফুলের বাগান নয়, এখানে বেশীর ভাগই বড় বড় গাছ আর ফলের গাছ। ফেলদা ঘুরে ঘুরে কী দেখছে তা ওই জানে! একবার এক জায়গায় থেমে মাটিটার দিকে যেন একটু বেশিক্ষণ ঘরে দেখল। এরই ফাঁকে আবার মল্লিক বাড়ির দোতলার পিছনের বারান্দা থেকে 'কে রে, কে ওখানে?' বলে জীবনবাবুর ঠাকুমা চোঁচিয়ে উঠলেন। তাতে জীবনবাবুকে আবার উলটে চোঁচিয়ে বলতে হল, 'কেউ না ঠাকুমা—আমরা।' 'ও, ভোঁর!' উত্তর দিলেন ঠাকুমা, 'আমি বোজাই যেন দেখি কারা ঘুর ঘুর করে খেয়ে।' 'আপনার ঠাকুমার দৃষ্টিশক্তি কেমন?' জিজ্ঞেস করল ফেলদা। 'খুবই কম,' বললেন জীবনবাবু, 'এবং তার সঙ্গে মাননসই শ্রবণশক্তি!'

'আপনার ঠাকুমার দৃষ্টিশক্তি কেমন?' জিজ্ঞেস করল ফেলদা।

'খুবই কম,' বললেন জীবনবাবু, 'এবং তার সঙ্গে মাননসই শ্রবণশক্তি!'

‘বাগান এমনিতে বোধহয় তেমন দেখাশোনা হয় না?’

‘ওই ভোলানাথবাবুই যা দেখেন।’

‘সঙ্গে লোকসংখ্যাকে এদিকে?’

‘রাহুল! মাথা খারাপ! রাত জেগে বাগানে টহল দেবে এরা?’

‘সদর দরজার তাল দেওয়া থাকে আশা করি?’

‘ওটা ভোলানাথবাবুর ডিউটি। তবে আমি থাকলে আমিই চাবি বন্ধ করি, চাবি আমার কাছেই থাকে।’

‘ভোলানাথবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়নি; তাঁকে একবার ডাকতে পারেন!’

ভোলানাথবাবুকে দিনের আলোয় দেখে মনে হল তিনি শহুরে লোকের মতো খুঁত সার্ফ পরলেও তাঁর চেহারায় এখনো অনেকখানি তাঁর পূর্বপুরুষের ছাপ রয়ে গেছে। খালি গা করে মাঠে নিয়ে হাতে লাঙল ধরিয়ে দিলে খুব বেমানান হবে না। আমরা বাড়ির সামনে বাঁধানো পুকুরের ঘাটে বসে কথা বললাম। বর্ষার জলে পুকুর প্রায় কানায় কানায় ভরে আছে আর সারা পুকুর ছেঁরে আছে শালদুকে। নবীন বলে একটি চাকরকে লেবুর সরবত আনতে বললেন জীবনবাবু। চারিদিক অদ্ভুত রকম নিস্তব্ধ, কেবল দূরে কোথেকে জ্বনি চিঁ চিঁ করে শোনা যাচ্ছে ট্রানজিস্টারে গান। ওটা না হলে সত্যিই যেন মনে হত আমরা কোন আদিকালে ফিরে গেছি।

‘মৃগাঙ্কবাবু আপনাদের বাড়িতে একবারই এসেছেন?’ ভোলানাথবাবুকে জিজ্ঞেস করল ফেলুদা।

‘সম্প্রতি একবারই এসেছেন।’

‘আর আগে?’

‘আগেও এসেছেন কয়েকবার। কাটোয়া থেকে আষাঢ় মাসে মদন গোসাঁইর দল এলো, তখন মৃগাঙ্কবাবুই তাদের নিয়ে এসে কর্তাকে কেন্দ্রন শুনিয়ে যান। এমনিতেও বার কয়েক একা আসতে দেখেছি; মনে হয় কর্তা একটা কুণ্ঠি হাঁকে দেবার কথা বলেছিলেন।’

‘সে কুণ্ঠি হয়েছে?’

‘আজ্ঞে তা বলতে পারব না।’

‘এবার যে এলেন, তাঁর ব্যবস্থা কে করল?’

‘আজ্ঞে কর্তার নিজেরও ইচ্ছা ছিল, আর কবিরেজ মশাইও বললেন, আর— আজ্ঞে, আমিও বলেছিলাম।’

‘আপনার ত বাতায়ন আছে ভটচাঁয় বাড়িতে?’

‘আজ্ঞে হ্যাঁ।’

‘ভক্তি হয়?’

ভোলানাথবাবুর মাথা হেঁট হয়ে গেল।

‘আজ্ঞে কী আর বলব বলুন। আমার মেয়ের নাম ছিল লক্ষ্মী, যেমন নাম তেমন মেয়ে, এগারোয় পড়তে না পড়তে ওলাউঠায় চলে গেল। মৃগাঙ্কবাবু শুনেন বললেন, সে কেমন আছে জানতে চাও তার নিজের কথায়?’

ভোলানাথবাবু অন্ধকারে ধূঁতির খুঁটে চোখ মুছলেন। তারপর সামলে নিয়ে বললেন, ‘সেই মেয়েকে নামিয়ে আনলেন ভট্টাচার্য মশাই। মেয়ে বললে ভগবানের কোলে সে সুখে আছে, তার কোনো কষ্ট নাই। মৃত্যু বললে না অবিশ্বাস, কাগজে লেখা হল। সেই থেকে.....’

ভোলানাথবাবুর গলা আবার ধরে গেল। ফেলুদা ব্যাপারটাকে আর না বাড়িয়ে বলল, ‘এ বাড়িতে আত্মা নামানোর সময় আপনি ছিলেন?’

‘ছিলাম, তবে ঘরের মধ্যে ছিলাম না, দরজার বাইরে। ভেতরে কেবল কর্তা-মশাই আর ভট্টাচার্য মশাই আর নিত্যানন্দ ছাড়া কেউ ছিলেন না। মা ঠাকরুন যেন জানতে না পারেন এইটে বলে দিয়েছিলেন কর্তামশাই, তাই দরজায় পাহারা থাকতে হল।’

‘তাহলে আপনি কিছুই শোনেন নি?’

‘আজ্ঞে দশ মিনিট থানেক চুপচাপের পর মধু সরকারের বাঁশ বনের দিক থেকে যখন শেগোল ডেকে উঠল সেই সময় যেন কর্তামশাইয়ের গলার শব্দলম্ব—কেউ এলেন, কেউ এলেন? তারপর আর কিছু শুনিনি। সব হয়ে যাবার পর ভট্টাচার্য মশাইকে নিয়ে তাঁর বাড়ি পেঁাছে দিয়ে আসি।’

সরবত খাওয়া শেষ করে একটা চারমিনার ধরিয়ে ফেলুদা বলল, ‘দুর্গভ মল্লিকের লোক আপনাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল সে কথা মনে পড়ে?’

ভোলানাথবাবুর উত্তর এলো ছোট্ট দুটো কথায়।

‘তা পড়ে।’

‘আপনার মনে আক্রোশ নেই?’

ফেলুদাকে এধরনের ধাক্কা-মারি প্রশ্ন করতে আগেও দেখেছি। ও বলে এই ধরনের প্রশ্নের রিঅ্যাকশন থেকে নাকি অনেক কিছু জানা যায়। ভোলানাথবাবু জিভ কেটে মাথা হেঁট করলেন। তারপর কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে বললেন, ‘এখন মাথাটা ঠিক নেই তাই, নইলে কর্তামশাইয়ের গতো মনুষ্য স্তম্ভন হয়?’

ফেলুদা আর কোন প্রশ্ন করল না। ভোলানাথবাবু একটুক্ষণ অপেক্ষা করে বললেন, ‘যদি অনুমতি দেন—আমি একটু ভট্টাচার্য মশাইয়ের বাড়ি যাব।’

ফেলুদা বা জীবনবাবুর কোন আপত্তি নেই জেরে উত্তরেক চলে গেলেন। জীবনবাবু একটু উসখুস করছেন দেখে ফেলুদা বলল, ‘কিছু বলবেন কি?’

‘আপনি কিছুটা অগ্রসর হলেন কিনা জানার আগ্রহ হচ্ছে।’

বুঝলাম জুদুলোকে বিনয়ের সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তিত।

ফেলুদা বলল, 'ভোলানাথবাবুকে বেশ ভালো লাগল।'

জীবনবাবু মুখ শূন্য করে গেল। 'তার মানে আপনি বলতে চান—'

'আমি মিস্টারই বলতে চাই না আপনাকে আমার ভালো লাগে না। আমি বলতে চাই শুধু দু-একটা খট্কার উপর নির্ভর করে ত খুব বেশী দূর এগিয়ে যায় না—বিশেষ করে সেই খটকাগুলোর সঙ্গে যখন মূল ব্যাপারটার কোনো সম্পর্ক পাওয়া যাচ্ছে না। এখন যেটা দরকার সেটা হল কোনো একটা ঘটনা, যেটা—'

'কে রে, কে এখানে?'

ফেলুদার কথা শুনে গেল, কারণ ঠাকুরা চেঁচিয়ে উঠেছেন। আওয়াজটা এসেছে বাড়ির পিছন দিক থেকে। চারদিক নিস্তব্ধ বলে গলা এত পরিষ্কার শোনা গেল।

ফেলুদা দেখলাম মূহুর্তের মধ্যে সোজা বাগানের দিকে ছুটেছে। আমরাও তার পিছু নিলাম। লালমোহনবাবু এতক্ষণ পুকুরের দিকে তাকিয়ে গুনগুন করে গান গাইছিলেন। তিনিও দেখলাম সঙ্গে সঙ্গে দিলেন ছুট।

তিনটে টেবিলের আলোর সাহায্যে আমরা বাগানে গিয়ে পেঁপীছলাম। ফেলুদা এগিয়ে গেছে, সে পশ্চিমের পাঁচিলের কাছে একটা ধসে যাওয়া অংশের পাশে দাঁড়িয়ে বাইরে টর্চ ফেলে রয়েছে। 'কাউকে দেখলেন?' জীবনবাবু প্রশ্ন করলেন।

'দেখলাম, কিন্তু চেনার মতো স্পষ্ট নয়।'

আধঘন্টা ধরে হাজার বিনবিনুনি আর কয়েক আর কিংবির কান ফাটলো শব্দের মধ্যে সারা বাগান চষে যেটা পাওয়া গেল সেটা একটা চরম রহস্য। সেটা হল বাগানের উত্তর দিকের শেষ মাথায় একটা গাছের গুড়ির পাশে একটা সদ্য-খোঁড়া গর্ত। তার মধ্যে যে কী ছিল বা কী থাকতে পারে সে ব্যাপারে জীবনবাবু কোনরকম আলোকপাত করতে পারলেন না। লালমোহনবাবু অবিশ্বাসে সোজাসুজি বললেন গুপ্তধন, কিন্তু জীবনবাবু বললেন তাঁদের বংশে কস্মিন-কালেও গুপ্তধন সম্বন্ধে কোন কিংবদন্তী ছিল না। ফেলুদা যে কথাটা বলল সেটাও আমার কাছে পুরোপুরি রহস্য।

'জীবনবাবু, আমার মনে হচ্ছে আমরা এই ঘটনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।'

আমরা কিছুক্ষণ হল খাওয়া-দাওয়া সেরে আমাদের ঘরে এসে বসেছি। আজ বেশ কাঁহিল লাগছে : বুঝতে পারছি অশ্বকারে বনবাদাড়ে ঘোরাটা সহজ কাজ নয়। আগার তার লালমোহনবাবুর পায়ে বেশ কয়েক জায়গায় ভেটল দিতে হয়েছে। কারণ আগাছার মধ্যে কাঁটা-ঝোপও ছিল বেশ কয়েকটা।

শুনে কী যেন হিজিবিজি লিখছে। লালমোহনবাবু একটা হাই অর্ধেক তুলে থেয়ে গেলেন, কারণ ফেলুদা একটা প্রশ্ন করেছে—লালমোহনবাবুকে নয়, তুলসীবাবুকে। তুলসীবাবু আমাদের জন্য পান নিয়ে ঢুকছেন।

‘তুলসীবাবু, আপনি যদি একজন মহৎ লোককে একটা লোক ঠকানো ফন্দি বাতলে দেন, সে-লোক যদি সে ফন্দি কাজে লাগায়, তাহলে তাকে কি আর মহৎ বলা চলে?’

তুলসীবাবু ভাবচ্যাকা ভাব করে বললেন, ‘ওরে বাবা, আমি মশাই এসব হেঁয়ালি-টেরালিতে একেবারেই অপটু। তবে হ্যাঁ, মহৎ লোক অত নিচে নামবেন কেন? নিশ্চই নামবেন না।’

‘সাক্,’ বলল ফেলুদা, ‘আমি খুশি হলাম জেনে যে আপনি আমার সঙ্গে এক মত।’

একেই ত পর্যাচালো রহস্য, সেটাকে ধোঁয়াটে কথা বলে ফেলুদা আরো পেরিচিয়ে দিচ্ছে, আমি তাই ও নিয়ে আর একদম চিন্তা না করে মশারির ভিতর ঢুকলাম। কিন্তু চিন্তা করব না ভাবলেই কি আর মন থেকে চিন্তা পালিয়ে যায়? আমার নিজের মনেই যে প্রশ্ন জমা হয়েছে একগাদা। শ্যামলালবাবুর পারে কাদা কেন? কে পাঠিয়েছে ঠগীর ফাঁস আর হুমকি চিঠি? ঠাকুরা কাকে দেখে চেঁচালেন আজকে? বাগানের গর্তে কী ছিল? আবার উত্তর লেখা কাগজ দেখালেন না কেন মল্লিকমশাই?.....গতকালের মতো আজও বিছানায় পড়তে না পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কেবল তফাৎটা এই যে গতকাল এক ঘুমে রাত কাবার, আর আজ চোখ খুলে দেখি তখনও অন্ধকার।

আসলে ঘুমটা ভেঙেছে একটা চীৎকারে। সেটার জন্য দায়ী বোধহয় লালমোহনবাবু, কারণ তিনি খাটের উপর বসে আছেন মশারির বাইরে, সামনের খোলা জানালার গরাদের ভিতর দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে তাঁর মুখের উপর, আর স্পষ্ট দেখছি তাঁর চোখ গোল হয়ে গেছে।

‘বাপ্‌রে বাপ্‌, কী স্বপ্ন, কী স্বপ্ন!’ বললেন লালমোহনবাবু।

‘কী দেখলেন আব্বার?’ আমি জিগোস করলাম।

‘দেখলুম আমার ঠাকুরদা হরিমোহন গাঙ্গুলীকে.....একটা সংবর্ধনা সভা, তাতে ঠাকুরদা স্পীচ দিলেন, তারপর আমার গঙ্গায় মালা পরিয়ে দিয়ে বললেন, এই দাখ্‌, কেমন রোমাঞ্চকর মালা দিলাম তোকে—আর আমি দেখছি সেটা ফুলের মালা নয় তপেশ, সেটা—ওরেবাসন্তর বাস্‌—সেটা খুদে খুদে রক্তবর্ণ নরমুণ্ড দিয়ে গাঁথা!’

‘এমন চমৎকার রান্না! কুহুত্বে আপনি এই সব উদ্ভট স্বপ্ন দেখছেন?’

আশ্চর্য! ফেলদাদে তার খাটে নেই সেটা এতক্ষণ খেয়ালই করিনি। সে ছাতের দরজা দিয়ে ঘরে এসে ঢুকল; বুকলাম সে খোগকায়াম করছিল। যাক্, তাইলে সকাল হয়ে গেছে।

‘কুঁ কুঁ বলুন,’ বললেন লালমেহনবাবু, ‘আপনার এই রক্তবরণ আর আত্মরক্ষা আর সংবর্ধনা মিলে এমন জগাখিচুড়ি হয়ে গেছে আমার মতো।’

‘আমরা উঠে পড়লাম। তুলসীবাবু কি এখনো ঘুমোচ্ছেন? ছাতে এসে দৌখ পূর্ব দিকটা নবে ফরসা হয়েছে, তার ফলে চাঁদের আলোটা ফিকে লাগছে। দু’তিনটে তারা এখনো পিট্-পিট্ করছে, কিন্তু তাদের মেয়াদও আর বেশিক্ষণ নয়। দাঁতন দিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করব বলে কিছু নিমের ডাল ভেঙে রেখেছিলাম—ফেলদাদ বলে দোকনের যে কোনো টুথব্রাশ আর পেপেটের চেয়ে দশ গুণ বেশী ভাল—তারই একটা চিবিয়ে রেডি করছি, এমন সময় শুনলাম পরিগ্রাহি চীৎকার।

‘মিস্তির মশাই! মিস্তির মশাই!’

ভোলানাথবাবুর গলা। আমরা দুন্দাড় করে নিচ গিয়ে হাজির হলাম। ‘সর্বনাশ হয়ে গেছে!’

ভোরের আকাশে ভুল্ললোকের ফ্যাকাশে মুখ আরো ফ্যাকাশে লাগছিল। ‘কি হয়েছে?’ ফেলদাদ দৌড়ে গিয়ে জিজ্ঞাস করল।

‘কাল রাত্তিরে বাড়িতে ডাকাত পড়ে সব লণ্ডভণ্ড। সিদ্দুক খান। কতামশাইয়ের হাত-পা-মুখ বেধে রেখেছিল। আমাকেও বেধেছিল, সকালে ছোটবাবু এসে খুলে দিলেন। আপনি শির্গির আসুন।’

শ্যামলাল মজ্জিক জখম হননি বটে, কিন্তু তারকে যেভাবে দু'ঘণ্টা বাঁধা অবস্থায় পড়ে থাকতে হয়েছিল তাতে তিনি বেশ টস্কে গেছেন। ফ্যালফ্যাল করে সামনের দিকে চেয়ে বসে আছেন ফরাসের উপর, কেবল একবার মাত্র 'বিড়বিড়' করে বলতে শুনলাম, 'বার্ভার্স যদি ত মেরে ফেললি না কেন?' এদিকে তাঁর সিন্দুক যে ফাঁক সেটা কি তিনি খেয়াল করেছেন?

ফেলদা প্রথমে শ্যামলালবাবুর ঘরটা তন্ন তন্ন করে দেখল। শব্দ শুনতে সিন্দুকটাই খোলা হয়েছে, আর বার যেমন তেমনই আছে। চারি থাকত নাকি ভদ্রলোকের বালিশের নিচে। ভোলানাথবাবু দেতলাতেই শোন, তাঁকে ঘুমের মধ্যে আটক করে হাত-পা চোখ-মুখ বেঁধে ফেলেছে ডাকাত। ওঁর বারণা যে অন্তত দু'জন লোক ছিল। চাকর নবীন নাকি সরোয়াত নাকে তেল দিয়ে ঘুমিয়েছে। দু'জন পাইকের মধ্যে একজন চলে গিয়েছিল সেগুনহাটি বাহা দেখতে, আরেকজন তার ডিউটি ঠিকই করছিল, দুঃখের বিষয় ডাকাত মাথায় লাঠি মেরে বেশ কয়েক ঘণ্টার জন্য তাকে অকেজো করে দিয়েছিল। সামনের দরজা বন্ধই ছিল, কাজেই মনে হয় খিড়িকের পাঁচিল টপ্কে পিছনের বারান্দা দিয়ে ঢুকোঁছিল। ঠাকুমাকে কিছু জিগ্যোস করে লাভ নেই, কারণ তিনি থাকেন বারান্দার উত্তর প্রান্তে তিনটে অকেজো ঘরের পরে শেষ ঘরে।

পনের মিনিট হল এসেছি, কিন্তু এখনো জীবনবাবুর দেখা নেই। ভোলানাথবাবু আমাদের সঙ্গেই ছিলেন, ফেলদা তাঁকে বলল, 'জীবনবাবু কি আমাদের সঙ্গে কথা না বলেই পুলিশে খবর দিতে গেলেন নাকি?'

ভোলানাথবাবু আমতা আমতা করে মাথা নেড়ে বললেন, 'আজ্ঞে আমাকে বলেই তিনি বাইরে বেরিয়ে ছিলেন বটে, কিন্তু তার পরে ত.....'

ফেলদা এবার ছুটল সিঁড়ির দিকে, পিছনে আমি আর লালমোহনবাবু। উঠান পেরিয়ে সোজা খিড়িক দিয়ে বাইরে বাগানে হাজির হলো। এখনো ভাল করে সূর্য ওঠেনি। অল্প কুয়াশাও বেন রয়েছে, কিন্তু জমে থাকা উনুনের ধোঁয়া। গাছের পাতাগুলো শিশিরে ভেজা, পাতের নিচে ঘাস ভেজা। পাখি ডাকছে—কাক, শালিক, আর আরেকটার নাম জ্ঞানি না।

আমরা বাগানের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গিয়ে ধমকে থেমে গেলাম।

দশ হাত দূরে একটা কাঁঠাল গাছের গুঁড়ির ধারে নীল পাঞ্জাবী আর

পায়জামা পরা একজন লোক পড়ে আছে। ওই পোশাক আমি চিনি ; ওই চিঠিটাও চিনি।

ফেলুদা এগিয়ে গিয়ে ক'ছ থেকে দেখেই একটা আতঙ্ক আর আক্ষেপ মেশানো স্বর করে পিছিয়ে এল।

‘ওম্মশাই!’

জীমোহনবাবু আঙুল দিয়ে কিছু দূরে মাটিতে একটা জায়গায় পরেণ্ট করে কথাটা বললেন।

‘জানি। দেখেছি।’ বলল ফেলুদা, ‘ওটা ছোঁবেন না। ওটা দিয়েই জীমোহনবাবুকে খুন করা হয়েছে।’ কোপের ধারে পড়ে রয়েছে কোণে পাথর বাঁধা একটা গামছা।

ভোলানাথবাবুও বেরিয়ে এসেছেন, আর দেখেই বুঝেছেন কী হয়েছে। ‘সর্বনাশ’ বলে মাথায় হাত দিয়ে প্রায় যেন ভিরামি লাগার ভাব করে তিন হাত পিছিয়ে গেলেন ভদ্রলোক।

‘এখন বিচলিত হলে চলবে না ভোলানাথবাবু, আপনি চলে যান ভদ্রলোকের সঙ্গে। এখানে পূর্বদিকের মাটিতে গিয়ে থবর দিন। দরকার হলে শহর থেকে দারোগা আসবে। কেউ যেন লাশ বা গামছা না ধরে। কিছুক্ষণ আগেই এ কাঁতিচিহ্ন হয়েছে। সে লোক হয়ত এখনো এ ভল্লাতেই আছে। আর—ভালো কথা—মল্লিকমশাই যেন খুনের কথাটা না জানেন।’

ফেলুদা দৌড় দিল পশ্চিম দিকের পাঁচিল লক্ষ্য করে, সঙ্গে সঙ্গে আমিও।

এ দিকের পাঁচিলের একটা জায়গা ধসে গিয়ে দিবা বাইরে যাবার পথ হয়ে গেছে। আমরা দুজনে টপকে বাইরে গিয়ে পড়লাম। ফেলুদার চোখ চারিদিকে ঘুরছে, এমনকি জমির দিকেও। আমরা এগিয়ে গেলাম। একশো গজের মধ্যে অন্য কোনো বাড়ি নেই, কারণ এটা সেই শর্টকাটের বাঁশবন। কিন্তু ওটা কী? একটা ভাঙা মন্দির। নিশ্চয়ই সেই বাদুড়ে কালী মন্দির।

মন্দিরের পাশে একজন লোক, আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছেন। কবিরাজ রসিক চক্রবর্তী। ‘কী ব্যাপার? এত সকালে?’ ভদ্রলোক জিগোস করলেন।

‘আপনি থবর পান নি বোধহয়?’

‘কী থবর?’

‘মল্লিক মশাই—’

‘অ্যাঁ!’ কবিরাজের চোখ কপালে উঠে গেছে।

‘আপনি যা ভয় পাচ্ছেন তা নয়। মল্লিক মশাই সুস্থই আছেন, তবে তাঁর বাড়িতে ডাকাত পড়েছে। আর জীবনবাবু খুন হয়েছেন—তবে এ থবরটা আর মল্লিক মশাইকে দেবেন না।’

রাসিকবাবু ব্যস্তভাবে এগিয়ে গেলেন। আমরাও ফেরার রাস্তা ধরলাম ;
খুঁনী পালিয়ে গেছে।

পাঁচল টপকে বাগানে ঢুকে এগিয়ে যেতেই তিন নম্বর বিস্ফোরণ।
আমার মাথা ভেঁ ভেঁ করছে। একি স্বপ্ন না সত্যি? কঠাল গছের নিচটা
এখন খালি।



জীবনবাবু লক্ষ্য উধাও।

ঝোপের পাশে থেকে ঠগের ফাঁসটাও উধাও।

লালমোহনবাবু একটা গোলমুণ্ড গাছের পাশে দাঁড়িয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছেন। কোনোরকমে ভয়লোক মদ্য খুললেন।

‘জলিলনাথবাবু পদপ্—পদালিশে খবর দিতে গেলেন, আমি আপনাদের খুঁজছি এসে দেখি...’

‘এসে দেখলেন লাশ নেই?’ ফেলুদা চোঁচিয়ে জিগোস করল। ‘না!’

ফেলুদা আবার দৌড় দিল। এবার পশ্চিমে নয়, পূর্বে।

পূর্বের দেয়ালে ফাঁক নেই, কিন্তু উত্তরে আছে। কালকের সেই গর্ত—
আজ দেখলাম সেটা একটা আম গাছের নিচ—আর পিছনেই ফাঁক। বড় ফাঁক,
প্রায় একটা ফটক বললেই চলে। আমি আর ফেলুদা বাইরে বেরোলাম।

দশ হাতের মধ্যেই একটা পুকুর জলে টেঁটবুদর। এই পুকুরেই যে ফেলা
হয়েছে লাশ তাতে সন্দেহ নেই।

আমরা ফিরে গিয়ে পিছনের সিঁড়ি দিয়ে সোজা উঠলাম দোতলায়।

‘ও জীবন, ও বাবা জীবন!’—ঠাকুমা চেঁচাচ্ছেন—‘এই যেন দেখলাম
জীবনকে, গেল কোথায় ছেলেটা?’

গাল ভেঁবড়ানো, চুল ছোট করে ছাটা, খান পরা আশি বছরের বৃদ্ধি,
ঘোলাটে চশমা পরে নিজের ঘর ছেড়ে বারান্দার এদিকে চলে এসেছেন।
আশ্বিন গলা শুনছি, আজ প্রথম দেখলাম ঠাকুমাকে। ফেলুদা এগিয়ে গেল।
‘জীবনবাবু একটু বোরিয়েছেন। আমার নাম প্রদোষ মিত্র। আপনার কী দরকার
আমাকে বলতে পারেন।’

‘তুমি কে বাবা?’

‘আমি জীবনবাবুর বন্ধু।’

‘তোমাকে ত দেখিনি।’

‘আমি দুদিন আগে এসেছি কলকাতা থেকে।’

‘তুমিও কলকাতার থাক?’

‘আজ্ঞে হ্যাঁ। কিছু বলার ছিল আপনার?’

বৃদ্ধি হঠাৎ যেন খেই হারিয়ে ফেললেন। ঝাড় উঁচু করে কিছুক্ষণ এদিক
ওদিক চেয়ে বললেন, ‘কী বলার ছিল সে আর মনে নেই বাবা, আমার বক্ত
ভোলা মন যে!’

আমরা ঠাকুমাকে আর সময় দিলাম না। তিনজনে গিয়ে ঢুকলাম শ্যাম-
লালবাবুর ঘরে।

রসিকবাবু ইতিমধ্যে এসে হাজির হয়েছেন; তিনি শ্যামলালবাবুর নাড়ী

ধরে বসে আছেন।

‘জীবন কোথায় গেল?’ এখনো কেমন জানি অসহায় ভাব করে কথা বলছেন ভদ্রলোক। বৃদ্ধনাম রসিকবাবু জীবনবাবুর মৃত্যু সংবাদটা শ্যামলালবাবুকে দেননি।

‘আপনি ত চাইছিলেন তিনি কলকাতায় ফিরে যান,’ বলল ফেলুদা।

‘ও চলে গেল! কিসে গেল? পালকিতে?’

‘পালকিতে ত আর সবটুকু যাওয়া যায় না। কাটোয়া থেকে ট্রেন ছাড়া গতি নেই। গরুর গাড়ি বা ডাক গাড়িতে যাওয়া আজকের দিনে যে সম্ভব নয় সেটা নিশ্চয়ই বোঝেন।’

‘তুমি আমাকে বিদ্রূপ করছ?’ শ্যামলালবাবুর গলায় যেন একটু অভিমানের সুর।

‘শুদ্ধ আমি কেন?’ ফেলুদা বলল, ‘গ্রামের সবাই করে। আপনি যা করছেন তাতে আপনার ত নয়ই, কারুরই লাভ বা মঙ্গল হচ্ছে না। আপনার নিজের কী হল সেটা ত দেখলেন। সড়কীর বদলে বন্দুকধারী একজন ভালো পাহারাদার থাকলে আর এ কান্ডটা হত না। বৈদ্যুতিক শক্তি-এর চেয়ে এ শক্তি কি কিছু কম হল? যে-যুগ চলে গেছে তাকে আর ফিরিয়ে আনা যায় না মজিকমশাই।’

আশ্চর্য. আমি ভেবেছিলাম ভদ্রলোক তেলেবেগুনে জ্বলে উঠবেন, কিন্তু সেটা হল না। ফেলুদার কথার উত্তরে একটি কথাও বললেন না তিনি, কেবল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে রইলেন।

‘মুখের চেহারা কী হয়েছে দেখেছেন?’

লালমোহনবাবু উত্তরপাশে বসে হাতে তাঁর দাড়ি কামানোর আয়নাটা নিয়ে তাতে নিজের মুখ দেখে মন্তব্যটা করলেন। ওর মুখের যা অবস্থা, আমাদের সকলেরই তাই।

‘গোসাইপুত্রের ওই একটা ডুবাক’, বললেন তুলসীবাবু। ‘এটার বিষয় আপনাদের আগে থেকেই ওয়ার্নিং দেওয়া উচিত ছিল।’

‘আপনি গোসাইপুত্র বলছেন, আমি বলব মল্লিক বাড়ির বাগ্যানে,’ বললেন লালমোহনবাবু। ‘ওইটেই হল মশার ডিপো।’

দুপুরের খাওয়া শেষ করে আমরা দোতলায় আমাদের ঘরে এসে বসেছি। পদলিখ এসে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে। ফেলুদা এভাবে গুম্ব মেরে গেছে কেন বুঝতে পারছি না। আমার বিশ্বাস জীবনবাবুর খুনটা ওর কাছে এতই অপ্রত্যাশিত যে ওর ক্যালকুলেশনে সব গুণ্ডগোল হয়ে গেছে। আর ডাকাতই যদি খুনটা করে থাকে, তাহলে তদন্তের মজাটা কোথায়? ডাকাত ধরার রাস্তা ত পদলিখের ঢের বেশি ভালো জানা আছে; সেখানে একজন প্রাইভেট গোয়েন্দা আর কী করতে পারে?

দারোগা সুধাকর প্রামাণিক ইতিমধ্যে ফেলুদার সঙ্গে এসে কথা বলে গেছেন। তিনি ফেলুদার নাম শুনেননি, তবে ফেলুদার উপর খুব একটা ভিত্তি ভাব আছে বলে মনে হল না। বিশেষ করে জীবনবাবুর লাশ লোপাট হয়ে যাওয়াতে তিনি রীতিমতো বিরক্ত।

‘আপনারা’ যারা শখের ডিটেকটিভ,’ বললেন সুধাকর দারোগা। ‘তাদের দেখছি কাজের মধ্যে সিসটেমের কোনো বলাই নেই। আরেকজন দেখছি আপনার মতো গণেশ দত্তগুপ্ত—তার সঙ্গে একটা কেসে ঠোকাঠুকি লাগে। যেখানে দরকার অ্যাকশনের, সেখানে চোখ কুঁচকে বসে ভাবছে। কী যে ভাবছে তা মা গঙ্গাই জানে। এবার যেখানে কাজ করছে, তার পেছনে কোনো চিন্তা নেই। লাশটা যখন দেখলেন পড়ে আছে, আর সেটাকে ছেড়ে যদি যেতেই হয় ত একটা লোককে পাহারায় বসিয়ে যেতে পারলেন না? এখন আমাদের ওই পেছনের পুকুরের জলে জাল ফেলতে হবে। আর তাতে যদি বাঁড়ি না ওঠে ত ভেবে দেখুন—এই গাঁয়ে এগারটা পুকুর, তার মধ্যে একটাকে দীর্ঘি বলা চলে।

আর তাতেও যদি না হয় তাহলে... এ সবই কিন্তু আপনার নেগালিভেন্সের জন্য।’

ফেলুদা পুরো ঝালটা হজম করে উল্টে একটা বেয়াড়া প্রশ্ন করে সুধাকর দারোগাকে আরো উস্কে দিল।

‘আপনি প্রেতাশ্বায় বিশ্বাস করেন?’

দারোগা কিছুক্ষণ অবাক হয়ে ফেলুদার দিকে চেয়ে থেকে যথেষ্ট নেড়ে বললেন, ‘আপনার সিরিয়াস বলে খ্যাতি আছে শুনোছিলাম, এখন দেখছি সেটাও ভুল।’

ফেলুদা বলল, ‘কথাটা জিগোস করলাম কারণ আপনারা যদি খুনী ধরতে না পারেন তাহলে আমাদের মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যের শরণাপন্ন হতে হবে। তিনি প্রেতাশ্বা নামাতে পারেন। আমার মনে হচ্ছে জীবনলালের আশ্বাই জীবনলালের খুনীর সঠিক সন্ধান দিতে পারেন।’

‘আপনি নিজে তাহলে হোপ্লেস ফীল করছেন বলুন।’

‘খুনের তদন্ত আমার সাধের বাইরে সেটা স্বীকার করছি,’ বলল ফেলুদা, ‘কিন্তু ডাকাতির হাতে হাতকড়া পরাতে পারব বলে আমার বিশ্বাস আছে।’

সুধাকরবাবু যে ফেলুদার উপর আস্থা কত কম সেটা তাঁর পরের কথা থেকেই বুঝতে পারলাম।

‘আপনি ডেড বডি আর জ্যান্ট বডি তফাৎ করতে পারেন আশী করি? গলায় ফাঁস দিয়ে টেন মারলে মৃত্যুর কী কী পরিবর্তন হয় সেটা জানা আছে আপনার?’

ফেলুদা ঠান্ডা ভাবেই উত্তরটা দিল।

‘সুধাকরবাবু, আমার যখন পুলিশে চাকরি নেবার কোনো বাসনা নেই, তখন আপনার প্রশ্নের জবাব দেওয়াটা আমার মজির ব্যাপার। পুলিশের উপর নির্ভর না করে যখন আমি প্রেতাশ্বার কথা বলছি তখন বুঝতেই পারছেন আমার তদন্তের রাস্তাটা একটু স্বতন্ত্র।’

‘ভোলানাথবাবু সম্পর্কে আপনার মনে কোনো সন্দেহের ভাব মেই?’

‘নিশ্চয়ই আছে। আমার সন্দেহ হয় আপনারা দিগ্‌বিদিক্‌ বিবেচনা না করেই ভদ্রলোকের হাতে হাতকড়া পরাবেন, কারণ তাঁর পূর্বপুরুষ যে জীবনবাবুর পূর্বপুরুষের দ্বারা লাঞ্চিত হয়েছিলেন সে খবর হয়তো আপনাদের কানে পৌঁছেছে। কিন্তু সেটা করলে আপনারা শারাস্থক ভুল করবেন।’

সুধাকর দারোগা সশব্দে হেসে মোড়া থেকে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ফেলুদার দিকে চেয়ে চুক্‌ চুক্‌ করে আঙ্গুণের শব্দ করে বললেন, ‘মুশকিল হচ্ছে কি জানেন, আপনারা বেশি ভেবে সহজ জিনিসটাকে জটিল করে ফেলেন।’

ফেসটা জলের মতো পরিষ্কার।'

'আপনাদের জন্ম ফেলা পুরুষের জলের মতো?'

ফেলদুদার খোঁচা অগ্রাহ্য করে দারোগা বলে চললেন, 'আপনি একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারতেন কেন ভোলানাথবাবুর কথা বলছি। ডাক্তারি এবং খুন দুটোর জন্যই সে দায়ী। এ ডাক্তারি ঘরের লোকের কাজ সে তো বোঝাই শক্ত। আসল ডাক্তার হলে সিদ্দুক ভাঙত—চারি দিগে খুলত না। ভোলানাথ টাকা নিয়ে পালাচ্ছিল, পিছনের বাগান দিয়ে, খুন করবার কোনো অভিপ্রায় ছিল না তার। জীবনবাবু ঘুম ভেঙে টের পেয়ে তাকে ধাওয়া করেন ; ভোলানাথ খুন করতে বাধ্য হয়। তারপর সন্দেহ যাতে না পড়ে তাই আপনাদের খবর দিতে আসে। ভোলানাথ বলেছে ডাক্তার তাকেও বেধে রেখেছিল, জীবনবাবু এসে তার বাঁধন খোলে। এ কথা যে সত্যি তার প্রমাণ কই? এর ত কোনো সাক্ষী নেই!'

'সিদ্দুকের টাকা তাহলে কোথায় গেল সিদ্দাকরবাবু?' ফেলদুদা গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাস করল।

'সে-টাকাও খুঁজতে হবে,' বললেন সিদ্দাকরবাবু। 'লাশ পেলে পর আমরা ভোলানাথবাবুকে জেরা করব। তখন সব সূরসূর করে বোঁরিয়ে পড়বে।'

আমার কিন্তু সিদ্দাকরবাবুর কথাগুলো বেশ মনে ধরল ; কিন্তু ফেলদুদা কেন আমল দিচ্ছে না? দারোগা যখন সিঁড়ি দিয়ে নামছে তখনই কেন সে বলতে গেল, 'আজ সম্ভব জীবনলালের আত্মা নামানো হবে মৃগাঙ্কবাবুর বাড়িতে। এলে ঠকবেন না!'

তুলসীবাবুর দেখলাম একমাত্র চিন্তা কালকের সংবর্ধনা হবে কিনা সেই নিয়ে। রহস্যের কিনারা না হলে, খুনীর হাতে হাতকড়া না পড়লে, নিশ্চয়ই হবে না, কারণ গ্রামের লোকের সংবর্ধনা সভায় বোগ দেবার উৎসাহই হবে না। লালমোহনবাবু অর্বাচ্য মেনেই নিয়েছেন যে মালা আর মানপত্র ফস্কে গেল, আর স্পীচটা মাঠে মারা গেল। হয়ত নিজেকে সাম্বনা দেবার জন্যই বললেন, 'আমরা মশাই রহস্য বেচে খাই ; বাস্তবিক একটা খাঁটি রহস্যের সামনে পড়লে সেইটেই আমাদের সবচেয়ে বড় পুরস্কার।'

মুখে এটা বলা সত্ত্বেও লক্ষ্য করছি উনি বার বার নিজের অজানতে বিড় বিড় করে স্পীচের লাইন বলছেন, আর বলেই নিজেকে সামলে নিচ্ছেন।

'মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য কেন বাড়িতে থাকেন বলতে পারেন?'

প্রশ্নটা এলো তুলসীবাবুর বাড়ির দরজার বাইরে থেকে।

'এই শব্দ হল,' বললেন তুলসীবাবু। 'সোম আর শব্দে এ উপদ্রব লেগেই আছে, আর রাস্তায় প্রথম বাড়ি বলে আমাদেরই এ ঝাঁক পোয়াতে

হয়।

ভুল্লোলক জানালা দিয়ে নিচের দিকে চেয়ে বললেন, 'আরো তিনটে বাড়ি পরে ডান দিকে।'

ফেলুদা বলল, 'আমরা আসছি বলে খবরটা পাঠিয়ে দিতে পারলে ভালো হত। আর বলবেন কিউয়ে দাঁড়াতে পারব না। আমাদের আত্মকে প্রাইয়-রিটি দিতে হবে।'

তুলসীবাবু বোধহয় এই প্রথম বুঝলেন যে ফেলুদা ব্যাপারটা সম্বন্ধে সত্যিই সিরিয়াস। তাঁর মুখের ভাব দেখে ফেলুদা বলল, 'আমার একার কাজ ফুরিয়ে গেছে তুলসীবাবু। এখন ভটচার্জি মশাইয়ের সাহায্য ছাড়া এগোতে পারব না।'

ফেলুদা অনেক সময়ই বলে যে মনের দরজা খোলা রাখা উচিত, বিশেষ করে আজকের দিনে; কারণ যোজ্জই প্রমাণ হচ্ছে যে এমন অনেক ঘটনা পৃথিবীতে ঘটে যার কারণ বৈজ্ঞানিকেরা জানে না, অথচ জানে না বলে সেটাকে উড়িয়েও দিতে পারছে না। এই যেমন সেদিন কাগজে বেরোল যে ইউরি গেলার বলে এক ইহুদী যুবক চোখের চাহনির জোরে পাঁচ হাত দূর থেকে বৈজ্ঞানিকের হাতে ধরা কাঁটা চামচ বোঁকিয়ে ফেলছে। এ ঘটনা চোখের সামনে দেখছে আরো একজন ডাকসাইটে বৈজ্ঞানিক, আর দেখে তারা না পারে কারণ বলতে, না পারে উড়িয়ে দিতে। মৃগাঙ্কবাবুর ক্ষমতাও কি এই ধরনের?

তুলসীবাবু বললেন, 'সাড়ে পাঁচটা বাজে; চলুন আমি আপনি একসঙ্গে গিয়ে ও'কে রিকোয়েস্টটা করি, তাহলে জোরটা বেশি হবে।'

ফেলুদা উঠে পড়ে বলল, 'তোরা বরং একটু বেড়িয়ে আর না।'

আমার নিজেরও এক ঘরে বেশিক্ষণ বসে থাকতে ভালো লাগছিল না, লালমোহনবাবুও বলছিলেন গোসাইপুরের শরৎকালের বিকেলের তুলনা নেই, তাই ফেলুদার বেরোনর সঙ্গে সঙ্গেই আমরাও দুজন বোরিং পড়লাম।

কদিন আগে যখন এসেছিলাম, তখন একরকম মনে হয়েছিল গ্রামটাকে ; আজ আমার মনে হচ্ছে আরেক রকম। তার কারণ মন বলছে এই সুন্দর গ্রামের কোনো একটা গোপন জায়গায় গলায়-ফাঁস-দিয়ে-মরা মানুষের লাশ লুপ্তিয়ে আছে। হঠাৎ যদি দেখি—

নাঃ—ওসব ভাবব না। তাহলে বেড়ানো মাটি হয়ে যাবে।

কিন্তু বাঁশ বনের মধ্যে দিয়ে এগোতে এগোতে আলো কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে সাহসটা আবার কমে গিয়েছিল। সেটাকে বাড়িয়ে দিল মূর্কাভিনেতা বেণীমাধব।

‘আরে, আমি যে আপনাদের বাড়িই যাচ্ছিলাম। বললাম না শত্ৰুরবার বিকেলে এসে অভিনয় দেখিয়ে যাব!’

‘কী করি বল ভাই,’ বললেন লালমোহনবাবু। ‘এমন একটা বিপর্যয় ঘটে যাবে সে কী জানতাম? এর পরে আর আঁকড়ি দেখার মূড থাকে? তুমিই বল।’

‘তা যা বলেছেন স্যার। তা আপনারা ক’দিন আছেন ত?’

‘হ্যাঁ, তা দিন তিনেক ত আছি।’

‘এ দিকে চল্লিশ কোথায়?’

‘কোনদিকে যাওয়া যায় তুমিই বল না।’

‘বাদুড়ে-কালী দেখেছেন স্যার? সপ্তদশ শতাব্দীর টেম্পল। এখনো কিছু হাতের কাজ রয়ে গেছে দেয়ালে। চলুন দেখিয়ে দিচ্ছি।’

আমি যে সকালে দেখেছি মন্দিরটা সেটা আর বললাম না। সত্যি বলতে কি, তখন যা মনের অবস্থা ছিল তাতে হাতের কাজটাজ চোখে পড়েনি।

মিনিট তিনেক যেতেই মন্দিরটায় পৌঁছে গেলাম। এখানে সকালেই আসা উচিত। সম্ভবত গা-টা একটু বেশি ছম্-ছম্ করে। পাশেই আবার একটা বটগাছ। তার একটা কুঁড়ি মন্দিরের চুড়োটাকে আঁকড়ে ধরে স্থলি ফাটতে দিয়েছে।

‘এইখেনটার বলি হত স্যার’, বটগাছের গুঁড়ির পাশে একটা জায়গা দেখিয়ে বলল বেণীমাধব।

‘বলি?’ লালমোহনবাবু কাঁপা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন।

‘নয়বলি, স্যার। গোসাইপুত্রের ডাকাত ওয়াল্ড ফেমাস নেন্দো ডাকাতির ইতিহাস পড়েননি? ওই নিয়মই ত আপনার একটা রহস্য-রোমাঞ্চের বই হয়ে যল্ল। ভেতরটা দেখবেন? টর্চ আছে?’

ভেতরটা এর মধ্যে অন্ধকার হয়ে গেছে।

‘ভেতর?’ ধরা গলায় বললেন লালমোহনবাবু। ‘টর্চ ত আনি নি ভাই। শূন্যিচি বাদুড়-টাদুড়...’

‘বাদুড়ের ত এখন ইতিহাস এক্সক্যুরশন স্যার। এইত সব চরতে বোঝিয়েছে। বাদুড় দেখতে চাইলে—’

‘না ভাই, চাই না। বরং না দেখাটাই বাঞ্ছনীয়।’

‘চলে আসুন স্যার। মার্চিস জেবলোঁছ। একটা বিড়ি ধরালুম স্যার। কিছু মাইন্ড করবেন না ত?’

‘নো নো ভাই, মাইন্ড কী, তুমি পাঁচটা বিড়ি একসঙ্গে ধরাও না।’

বেণীমাধব বিড়ি ধরিয়ে জ্বলন্ত দেশলাইটা মন্দিরের দরজার জায়গায় ধরল, আর অর্মান এক লাফে আন্নার হুপিপুন্ডটা গলার কাছে চলে এল। লালমোহনবাবু চারবার ‘জী-জী-জী-জী’ বলে থেমে গেলেন।

জীবনবাবুর মৃতদেহ! মন্দিরের ভিতরে ধর্মের আড়ালে নীল পাঞ্জাবী আর সাদা পায়জামার খানিকটা উঁকি মারছে। সকালে হাতে খড়ি ছিল, এখন নেই।

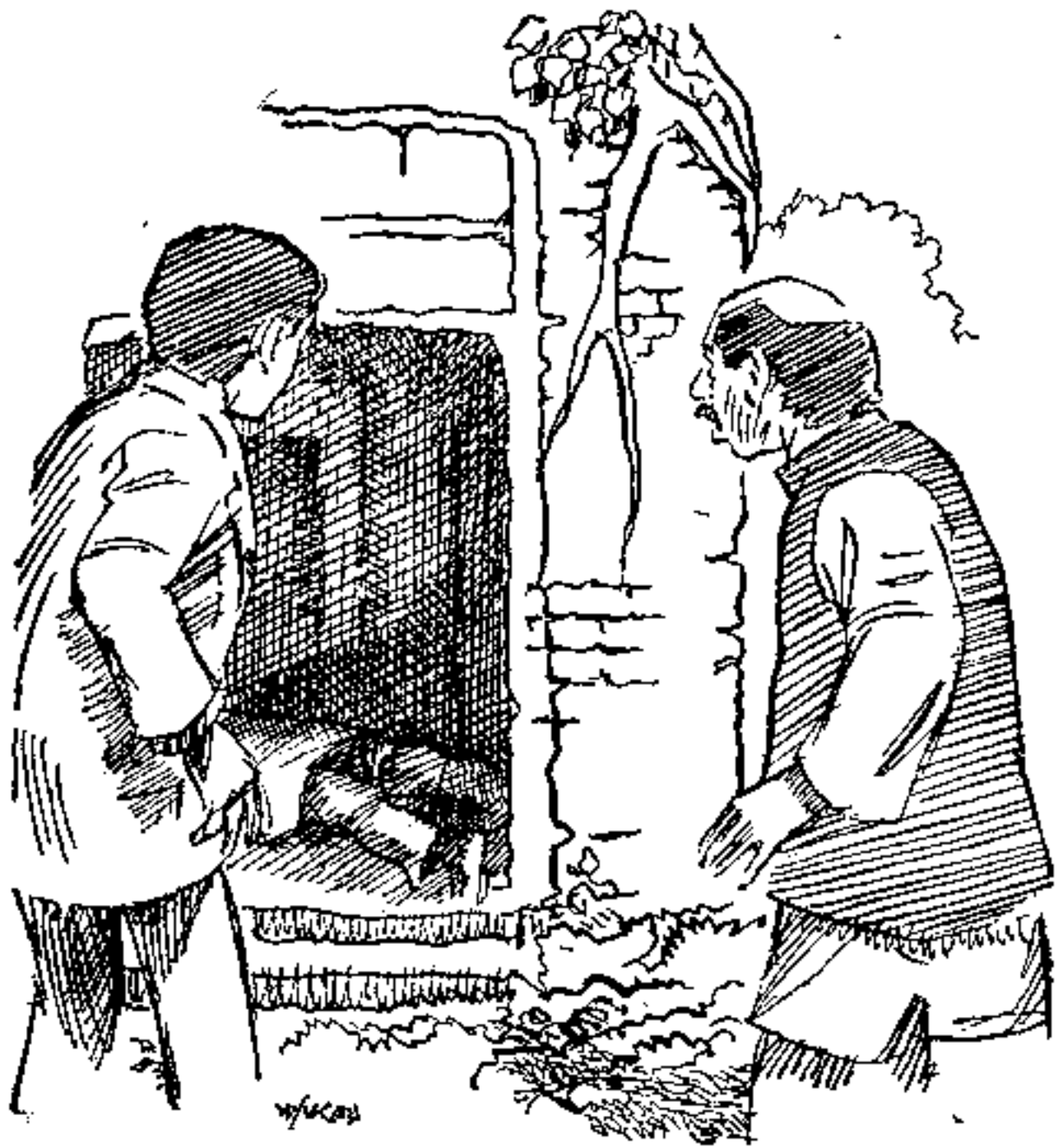
‘এই দেখুন, কে কাপড় ফেলে গেছে।’

বেণীমাধব দিবা এগিয়ে যাচ্ছিলেন, বোধহয় কাপড়গুলো উন্মার করে তার মালিককে ফেরত দিতে, লালমোহনবাবু তার সার্ভের কোনা খামচে ধরে বললেন, ‘ওটা ল-লাশ! পুশ-পুশ, পুশ, পুশিশের ব্যাপার!’

মুকুন্ডভিনেতা লাশ শূন্যেই মৃক মেরে গিয়েছিলেন—এইবার দেখলাম তার অভিনয়। অবাক থেকে শুরু করে এক ধাপে আতঙ্কে পৌঁছে তিনি দেখিয়ে দিলেন কথা না বলে কী করে পিটুটন দেওয়ার অভিনয় করতে হয়। আমরাও আর অপেক্ষা না করে এই বিভীষিকাময় পরিবেশ থেকে যত্নে জোরে-হেঁটে বাড়িমুখে রওনা দিলাম।

ফেলদা দেখলাম ফিরে এসেছে। বলল, ‘অমন ফ্যাকাশে মেরে গেছিস কেন? চটপট রেডি হয়ে নে। পনের মিনিটের মধ্যে আত্ম নামবে।’

লালমোহনবাবু ফেলদাকে দেখেই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বললেন, ‘একটা ইম্পরট্যান্ট ডিসকভারি করে এলুম। অধিশি একা নরু’দুজনে। জীবনবাবুর লাশ পড়ে রয়েছে বাদুড়ে কালীর মন্দিরে। পুন্ডলকে জানাবেন, না খুঁজতে দেবেন?’



আমি জানতাম সুধাকর দারোগাকে জালমোহনবাবুর মোটেই পছন্দ হয়নি, তাই খুঁজতে দেবেন। ফেলুদা বলল, 'মন্দিরের ভেতরে গেস্‌লেন?'

'নো স্যার। লশ ত হ্যান্ডল করা বারণ, তাই আর যাইনি। তবে বিয়ান্ড ডাউট জীবন মল্লিক।'

'ঠিক আছে। সুধাকরবাবু এসেছিলেন একটু আগে। বোধহয় ভট্টাচার্য মহাশয়ের ওখানে আসছেন। তখন খবরটা দিয়ে দিলেই হবে।'

দশ মিনিটের মধ্যে আমরা রওনা দিয়ে দিলাম। তুলসীবাবু বললেন যে একবার উকীলবাবুর বাড়ি থেকে চট করে ঘুরে আসতে হবে। কালকের অনুষ্ঠানটা যে ভেঙে যেতে পারে সেটা ওঁকে জানানো দরকার।

ঘানার পথে ফেলুদা বলল যে মৃগাক্ষবাবু নাকি জীবনলালের আত্মা নামা-
নোর ব্যাপারে আপত্তি দূরের কথা, রীতিমতো আগ্রহ দেখিয়েছেন। বাইরে
থেকে আরো জন তিনেক লোক এসেছেন, তাদের বাইরে বসিয়ে রেখে আগে
অমাদের কাজটা করে দেবেন।

মৃগাক্ষবাবুর ঘরে আজ তক্তপোষের বদলে রয়েছে একটা কাঠের টেবিল,
আর সেটাকে ঘিরে তিন আর কাঠে মেশানো পাঁচটা চেয়ার। এরই একটাতে
বসে আছেন মৃগাক্ষ ভট্টাচার্য। টেবিলের মাঝখানে রয়েছে একটা পিঁড়ি, আর
তার পাশেই একটা কাগজ আর পেনসিল। এ ছাড়া ঘরে রয়েছে দুটোর বদলে
একটা বোঁগা, আর দুটো মোড়। বোঁগাতে বসে আছে ভাগনে নিত্যানন্দ।

আমরা তিনজনে তিনটে চেয়ারে বসলাম, একটা খালি রইল তুলসীবাবুর
জন্য।

‘তুলসীচরণের জন্য অপেক্ষা করব কি?’ প্রশ্ন করলেন মৃগাক্ষবাবু।

‘পাঁচ মিনিট দেখা যেতে পারে,’ বলল ফেলুদা।

‘আমি জানতাম। সেদিন আপনাকে দেখেই উপলব্ধি হয়েছিল যে আমার
কমছে আবার আসতে হবে।’ ভদ্রলোকের গলাটা এই অশ্রুকার ঘরে গমগম
করছে। মৃগাক্ষবাবু বলে চললেন, ‘বিজ্ঞান অর্থ বিশেষ জ্ঞান। পরলোকগত
আত্মার সঙ্গে যোগস্থাপন হল এই বিশেষ জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। সূত্রাং যারা
প্রকৃত বৈজ্ঞানিক, তারা এই বিশেষ জ্ঞানকে হয়ে জ্ঞান করে না।’

জ্ঞান জ্ঞান করে এই ধ্যানধ্যাননি আর ভালো লাগছিল না। ভদ্রলোক
এবার আরম্ভ করলেই পারেন।

‘আপনারা সকলেই পরলোকগত জীবনলালকে প্রভাঙ্ক করেছেন, এবং তিনি
সদা মৃত। এই দুই কারণে আজকের অধিবেশনের চূড়ান্ত সাফল্য আমি আশা
করি। আত্মা এখনো নরলোক হতে পরলোকে উত্তীর্ণ হবার অবকাশ লাভ করেনি।
অনেক পার্থিব বন্ধন মৃত করে তবে আত্মার উত্তরণ। জীবনলালের আত্মা
এখনো আমাদের পরিপার্শ্বে বিদ্যমান। সে আমার আবাহনের অপেক্ষায় আছে।
সে জানে আমি তাকে ডাকলে পাব, আমি জানি তাকে ডাকলে সে আসবে।
জীবনলালের আত্মা শিকালজ্ঞ, অবিদ্যমান। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে তার অবাধ
গতি। আমার এই কক্ষে তার অবাধ গতি। আমার এই লেখনী হবে তারই
লেখনী। তারই জ্ঞান, তারই উপলব্ধি, তারই বিশ্বাস, ব্যস্ত হবে তারই ভাষায়
আমার এই লেখনীর সাহায্য।’

এবার ফেলুদার মুখ খুলল। এ অবস্থায় কুখা বলা ওর পক্ষেই সম্ভব,
কেননা আমার গলা শুকিয়ে গেছে, আর আমার বিশ্বাস লালমোহনবাবুরও।

‘আপনি কী লিখছেন সেটা জানার জন্য সকলেরই কৌতূহল হবে, অথচ

আমি ছাড়া আর সকলেই টেবিলের উত্তে দিকে বসেছে, লেখা পড়া সম্ভব নয়। আমি যদি সকলের সুবিধের জন্য পড়ে দিই তাতে আপনার আপত্তি আছে কি?’

‘কোনো আপত্তি নেই,’ বললেন মৃগাঙ্কবাবু, ‘আপনি স্বচ্ছন্দেই লেখা পড়ে শুনিয়ে দিতে পারেন। আপনার জিজ্ঞাসা ত একটাই, নয় কি?’

‘তিনটে—ডাকাতের পরিচয়, খুনীর পরিচয় এবং কখন কী ভাবে খুনটা হয়।’

‘উত্তম,’ বললেন মৃগাঙ্কবাবু।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেও তুলসীবাবু এলেন না দেখে মৃগাঙ্কবাবু কাজ আরম্ভ করে দেওয়া স্থির করলেন। মনে মনে বললাম—তুলসীবাবু এ জিনিস অনেক দেখেছেন, তাঁর পুরোটা না দেখলেও চলবে।

‘অনুগ্রহ করে আপনারা দিগের প্রত্যেকের হস্তস্বয় অঙ্গুলি প্রসারিত করে এই টেবিলের উপর স্থাপন করুন।’

কাঠের টেবিলে হাতগুলো রাখার সঙ্গে সঙ্গে যে একটা টক্ টক্ শব্দ শুরু হল সেটা আর কিছুই না, লালমোহনবাবুর কাঁপা অঙ্গুলি টেবিলের উপর তবলার বোল তুলে ফেলছে। ভদ্রলোক দাঁতে দাঁত চেপে হাত স্টেডি করলেন।

মৃগাঙ্কবাবুর চোখ বন্ধ, ঠোঁট নড়ছে। চারিদিক একেবারে নিস্তব্ধ বলেই বৃকলাম উনি ফিস্ ফিস্ করে একটা শ্লেথ আওড়াচ্ছেন।

এক মিনিট পরে সেটাও বন্ধ হয়ে গেল। এবারে যাকে ইংরিজিতে বলে ডেথলি সাইলেন্স। পিদিমের শিখা কাঁপছে, আর তার চার পাশে ঘুর ঘুর করছে তিনটে ফিড়িং। ঘরের চারিদিকের দেয়ালে চারটে মানুকের ছায়া থর থর করে কাঁপছে। আড়চোখে ফেলদুদার দিকে চেয়ে তার মনের অবস্থা কিছু বুঝতে পারলাম না। চোয়াল শক্ত, চোখের পাতা প্রায় পড়ছেই না, দৃষ্টি সটান মৃগাঙ্কবাবুর দিকে। মৃগাঙ্কবাবু নিজে যেন পাথরের মূর্তি। এর মধ্যে কখন যে পেনসিলটা তার হাতে চলে গেছে জার্নি না। সেটা এখন খাতার সাদা পাতার উপর ধরা, শিসের ডগাটা ঠেকে রয়েছে কাগজের সঙ্গে।

এবার মৃগাঙ্কবাবুর ঠোঁটে কাঁপুনি আরম্ভ হল। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। আমার পাশে আবার তবলার বোল শুরু হয়েছে, এখন আওয়াজটা রীতিমত ভৌতিক বলে মনে হচ্ছে। অনেকেই এ অবস্থার এতদূর হাত কাঁপতে পারে, যদিও আমার কাঁপছে শুরু বৃক।

‘জীবনলাল, জীবনলাল, জীবনলাল.....’

তিনবার পর পর অতি আস্তে উচ্চারণ হল নামটা। মৃগাঙ্কবাবুর ঠোঁটটা নড়ল কি না তাও ভালো করে বুঝতে পারলাম না। ‘এসেছেন? আপনি এসেছেন?’

প্রশ্ন এল আমাদের চমকে দিয়ে আমাদের পিছন থেকে। এইবারে বৃকলাম

নিত্যানন্দের ভূমিকাটো কষ্টে। মৃগাশ্কবাবু নিজে এই অবস্থায় কথা বলেন না।
হয়ত বলা সম্ভবই না। 'এসেছি।'

ফেল্দাদার গল্পে খাতায় লেখা হয়েছে, ফেল্দাদা সেটাই পড়ে বলেছে।

আমার স্রোথ মৃগাশ্কবাবুর হাতের দিকে গেল। পিছন থেকে প্রশ্ন এল,
'তুমি কেসময় আছ?'

কিছুই—পড়ে বলল ফেল্দাদা।

'কতগুলি প্রশ্ন তোমাকে করা হবে, সেগুলোর জবাব দিতে পারবে?
পেনসিল নড়ল।

'পারব'—পড়ে বলল ফেল্দাদা।

'সিন্দুক খুলে টাকা নিল কে?' 'আমি।'

'তোমাকে যে হত্যা করল, তাকে দেখেছিলে?' 'হ্যাঁ।'

'চিনেছিলে?' 'হ্যাঁ।'

'কে সে?' 'বাবা।'

কিন্তু কী ভাবে খুনটা করা হল সেটা আর জানা হল না, করেন প্রশ্নটা
হবার সঙ্গে সঙ্গে 'এতেই হবে' বলে ফেল্দাদা উঠে দাঁড়াল। তারপর আমার
দিকে ফিরে বলল, 'তাপসে, ওই লন্ঠনটা আন ত—দরজার বাইরে রাখা রয়েছে।
আলো বন্ধ কম।'

আমি ভাবাচ্যাকা, লন্ঠনটা এনে টেবিলের উপরে রাখলাম।

ফেল্দাদা মৃগাশ্কবাবুর সামনে থেকে কাগজটা তুলে নিল। তারপর
উত্তরগুলোর দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলে বলল, 'মৃগাশ্কবাবু, আমার
মনে হচ্ছে আপনার এই আত্মাটি এখনো ঠিক দিকালঙ্ঘ হয়ে উঠতে পারেনি,
কারণ প্রশ্নোত্তরে কতগুলো গোলমাল পাচ্ছি।'

মৃগাশ্কবাবু কটমট করে ফেল্দাদার দিকে চাইলেন, যেন এক চাহনিতে
ফেল্দাদাকে ভঙ্গ্য করবেন। ফেল্দাদা তাঁকে আগ্রহ করে বলে চলল, 'যেমন,
তাঁকে জিগোস করা হচ্ছে সিন্দুক খুলে টাকা নিল কে, উত্তর হচ্ছে—'আমি'।
কিন্তু সিন্দুক ত টাকা ছিল না মৃগাশ্কবাবু!'

ম্যাজিকের মতো মৃগাশ্কবাবুর মুখ থেকে ক্রোধের ভাবটা চলে গিয়ে সেখানে
দেখা দিল সংশয়। ফেল্দাদা বলল, 'টাকা ছিল না বলছি এই কারণে যে সিন্দুক
খুলেছিল জীবনলাল নয়, খুলেছিল প্রদোষ চন্দ্র মিত্র। অবিশ্যি জীবনবাবু
এই ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করেছিলেন। তিনিই মাঝরাতিরে দরজা খুলে
আমাকে ঢুকতে দেন, তিনিই বলে দেন যে তাঁর ধবার বালিশের তলায় থাকে
সিন্দুকের চাবি; ভোলানাথবাবু আর শামসুলবাবুকে বাঁধার ব্যাপারেও
অবিশ্যি তিনি আমাকে সাহায্য করেন। যাই হোক, সিন্দুক টাকা বদলে

সেটা ছিল সেটা হল—

ফেলুদা পকেট থেকে আরেকটা কাগজ বের করল। এটাও খাজার কাগজ, এটাতেও পেন্সিল দিয়ে লেখা।

‘এই কাগজটাই,’ বলল ফেলুদা, ‘শ্যামলালবাবুর কাছ থেকে চেয়ে আমি পাইনি। এটার প্রয়োজন হয়েছিল এই কারণেই যে মৃগাঙ্কবাবুর সততা সম্বন্ধে আমার মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়েছিল, আর সেটা হয়েছিল একেবারে প্রথম দিনের সাক্ষাতের পরেই। আমার সঙ্গে আলোচনার পরমুহূর্তেই তিনি ভান করলেন যে আমার নাম এবং পেশা তিনি অলৌকিক উপায়ে জেনে ফেলেছেন। আমলে এগুলো কিন্তু তাঁকে আগেই জানিয়ে রেখেছিলেন তুলসীবাবু। তাই নয়, তুলসীবাবু?’

তুলসীবাবু এর মধ্যে কখন যে অন্ধকারে ঘরে ঢুকে মোড়ায় বসেছেন তা দেখেইনি। ভুললোক ফেলুদার কথায় ভারি অপ্রস্তুত হয়ে আমতা আমতা করে বললেন, ‘মাকে আপনার মনে, ইয়ে, যদি একটু ভাবিতেন লাগে...’

ফেলুদা তাঁকে ধামিয়ে বলল, ‘দোষ আমি আপনাকে দিচ্ছি না তুলসীবাবু। আপনি ও আর নিজেকে মহৎ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন না। কিন্তু ইনি করেন। যাই হোক, এই ভাঙামীর গন্ধ পেয়েই আমি কাগজটা পেতে বন্ধ-পারিকর। আমার আশা ছিল শ্যামলালবাবু সম্পর্কে কয়েকটা খট্কার উত্তর আমি এই কাগজে পাব।’

পিঁদিমের আলোতেও বুঝতে পারলাম মৃগাঙ্কবাবুর কপাল ঘেমে গেছে। ফেলুদা কাগজটা আলোয় ধরে বলল, ‘দুর্লভ মঞ্জিকের আশা এই কাগজে তাঁর ছেলের কিছু প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নগুলো মনে করা হয়েছিল, তাই এতে লেখা নেই; কিন্তু উত্তরগুলো থেকে প্রশ্নগুলো অনুমান করা যায়। আমি উত্তরের পাশে পাশে সেগুলো লিখেছি, এবং সেই ভাবেই পড়ে শোনাচ্ছি; আমার ভুল হলে সংশোধন করে দেবেন মৃগাঙ্কবাবু!’

মৃগাঙ্কবাবুর দ্রুত নিশ্বাসে প্রদীপের শিখা কেঁপে কেঁপে উঠছে। ফেলুদা পড়া আরম্ভ করল—

‘এক নম্বর প্রশ্ন—আমার শত্রু কে? উত্তর—ঘরেই আছে।’

সে কি আমার মৃত্যু কামনা করে—না। তবে কী চায়?—চাঁকা। টাকা রক্ষার উপায় কি?—সিন্দূকে রেখে না। কোথায় রাখব?—মুঠোয় নিচে। কোন-খানে?—বাগানে। বাগানের কোথায়?—উত্তরে। উত্তরে কী আছে?—আম গাছের নিচে। কোন আম গাছ?—দয়ালের ফাটলের ধারে।’

ফেলুদা এবার হাতের কাগজটা টেবিলের উপর রেখে বলল, ‘শ্যামলালবাবুর পায়ের তলায় মাটি এবং গায়ে মশার কামড় দেখে মনে হয়েছিল তিনি কোনো

কারণে বাগানে গিয়ে সেখানে কিছুটা সময় কাটিয়েছেন। আজ জানি তিনি এই কাগজের—অর্থাৎ মৃগাঙ্কবাবুর—নির্দেশ অনুযায়ী সিন্দুক থেকে টাকার বাস্ত্র বার করে মাটিতে পুততে গিয়েছিলেন। টাকা লুকিয়ে রাখার এই প্রাচীন পন্থা শ্যামলালবাবুর মনোপুত্র হবে এটা মৃগাঙ্কবাবু বুঝেছিলেন। এই টাকার উপর মৃগাঙ্কবাবুর লোভ অনেক দিনের, কিন্তু বিশ্বস্ত ভোলানাথ যশ্দিন অজেন্ন তশ্দিন সিন্দুকের নাগাল পাওয়া অসম্ভব। প্রথমে চেষ্টা করেছিলেন ভোলানাথবাবুর উপর শ্যামলালের সন্দেহ ফেলে তাকে হটানোর। সেটা সফল হয়নি। কিন্তু সেই সময় আশ্চর্য সন্যোগ এসে যায়। শ্যামলালবাবু নিজেই মৃগাঙ্কবাবুকে ডেকে পাঠান আস্তা নামানোর জন্য। মৃগাঙ্কবাবু তাঁর আশ্চর্য বৃদ্ধি বলে এক চিলে দুই পাখি ধারেন; শ্যামলালের ঘরের লোককেই শ্যামলালের শত্রু করে দেন, এবং টাকার বাস্ত্র সিন্দুক থেকে বার করিয়ে বাগানে আনান। সেই বাস্ত্র কাল সন্ধ্যাবেলা—

একটা শব্দ শুনে পিছন ফেরে দেখে ভাগ্নে বেগু ছেড়ে দরজার দিকে একটা লাফ মেরেছে। কিন্তু ঘর থেকে বেরোন আর হল না কারণ দড়টো শক্ত হাত তাকে বাধা দিয়েছে। এবার হাতের মালিক ভাগ্নে সমেত ভিতরে ঢুকলেন। আরেম্বাস—এ যে সূখ্যকর দারোগা! দারোগা বললেন, ‘বাস্ত্রটা পেয়েছি মিস্টার মিস্তুর; একটা ট্রান্সেক্সর মধ্যে কাপড়ের নীচে রাখা ছিল। মনশী—দাও তা।’

একজন কনস্টেবল একটা স্টীলের বাস্ত্র নিয়ে ঘরে ঢুকে সেটাকে টেবিলের উপর রাখল।

‘এর ডাঙা ত ভেঙেই ফেলা হয়েছে দেখছি,’ বলল ফেলুদা।

বাস্ত্র খুলতে লন্ঠন আর পিদিমের আলোয় তাড়া তাড়া একশো টাকার নোট দেখেই বড়লাগল এত টাকা আমি একসঙ্গে কখনো দেখিনি।

‘কিন্তু খুন?’ হঠাৎ চীৎকার করে উঠলেন মৃগাঙ্কবাবু। ‘খুন করল কে? খুন ত আমি করিনি!’

‘খুন একজনই করেছে মৃগাঙ্কবাবু!’—ফেলুদার গলা যেন খাপখোলা তলোয়ার—‘এবং তারও নাম প্রদোষ চন্দ্র মিত্র। খুন হয়েছে আপনার ভণ্ডামী, আপনার শয়তানী, আপনার লোভ। এর কোনোটাই আর কোনোদিনও মাথা তুলতে পারবে না, কারণ সকলেই জানবে যে আপনি আজ অপূর্ব ক্ষমতাবলে একটি জীবন্ত ব্যক্তির আগ্রাকে পরলোক থেকে ডেকে এনেছেন আপনার এই ঘরে—আসুন, জীবনবাবু!’

এবার পিছন নয়, সামনের দরজা দিয়ে ঢুকলেন জীবনলাল মল্লিক। তাঁকে দেখেই মৃগাঙ্কবাবু যে কথাটা বলে আতঁনাদ করলেন, সেটা লালমোহনবাবুর

বিশ্বাস 'হা হতোহ্মি', কিন্তু আমি যেন শুনলাম 'হার! হাতে হাতকড়া!'

*

*

*

অবিশ্য হাতে হাতকড়া পড়েছিল ঠিকই। সুধাকরবাবু শুধু একটা অভিযোগ করলেন ফেলুদাকে—'মিছির্মিছি দুটো পুরুরে জাল ফেলালেন আমাদের দিয়ে!'

'কী বলছেন সুধাকরবাবু' বলল ফেলুদা, 'জীবনবাবু খুন হয়েছে এ ধারণা সকলের মনে বন্ধমূল না হলে মৃগাক্ষবাবুর ভাডামী হাতেনাতে ধরব কী করে?'

জীবনবাবু খুনের ব্যাপারটা শুধুই মৃগাক্ষবাবুকে সায়েশতা করার জন্য। একেবারে প্ল্যান করে ভাঁওতা। এদিকে আমি আর ফেলুদা, আর ওদিকে লালমোহনবাবু ও ভোলানাথবাবু চলে যাওয়া মাত্র উদ্ভলোক বাগান থেকে উঠে বাড়িতে ফিরে গিয়ে দোতলার পিছন দিকের একটা গুদোম ঘরে গা ঢাকা দেন। খাবার পথে ঠাকুমা দেখে ফেলোছিলেন, কিন্তু সেটা ফেলুদা ম্যানেজ করে। আজ সন্ধ্যায় তিনি আবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন মৃগাক্ষবাবুর বৈঠকের শেষে আত্মপ্রকাশ করবেন বলে। সেই সময় বাঁশ বনে দূর থেকে আমাদের দেখে বাদুড়ে কালীমন্দীরে ঢুকে মড়া সেজে পড়ে থাকতে হয়।

রাগে খাবার সময় তুলসীবাবু কাঁচুমাচু ভাব করে ফেলুদাকে বললেন, 'আপনি আমার উপর অসন্তুষ্ট হন নি ত?'

'অসন্তুষ্ট?' বলল ফেলুদা, 'আপনি আমাকে কতটা হেল্প করেছেন জানেন? লোকটা সেদিন আমার নাম নিয়ে হে'য়ালি না করলে ত ওর ওপর আমার সন্দেহই পড়ত না! আমার ত আপনাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।'

আজ জীবনবাবু আমাদের বাড়িতে যাচ্ছিলেন। বললেন, 'আমি বেরোবার আগে বাবাকে প্রণাম করে এলাম।'

'কী মনে হল?' জিগোস করল ফেলুদা।

'ভয়ঙ্কর বনে গেলো' বললেন জীবনবাবু। 'আমার মাথায় হাতু বুলিয়ে জিগোস করলেন ব্যবসা কেমন চলেছে।'

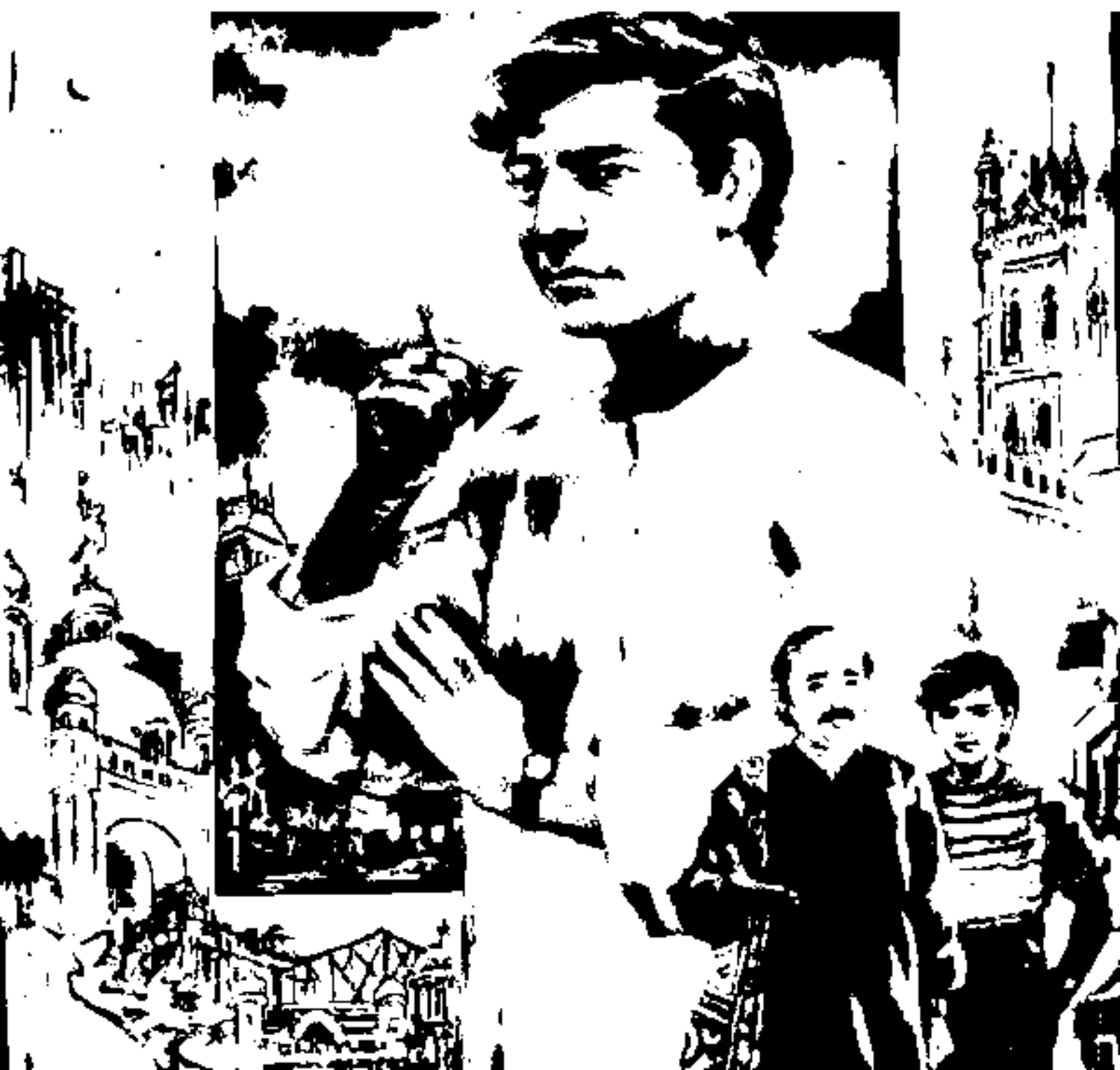
লালমোহনবাবু এতক্ষণ মাছের মড়ো চিবোচ্ছিলেন বলে কিছু বলেন নি। এবার তুলসীবাবুর দিকে ফিরে বললেন, 'তাহলে কলকর ইয়েটা—?'

'হচ্ছে বৈকি। এখন ত আর কোনো বাধা নেই।'

'ভেরি গুড। আমার ইয়েটাও রেডি আছে।'

গোরস্থানে সাবধান

সত্যজিৎ রায়



গোরস্থানে সাবধান

॥ ১ ॥

রহস্য-রোমঞ্চ ঔপন্যাসিক জটায়ু গুরুফে লালমোহন গাঙ্গুলীর লেখা গল্প থেকে বাস্তব ফিল্ম পরিচালক পুলক ঘোষালের তৈরি হ'ব কলকাতার প্যারাডাইজ সিনেমায় জুবিলি করার ঠিক তিন দিন পরে বিকেল বেলা উৎকট সারেগামা হর্ন বাজিয়ে একটা সেকেন্ড হ্যান্ড মার্ক টু অ্যান্ডসান্ডর গাড়ি আমাদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। আমরা জানতাম যে লালমোহনবাবু একটা গাড়ি কেনার ভাল করছেন, কিন্তু ঘটনাটা যে এত চট করে ঘটে থাকবে সেটা ভাবিনি। অবিশিষ্ট শুধু যে গাড়িই কেনা হয়েছে তা নয়; তার সঙ্গে একটি ড্রাইভারও বাধা হয়েছে, কারণ লালমোহনবাবু গাড়ি চালাতে জানেন না। এমনকী শেখার ইম্ফোর্টাও নেই। একথাটা তিনি এতবার আমাদের বলেছেন যে, শেখটায় একদিন খেলুঙ্গকে বাধা হয়ে জিজ্ঞেস করতে হ'ল, 'কেন মশাই, শিখবেন না কেন?' তাতে লালমোহনবাবু বললেন যে, বছর পাঁচেক আগে নাকি এক বন্ধুর গাড়িতে শিখতে আরম্ভ করেছিলেন। দু দিন শিখে খার্ড দিনে একটা চমৎকার গাড়ের প্রট মাথায় নিরে ফার্স্ট গিয়ার থেকে সেকেন্ড গিয়ারে যেতে গাড়িটা এমন হ্যাঁচকা মারলে যে স্লটের খেঁই কেমনাম হাওয়া। 'সে-আপনোস আমার আজও হয়েনি মশাই।'

সাদা শাটী আর খাকি প্যান্ট-সর; ড্রাইভার নেমে এসে দরজা খুলে নিতে লালমোহনবাবু একটা ছোট্ট লাফ দিয়ে রাস্তায় নামতে গিয়ে ধূতির কোঁচায় পা আটকে খানিকটা বেসামান হলেও তাঁর মুখ থেকে হাসিটা গেল না। ফেলুদা কিন্তু গভীর। তিনজনে ঘবে এসে বসার পর

সে মূখ ঝলল।

‘আপনার ওই বিটকেল হর্নটা পাশাটরে সাধারণ, মধ্য হর্ন না-
লাগানো পর্যন্ত রক্তানী সেন রোডে ও-গাড়ির প্রবেশ নিষেধ।’

জটায়ু জিঃ কটিলেন। ‘আমি জানতুম ব্যাপারটা একটু রিস্কি হয়ে
যাচ্ছে। যখন ডিহনট্রেট করলে না?—তখন লোভ সামলাতে পারলুম
না।—জাপানি, জানেন তো?’

‘কান-কাটানি হাঃ-জাপানি’, ফেলুদা। ‘আপনার উপর হিন্দি
ফিল্মের প্রভাব এতটা খটিক্তি পড়বে সেটা ভাবতে পারিনি। আর
রংটাও ইকুয়ালি পীড়াদায়ক। মাত্রাধি ফিল্ম-মার্কা।’

লালমোহনবাবু কাতরভাবে হাত জোড় করলেন। ‘দোহাই মিস্টার
মিস্ত্রি! হর্ন আমি কালই চেঞ্জ করছি, কিন্তু রংটা রাখতে দিন। গ্রিনটা
বড় সুদিং।’

ফেলুদা হাল হেডে দিয়ে চায়ের অর্ডার দিতে যাচ্ছিল,
লালমোহনবাবু বাধা দিয়ে বললেন, ‘ওটা এখন বাদ দিন; আগে চলুন
একবারটি চক্কর মেরে আসি। আপনাকে আর তপেশবাবুকে না-চক্করনো
অবধি আমার ঠিক স্যাটিসফ্যাকশন হচ্ছে না। বলুন কোথায় যাবেন।’

ফেলুদা আপত্তি করল না। একটু ভেবে বলল, ‘তোপ্সেকে একবার
চর্নকের সমাধিটা দেখিয়ে আনব ভাবছিলাম।’

‘চর্নক? জব চর্নক?’

‘না।’

‘তবে? চর্নক আরও আছে নাকি?’

‘আরও নিশ্চয়ই আছে, তবে কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা চর্নক
একজনই।’

‘তাই তো—মানে...’

‘তার নাম জব নয়, জোব। জব হল কাজ, চাকরি; আর জোব হল
নাম। যে ডুলটা আর পাঁচজনকে করে সেটা আপনি করবেন কেন?’

এখানে বলে রাখি ফেলুদার সেটেষ্ট নেশা হল পুরনো ফলকাতা।
ফ্যান্সি সেনে একটা খুনের তদন্ত করতে গিয়ে ও যখন জানল যে ফ্যান্সি
হচ্ছে আসলে ফাঁসি, আর এই অঞ্চলেই দূশো বছর আগে নন্দকুমারের
ফাঁসি হয়েছিল, তখন থেকেই নেশাটা ধরে। গত তিন মাসে ও এই

নিয়ে যে কত বই পড়েছে, খ্যাপ দেবেছে, ছবি দেবেছে তার ইয়ত্তা নেই। অবিশ্যি এই সুযোগে আমারও অনেক কিছু জ্ঞান; হয়ে বাচ্ছে, আর তার বেশির ভাগটা হয়েছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে দুটো দুপুর কাটিয়ে।

ফেলুদা বলে দিল্লি-আগ্রার তুলনার কলকাতা খোঁকা-শহর ইলেক্ট্রোটিকে উড়িয়ে দেওয়া মোটেই ঠিক নয়। এখানে ভাঙ্কমহল নেই, কুতুবমিনার নেই, খোদপুর-জহঙ্গীরের মতো কেল্লা নেই, বিজ্ঞানমন্ডর গলি নেই—এ সবই ঠিক—কিন্তু ভেবে দ্যাখ ভোপসে—একটা সাহেব মশা মাছি সাপ ব্যাঙ কন-বাদাড়ে ভরা মাঠের এক প্রান্তে গন্ধার ধারে বসে ডাবল এখানে সে কুঠির পত্তন করবে, আর দেখতে দেখতে কন-বাদাড় সাফ হয়ে গিরে সেখানে দালাল উঠল, রাস্তা হল, রাস্তার ধারে লাইন করে গ্যাসের ব্যতি বসল, সেই রাস্তায় ঘোড়া ছুটল, পাখি ছুটল, আর একশো বছর যেতে না যেতে গড়ে উঠল এমন একটা শহর যার নাম হয়ে গেল সিটি অফ প্যালেসেস। এখন সে শহরের কী ছিরি হয়েছে সেটা কথা নয়; আমি বলছি ইতিহাসের কথা। শহরের রাস্তার নাম পালাটে এরা সেই ইতিহাস মুখে ফেলাতে চাইছে—কিন্তু সেটা কি উচিত? বা সেটা কি সম্ভব? অবিশ্যি সাহেবরা তাদের সুবিধের জন্যই এত সব করেছিল, কিন্তু যদি না করত, তাহলে কেলু মিডির এখন কী করত ভেবে দ্যাখ। ছবিটা একবার কল্পনা করে দ্যাখ—তোর ফেলুদা—প্রদোষচন্দ্র মিত্র, প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর—খাড়া গুঁজে কলম পিঁছে কেন্দ্র জমিদারি সেরেজায়, যেখানে ফিংগার প্রিন্ট বসলে বুঝবে টিপসই।’

বিবিডি বাগ—যার নাম ছিল ডালহৌসি কোয়ার—যে ডালহৌসি আমাদের দেশে লাটসাহেব হয়ে এসে গঙ্গাপু রাজ্য গিলেছে, আর সেই সঙ্গে প্রথম রেলগাড়ি আর প্রথম টেলিগ্রাফ চালু করেছে—সেই বিবিডি বাগে দুশো বছরের পুরনো সেন্ট জর্জস্ চার্চের কম্পাউন্ডে কলকাতার প্রথম ইন্টার বাড়ি জোব চার্নকের সমাধি নেখে লালমোহনবাবু যদিও বলছেন ‘প্রিসিং’, আমার কিন্তু মনে হল সেটা আকাশে মেঘের কনখটা আর সেই সঙ্গে একটা গুরু-গভীর গর্ভনের জন্ম। সমাধির পারে একটা মার্বেলের কলকের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে

থেকে ভদ্রকোণ বললেন, 'এ তো দেখছি জোবও নয় মশাই - জোবাস্ ব্যাপার কী বলুন তো?'

'জোবুস হল জোবের ল্যাটিন সংস্করণ', বলল ফেলুদা। 'পুরো কথটা এই ল্যাটিনে সেটা বুঝতে পারছেন না?'

'ল্যাটিন-মার্কিন জানি না মশাই; ইংলিজি নয় এটা বুঝতেই পারছি। নামের উপর ডি ও-এম লেখা কেন?'

'ডি ও-এম হচ্ছে ডমিনুস অমনিউম ম্যাক্সিমেল। অর্থাৎ ঈশ্বর সকলের কর্তা। আর তার নীচে যে কথাগুলো রয়েছে তার একটার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করি। Marmorel মর্মর-সৌধ জানেন তো? সেই মর্মর আর এই মারমোরে একই জিনিস—মার্বেল। আর আরও মজা হচ্ছে এই যে, মর্মর কথাটা সংস্কৃত নয়, ফারসি। অঞ্চ সৌধ হল সংস্কৃত। এইভাবে সংস্কৃত-ফারসি সংস্কৃত-আরবি আমরা মিলি জোড়া লাগিয়ে চলিয়ে গিই। যেমন, শলাপরামর্শ। শলা হল সলাহ—অর্থাৎ পরামর্শ, ফারসি কথা: পরামর্শ সংস্কৃত। বা কাগজপত্র—কাগজ আরবি, পত্র সংস্কৃত। তারপর আবার—'

ফেলুদার লেকচার শেষ হল না, কারণ কথা নেই বার্তা নেই উঠল এমন এক ধুলোর ঝড় (জটায়ু বললেন 'প্রলয়ঙ্কর') যেমন আমি আর কোনওদিন দেখিনি। আমরা পড়ি-কি-মরি করে সালমোহনবাবুর সবুজ আমবাসান্তরে গিয়ে উঠলাম, আর জ্বাইভার হরিপদবাবু গাড়ি ছুটিয়ে মিলেম এস্প্রানেডের নিকে। এই প্রথম দেখলাম ধুলোর জন্য অক্টোর—খুড়ি—শহিদ মিনারটা আর দেখা হচ্ছে না। হাওয়ার তেজ কত বুঝতে পারছি না। কারণ গাড়ির কাঁচ ভুলে দেওয়া হয়েছে। তবে এটা দেখলাম যে, চান্দুরওয়ালারা যে সরু লম্বা বেতের মোড়ার হাতো ষ্ট্যান্ডের উপর তাদের জিনিসপত্র রাখে, তারই একটা গড়ের মাঠের নিক থেকে শূন্য দিয়ে প্যাক খেতে খেতে উড়ে এসে আমাদের ঠিক সামনে একটা চলন্ত ভবল ডেকারের দোতলার আহড়ে পড়ে পরক্ষণেই আবার ছাড়া পেয়ে কার্জন পার্কের নিকে উড়ে গেল।

পার্ক স্ট্রিটের কাছাকাছি এসে দেখি টাম বন্ধ, কারণ একটা সেবদার গাছ ঝেঙে লাইনের উপর পড়েছে, ফেলুদার ইচ্ছে ছিল আমাদের পার্ক স্ট্রিটের পুরনো গোরস্থানটা দেখিয়ে নিয়ে যাবে, কিন্তু সেটা আর এই

ঝড়ের জন্য হল না। যদি যেতাম, তা হলে হয়তো একটা ঘটনা সেনের সামনে দেখতে পেতাম—যেটার বিষয় পরদিন সকালে কাগজে বেরোয়। চমিলে জুনের এই প্রলয়ধর ঝড়ে (উইল্ড ভেলস্টি ষ্ট্রান হাড্রেড 'আও হাউসাইন্ড কিলোমিটার্স পার আওয়ার') সাউথ পার্ক স্ট্রিট গোরস্থানে একটা গাছ ভেঙে পড়ে নরসিংনাথ বিশ্বাস নামে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোককে গুরুতরভাবে জখম করে। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অবশিষ্ট তিনি সন্ধ্যাবেলা এই আদিকালের গোরস্থানে ঝাঁকরছিলেন সে খবর কাগজে পেরেছি।

॥ ২ ॥

পরদিন সকাল আর দুপুরের অর্ধেকটা বাদসার উপর দিয়েই গেল। ফেলুদা কোথেকে জানি একটা ১৯৩২ সালের ক্যালকটি অ্যান্ড হাওড়ার মাপ জোগাড় করেছে; দুপুরে পিচুড়ি আর ডিম ভাজা খোরে পান মুখে পুরে একটা চারমিনার ধরিয়ে ও মাপটার ভাঁজ খুলল। সেটাকে মাটিতে বিছানোর জন্য টেবল চেয়ার সব ঠেলে দেয়ালের গায়ে লাগিয়ে দিয়ে মেঝের মাঝখানে ছ-ফুট বাই ছ-ফুট জায়গা করতে হল। মাপের উপর হামাগুড়ি দিয়ে আমরা কলকাতার রাস্তাঘাট দেখছি, ফেলুদা বলছে 'রজনী সেন খুঁজিস না, এ অঞ্চলটা তখন জঙ্গল,' এমন সময় জটাছু এলেন। আজ আর দৃষ্টি-পাঞ্জাবি নয়, গাঢ় নীল তেরিকটের প্যান্ট আর হলদে খুল শাট। 'ছিয়াত্তরটা গাছ পড়েছে কালকের ঝড়ে' ঢুকেই ঘোষণা করলেন ভদ্রলোক। 'আর আপনার কথা রেখেছি মশাই, এখন আর হর্ন শুনে হিন্দি ফিল্মের কথা মনে পড়বে না।'

আজ ভাড়া নেই, তাই চা খেয়ে বেরনো হল। ছিয়াত্তরটা গাছ পড়ার খবর কাগজে পড়ে বিশ্বাস হয়নি, কিন্তু পার্ক স্ট্রিট থেকে নিজের চোখে উনিশটা গাছ বা গাছের ডাল পড়ে থাকতে দেখলাম, তার মধ্যে সাদান এভিনিউতেই তিনটে। তাও তো এর মধ্যে শুভ ভাসপালা সরিয়ে ফেলা হয়েছে কে জানে।

গোরস্থানের গেটের সামনে যখন পৌঁছলাম (এখানে আসছি সেটা

কামান খিটের আশ (ফেলুনা আমাদের বেনে) তখন শুটামুর দিকে চেয়ে দেখি তাঁর স্বাভাবিক মূর্তি ভাবটা যেন একটু কম। ফেলুনা তাঁর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দিতে তত্নলোক বললেন, 'একবার এক সাহেবকে কবর দিতে দেখেছিলাম—ফটিওয়েনে—রাঁচিতে। কাঠের বাক্সটা গর্তে নামিয়ে যখন তার উপর চাবড়া চাবড়া মাটি কেলে না সে এক বীভৎস শব্দ মন্দাই।'

'সে শব্দ এখানে শোনার কোনও সম্ভাবনা নেই,' বলল ফেলুনা। 'এই পেরোয়ানে গও সোম্যশো বছরে কোনও দৃষ্টান্তকে সমাধিস্থ করা হয়নি।'

গেট দিয়ে ঢুকতেই ভাইনে দারোয়ানের ঘর। দিনের বেলা যে-কেউ এ পেরোয়ানে ঢুকতে পারে, তাই দারোয়ানের বোম্বয় বিশেষ কোনও কাজ নেই। 'তবে হ্যাঁ,' বলল ফেলুনা। 'একটা ব্যাপারে একটু নজর রাখতে হয়—যাতে সমাধির গা থেকে কেউ মার্বেলের ফলক খুলে না নেয়। ভালো ইটালিয়ান মার্বেল বাজারে বিক্রি করলে বেশ দু পয়সা আসে।—দারোয়ান!'

দারোয়ান ঘর থেকে বেরিয়ে এল। দেখে বলে দিতে হয় না সে বিহারের লোক; খৈনিটা মনে হয় শবেমাত্র পুরেছে মুখে।

'কাল এখানে একজন বাঙালিদাবু কখন হয়েছেন—মাথায় গাছ পড়ে?'

'হ্যাঁ বাবু।'

'সে জায়গাটা দেখা যায়?'

'উয়ো রাস্তাসে সিধা চলিয়ে যান—একদম এন্ড তক্। বাঁয়ে খুমপেই দেখতে পাবেন। অভিতক্ পড়া হয় হায় পেড়।'

আমরা তিনজন খাস-গজিয়ে-যাওয়া বাঁধানো রাস্তাটা দিয়ে এগিয়ে গেলাম। দু দিকে সমাধির সারি—তার এক একটা বারো-চোদ্দ হাত উঁচু। ডাইনে কিছু দূরে একটা সমাধি প্রায় তিনতলা বাড়ির সমান উঁচু। ফেলুনা বলল, ওটা খুব সম্ভবত পণ্ডিত উইলিয়াম জেন্স এর সমাধি, ওর চেয়ে উঁচু সমাধি নাকি কলকাতায় আর নেই।'

প্রত্যেকটা সমাধির গায়ে সাদা কিংবা কালো মার্বেলের ফলকে মৃতব্যক্তির নাম, জন্মের তারিখ, আর মৃত্যুর তারিখ, আর সেই সঙ্গে

আরও কিছু লেখা। কয়েকটা বড় ফলকে দেখলাম অল্প কথায় জীবনী পর্যন্ত লেখা রয়েছে। বেশির ভাগ সমাধিই চারকোনা থাকেব মতো, নীচে চওড়া থেকে উপরে সরু হয়ে উঠেছে। লালমোহনবাবু সেগুলোকে বললেন বোরখাপরা ভূত। কথাটা খুব খারাপ বললেননি, যদিও এ ভূতের নড়াচড়ার উপায় নেই। এ ভূত গ্রহরী ভূত; মাটির নীচে কফিনবন্দি হয়ে যিনি শুয়ে আছেন তাঁকেই যেন গার্ড করছেন এই ভূত। 'এই স্তম্ভগুলোর ইংরিজি নামটা জেনে রাখ তোপসে। একে বলে ওবেলিস্ক।' লালমোহনবাবু ব্যয় পাঁচেক কথাটা আউড়ে নিলেন। আমি বাঁ-দিক ডান-দিক চোখ ঘোরান্ধি আর ফলকের নামগুলো বিড়বিড় করছি - ওয়াকসন, ওয়টস, ওয়েলস, লারকিন্স, গিবন্স, ওল্ডহাম...। মাঝে মাঝে দেখছি পাশাপাশি একই নামের বেশ কয়েকটি সমাধি রয়েছে - বোঝা যাচ্ছে সবাই একই পরিবারের লোক। সবচেয়ে আগের তারিখ যা এখন পর্যন্ত চোখে পড়েছে তা হল ২৮ শে জুলাই ১৭৭৯। তার মানে ফরাসি বিপ্লবেরও বারো বছর আগে।

রাস্তার শেষ মাথায় পৌঁছে বুঝতে পারলাম গোরস্থানটা কত বড়। পার্ক স্ট্রিটের ট্রাফিকের শব্দ এখানে শ্রীণ হয়ে এসেছে। ফেলুদা পরে বলেছিল, এখানে নাকি দু' হাজারের বেশি সমাধি আছে। লালমোহনবাবু পোরার সার্কুসার রোডের বিকটাস গোরস্থানের গায়ে-লাগা একটা ফ্ল্যাটবার্ডের দিকে দেখিয়ে বললেন, ওঁকে লাখ টাকা দিলেও নাকি উনি ওখানে থাকবেন না।

গাছ যেটা ভেঙেছে বলে কাগজে বেরিয়েছে, সেটা আসলে শাখা-প্রশাখা সমেত একটা প্রকাণ্ড আম গাছের ডাল। সেটা পড়েছে একটা সমাধির বেশ খানিকটা ধ্বংস করে। এ ছাড়াও আরও অনেক ডালপালা চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে।

আমরা সমাধিটার দিকে এগিয়ে গেলাম।

এটা অন্যগুলোর তুলনায় নোট, লালমোহনবাবুর কাঁধ অবধি আসবে বড় জেগর। বোঝা যায় এমনিতেই সেটার অবস্থা বেশ কাঁহিল ছিল। যেদিকে তালের ছা লগেনি সেদিকটাও ফাটল ধরে টোটির হয়ে আছে, পালতোলা খসে ইট বেরিয়ে আছে। ছা লাগার দরুন খেঁত পাথরের ফলকটাও ভেঙেছে; তার খানিকটা সমাধির গায়ে এখনও

সেখানে আছে, বাকিটা অট-দশ টুকরো হয়ে বাসের উপর পড়ে আছে।
 ৫টি হয়ে চারিদিকটা এমনিতেই জলকাদায় ভরা, কিন্তু এখানে যেন
 কাদাটা অন্য জায়গার চেয়ে একটু বেশি। 'আশ্চর্য', বললেন
 সানমোহনবাবু, 'গভ কথাটা কিন্তু এখনও সমাধির গায়ে লেগে আছে।'

'শুধু গভ নয়,' বলল ফেলুদা, 'তার নীচে সকলের অংশ দেখতে
 পাচ্ছেন নিশ্চয়ই।'

'ইয়েস। ওয়ান এইট-ফাইন্ড—তারপর ভাঙা। বোকাই যাচ্ছে এই
 গভ হল আপনার সেই ঈশ্বর সকলের কর্তা র গভ।'

'তাই কি?'

ফেলুদার প্রশ্ন শুনে তার দিকে চাইলাম। তার ভুরু কঁচকোনা।
 বলল, 'আপনি অন্য সমাধিগুলো বিশেষ মন দিয়ে দেখেননি দেখছি।
 দেখুন না ওই পাশেরটার দিকে।'

পাশেই আরেকটা বড় সমাধি রয়েছে। তার ফলকে লেখা—

To the Memory of

Capt. P. O'Reilly, R. M. 44th Regt.

who died 25th May, 1823 aged 38 years

'লক্ষ করুন, নামের নীচেই আছে মরণ-তারিখ। বেশির ভাগ
 কসাকেরই তাই। আর, গভ কথাটা অন্য কোনও ফলকে দেখলেন কি?'

ফেলুদা ঠিকই বলেছে। এই পথটুকু আসার মধ্যে আমি নিজেই
 অন্তত ত্রিশটা ফলাকের লেখা পড়েছি, কিন্তু কোনওটাতেই গভ
 দেখিনি।

'তার মানে বলছেন, গভ হল মৃতবাহির নাম?'

'গভ কাকুর নাম হয় বলে আমার মনে হয় না, যদিও ঈশ্বর বা
 ভগবান নামটা হিন্দুদের মধ্যে আছে। লক্ষ করুন, গভ-এর ডি-এর
 বা দিকে ইকি-খানেক ফাঁক দেখা যাচ্ছে—অর্থাৎ বাঁ-দিকে ওর পায়ে
 পায়ে কোনও অক্ষর ছিল না। কিন্তু ডি-এর ডান দিকটার ফাঁক আছে
 কিনা বোঝা যাচ্ছে না কারণ সে জায়গার পাথরটা ভেঙে পড়ে
 গেছে। আমার ধারণা এটা যার কবর তার পদটির প্রথম তিনটে অক্ষর
 হল ডি ও ডি; যেমন গুড্রি বা গভার্ড।'

'সে তো পাথরের টুকরোগুলো ভাঙে করে পাশাপাশি—'



লালমোহনবাবু কথাটা বলতে বলতে ভাঙা ডালপালার উপর দিয়ে সমাধিটার দিকে এগিয়ে তার ধারে পৌঁছোতেই হঠাৎ সড়াং করে খানিকটা নীচের দিকে নোমে গেলেন। গর্তে পা পড়লে যেমন হয় ঠিক তেমনি। কিন্তু ফেলুদা ঠিক সময়ে তার লম্বা হাত দুটি বাড়িয়ে তাঁকে ধপ্প করে ধরে টেনে তুলে শক্ত জমিতে দাঁড় করিয়ে দিল। ব্যাপারটা কী? ওখানে গর্ত হল কী করে? ‘কেমন যেন খটকা লাগছিল,’ বলল ফেলুদা, ‘ভাঙল আমগাছ, অগাচ আমপাতার সঙ্গে জম-কাঠাল কী করেছে তাই ভাবছিলাম।’

লালমোহনবাবু এমনিটেই গোরস্থানে এসে একটু শুষ্ক মেরে গিয়েছিলেন, তার উপর এই ব্যাপার। প্যাণ্টের ধুলো আড়তে আড়তে ‘এ একটু বাড়াবাড়ি মশাই’ বলে ভদ্রলোক একপাশে সরে গিয়ে আমাদের দিকে পেছন করে বোম্‌হয় নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করলেন।

‘তোপুসে—খুব সংবধানে ডালপালাগুলো সরা তো।’

আমি আর ফেলুদা গর্ত বাঁচিয়ে জায়গাটি পরিষ্কার করতেই বেশ বোঝা গেল কবরের পাশটায় হাত খানেক গভীর খালের মতো রয়েছে। সেটা আগেই ছিল, না সম্প্রতি কেউ খুঁড়ে করেছে সেটা ফেলুদা বুঝে থাকলেও, আমি বুঝলাম না।

ফেলুদা এবার মার্বেলের টুকরোগুলোর মন দিল। দু’জনে মিলে এগারোটা টুকরো জুড়ো করে মিনিট দশেক ঘাসের উপর ক্লিগ-স প্লাজল খেলে সেগুলোকে ঠিক ঠিক জায়গায় বসিয়ে দিলাম। তার ফলে ক্লিনিসটা এইরকম দাঁড়াল—

Sacred to the Memory of
THOMAS—WIN

Obl. 24th April—8, A.E.T. 180—

‘গডউইন’, বলল ফেলুদা, ‘টমাস গডউইনের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে। ও বি টি হল “ওবিটুস” অর্থাৎ মৃত্যু, আর এ ই টি হল “এইটাজিস” অর্থাৎ বয়স। এখন কথা হচ্ছে—’

‘ও মশাই!’

জটায়ু হঠাৎ চোঁচিয়ে উঠে আমাকে বেশ চমকে দিলেন। ঘুরে

সেখতেই ভদ্রলোক একটা ঠোঁকো চাপটা কালো জিনিস আমাদের দিকে তুলে ধরে বললেন, 'সাইব্রিশ টাকায় দু ফরে জিনজনের ডিনার হবে কি?'

'কী পেলেন ওটা?'

আমরা দু জনেই বেশ আগ্রহের সঙ্গে এগিয়ে গেলাম।

সালমোহনবাবুর বাঁ হাতে একটা কালো মানিব্যাগ, আর ডান হাতে ডিনারে দশ, একটা পাঁচ, আর একটা দু টাকার নোট। টাকা যার ব্যাগ দুটোরই অবস্থা বেশ শোচনীয়। ভদ্রলোকের ডায়া কেটে গিয়ে এখন একটা বেশ মারদিস্ ভাব; বেশ বুঝতে পারছেন যে, ফেলুদার জন্য একটা ভাল ক্ল জোগাড় করে দিয়েছেন।

ফেলুদা ব্যাগটা খুলে খাপগুলোর ভিতর যা ছিল সব বার করল। চার রকম জিনিস বেরোল খাপ থেকে। এক নম্বর—এক গোছা ভিকিটিং কার্ড, যাতে ইংরিজিতে লেখা এন এম বিশ্বাস। ঠিকানা টেলিফোন নেই। ফেলুদা বলল, 'দেখেছেন খবরের কাগজের কাগজ— নরেন্দ্রমোহনকে নরেন্দ্রনাথ করে দিয়েছে।'

দুই নম্বর হচ্ছে দুটো খবরের কাগজের কাটিং। একটাতে এই সাত্ত্ব পাৰ্ক স্ট্রিটে গোরস্থান প্রথম যখন খুলল তার খবর, আর আরেকটাতে আজকাল থাকে শহিদ মিনার বসি, সেই অকটারলোনি মনুমেন্ট তৈরি হবার খবর। তার মানে দুটো কাগজের টুকরেই দেড়শো-দুশো বছরের পুরনো। 'বিশ্বাস মশাই এত প্রাচীন কাগজের কাটিং কোথেকে জোগাড় করলেন জানতে ভারী কৌতূহল হচ্ছে—' মন্তব্য করল ফেলুদা।

তিন নম্বর হচ্ছে পাৰ্ক স্ট্রিটের অক্সফোর্ড বুক কোম্পানির একটা বাবো টাকা পঞ্চাশ পয়সার ক্যাশমেমো; আর চার হল এক টুকরো সাদা কাগজ, যাতে ডট পেনে ইংরিজিতে কয়েকটা পাইন লেখা। লেখার মাধ্যমুৎ বুঝলাম না, যদিও ভিক্টোরিয়া নামটা পড়তে পেরেছিলাম।

'অকটারলোনি মনুমেন্ট নিয়ে যে একটা লেখা দেখলুম সেদিন কাগজে', হঠাৎ বলে উঠলেন সালমোহনবাবু, 'আর যদুর মনে পড়ছে লেখকের পদবি ছিল বিশ্বাস। হ্যাঁ—বিশ্বাস। কারেস্ত।'

'কোন কাগজ?' ফেলুদা জিজ্ঞাস করল।

‘হয় “লেখনী” না হয় “বিচিত্রপত্র”। ঠিক মনে পড়ছে না। আফ্রি বাড়ি গিয়ে চেক্ করব।’

জটায়ুর স্বরূপশক্তি তেমন নির্ভরযোগ্য নয় বলেই বোধ হয় ফেলুদা এ ব্যাপারে আর কিছু না বলে সাদা কাগজের লেখাটা তার নিজের নেতিবুকে রূপি করে নিয়ে আসল কাগজ আর অন্য জিনিষগুলো মানিব্যাগে ভরে সেটা পকেটে নিয়ে নিল। তারপর মিনিট পাঁচেক ধরে কবরের আশপাশটা ভাল করে দেখে আরও দুটো জিনিস পেয়ে সেগুলোও পকেটে পুরল। সে-দুটো হচ্ছে একটা ব্রাউন রঙের কোটের হেতাম আর একটা নেতিয়ে যাওয়া রোসের বই।—‘চল, দারোয়ানের সঙ্গে একবার কথা বলে বেরিয়ে পড়ি। আবার মেঘ করল।’

‘বাগটি কি ফেরত দেবেন?’ জিগোস করলেন লালমোহনবাবু।

‘অবিশ্যি। কোন হাসপাতালে আছে খোঁজ করে কাল একগার যাব।’

‘আর সে-লোক যদি মরে গিয়ে থাকে?’

‘সেই অনুমান করে তো আর তার প্রপার্তি আত্মসাৎ করা যায় না। সেটা নীতিবিরুদ্ধ।—আর সাইক্লিশ টাকায় দু-ফক্কে তিনজনের জা স্যান্ডউইচের বেশি কিছু হবে না, সুতরাং আপনি জিনারের আশা ত্যাগ করতে পারেন।’

আমরা আবার উলটোমুখে দূরে কবরের সারির মাঝখানের পথ দিয়ে ধোঁটের দিকে এগোতে লাগলাম। ফেলুদা গম্বীর। এরই ফাঁকে একটা চারমিনার ধরিয়ে নিয়েছে। এমনিতে ও সিগারেট অনেক কমিয়ে দিয়েছে। কিন্তু রহস্যের গন্ধ পেলে নিজের অজান্তেই মাঝে মাঝে সাদা কাঠি মুখে চলে যায়।

আরেক পথ যাবার পর সে হঠাৎ থামল কেন সেটা তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারিনি। তারপর তার চাহনি অনুসরণ করে একটা জিনিস দেখে আমার হাঁটার সঙ্গে সঙ্গে হার্টবিটটাও এক পলকের জন্য থেমে গেল।

একটা গম্বুজওয়ালা সমাধি—যার ফলকে গুত্বাক্তির নাম রয়েছে মিস মার্গারেট টেম্পলটন—তার ঠিক সামনে ঘাসে পড়ে থাকা একটা পুরনো ইটের উপর একটা সিকিখওয়া জলন্ত সিগারেট থেকে সফ ফিতের হাতা খোঁচা কুণ্ডলী পাকিয়ে উপরে উঠেছে। বৃষ্টি হবে

বলেই বোধ হয় বাতাসটা বন্ধ হয়েছে, না হলে ধোঁয়া দেখা যেত না।

ফেলুদা এগিয়ে গিয়ে দু ইঞ্চি লম্বা সিগারেটটা ভুলে নিয়ে মস্তব্য করল, 'গোল্ড স্ট্রোক।' জটায়ু বলল, 'বাড়ি চলুন।' আমি বললাম, 'একবার খুঁজে দেখব লোকটা এখনও আছে কিনা?'

'সে যদি থাকত', বলল ফেলুদা, 'তাহলে সিগারেট হাতে নিয়েই থাকত; কিংবা হাত থেকে ফেলে পা দিয়ে মাড়িয়ে নিবিতে দিত। আশখাওয়া অবস্থায় এভাবে ফেলে যেত না। সে লোক পালিয়েছে, এবং বেশ ব্যস্তভাবেই পালিয়েছে।'

দারোয়ান ঘরে ছিল না। মিনিট তিনেক অপেক্ষা করার পর সে পশ্চিম দিকের একটা ঘোপের পিছন থেকে বেরিয়ে ছেলতে দুলাতে এগিয়ে এসে বলল, 'আন্ডি এক চুহাকো খতম কর দিয়া।'

বুঝলাম, ওই ঘোপের পিছনে চুহুর সংকার সেবে তিনি কিরছেন, ফেলুদা কাকের কথায় চলে গেল।

'যার উপর গাছ পড়েছিল তাকে জখম অবস্থায় প্রথম দেখল কে?'

দারোয়ান বলল যে সেই দেখেছিল। গাছ পড়ার সময়টা সে গোরস্থানে ছিল না, তার নিজের একটা শার্ট উড়ে গিয়েছিল পার্ক স্ট্রিটে, সেটা উদ্ধার করতে গিয়েছিল। ফিরে এসে ব্যাপারটা দেখে। দারোয়ান ভদ্রলোকের মুখ চিন্তা, কারণ তিনি নাকি সম্ভ্রান্তি আরও কয়েকবার এসেছেন গোরস্থানে।

'আর কেউ এসেছিল কালকে?'

'মালুম নেহি বাবু। হাম বদ সৌড়কে গিয়া, উস টাইমমে তো আউর কোই নেহি থা।'

'এইসব সমাধির পিছনে লুকিয়ে থাকতে পারে তো?'

এটা দারোয়ান অস্বীকার করল না। আমারও মনে হচ্ছিল যে এই গোরস্থানের চেয়ে ভাল লুকোচুরির জায়গা বোধ হয় সারা কলকাতায় আর একটিও নেই।

নরেন বিশ্বাসের অবস্থা দেখে দারোয়ান রাস্তায় বেরিয়ে এসে এক পথচারী সাহেবকে খবরটা দেয়। বর্ণনা থেকে মনে হল সেট জেডিয়ার্গের ফদার-টাদার হতে পারে। তিনিই নাকি ট্যান্ডি ডাকিয়ে নরেন বিশ্বাসকে হাসপাতালে পাঠানোর বন্দোবস্ত করেন।

‘আজ একটু আগে কাউকে আসতে দেখেছিলে?’

‘অভি?’

‘হ্যাঁ?’

না, দারোয়ান কাউকে আসতে দেখেনি। সে গেটের কাছে ছিল না। সে গিয়েছিল চুহার লাক নিয়ে ওই ঘোপড়টির পিছনে। ওটা ফেলে দিয়েই ওর কান্ড শেষ হয়নি, কারণ একটু পিপাসার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

‘রাগে তুমি এখানে থাকো?’

‘হ্যাঁ বাবু। लेकिन रातको तो पहचानेका कोई जरूरत नैहि होता। डर के मारे कोई आताहि नैहि। पहले लोयार सारकुलार रोड साइडमे दि-ওয়ার टूटा था, लेकिन आजकाल रातको कोई नैहि आता समनटरिमे।’

‘তোনার নাম কী?’

‘বরমসেও।’

‘এই নাও।’

‘সালাম বাবু।’

দারোয়ানের হাতে দু টাকার নোটসি গুঁজে দেবার ফল অবিশ্যি আমরা পরে পেয়েছিলাম।

॥ ৩ ॥

‘গডউইন...? টমাস গডউইন...?’

সিধু জ্যাঠার কপালে হু-টা খাঁজ পড়ে গেল।

সিধু জ্যাঠাকে আমি বলি বিশ্বকোষ, ফেলুদা বলে শ্রুতিধর। দুটোই ঠিক। একবার যা পড়েন, একবার বা শোনেন—মনে ধরলে ভোলেন না। ফেলুদাকে মাঝে মাঝে ওর কাছে আসতেই হয়। যেমন আজকে। ভোরে উঠে হাটতে বেরোন সিধু জ্যাঠা লেকের ধারে। মাইল দু-এক হেঁটে বাড়ি ফিরে আসেন সাড়ে ছ-টার মধ্যে। খুঁটি হলেও বাদ নেই; ছাতা নিয়ে বেরোবেন। বাড়ি ফিরে সেই যে শুকনোপোষের উপর বসেন, এক স্নান-খাওয়া ছাড়া ওঠা নেই। সামনে একটা ডেক, তার উপর বই,

মাগাজিন, বকরের কাগজ। লেখেন না। চিঠিও না। খোঁজার হিসেবও না, কিন্তু না। খালি পড়ে না। টেলিফোন নেই। আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার দরকার হলে চাকর জনার্দনকে দিয়ে বলে পাঠান; দশ মিনিটে সে খবর পৌঁছে যায়। বিয়ে করেননি; বউ-এর কদলে বই নিয়ে ঘর করেন। বলেন, আমার সংসার, আমার স্ত্রী-পুত্র পরিবার। আমার ডাক্তার মাস্টার সিস্টার খাদ্যার ফাদার, সবই আমার বই। পুরনো কলকাতা সম্বন্ধে ফেলুদার উৎসাহের জন্য সিধু জ্যাঠাই বক্তকটা দায়ী। তবে সিধু জ্যাঠা শুধু কলকাতা না, সারা বিশ্বের ইতিহাস জানেন।

দুধ-ছাড়া চায়ে পর পর দুটো চুমুক দিয়ে সিধু জ্যাঠা গডউইন কথাটা আরও দু'বার আওড়ালেন। তারপর বললেন, 'গডউইন নামটা ফস্ করে বললে প্রথমটা শেলির স্বপ্নের কথাই মনে হয়, কিন্তু ভারতবর্ষে এসেছে এমন একটা গডউইনও ছিল বটে; কোন বছরে মারা গেছে বললে?'

'আঠারো শো আটাল।'

'আর জন্ম?'

'সত্তেরো শো আটালি।'

'হুঁ, তা হলে এই গডউইন হতে পারে বটে। আটচলিশেই বোধ হয়, কিংবা ঊনপঞ্চাশে, কালকটা রিভিউতে একটা লেখা বেরিয়েছিল। টমাসের মেরে। নাম শার্লি। না না—শার্লট। শার্লট গডউইন। তার বাপ সম্বন্ধে লিখেছিল। হুঁ, মনে পড়েছে।... ওরেব্বাস্! সে তো এক ডাঙ্কব কাহিনী হে কেবু!—অবিশ্যি শেষ জীবনের কথা লেখেনি শার্লট। আর সেটা আমি জানিও না; কিন্তু গোড়ায় ভারতবর্ষে এসে তার কীর্তিকলাপ—সে তো একেবারে গল্পের মতো। তুমি তো লখনৌ গেছ?'

ফেলুদা মাথা মেড়ে হ্যাঁ বলল। বাদশাহি আংটির ব্যাপারে প্রথম তার গোয়েন্দাগিরির তারাবাজি লখনৌতেই দেখিয়েছিল ফেলুদা।

'সাদত আলির কথা জান তো?'

'জানি।'

'সেই সাদত আলি তখন লখনৌ-এর নবাব। দিল্লির গির্দিম তখন

নিধু-নিধু, যত রোশনাই সব লখনৌ-এ। সাদত ইয়াং ব্যাসে কলকাতার
 ছিল, সাহেবদের সঙ্গে মিশে ইংরিজি ভাষাটা একটু ভাসাভাসা
 শিখেছিল, আর শিখেছিল ফোলা অলো সাহেবিয়ানা।
 আসাফ-উদ-দৌল্লা মারা যাবার পর ওয়জীর আলি হল নবাব। সাদত
 আলি তখন কালীতে। মন খারাপ, কারণ আশা ছিল আসাফের পর সেই
 পদেই বসবে। এদিকে ওয়জীর ছিল অকর্মার টেকি। ব্রিটিশরা তাকে
 বরদাস্ত করতে পারলে না; চার মাসে তার নবাবি দিলে বরবাদ করে।
 মনে রেখো। অযোধ্যায় তখন কোম্পানির প্রতিপত্তি খুব; নবাবরা
 কোম্পানির কথায় ওঠে বসে। ওয়জীরকে হটিয়ে তারা সাদতকে
 সিংহাসনে বসাল। সাদত খুশি হয়ে ব্রিটিশকে অর্বেক অযোধ্যা দিয়ে
 দিলে।

‘সে সময়ে লখনৌ-এর অলিতে-পলিতে সাহেব। নবাবের হৌজে
 সাহেব অফিসার, সাহেব গোলন্দাজ; তা ছাড়া সাহেব বাবসায়ী,
 সাহেব ডাক্তার, সাহেব পেষ্টার, সাহেব নাপিত, সাহেব ইকুল মাস্টার;
 আবার কেউ কেউ আছে যারা এসেছে শুধু টাকার লোভে; নবাবের
 নেক নজরে পড়ে দু পয়সা যদি কামাতে পারে। এই শেষ মনের মধ্যে
 পড়ে টমাস গডউইন। ইংলন্ডের ছোকরা— সাসের না স্যাকক না
 সারি কোথায় তার বাড়ি ঠিক মনে নেই—সে দেশে বসে নবাবির গল্প
 শুনে এসে হাজির হল লখনৌতে। সুপুরুষ চেহারা, কথাখারজা ভাল,
 রেসিডেন্ট চেরি সাহেবের মন ভিজিয়ে তার কদম থেকে সুপারিশপত্র
 নিয়ে গিয়ে হাজির হল নবাবের দরবারে। সাদত জিগোস করলে,
 তোমার গুণপনা কী। টমাস শুনেছে নবাব বিলিতি খানা পছন্দ করে—
 রাজার হাত ভাল ছিল ছোকরার—বললে আমি ভাল শেফ, তোমাকে
 রৌখে খাওয়াতে চাই। নবাব বললে খাওয়াও। বাস—গডউইন এমন
 রান্না রাঁধলে যে সাদত তক্ষুনি তাকে বাবুচিখানার বাহাল করে নিলে।
 তারপর থেকে নবাব যেখানে যায় সেখানেই মুসলমান বাবুচির পাশে
 পশে হয়ে টমাস গডউইন। লটসাহেব শহরে এলে সাদত তাকে
 ব্রেকফাস্ট ডাকে—সাহেব খুশি হলে সাদতের মঙ্গল—তরনা টমাস
 গডউইন। আর নতুন কোনও ডিশ পছন্দ হলেই আসে বকশিশ। নবাবি
 বকশিশ ভালো তো? দু-দশ টকা কি দু-চারটে মোহর ওঁজ দেওয়া

তো নয়—লখনৌ-এর নবাব! হাও আড়লেই পর্বত। বুঝে দেখো, গডউইনের পকেট কীভাবে ফুলে-ফোঁপে উঠল। আর তাই যদি না হবে তো সে বাবুর্চিখানার পড়ে থাকবে কেন? সে রকম লোকই সে নয়।

‘বেরিয়ে এসে নবাবের আওতা থেকে। চলে এসে আমাদের এই কলকাতায়! এসেই বিষে করলে ত্রেন ম্যান্ডক বলে এক মেমসাহেবকে—কোম্পানির ধৌদ্রের এক ক্যান্টেনের মেয়ে। তার তিন মাসের মধ্যে এক রোস্টেরান্ট খুললে খাস চৌরঙ্গীতে। তারপর যা হয় আর কী। সুদিন তো আর কারুর চিরটা কাল থাকে না। গডউইনের ছিল জুয়ের নেশা। লখনৌ থাকতে মুরগীর লড়াই আর তিতিরের লড়াইয়ে বাজি ফেলে যেমন কামিয়েছে তেমনি খুইয়েছে। কলকাতায় এসে সে রোগ আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।... এর বেশি আর তার মেঝে কিছু লেখেনি। বন্দুর মনে হয়, টমাস গডউইন মারা যাবার কয়েক মাস পরেই এ-লেখাটা বেরোয়। সেক্ষেত্রে তার নিজের মেয়ের পক্ষে তার বাপের মন্দ দিকটা কি আর খুব ফলাও করে লেখা চলে? অন্তত সে যুগে যেত না নিশ্চয়ই। বাই হোক, এশিয়াটিক সোসাইটিতে গিয়ে তুমি লেখাটা পড়ে দেখতে পারো। আমি যা বললাম তার চেয়ে ন্যাচারেলি আরও বেশি ডিটেল পাবে।’

আমার অবিশ্বাস মনে হল, সিধু জ্যাঠা পুরো লেখাটাই বাংলা করে বলে ফেলেছেন।

কেজুদা আর আমি দু জনেই টমাস গডউইনের এই আশ্চর্য কাহিনী শুনে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। আমাদের আগে সিধু জ্যাঠাই আবার মুখ ঝুললেন।

‘কিছু টমাস গডউইনের বিষয় হঠাৎ জিজ্ঞেস করছ কেন? কী ব্যাপার?’

কেজুদা বলল, ‘সেটা বলছি। তার আগে আর একটা জিনিস, জানার আছে। নরেন্দ্র বিশ্বাস বলে কারুর নাম শুনেছেন—যিনি পুরনো কলকাতা নিয়ে প্রবন্ধ-টবন্ধ লেখেন?’

‘কিসে লেখেন?’

‘তা জানি না।’

‘কোনও অখ্যাত কাগজে লিখলে সে লেখা আমার চোখে পড়বে

না। অজ্ঞানকাল আর ধরাবাঁধা বাগানের বাহিরে আর কিছু পড়ি না। কিন্তু এ প্রশ্নই বা কেন?’

ফেলুদা সংক্ষেপে কালকের ঘটনাটা বলে বলল, ‘গাছ পড়ে যদি একটা লোক প্রাণহীন হয়ে অজ্ঞান হয়, তাহলে তার মানিব্যাগটা দশ হাত দূরে ছিটকে পড়বে কেন, এইখানেই থটকা।’

‘হুম’...

সিধু জ্যাঠা একটু গম্ভীর থেকে বললেন, ‘কাল বড়ের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় নব্বুই মাইল। যদি ধরো যে ভদ্রলোকের মানিব্যাগ তার শার্ট বা পাঞ্জাবির বুকেপকেটে ছিল, তাহলে দৌড়ে পালাতে গিয়ে পকেট থেকে সে ব্যাগ ছিটকে পড়া কিছুই আশ্চর্য নয়। আর দৌড়ানোর অবস্থাতেই তার মাথায় গাছ পড়ে থাকতে পারে। তা হলে আর রহস্য কোথায়?’

‘ভদ্রলোক পড়েছিলেন গডউইনের সমাধির পাশে।’

‘তাতে কী এসে গেল?’

‘সেই সমাধির পাশে খালের মতো গর্ত। মনে হয় কেউ খোঁড়ার কাজ শুরু করেছিল।’

সিধু জ্যাঠার চোখ হানাবড়া।

‘বল কী হে। খোঁড় ডিগি? এ তো ভারী খোঁড় সংবাদ দিলে হে ভূমি। এ তো অবিদ্যম্য। টাটকা লাশ হলে খুঁড়ে খার করে শব ব্যবচ্ছেদের জন্য বিক্রি করে পরসে আসে জানি। কিন্তু দুশো বছরের পুরনো লাশের কয়েকটা হাড়গোড় ছাড়া আর কী পাওয়া যাবে বলো। তার না আছে প্রত্নতাত্ত্বিক ডাক্তার, না আছে রিসেল ড্যানু। খুঁড়েছে সে ব্যাপারে ভূমি শিঙর?’

‘পুরোপুরি নয়—কারণ বৃষ্টির জন্য কোদালের কোপের চিহ্ন মুছে গেছে—কিন্তু তবু...’

সিধু জ্যাঠা আরও একটু ভেবে মাথা নেড়ে বললেন, ‘না হে ফেলু, আমার মনে হচ্ছে তুমি বুঝে হাঁসের পেছনে ধাওয়া করছ। হাতে কোনও কেস-টেক নেই বুঝি? তাই কল্পনার একটা রহস্য খাড়া করছ—অ্যা?’

ফেলুদা তার একপেশে হাসিটা হেসে চুপ করে রইল। সিধু জ্যাঠা

বললেন, ‘গডউইনের বংশের কেউ যদি এখানে থাকত তা হলে না হয় তাদের জিগোস করে কিছু জানা যেত। কিন্তু সেও তো বোধহয় নেই। সব সময়েই পরিবারই তো আর বারওয়েল বা টাইটলার পরিবার নয়—বাদের কেউ না কেউ সেই ক্লাইভের আমল থেকে এই সেদিন অবধি ইন্ডিয়াতে কাটিয়ে গেছে।’

এইবার ফেলুদা তার এতকালের চাণা খবরটা দিয়ে দিল।

‘টমাস গডউইনের তিন পুরুষ পর অবধি তাদের কেউ না কেউ এসেছেই মারা গেছে সে খবর আমি জানি।’

‘সে কী?’ সিধু জ্যাঠা অবাক। আসলে আজই সকালে এখানে আসার আগে আমরা লোয়ার সার্কুলার রোডের গোরস্থানটা দেখে ফটা ধরে দেখে এসেছি। এটা পার্ক স্ট্রিট গোরস্থানের পরে তৈরি আর এখনও ব্যবহার হয়।

‘শার্লট গডউইনের সমাধি দেখেছি’, বলল ফেলুদা। ‘১৮৮৬ সালে সাতবছরি বছর বয়সে মারা যান।’

‘গডউইন পদবি দেখলে? তার মানে বিবাহ করেননি। আহা, বড় সুলেখিকা ছিলেন।’

‘শার্লটের পাশে তার বড় ভাই ডেভিডের সমাধি। মৃত্যু ১৮৭৪’—ফেলুদা পকেট থেকে তার খাঙটা বার করে নেট দেখে দেখে বলে চলেছে—‘ইনি ব্রিটিশপুয়ের কিড কোম্পানির হেড অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলেন। ডেভিডের পাশে তার ছেলে লেফটেন্যান্ট কর্নেল অ্যান্ড্রু গডউইন ও তার স্ত্রী এমা গডউইন। অ্যান্ড্রু মারা যান ১৮৮২-তে। অ্যান্ড্রু-এমার পাশে তাদের ছেলে চার্লস। ইনি ডাক্তার ছিলেন, মৃত্যু ১৯২০।’

‘সাবাস! ধনি তোমার অনুসন্ধিৎসা আর অধ্যবসায়।’ সিধু জ্যাঠা সত্যিই খুশি হয়েছেন। ‘এখন তোমার জ্ঞানতে হবে বর্তমানে এঁদের কেউ জীবিত কিনা এবং কলকাতায় আছেন কিনা। টেলিফোন ডিরেক্টরিতে গডউইন নাম পেলো?’

‘মাত্র একটি। ফোন করেছিলোম। এই পরিবারের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই।’

‘দেখো খোঁজ করে। হয়তো থাকতে পারে। অবিশ্যি তার হৃদিস কী

করতে পারে তা জানি না। পেন্সে, আর কিছু না হোক—শ্রেষ্ঠ ডিগিট-
এর ব্যাপারটা আমার কাছে ভুলেই মনে হয়—অন্ততঃ টমাস
গডউইনের মতো একটা জনারফুল চরিত্র সম্বন্ধে হয়তো আরও কিছু
তথ্য জোগাড় করতে পারো। শুভ কাক।’

॥ ৪ ॥

বাড়ি এসে দুপুর পর্যন্ত বৈধি ধরে তারপর ফেলুদাকে আর না
জিগোস করে পারলাম না।—

‘কাল যে নরেন বিশ্বাসের ব্যাং থেকে একটা সাদা কাগজ বেরোল,
তাতে কী লেখা ছিল?’

নরেন বিশ্বাসের খাতটা ফেলুদা বিকেলে ফেরত দিতে যাবে। সে
খবর নিয়ে জেনেছে যে, ভদ্রলোক পার্ক হসপিটালে আছেন।

ফেলুদা তার খাতটা খুলে আমার দিকে এগিয়ে দিল।

‘যদি এর মানে বার করতে পারিস তা হলে বুঝব নোবেল প্রাইজ
তোর হাতের মুঠোয়।’

খাতার ক্রল টানা পাতায় লেখা রয়েছে—

B/S 141 SNB for WG Victoria & P.C. (44?)

Re Victoria's letters try MN, OU, GAA, SJ, WN

আমি মনে মনে বললাম, নোবেল প্রাইজটা ফসকে গেল। তাও মুখে
বললাম, ‘ভদ্রলোক কুইন ভিক্টোরিয়া সম্বন্ধে ইন্টারেস্টেড বলে মনে
হচ্ছে। কিন্তু ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড পি সি টা কী ঠিক বুঝতে পারছি না।’

‘পি সি বোধ হয় প্রিন্স কমসর্ট; তার মানে ভিক্টোরিয়ার স্বামী প্রিন্স
অ্যালবার্ট।’

‘আর কিছুই বুঝতে পারছি না।’

‘কেন, কর মানে জন্য আর টাই মানে চেষ্টা বুঝাল না?’

ফেলুদার মেজাজ দেখে বুঝলাম সেও বিশেষ কিছু বোঝেনি। সিধু
জ্যোতির কথাটা যে আমারও মনে ধরেনি তা নয়। ফেলুদা সত্যিই
হয়তো যেখানে রহস্য নেই সেখানে জোর করে রহস্য ঢোকাচ্ছে। কিন্তু
তার পরেই মনে পড়ে যাচ্ছে কালকের সেই কলক সিগারেটটা, আর

সঙ্গে সঙ্গে পেটের ভিতরটা কেমন হেল খালি হয়ে যাচ্ছে। আমরা
আছি জেনে কে পানাল গোরহান থেকে? আর বাদলা দিনে সঙ্গে করে
সে সেখানে গিয়েছিলই বা কেন?

আগে থেকেই ঠিক ছিল যে চারটের সময় আমরা নরেন বিশ্বাসের
বাগ ফেরত দিতে যাব, আর লালমোহনবাবুই আমাদের এসে নিয়ে
যাবেন। টাইমমার্ক বাড়ির সামনে গাড়ি থামার শব্দ পেলাম।
তদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন হাতে একটা পত্রিকা নিয়ে। ‘কী বলেছিলুম
মশাই? এই দেখুন বিচিত্রপত্র, আর এই দেখুন নরেন বিশ্বাসের লেখা।
সঙ্গে একটা ইবিও আছে মনুমেন্টের, যদিও ছাপেনি ভাল।’

‘কিন্তু এও তো দেখছি নরেন্দ্রনাথ’ বলছে; নরেন্দ্রমোহন তো নয়। তা
হলে কি অন্য লোক নাকি?’

‘আমার মনে হয় ভিত্তিটিং কার্ডেই গুগগেল। বাজে প্রেসে
ছাপানো। আর তদ্রলোক হয়তো প্রফও দেখেননি। কিন্তু ব্যাগের মধ্যে
ওই কাটিং আর তারপর এই লেখা—ব্যাপারটা প্রফ বাকভালীই বলে
উড়িয়ে দেওয়া যায় কি?’

ফেলুদা লেখাটার চোখ বুজিয়ে পত্রিকাটা পাশের টেবিলের উপর
ফেলে দিয়ে বলল, ‘ভাষা মশা না, তবে নতুন কিছু নেই। এখন জানা
দরকার এই লোকই গাছ পড়ে জখম হওয়া নরেন বিশ্বাস কি না।’

পার্ক হাসপিটালের ডা. শিকদারকে বাবা বেশ ভাল করে চেনেন।
আমাদের বাড়িতেও এসেছেন দু-একবার, তাই ফেলুদার সঙ্গেও
আলাপ। ফেলুদা কার্ড পাঠানোর মিনিট পাঁচকের মধ্যে আমাদের
ডাক পড়ল।

‘কী ব্যাপার? কোনও নতুন কেস-টেস নাকি?’

ফেলুদা যেখানেই যে-কারণেই যাক না কেন, জেনা লোক থাকলে
তারে এ প্রশ্নটা সুনতেই হয়।

ও হেসে বলল, ‘আমি এসেছি এখানের এক পেশেন্টকে একটা
জিনিষ ফেরত দিতে।’

‘কোন পেশেন্ট?’

‘মিস্টার বিশ্বাস। নরেন বিশ্বাস। শ্রুত—’

‘সে তো চলে গেছে! এই ঘন্টা দু-এক আগে। তার ভাই এসেছিল

গাড়ি নিয়ে, নিয়ে গেছে।’

‘কিন্তু কাগজে যে লিখল—’

‘কী লিখেছে? সিরিয়াস বলে লিখেছে, তো? কাগজে ও রকম অনেক লেখে। আস্ত একটা গাছ মাথার পড়লে কি আর সে লোক বাঁচে? একটা ছোট ডাল, যাকে বলে প্রশাখা, তাই পড়েছে। জখমের চেয়ে শকটাই বেশি। ডান কবজিটায় চোট পেয়েছে, মাথায় কটা স্টিচ—ব্যস এই তো।’

‘আপনি কি বলতে পারেন ইনিই পুরনো কলকাতা নিয়ে—’

‘ইয়েস। ইনিই। একটা লোক সম্ভেবেলা গোরস্থানে ঘেরাঘুরি করছে, নাচারেলি কৌতূহল হয়। ভিক্সেস করতে কলসেন পুরনো কলকাতা নিয়ে চর্চা করছেন। তা আমি কলসুন ডাল সাইন বেছেছেন; নতুন কলকাতাকে যতটা দূরে সরিয়ে রাখা যায় ততই ভাল।’

‘জখমটা স্বাভাবিক বলেই মনে হল?’

‘অ্যাহি!... পথে আসুন বাবা। এতক্ষণে একটা গ্যোয়েন্দা মার্কা প্রস্তুত হয়েছে!’

ফেলুদা অপ্রস্তুত ভাবটা চাপতে পারল না।

‘মানে, উনি নিজেই বললেন যে গাছ পড়ে...?’

‘আরে মশাই, গাছটা যে পড়েছে তাতে তো আর ভুল নেই? অমর উমি সেখানেই ছিলেন। সন্দেহ করার কোনও কারণ আছে কি?’

‘উনি নিজে স্বাভাবিক বা সন্দেহজনক কিছু বলেননি তো?’

‘মোটাই না। বললেন, চোখের সামনে দেখলাম গাছটা ভাঙল—তার ডালপালা যে কতখানি হুড়িয়ে আছে সেটা তো আর আঁচ করা সম্ভব হয়নি। তবে হ্যাঁ—ইয়েস—জ্ঞান হবার পরে ‘উইল’ কথাটা দু-তিনবার উচ্চারণ করেছিলেন। এতে যদি কোনও রহস্য থাকে তবে জানি না। মনে তো হয় না, কারণ উইলের উল্লেখ ওই একবারই, আর করেননি।’

‘ভদ্রলোকের পুরো নামটা আপনার জানা আছে?’

‘কেন, কাগজেই তো বেরিয়েছিল। নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।’

‘আরেকটা প্রশ্ন—বিরক্ত করছি, কিছু মনে করবেন না—ওনার পোশাকটা মনে আছে?’

‘হিল্লোল’। শার্ট আর প্যান্ট। রংও মনে আছে—সবুজ শার্ট আর
বিস্তীর্ণের রঙের প্যান্ট। গ্যাকো না, ক্রিম ক্যাকার - হেঃ হেঃ!’

ফেলুদা ডা. শিকদারের কাছে নরেন বিশ্বাসের ঠিকানা নিয়ে
নির্দেশিল। আমরা নার্সিংহোম থেকে সটান চলে গোসাম নিউ
অলিপুরে। ভারী আমেলা নিউ অলিপুরে ঠিকানা খুঁজে বার করা,
কিন্তু কুটায়ুর ত্রিভার মশাইটি দেখলাম কলকাতার রাস্তাঘাট ভানই
চেন্ন। বাড়ি বার করতে তিন মিনিটের বেশি ঘুরতে হয়নি।

দোতলা বাড়ি, দেখে মনে হয় পানের থেকে বেশ বছরের মধ্যে
বয়স। গেটের সামনে রাস্তার উপর একটা কালো অ্যামবাসাডর
দাঁড়িয়ে আছে, আর গেটের গায়ে দুটো নাম—এন বিশ্বাস ও জি
বিশ্বাস। বেল টিপতে একজন চাকর এসে মরজা খুলে দিল।

‘নরেনবাবু আছেন কি?’ ফেলুদা প্রশ্ন করল।

‘তার তো অসুখ।’

‘দেখা করতে পারবেন না? একটু দরকার ছিল।’

‘কাকে চাই?’

প্রশ্নটা এল চাকরের পিছন দিক দিয়ে। একজন চক্লিশ-পঁয়তাল্লিশ
বছরের ভদ্রলোক এগিয়ে এসেছেন। ফরসা রং, চোখ সামান্য কটা,
দাড়ি-গোঁফ কামানো। পাজামার উপর কুপ শার্ট, তার উপর একটা
মটিকার চাদর জড়ানো। ফেলুদা বলল, ‘নরেন বিশ্বাস মশাই—এর একটা
জিনিস তাঁকে সেরত দিতে চাই। ঠাঁর মানিব্যাগ, পকেট থেকে পড়ে
গেসল পার্ক স্ট্রিট গোরস্থানে।’

‘তাই বুঝি? আশি ঠাঁর ভাই। আপনারা ভিতরে আসুন। দাদা
বিছানায়। এখনও ব্যান্ডেজ বাঁধা। কথা কলাছেন, তবে এ রকম
আম্বিডেন্ট...একটা বড় রকম ইয়ে তো।...’

দোতলায় যাবার সিঁড়ির পিছন দিকে একটা কেডরুম, তাতেই
নরেনবাবু শুয়ে আছেন। ভাই-এর চেয়ে রং প্রায় দু-পোঁচ কালো,
চোঁটের উপর বেশ একটা পুরু গোঁফ, আর মাথার ব্যান্ডেজটার নীচে
যে চাক আছে সেটা বলে দিতে হয় না।

বাঁ হাতে ধরা স্টেটসম্যান কাগজটা নারিয়ে ভদ্রলোক ঘাড় হেঁট
করে আমাদের নমস্কার জানালেন। ডান কবজিতে ব্যান্ডেজ, তাই হাত

জোড় করে নমস্কারে অসুবিধা আছে। ভাইটি আমাদের ঘরে ঢুকিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। সুনন্দাম চাকরকে হাঁক দিয়ে আরও দুটো চেয়ারের কথা বলে দিলেন। এ ঘরে রয়েছে একটিমাত্র চেয়ার, খাটের পাশে ভেঙের সামনে।

ফেলুদা মানিবাগটা ব্যর করে এগিয়ে গেল।

‘ও হো হো—অনেক ধন্যবাদ। আপনি আবার কষ্ট করে...’

‘কষ্ট আর কী’—ফেলুদা ক্রিয়ভূষণ—‘ঘটনাচক্রে ওখানে গিয়ে পড়েছিলাম, আমার এই বন্ধুটি কুড়িয়ে পেলেন, তাই...’

নরেন্দ্রাবু এক হাতেই মানিবাগের স্বাপগুলো ফাঁক করে তার ভিতরে একবার ঢোখ বুজিয়ে ফেলুদার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলেন। ‘গেরেছানে...?’

‘আমিও আপনাকে ঠিক ওই প্রকৃষ্ট করতে যাচ্ছিলাম,’ ফেলুদা হেসে বলল, ‘আপনি বোধ হয় প্রাচীন কলকাতার ইতিহাস নিয়ে পড়াশুনা করছেন?’

ভদ্রলোক দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

‘করছিলাম তো বটেই—কিন্তু যা যা খেলার। মনে হয় পকনপেব চাইছেন না আমি এ নিয়ে বেশি ঘাঁটঘাঁটি করি।’

‘বিচিত্রপত্র কাগজে যে লেখাটা—’

‘ওটা আমারই। মনুসেন্ট তো? আমারই। আরও লিখেছি দু-একটা এখানে সেখানে। চাকরি করতাম, গভ বছর রিটায়ার করেছি। কিছু তো একটা করতে হবে। হাও্র ছিলাম ইতিহাসের। ছেনেবেনা থেকেই ওদিকটায় ঝোঁক। কলেজে থাকতে বাগবাজার থেকে হেঁটে ময়মন ঘাই ক্লাইভ সাহেবের বাড়ি দেখতে। দেখেছেন? এই সেদিন অবধি ছিল—একতলা বাংলো টাইপের বাড়ি, সামনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কোট-অফ-আর্মস।’

‘আপনি প্রেসিডেন্সিতে পড়েছেন?’

খাটের ডান পাশেই টেবিল, আর তার দু হাত উপরেই দেয়ালে একটা বাঁধানো গ্রুপ স্থিতিতে লেখা—

Presidency College Alumni Association 1953.

‘শুধু আমি কেন,’ বললেন নরেন বিশ্বাস, ‘আমার ছেলে, ভাই, বাপ,

ঠাকুরদাস সবাই প্রেসিডেন্সির ছাত্র। ওটা একটা ফ্যামিলি ট্রাডিশন। এখন বলতে লজ্জা করে—আমরা সোনার মেডেল পাওয়া ছাত্র—গিরিন, আমি, দু জনেই।’

‘কেন, লজ্জা কেন।’

কী আর করলুন বলুন জীবনে? আমি গেলাম চাকরিতে, গিরিন গেল ব্যবসায়। কে আর চিনল আমাদের বলুন?’

ফেলুদা এগিয়ে গিয়েছিল ছবিটা দেখতে। এবার তার দৃষ্টি নামল নীচের দিকে। টেবিলের উপর একটা নীল খাতা। সেটার প্রথম পাতাটা খোলা রয়েছে, দেখে বোঝা যাচ্ছে একটা লেখা শুরু হয়ে আট-দশ লাইনের বেশি এসেছে।

‘আপনার নাম কি নরেন্দ্রনাথ না নরেন্দ্রমোহন?’

‘আজ্ঞে?’

ভদ্রলোক বোধহয় একটু অনাম্মনস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ফেলুদা আবার প্রশ্নটি করল। ভদ্রলোক একটু হেসে একটু যেন অবাক হয়ে বললেন, ‘নরেন্দ্রনাথ বলেই তো জানি। কেন, আপনার কি সন্দেহ হচ্ছে?’

‘আপনার ভিত্তিটিং কার্ডে দেখলাম এন এম বিশ্বাস রয়েছে।’

‘ও হ্যাঁ। ওটা তো ছাপার ভুল। কাউকে কার্ড দেবার আগে ওটা কলম দিয়ে শুকিয়ে দিই। অবশ্য নতুন কার্ড ছাপিয়ে নেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু গাফিলতি করে আর করিনি। আর সত্যি বলতে কী, আমাদের আর ভিত্তিটিং কার্ডের কী প্রয়োজন বলুন। ইন্দোনীং মিউজিয়াম-টিউজিয়মের কর্তা-ব্যক্তিদের সঙ্গে একটু দেখা-টোকা করতে হচ্ছিল তাই ব্যাগে কয়েকটা ভরে নিয়েছিলাম। ভাল কথা—আপনিও কি ওই গোরহান নিয়ে লিথকেন-টিথকেন নাকি? অশা করি না। আপনার মতো ইয়ং রাইভ্যাপের সঙ্গে কিন্তু পেরে উঠব না।’

ফেলুদা যাবার জন্য উঠে পড়ে বসল, ‘আমি লিথি-টিথি না—শুধু জেনেই আনলাম। ভাল কথা—একটা অনুরোধ আছে। পুরনো কপকাতা নিয়ে পড়াশুনা করতে গিয়ে যদি গডউইন পরিবারের কোনও উল্লেখ পান তা হলে অনুগ্রহ করে জানায়ে উপকার হবে।’

‘গডউইন পরিবার?’

‘টমাস গডউইনের সমাধি পার্ক স্ট্রিট গোরস্থানে রয়েছে। ইন ফ্যাক্ট, একই গাই একসঙ্গে আপনাকে এবং গডউইনের সমাধিকে ভ্রমণ করেছে।’

‘তাই বুলি?’

‘আর সার্কুলার রোড গোরস্থানে গডউইন পরিবারের আরও পাঁচটা সমাধি রয়েছে।’

‘অবিশ্যি জানাব। কিন্তু কোথায় জানাব? আপনার ঠিকানাট,?’

ফেলুদা তার আইডেট ইন্ডেসটিগেটর লেখা কার্ডটা নরেনবাবুর হাতে তুলে দিল।

‘এই আপনার পেশা নাকি? গোয়েন্দাগিরি?’ ভদ্রলোক বেশ একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন।

‘অজ্ঞে হ্যাঁ।’

‘কলকাতায় আইডেট ডিটেকটিভ আছে বলে শুনেছি, কিন্তু চোখে দেখলাম এই প্রথম!’

॥ ৫ ॥

‘তুমি ডিটেকটিভের কথাটা জিজ্ঞাস করলে না কেন?’ আমি ফেলুদাকে জিজ্ঞাস করলাম গাড়িতে চৌরঙ্গীর দিকে যেতে যেতে। আজ লালমোহনবাবু ধরেছেন ব্লু-ফক্সে গিয়েই চা-স্যাকউইচ খাওয়াবেন। কে জানত যে এই ব্লু-ফক্সে গিয়েই ঘটনার মোড় ঘুরে যাবে।

ফেলুদা বলল, ‘তার ব্যাপার কাগজপত্র আমি ঘাঁটাঘাঁটি করেছি সেটা জানলে কি ভদ্রলোক খুব খুশি হতেন? আর লেখাটা সাংকেতিক না হোক, সংক্ষিপ্ত ভাষায় তেঁা বটেই। যদি কোনও গোপনীর ব্যাপার হয়ে থাকে?’

‘তা বটে।’

লালমোহনবাবুকে একটু ভাবুক বলে মনে হচ্ছিল। ফেলুদাও সেটা লক্ষ করেছে। বলল, ‘আপনার চোখে উদ্ভাস নৃষ্টি কেন?’

ভদ্রলোক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ‘পুলক হোকবার জন্য

একটা ভাল প্লট কেঁদেছিলুম। নির্ঘাৎ আবার ছিট হও—তা সে আজ লিখেছে হিপি হকিতে নাকি খুল আর ফাইটিং-এর বাজারে মন্দা। সবাই নাকি ভক্তিমূলক ছবি চায়। জয় নভোবী মা সুপারহিট হবার ফলে নাকি এই হল। ভেবে দেখুন।’

‘তা আপনার মুশকিলটা কোথায়। ভক্তিবাব জাগছে না মনে?’

লালমোহনবাবু কথাটার উত্তর দেবারও প্রয়োজন বোধ করলেন না। কেবল ভীষণ একটা অসন্তোষের ডাল করে দুবার ‘হেল’ ‘হেল’ বলে চুপ করে গেলেন। হেল বলার কারণ অবিশিষ্ট। পূনক ঘোষালের চিঠি নয়। আমরা বিড়লা প্রানেটেরিয়াম ছাড়িয়ে টেরঙ্গীতে পাড়েছি; যাঁয়ে মারটির পাহাড় ময়দানটাকে আড়াল করে দিয়েছে। লালমোহনবাবু কিছুদিন থেকে পাতাল রেল না বলে হেল রেল বলছেন।

গাড়ি ক্রমাগত গাভ্রায় পড়ছে আর লালমোহনবাবু শিউরে শিউরে উঠছেন। বললেন, ‘খিঃ খতটা খারাপ ডাকছেন ততটা নয়। চলুন রোড রোড দিয়ে, দেখবেন গাড়ির কোনও দোষ নেই।’

‘তাও তো এখন রাস্তা পাবে,’ বলল ফেলুদা, ‘দুশো বছর আগে এ রাস্তা ছিল গোঁয়ো কাঁচ। কখনো করে দেখুন।’

‘তখন তো আর আশ্বাসভর চলত না। আর এত ভিড়ও ছিল না।’

‘ভিড় ছিল, তবে সে মানুষের নয়, হাড়গিলের।’

‘হাড়গিলে?’

‘সাড়ে চার ফুট লম্বা পাখি। রাস্তায় ময়লা খুঁটে খুঁটে খেত। এখন যেমন দেখছেন কাক চড়ুই, তখন ছিল হাড়গিলে। পঙ্গুর জলে মড়া ভেসে যেত, তার উপর চেপে দিবি নৌসফর করত।’

‘জংলী জায়গা ছিল বলুন। বীভৎস। ভয়াবহ।’

‘তারই মধ্যে ছিল ল্যাটের বাড়ি, সেন্ট জনস চার্চ, পার্ক স্ট্রিটের গোরস্থান, থিয়েটার রোডের থিয়েটার, আর আরও কত সাহেব-সুবোদের বাড়ি। এ অঞ্চলটাকে বলত হোয়াইট টাউন—এদিকে নেটিভদের নো-পাতা, আর উত্তর কলকাতা ছিল ব্ল্যাক টাউন।’

‘গায়ের রক্ত গরম হয়ে বাচ্ছে মশাই।’

পার্ক স্ট্রিটে এসে মোড় ঘুরে হু-ফক্সের অফিসেই ফেলুদা গাড়ি থামাতে বলল।—‘একবার বইয়ের দোকানে টু মারতে হবে।’

ওক্সফোর্ড বুক কোম্পানি সম্পর্কে লালমোহনবাবুর কোনও উৎসাহ নেই, কারণ এখানে রহস্য নোমাঞ্চ সিরিজের বই বিক্রি হয় না। এলেন, 'আমাদের কলেক্স স্ট্রিট আর শালিগঞ্জের ক্র্যাকবুতশপ বেঁচে থাকুক।'

ফেলুদা দোকানে ঢুকে এদিক ওদিক ঘুরে একটা কাউন্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সামনে খরে খরে সাজানো রয়েছে নীল আর লাল খাতা, ফাইল, ডাইরি, এনসেজমেন্ট প্যাড। একটা নীল খাতা হাতে তুলে দুমটা দেখে নিল। বারো-পঞ্চাশ। ঠিক এককম খাতা হিস মরেন বিশ্বাসের টেবিলে।

ইয়েস ?

দোকানের একজন লোক এগিয়ে এসেছে ফেলুদার দিকে।

'কুইন ভিক্টোরিয়ার কোনও চিঠির কালেকশন আছে আপনাদের এখানে ?'

'কুইন ভিক্টোরিয়া ? না সার। তবে আপনি প্রকাশকের নাম বসতে পারলে আমরা আনিয়ে দিতে পারি। যদি ম্যাকমিলন বা অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি হয় তা হলে ওদের কলকাতার আপিসে খোঁজ করে দেখতে পারি।'

ফেলুদা কী যেন ভাবল। তারপর বলল, 'ঠিক আছে। আমি খোঁজ করে আপনাদের জানাব।'

আমরা পার্ক স্ট্রিটে বেরিয়ে এলাম। গাড়িটা এগিয়ে ব্লু-ফ্লগের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, আমরা হেঁটে এগোতে লাগলাম।

'একটু মজা!'—ফেলুদা পকেট থেকে তার খাতাটা বার করেছে।—'ভিড়ের মধ্যে হাটতে হাটতে পড়া যায় না।'

কয়েক সেকেন্ড খাতায় চোখ বুনিয়েই ফেলুদা আবার হাটতে শুরু করল। 'কিছু পেলো ?' আমি জিজ্ঞাস্য করলাম। জবাব এল: 'আগে ব্লু-ফ্লগে গিয়ে বসি।'

ট্রেস্টেরাটে বসে জানা গেল ব্লু-ফ্লগ নামটা ভাল লাগে বলেই লালমোহনবাবু আমাদের এখানে এনেছেন। নিজে এল আগে কখনও আসেননি। এমনকী পার্ক স্ট্রিটের কোনও ট্রেস্টেরাটেই আসেননি।—'খাকি সেই গড়পায়ে। পাবলিশার কলেক্স স্ট্রিট পাড়ায়, এ সন্ধ্যাটে

খেতে আসার মতক'ই ব: কোথায় আর দরকারই বা কী ?'

চা আর স্যান্ডউইচ অর্ডার দেবার পর ফেলুদা খাতাটা আবার খাষ করে টেবিলের উপর রাখল। তারপর সেই পাতাটা খুলে বসল, 'প্রথম লাইনটা এখনও বহস্যবৃত। দ্বিতীয়টা কবজা করে ফেলেছি। এগুলো সব বিশ্লেষণ প্রকাশকের ন্যম।'

'কোনগুলো ?' জিজ্ঞাস করলুম আমি।

'MM, OU, GAA, SJ আর WN হল যথাক্রমে ম্যাকমিলান, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, হার্ট অ্যান্ড আলেন অ্যান্ড আনউইন, সিজিক অ্যান্ড জ্যাকসন, ওয়াইডেনফেল্ড অ্যান্ড নিকলসন।'

'খাপরে খাপ', বললেন জটায়ু, 'আপনার জিজ্ঞার ভয় হোক। এতগুলো ইংরিজি নাম হোঁচট না খেয়ে একধারসে আউড়ে গেলেন কী করে মশাই ?'

'কোথাই যাম্বে ডব্রলোক এইসব পাবলিশারদের চিঠি লিখতেন বা লিখছেন, ভিক্টোরিয়ার চিঠির সংকলন সম্বন্ধে খোঁজ করে। অথচ মজা এই যে, এত না করে ব্রিটিশ কাউন্সিল বা ন্যাশনাল সাইবেরিজে গিয়ে ভিক্টোরিয়ার চিঠি পড়ে আসা ঢের সহজ ছিল।'

'এ মেন খাখার পিছন দিক দিয়ে হাত ঘুরিয়ে নাক দেখানো', মন্তব্য করলেন জটায়ু।

ফেলুদা খাতাটা পকেটে পুরে স্যান্ডউইচের জায়গা করে দিবে একটা চারমিনার ধরাল। লালমোহনবাবু টেবিলের উপর তাল ঠুকে একটা বিলিতি খাঁচের সূরের এক লাইন স্কন স্কন করে বললেন, 'চলুন কোথাও বেরিয়ে পড়ি শহরের বাইরে। বাইরে গেলেই দেখিচি আপনার কেসও জোটে, আমার গরুও জোটে। কোথায় যাওয়া যায় বলুন তো ? বেশ কলঙ্ক জায়গা হওয়া চাই। সম্ভবল শস্যশ্যামলা আয়েশি ভেঙে মিনমিনে পরিবেশ হলে চলবে না। বেশ একটা—'

স্যান্ডউইচের জোটে এসে পড়ায় আর কথা এগোল না। আমাদের তিনজনেরই খিদে পেয়েছিল বেশ জ্বর। একসঙ্গে দু' জোড়া স্যান্ডউইচ একটা বিশাল কয়লড় দিয়ে তিনবার চোয়াল খেলিয়েই লালমোহনবাবু কেন জার্নি থমকে গেলেন। তারপর গেল গোল চোখ করে দু'বার পর পর 'ঈশ্বরের জয়...ঈশ্বরের জয়' বললেন, যার ফলে

মুখ থেকে কয়েকটা কুটির চুকরে ছিটকে বেরিয়ে টেবিলের ওপর পড়ল।

ব্যাপারটা হল এই—আমি আর ফেলুদা রাস্তার দিকে মুখ করে এসেছিলাম। আর লালমোহনবাবুর মুখ ছিল রেস্টোরাণ্টের পিছন দিকটায়। ঘরের শেষ মাথায় একটা নিচু প্র্যাটফর্ম, দেখেই বোঝা যায় সেখানে রাত্রে বাজনা বাজে। সেখানে একটা সাইনবোর্ড দেখেই জটায়ুর এই দৃশ্য। তাতে রয়েছে এই বাজনার দলের নাম, আর নগের টিক তলায় সেখা—‘সিটার—ক্রিস গডউইন।’

ফেলুদা হাত থেকে স্যাডউইচ নামিয়ে একটা বেয়ারাকে তুলি দিয়ে কাছে ডাকল।

‘এখানে জিনারের সময় বাজনা বাজে?’

‘হাঁ বাবু, বাজতা হ্যাঁ।’

‘তোমাদের ম্যানেজারের সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?’

ক্রিস গডউইনের ঠিকানা জোগাড় করাই ফেলুদার উদ্দেশ্য। আর তার জন্য একটা দ্রুতসই অভ্যুত্থানও রেডি করে রেখেছিল। ম্যানেজার আসতে কলল, ‘বালিগঞ্জ পার্কের হিস্টার মানসুখানির বাড়িতে বিয়ের জন্য একটা ভাল বাড়িতে গ্রুপ চাই। আপনাদের এনামের দলটার খুব নাম শুনেছি—তারা কি বিয়েতে ভাড়া খাটবে?’

‘হোয়াই নট? এটাই তো তাদের পেশা।’

‘ওই যে গডউইন নামটা দেখছি, ওই বোধ হয় লিডার? ওর ঠিকানাটা যদি...’

ম্যানেজার একটা স্লিপে ঠিকানাটা লিখে ফেলুদাকে এনে দিলেন। দেখলাম লেখা আছে—১৪/১ রিপন লেন।

অন্য দিন হলে গল্প-টল্প করে চা-স্যাডউইচ খেতে যতটা সময় লাগত, আজ অবিশ্যি তার চেয়ে অনেক কম লাগল। ফেলুদার খিদে মিটে গেছে; সে একটার বেশি বেশ না। লালমোহনবাবু অসম্ভব স্পিডে আর এনার্জির সঙ্গে ফেলুদার দুটো আর নিজের তিনটে খেয়ে ফেলে বললেন, ‘পয়সা যখন পুরো দেব তখন খাবার ফেলা যায় কেন মশাই?’

ফোটিন বাই ওয়ান রিপন লেনের বহিরেটা দেখে মনটা দমে বাঙায়

স্বভাবিক— কারণ সানত আলির নবাবির কথা এখনও ভুলতে পারিনি। কিন্তু ফেলুদা বলল, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। চার-পাঁচ পুরুষের ব্যবধানে একটা পরিবার যে কোথা থেকে কোথায় নাহতে পারে তার কোনও লিমিট নেই। অবিশ্যি বাড়িগুলো যে খুব ছোট ভা নয়, সবই তিনতলা চারতলা, কিন্তু কোনওটারই বাইরেটা দেখে ভিতরে ঢুকতে ইচ্ছে করে না। লালমোহনবাবু বললেন যে, বোঝাই যাচ্ছে এর প্রত্যেকটাই হানাবাড়ি। যাই হোক, ঢোকার আগে পাশেই একটা পান-বিড়িওয়ালাকে ফেলুদা সিজ্জেস করে নিল।

‘ইয়ে কোঠিমে গডউইন সাহাব বেঙ্গকে কোই রহতা হ্যায়?’

‘গুডিন সাহাব? জো বাজা বাজাতা হ্যায়?’

‘সে ছাড়া আরও আছে নাকি?’

‘কুচা সাহাব ভি হ্যায়। মার্কিস সাহাব। মার্কিস গুডিন।’

‘কোন তলায় থাকেন সাহেব?’

‘দো তলা। তিন তলামে আর্কিস সাহাব।’

‘আর্কিস-মার্কিস দুই ভাই নাকি বাবা?’ প্রশ্ন করলেন লালমোহনবাবু।

‘নেহি বাবু। আর্কিস সাহাব আর্কিস সাহাব, মার্কিস সাহাব গুডিন সাহাব—দো তলামে মার্কিস সাহাব, তিন তলামে...’

ফেলুদা আর্কিস-মার্কিসের বায়েলা ছেড়ে ইতিমধ্যে চোন্দ বই একে ঢুকে পড়েছে। আমরাও দুয়া বলে তার পিছন পিছন ঢুকলাম।

যা ভেবেছিলাম তাই। ভিতরে বাইরে কোনও তফাত নেই। জুন মাসের দিন বড় বলে এই সাড়ে ছ-টার সময়ও বাইরে আলো রয়েছে, কিন্তু ভিতরে সিঁড়ির কাছটায় একেবারে মিশমিশে অন্ধকার। ফেলুদার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে—হয়তো ওর চোখটাই ওইভাবে তৈরি— অন্ধকারে সাধারণ লোকের চেয়ে ও অনেক বেশি দেখতে পায়। ওর তরতরিয়ে সিঁড়ি ওঠা দেখে লালমোহনবাবু রেলিংটাকে খামচে ধরে কোনওরকমে উঠতে উঠতে বললেন, ‘ক্যাটি-বার্গলার হয় জানতুম মশাই, ক্যাটি-গোয়েন্দা এই প্রথম দেখলুম।’

দোতলা থমথমে। একটা ক্ষীণ বাক্তনার শব্দ শোনা যাচ্ছে, বোধহয় কোনও রেডিও থেকে আসছে। সিঁড়ির মুখে একটা দরজা, তার পিছনে

বারান্দা, তাতে আলো না জ্বললেও বাইরেটা খোলা বলে খানিকটা দিনের আলো এসে পড়ে বারান্দার ভাঙা-কাচের টুকরো বসানো মেঝেটাকে বুঝিয়ে দিচ্ছে। আমাদের বাঁয়ের দরজা দিয়ে যে ঘরটা দেখা যাচ্ছে তাতে কেউ নেই, কারণ বাঁতি জ্বলছে না। ভিতরে বারান্দার বাঁ দিকে একটা ঘর আছে বুঝতে পারছি, কারণ সেই ঘর থেকেই এক চিলতে আলো এসে বারান্দার একটা কোণে পড়েছে। একটা কালো ডেজল সেই আলোর কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে একদৃষ্টে আমাদের দেখছে। তিনভুজা থেকে পুরুষের গলার শব্দ পাচ্ছি মাঝে মাঝে। একবার যেন একটা ঘৎঘৎ কপিলির শব্দও শেলার।

‘বাড়ি চাশুন’, বললেন জটায়ু। ‘এ হল বিপন লেনের গোরস্থান।’

ফেলুদা বারান্দার দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

‘কোই হ্যার?’

কয়েক সেকেন্ড কোনও শব্দ নেই, তারপর উত্তর এল—‘কৌন হ্যার?’

ফেলুদা ইতস্তত করছে, এমন সময় আবার কথা এল, এবার বেশ কড়া স্বরে।

‘অন্দর আইয়ে!—আই কাশ্ট কাম আউট।’

‘ভেতরে যাবেন, না বাঁতি যাবেন?’

ফেলুদা জালামোহনদাবুর প্রশ্ন অগ্রাহ্য করে চৌকঠ পেঁয়িয়ে এগিয়ে গেল। ও দুড়ি, আমরা ল্যাঙ্ক; একেবেঁকে এগোনাম দু জনে পিছন পিছন।

‘কাম ইন,’ হুকুম এলো বাঁয়ে ঘরের ভিতর থেকে।

॥ ৬ ॥

তিনজনে ঢুকলাম ভিতরে। একটা মাঝারি সাইজের বৈঠকখানা। দরজার উলটো দিকে একটা সোফা, তার কাপড়ের ঢাকনির তিন জায়গায় ফুটো দিয়ে নারকোলের ছোদড়া বেরিয়ে আছে। সোফার সামনে একটা খেতপাথরের টেবিল;—এখন যেত বললে ভুল হবে, কিন্তু এককালে তাই ছিল। বাঁয়ে একটা কালো প্রাচীন বুক কেস, তাতে



গোটা গানেরো প্রাচীন বই। বুক কোসের মাথায় একটা পিওলের ফুলদানিতে ধুলো জমা প্রাস্টিকের ফুল, সে ফুলের রং বোধে কার সাধি। দেয়ালে একটা বাঁধানো ছবি, সেটা খোঁড়াও হতে পারে, রেলগাড়িও হতে পারে, এন্ত ধুলো জমেছে তার কাছে। যে ফিলিপস রেডিওটা সোফার পাশের টেবিলের উপর রাখা রয়েছে সেটার মডেল নির্বাহ ফেলুদার জয়েরও আগের। আশ্চর্য এই যে সেটা এখনও চলে, কারণ সেটা থেকেই গানের শব্দ আসছিল। এখন একটা শিরা-বার-করা ক্যাকাসে হাত নব ঘুরিয়ে গানটা বন্ধ করে দিল। যার হাত, তিনি সোফার এক কোণে একটা কুশন কোলে নিয়ে বাঁ পা-টা একটা মোড়ার উপর তুলে দিখে বসে মিটমিট করে আমাদের দিকে চাইছেন। ঐর শরীরে যে সাহেবের রক্ত আছে সেটা চামড়ার রং থেকে বোকা যায়, আর চুলের যেটুকু পাকা নয় তার রং কটা। চোখটা যে কীরকম সেটা বুঝতে পারছি না, কারণ হাত থেকে ঝোলানো যে বাতিটা কলছে সেটার প্যওয়ার পঁচিশের বেশি নয়।

‘আমি গডউটে ভুগছি, তাই চ্যামফেরা করতে পারি না’, ইংরিজিতে বললেন সাহেব। ‘আই হ্যাভ টু টেক দ্য হেল অফ মাই সারভেন্ট। সে শুয়ারটা আবার ফাঁক পেলেই সটকায।’

ফেলুদা এবার পরিচয়ের ব্যাপারটা সেরে মিল। ভদ্রলোক আমরা আসাতে বিরক্ত হলেও সেটা এখনও প্রকাশ করেননি। ফেলুদা কাকের কথায় চলে গেল।

‘আমি শুধু একটা খবর জানতে এসেছি। আপনি কি টমাস গডউইনের বংশধর—যিনি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতবর্ষে এসেছিলেন?’

সাহেব মাথাটা আর একটু তুললেন। এবারে বুঝলাম তার চোখের রং যোন্নাটে নীল। কিছুক্ষণ এক দৃষ্টে ফেলুদার দিকে চেয়ে থেকে বললেন, ‘নাউ হাও দ্য হেল ডিড ইউ নো আবাউট মাই গ্রেট গ্র্যান্ডফাদার?’

‘তাহলে আমার অনুমান ঠিক?’

‘শুধু তাই নয়, আমার কাছে এমন একটা জিনিস আছে যেটা খোদ টমাস গডউইনের সম্পত্তি। অকৃত আমার ঠাকুমা তাই বলতেন।

দেড়শো বছরের—ও হেল!

‘কী হল?’

‘দ্যাট স্কেউল্ড্রল অ্যারাকিস—ঠক, জোচ্চোর! কালই রাতে ওটা চেয়ে নিয়ে গেছে। বলেছে আজ তেরাও দেবে। আজই ওদের মিটিং বসবে। আজ নিশ্চয়দবার তো? একটু পরেই শুনতে পাবে মাথার উপরে সব উদ্ভট আওয়াজ।’

মাথাটা শুষ্কিয়ে বাছে বলেই বোধহয় ঘরটা আরও অন্ধকার লাগছে। কিংবা হয়তো সত্যি করেই রাত হয়ে আসছে। না, মেঘ ডাকল। আকাশে মেঘ করেছে, তাই অন্ধকার।

ফেলুদা মি. গডউইনের সামনে একটা হাতলডাঙা চেয়ারে বসেছে। তার ডান পাশে আরামকেন্দ্রায় জটাছু। আরাম খুব হচ্ছে না, কারণ উশখুশে ভাব দেখে মনে হয় ছাঁরপোকাকার কামড় খাচ্ছেন। আমি বসেছি বাঁয়ে একটা চেয়ারে। ফেলুদা চেয়ে আছে একদৃষ্টে সাহেবের দিকে, ভাবটা—তুমি যা বলতে চাও বলো, আমি শুনতে এসেছি।

‘ইটস অ্যান অহিভরি কাসকেট,’ বললেন মি. গডউইন। ‘ভেতরেও জিনিস আছে। দুটো পুরনো পাইপ, একটা রূপোর নসিয়ার কৌটো, একটা চশমা, আর সিন্কে মোড়া একটা প্যাকেট। ভেতরে বইটাই আছে বলে মনে হয়; কোনওদিন খুলিনি। আরও সব ছিল বাড়িতে পুরনো জিনিস; আমার বাউন্সলে ছেলেটা সব বেচে দিয়েছে। পড়াশুনোর জন্যগুলি দিয়ে গাঁজা ধরল, আর তারপরেই ঘর থেকে এটা ওটা সরিয়ে কেমনতে শুরু করল। বাব্বাটা যে কেন নেয়নি জানি না। হয়তো নিত; কপাল ফিরে গেল তাই নেবার দরকার হয়নি। বাব্বার দল করেছে একটা। তার বোজুগারেই চলেছে এখন—যদি চলা বলো এটাকে। ছেলেকে আর দোষ দিই কী করে? আমারই কি কম দোষ? শুনেছি টম গডউইন জুরো খেলে সর্বস্ব খুইয়েছিলেন। আমারও তাই।...’

জঙ্গলোক একটু থামলেন। হাঁপাচ্ছেন। বোধহয় একটানা এত কথা বলে। বাতের যন্ত্রণাতেই বোধ হয় একবার মুখটা বেঁকে গেল। তারপর আবার কথা। -

‘একবার বিলোত গিয়েছিলাম ইয়ং বয়সে। হোট কাক্স ছিল লন্ডনে,

মিডল্যান্ড ব্যাঙ্কে ক্যাশিয়ারি করত। তিন মাসের বেশি থাকতে পারিনি। শীত সহ্য হয়নি। খানা সহ্য হয়নি। ভাল-ভাতের অভ্যাস। ফিরে এসাম ক্যানকটি। বিয়ে করলাম। এট মরয়েছে দশ বছর আগে। এখন আছে ক্রিস্টোফার। খুব দেখি দিনে একটাবার হয়তো; কী ভাও না। পাশের ঘরে বসে দিটারে টাং টাং করে। হাত ভাল।’

মাথার উপরে স্টিই একটা অঙ্কুত আওয়াজ শুরু হয়েছে। খট খট—খট খট। হচ্ছে আবার খামছে, ঘরের ছায়াগুলো দুলছে, কারণ খট খটের সঙ্গে সঙ্গে সিলিং-এর বাতিটা দুলতে আরম্ভ করেছে। এখন আর শুধু লালমোহনবাবু না; আমরাও ভয় করছে। এ রকম ব্যড়িতে, এ রকম ঘরে কখনও আসিনি; এরকম মানুষের মুখে এ রকম কথা কখনও শুনিনি। কী ব্যাপার হচ্ছে ওপরের ঘরে?

গডউইন সাহেব ওপরে না তাকিয়েই বললেন, ‘টেবিলটা লাফাচ্ছে। চার বাটা ভণ্ড টেবিলটাকে ফিরে বাসেছে। বলে মরা পোকের আত্মা নামান ওয়া, আর যেই সে আত্মা আসে অমনি টেবিলটা ছটফট করতে শুরু করে।’

‘ওরা কারা?’ ফেলুদা প্রশ্ন করল।

‘অ্যারাকিসের দল। প্রেভার্চা সমিতি। দুটো ইহুদি, একটা পার্শি, আর অ্যারাকিস। আমাকে দলে টানতে চেয়েছিল, আমি স্বাইনি। একদিন অ্যারাকিসের কাছে টমাস গডউইনের কথা বলেছিলাম। বললে, তোমাকে তার সঙ্গে কথা বলিয়ে দেব। আমি বললাম—নো, সার্ভেনলি নট। আজ বাসে কাল এমনিতেই তার সঙ্গে দেখা হবে। তারপর কাল এসে বললে—’

ভদ্রলোক থামলেন। খট খট খট। আবার টেবিল লাফাচ্ছে।

‘কিন্তু বাস্তবতা কেন নিল আপনার কাছ থেকে?’ প্রশ্ন করল ফেলুদা।

‘সেটাই তো বলছি। বললে, আমরা তোমাকে ছাড়ছি গডউইনের আত্মা নামাব। তার নিছকের জিনিস কিছু থাকলে দাও, সেটা টেবিলের উপর রাখলে আত্মা সহজে নামবে। আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে তিনি নেমেছেন।’

খট খট খট...আবার টেবিল লাফাল।

‘ব্যানারটি কি আত্মকারে হয়?’ ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

‘সব বুজুকিই তো অঙ্ককারে হয়।’—গডউইনের গলার স্বরে বিক্ষিপ।

‘একবার উপরে যাওয়া যায়?’

লালমোহনবাবু প্রকট করেই চেয়ারের হাতল ধরে তার আপত্তি জানিয়ে দিয়েছিলেন। গডউইন সাহেবের উত্তরে তিনি অনেকটা আশ্বস্ত হলেন।

‘ও ঘরে তোমার ঢুকতে দেবে না,’ বললেন মি. গডউইন। ‘ফর মেমবারস্ ওনলি। ওর চাকর পাহারা দেয়। শুনে কেউ যদি কারুর আখ্যা নামান্তে চায় ওদের সাহায্যে, তো সে আলাদা কথা। আগাম বিশ টাকা, আখ্যা নামলে আরও একশো।’

‘আই সি...’

ফেলুদা উঠে পড়ল। ‘আচ্ছা, মিস্টার গডউইন। অনেক ধন্যবাদ। আপনাকে বিরক্ত করে গেলাম, কিছু মনে করবেন না।’

‘শুভ নাইট।’

গডউইন সাহেবের শীর্ণ হাত আবার রেডিওর দিকে চলে গেল।

ল্যাভিং-এ এসে ফেলুদা যেটা করল সেটা আমাকে হকচকিয়ে দিল। লালমোহনবাবুর যে কী দশা হল সেটা অঙ্ককারে বুঝতে পারলাম না। ফেলুদা নীচে না গিয়ে সটান তিনতলায় রওনা দিল।

‘আপ-ডাউন শুদিয়ে ফেললেন নাকি?’ বাস্তবাবে প্রশ্ন করলেন স্টাফ। উত্তর এল, ‘চলে আসুন, দাবড়াকেন না।’

উপরে উঠেই সামনে লুঙ্গি পরা দারোয়ান।

‘আপ কিসকো মাংতে হ্যার?’

‘আমি শুধু তোমার প্রয়োজন মেটাতে এসেছি ভাই!’

ফেলুদা আরাকিস সাহেবের দারোয়ানের দিকে একটা পাঁচ টাকার নোট এগিয়ে দিয়েছে। লোকটা খতমত। ফেলুদা তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, ‘তোমার মনিব যে ঘরে বসেছেন সেটা এখন চারদিক থেকে বন্ধ বিনা সেটা আছে হলো।’

ওবুধ ধরেছে বোধহয়। চাকর বলল বায়ল্লার দিক থেকে বন্ধ, কিন্তু শোবার ঘর দিয়ে দরজা আছে ডেকোর; সেটা খোলা।

‘তোমার কোনও চিন্তা নেই—কিন্তু করতে হবে না—শুধু

একবারটি শোবার ঘরটা দেখিয়ে দাও। নইলে বিপদ হবে। আমরা পুলিশের লোক : ইনি দারোগা।’

লালমোহনবাবু পায়ের বুড়ে আঙুলে দাঁড়িয়ে হাইটটা বস করে দুই হাঁকি বাড়িয়ে নিলেন। এ ল্যান্ডিং-এ বাতি আছে। ফেলুসা নোটটা আর একটু এগিয়ে একেবারে দারোগামানের হাতের তেলোতে ঠেকিয়ে দিল। তেলোটা আপন থেকেই নোটের উপর মুঠো হয়ে গেল।

‘আইয়ে-- লেকিন...’

‘লেকিন-টেকিন ছাড়া ভাই! তোমার মনিবের বন্ধুদের একজনের ওপর পুলিশের সন্দেহ, তাই যাওয়া দরকার। তোমার সাহেবের বা তোমার কিছু হবে না।’

‘আইয়ে।’

শোবার ঘর অন্ধকার, আর তার একটা খোলা দরজার ওদিকে যে ঘর, সেও অন্ধকার। আমরা তিনজনে সেই দরজাটির দিকে এগিয়ে গেলাম।

প্রধানচোটের ঘর থেকে এখন কোনও শব্দ নেই। তবে একটু আগে পর পর তিনবার টেলিফোন পায়ের শব্দ পেয়েছি। বুঝতে পারছি ভূত নামনের ক্লাবের সদস্যরা সব দম বন্ধ করে টমাস গডউইনের আশ্বাস জ্ঞান অপেক্ষা করছেন। লালমোহনবাবু এত জোরে আর এত দ্রুত নিশ্বাস ফেলছেন যে ভয় হচ্ছে তাতেই পায়ের ঘরের সবাই আমাদের অস্তিত্ব টের পেয়ে যাবে। ফেলুসা ইতিমধ্যে বোধহয় দরজার আরও কাছে এগিয়ে গেছে। কোথেকে যেন কেবোসিন তেলের গন্ধ আসছে। একবার শুনলাম একটা বেড়াল মাও করল। বোধহয় সোতলার সেই কান্দো হলোটা।

‘ট—মাস গডউইন। ট—মাস গডউইন।’

গোঙানির মতো স্বরে নামটা দু’বার উচ্চারিত হল। বুঝলাম এইভাবেই এরা আশ্বাসকে ডাকে।

‘আর ইউ উইথ আস? আর ইউ উইথ আস?’

কোনও সাড়া নেই, কোনও শব্দ নেই। শব্দ আধ মিনিট হয়ে গেল। তারপর আবার সেই কাতর প্রশ্ন—

‘টমাস গডউইন...আর ইউ উইথ আস?’



‘ইয়ে—স। ইয়ে—স!’

আমার ডান পাশেও পারা ঠক ঠক করে কাঁপছে। টেবিলের নয়, মানুসের। লালমোহনবাবুর হাটু।

‘ইয়েস! আই হ্যাভ কমে: আই অ্যাম হিয়ার!’

‘হিয়ার’ বললেও মনে হয় বহু দূর থেকে আসছে গলার স্বরটা।

প্রানচেটের দল আবার প্রস্তুত করল।

‘তুমি কি সুখে আছ? শান্তিতে আছ?’

উত্তর এলো—‘নো—ও!’

‘কী দুঃখ তোমার?’

প্রায় আধ মিনিট সব চুপ। তারপর আবার প্রস্তুত করল অ্যারাকিসের দল।

‘কী দুঃখ তোমার?’

‘আই...আই...আই...ওয়েন্ট মাই...আই ওয়েন্ট মাই...কাসকেট!’

এর পরেই একসঙ্গে কতকগুলো অজুত ব্যাপার। পাশের ঘর থেকে এক ভয়াবহ চিংকার, আতঙ্কের শেষ অবস্থায় যেটা হয়—আর পর হুটুর্কেই আমার হাতে একটা হ্যাঁচকা টান আর কানের কাছে ফিসফিস—‘চলে আয়, তোপসে!’

অ্যারাকিসের ঢাকর আমাদের তিনজনকে ছুটে বেরোতে দেখে ফেন আরও হতভম্ব হয়ে কিছুই করল না। এক মিনিটের মধ্যে তিনজনে বিপন্ন জেন পেরিয়ে ব্রয়েড স্ট্রিটে রাবা আমাদের গাড়িটার দিকে এগোতে লাগলাম। ‘এ এক খেল দেখালেন মশাই,’ বললেন লালমোহনবাবু। ‘এ জিনিস ফিল্মে দেখালে সুপারহিট!’

লালমোহনবাবুর তারিফের কারণ আর কিছুই না; ফেলুদার হাতে এসে গেছে সাদাত আলির দেওয়া টমাস গডউইনের আইভরি কাসকেট।

॥ ৭ ॥

পরদিন সকাল। ফেলুদা নিজেই আমাকে তার ঘরে ডেকে পাঠিয়েছে। কাল রাতে লালমোহনবাবু আমাদের নামিয়ে দিয়ে যাবার

পর আধ ঘণ্টার মধ্যে জল-খাওয়া সেরে ফেলুদা তার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। সত্যি বসতে কী, রাতে আমার ভাল করে ঘুমই হয়নি। বেশ বুঝতে পারছি যে আমরা একটা অশুভ রকম পাঁচালো রহস্যের জালে জড়িয়ে পড়েছি। এ গোলকধাঁধার কাছে পখনৌ-এর ভুলভুলাইয়া হার মেনে যায়। কেন দিকে কেন রাস্তায় যেতে হবে জানি না। সব ভরসা ফেলুদার উপর। অতঃ ফেলুদা নিজেই কি ভুলভুলাইয়া থেকে বেরনোর পথ জানে?

ফেলুদা তার ঘরে খাটের উপর বসে, তার সামনে টমাস গডউইনের বাক্স, তার ভিতরের জিনিস খাটের উপর ছড়ানো। দুটো ডামাক খাবার সাদা পাইপ—ডেমন পাইপ আমি কখনও চোখেই দেখিনি; একটা রপ্পোর নন্টির কৌটো; একটা সোনার চশমা, আর চারটে লাল চামড়ার বাঁধানো খাতা—তার প্রত্যেকটার মলাটে সোনার ফল দিয়ে লেখা ‘ডায়রি’। খাতাটি যে সিল্কের কাপড়ে বাঁধা ছিল সেটা বিছনার উপরেই পড়ে আছে, আর তার পাশে পড়ে আছে নীল ফিতোটা। ফেলুদা একটা খাতা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, ‘খুব সাবধানে প্রথম পাতাটা উল্টে দাখ।’

‘এ কী। এ যে শার্লট গডউইনের খাতা।’

‘১৮৫৮ থেকে ৬২ পর্যন্ত। যেমন মৃত্যুর মতো হাতের লেখা, তেমনি স্বচ্ছন্দ ভাষা। কাল সারা রাত ধরে পড়ে শেষ করেছি। কী অমূল্য জিনিস যে রিপন লেনের অঙ্ককূপের মধ্যে এককাল পড়েছিল, তা ভাবা যায় না।’

আমি অবাক হয়ে প্রথম পাতাটার দিকে চেয়ে আছি। আর উলটোতে সাহস পাচ্ছি না, কারণ বুঝতে পারছি পাতাগুলো খুবখুরে হয়ে আছে। ফেলুদা বলল, ‘আরাকিস এ খাতা খুলেছিল।’

‘কী করে জানলে?’

‘খাতার পাতা অসাবধানে উলটোলেই পাতার উপরের ভান দিকের কোণ আঙুলের চাপে ভেঙে যায়। এই দাখ—’

ফেলুদা একটা পাতা অসাবধানে উলটে দেখিয়ে দিল।

‘আর শুধু তাই না,’ বলে চলল ফেলুদা, ‘এই ফিতোটা দাখ। কয়েক জায়গায় ক্ষয়ে গেছে—একশো বছরের উপর গেরোবাঁধা অবস্থায়

পাকার জন্য। কিন্তু এই ক্ষয়ে যাওয়া জায়গা ছাড়াও দ্যাক এই বুটো জায়গায় ফিতে কেমন পাকিয়ে গেছে। এটা হচ্ছে টাটকা নতুন গেরোর জন্য। সে বুজেছে সে তত হিসেব করে ঠিক একই জায়গায় গেরো গাঁধেনি; সেটা কমলে মরা মুশকিল হত।”

‘তোমার আঙুলে কালো দাগ কেন?’—এটা আমি যবে তুকেই লক্ষ করেছি।

‘এটা আরেকটা ক্ল,’ বলল ফেলুদা। ‘এটা গোআলোর সময় পরে আসবে। দাগটা লেগেছে ওই নসিঁর কৌটোটা থেকে।’

‘কী জানলে ওই ডায়রি পড়ে?’ আগ্রহে আমার প্রশ্ন দম বন্ধ হয়ে আসছিল।

‘উম গডউইনের শেষ বয়সের কথা,’ বলল ফেলুদা। ‘একটা পরসা হাতে নেই, খিটখিটে মেজাজ। এক ছেলে মরে গেছে, অন্য ছেলে ডেভিডের উপর কোনও বিশ্বাস নেই, কোনও টান নেই। কাউকে ট্রাস্ট করে না, এমনকী নিজের মেয়ে শার্লটকেও না। কিন্তু শার্লট তবু তার পরিচর্যা করে, তাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, ভালবাসার কাছে তার মঙ্গল প্রার্থনা করে। জুয়ার সর্বস্ব গেছে টমাস গডউইনের; শার্লট নিজে সেপাই-এর কাজ করে আর কার্পেট বুনে বলকাতার মেমসাহেবদের কাছে বিক্রি করে সংসার চালাচ্ছে। গডউইন লখনৌ-এর নবাবের কাছে দামি জিনিস যা পেয়েছিল সব বিক্রি করে দিয়েছে, কেবল তিনটি জিনিস ছাড়া। এই কাসকেট, এই নসিঁর কৌটো—যেটা সে আগেই শার্লটকে দিয়েছিল—আর তৃতীয় হল সাদতের কাছে পাওয়া তার প্রথম বকশিশ।’

‘সেটাও শার্লটকে দিয়ে গেছিল?’

‘না। সেটা সে কাউকে দেয়নি। মারা যাবার আগে সে মেয়েকে বলে গিয়েছিল, সেটা যেন তার কফিনের মধ্যে পুরে তার মৃতদেহের সঙ্গে কবর দেওয়া হয়। শার্লট তার বাপের ইচ্ছা পূরণ করে মনে শান্তি পেয়েছিল।’

‘সেটা কী জিনিস?’

শার্লটের ভাষায়—“ফাদার’স প্রেশাস পেরিগ্যাল রিপিটার”।’

‘সেটা আবার কী?’

‘এখানে ফেলু মিডিকও ফেলু মেরে গেছে রে তোপসে। ভিকশনারিতে বলছে রিপোর্টার বন্দুক বা পিস্তল হাতে পারে, অবার হাতিও হাতে পারে। পেরিগ্যাল হয়তো কোম্পানির নাম। সিং জ্যাঠাও শিঙের নন। তুই খুম থেকে ওঠার আগে ওর বাড়িতে টুঁ মেরে এসেছি। দেখি, বিকাশবাবু যদি আলোকপাত করতে পারেন।’

পার্ক স্ট্রিটে একটা নিলামের দোকান আছে; নাম পার্ক অকশন হাউস। সেখানে বিকাশ চক্রবর্তী বলে এক ভদ্রলোক কাজ করেন হাঁর সঙ্গে ফেলুদার খুব আলাপ। একটা কেনের ব্যাপারে ফেলুদাকে ওখানে যেতে হয়েছিল বার কয়েক, তখনই চেনা হয়।

‘এই সেন্নিনও দোকানটার পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখেছি অনেক পুরনো হাতি সাজানো রয়েছে। আমার মন বলছে ওটা বন্দুক-টন্দুক নয়, হাতি।’

লালমোহনবাবু আসার আগে অবধি ফেলুদা শার্জিট গডউইনের ডায়েরি থেকে অনেক ঘটনা বলল। শার্জিটের এক ভাইঝি বা বোনঝিরও কথা নাকি আছে ডায়েরিতে। শার্জিট তাকে উল্লেখ করেছে ‘মাই ডিয়ার ক্রেডার নীস’ বলে। সে নাকি কোনও কারণে তার ঠাকুরদাদাকে অসন্তুষ্ট করেছিল, কিন্তু মারা যাবার আগে টম গডউইন তাকে ক্ষমা করে তাঁর আশীর্বাদ দিয়ে যান। শার্জিটের দুই ভাই ডেভিড আর জনের কথাও ডায়েরিতে আছে। ডেভিডের সমাধি আমরা সার্কুসার রোডের গোরস্থানে দেখেছি। জন বিলেতে গিয়ে আত্মহত্যা করেন; কেন সেটা শার্জিট জানতে পারেননি।

লালমোহনবাবু এসে বললেন, ‘কাল সকাল অবধি দোটার নথো ছিলুম,—পুলকের জন্য ভক্তিমূলক পত্র লিখি, না আপনার সঙ্গে ভিড়ে পড়ি। কালকের কাণ্ডকারখানার পর আর বিশ্বা নেই। থ্রিল ইন্ড বোটর দ্যান ভক্তি। সেই বাস্তবে কিছু পেলেন?’

‘একটা সোডালো বছরের পুরনো ডায়েরি থেকে জ্ঞানগাম যে, টমাস গডউইনের কবর খুঁড়লে হয়তো একটা পেরিগ্যাল রিপোর্টার পাওয়া যেতে পারে।’

‘কী পিটার?’

‘চলুন, বেরিয়ে পড়া যাক। পেট্রোল কত আছে?’

‘দশ লিটার ভরলুম তো আজ সকালেই।’

‘ওহা খোরাধুরি আছে।’

পার্ক অংশন হাউসে ঢুকেই ফেলুদার ভুরুটা কঁচকে গেল।

‘আসুন, মিস্টার ব্রিড্জার! কী সৌভাগ্য আমার। কোনও নতুন কেস-
ট্রেস নাকি?’

বিকাশবাবু এগিয়ে এসেছেন। বেশ চকচকে নাদসনবুস চেহারা, গাল
ভর্তি পান। কেন জানি সেখানেই মনে হয় নর্থ কালকটির লোক।

‘আপনার যে সৌভাগ্য সে ওঃ দেখতেই পাচ্ছি,’ বলল ফেলুদা।
‘এই সেদিন দেখলাম গোলি আষ্টেক ছোট বড় ঘড়ি সজ্ঞানো রয়েছে;
এর মধ্যেই সব বিক্রি হয়ে গেল?’

‘কেন? কী ঘড়ি চাই আপনার? ওয়াল ক্লক? অ্যালার্ম ক্লক?’

ফেলুদা তখনও এদিক ওদিক দেখছে। বিকাশবাবুকে দেখে কেন
জানি মনে হচ্ছিল যে ঊনি ওই খটমট নমাওয়াল ঘড়ির বিষয় কিছু
জানবেন না। ফেলুদার প্রশ্ন শুনে বললেন, ‘রিপিটার মোধহুয় এক
রকমের অ্যালার্ম ঘড়ি। তবে পেরিগ্যাল ঠিক কুলাম না। তা ঘড়ির
বিসয়ে জানার জন্য তো খুব ভাল লোক রয়েছে। তার বাড়িতে শুনেছি
আড়াইশো রকম ঘড়ি আছে। ঘড়ি-পাগল্য লোক আর কী।’

‘কার কথা বলছেন?’

‘মিস্টার চৌধুরী। মহাদেব চৌধুরী।’

‘বাস্তাবি?’

‘বাস্তাবি হলোও মনে হয় পশ্চিম-টপ্পিমে মানুষ। ভাঙা-ভাঙা বলেন
বাণো। বেশির ভাগ ইংরিজিই বলেন। এলেমদার লোক। আগে বাসে
ছিলেন, এখন কলকাতায় এয়েছেন। আর এসেই, যা পাচ্ছেন—একটু
ভাল হলেই—কিনে নিচ্ছেন। অবিশি পুরনো হওয়া চাই। আপনি যে
বলছেন এখানে ঘড়ি দেখছেন না, তার বেশির ভাগই আপনি দেখতে
পাবেন ওর বাড়িতে গেলে। আর লোকটা জানেও। আপনি একবারটি
সিয়ে কথা বলে দেখুন না। কানজে বিজ্ঞাপন দিচ্ছেলি—দেখেননি?’

‘কী বিজ্ঞাপন?’

‘তার কাছ থেকে কোনও পুরনো ঘড়ি বিক্রি থাকলে ওর সঙ্গে
যোগাযোগ করতে।’

‘স্লোকটিকে একটি পুরোদস্তুর কলকাতার বলে মনে হচ্ছে?’

‘বাকবা—প্রথম মিল, সিনেমা হাউস, চা, জুট, রোসের ঘোড়া, ইম্পোর্ট-এক্সপোর্ট কী চাই আপনার?’

‘ঠিকানা জানেন?’

‘জানি বইকী। কলকাতায় আলিপুর পার্ক, আর তা ছাড়া পেনেটিভে গঙ্গার ধারে একটা বাড়ি কিনেছে। ওখানেই কাছাকাছির মধ্যে কাপড়ের দোকান ছিল। এখন বোধহয় কলকাতায় আছে, তবে আপনারা সকালে না গিয়ে বিকেলে যাবেন; এখন অফিসে থাকবেন।...দাঁড়ান, ঠিকানাটা লিখে দিচ্ছি।’

মহাদেব চৌধুরীর ঠিকানা নিয়ে আমরা পার্ক অফশন হাউস থেকে বেরিয়ে পড়লাম। ‘আপনারা এক কাজ করুন,’ ফেলুদা গাড়িতে উঠে বলল, ‘আমাকে ন্যাশনাল সাইব্রেরির এসপ্লানেড রিডিং রুমে নামিয়ে দিবে একবারটা পার্ক স্ট্রিট গোরস্থানে গিয়ে দেখে আসুন তো রিপোর্ট করার মতো কিছু আছে কিনা।’

‘রিপোর্ট?’—লালমোহনবাবুর গলা আর স্টেডি নেই।

‘হ্যাঁ, রিপোর্ট। আর কিছু দেখবার দরকার নেই, শুধু গডউইনের সমাধিটা একবার দেখে আসবেন। এ দু দিন জল হয়নি, জামগাটা শুকনোই পাবেন। ওখানে কাজ সেরে চলে আসবেন আমার কাছে, তারপর বাইরে কোথাও খেয়ে নেওয়া যাবে। এখন আর বাড়ি ফেরার কোনও মানে হয় না। অনেক কাজ; একবার রিপন লেনেও বেতে হবে।’

ফেলুদা গডউইন সাহেবের বাস্কাটা ছাল করে ব্লাউন কাগজে প্যাক করে সঙ্গেই এনেছে, আর সব সময় বগলদাবা করে রেখেছে।

‘অবিশ্যি দিনের বেলা আর ভয়ের কী আছে বলুন,’ বললেন লালমোহনবাবু, ‘সন্দের দিকটাতেই একটু ইয়ে-ইয়ে লাগে।’

‘মন যদি কুসংস্কারের ডিপো না হয় তা হলে ভুতের ভয় কোনও সময়ই নেই।’

এসপ্লানেডের পথে একটা ট্রাফিক জ্যামে পড়ে অপেক্ষা করার ফাঁকে লালমোহনবাবু বললেন, ‘আপনি যে ঘড়ির খোঁজ করছেন, সে কি টার্ক-যক্তি?’

‘সে তো জিনি না এখনও।’

‘সাঁক-ঘড়ি যদি হয় তো আমার কাছে একটা আছে।’

‘ক’র ঘড়ি?’

‘যার ঘড়ি তার তিনটে জিনিস রয়েছে আমার কাছে—ঘড়ি, ইড়ি আর পাগড়ি। হুস্তফাদারের জিনিস। সেট প্যারীচরণ পরোপাখ্যায়। আস্হা, প্যারী নামটা কোথেকে এল মশাই?’

‘এখানেই ছিল,’ বলল ফেলুদা। ‘আপনি বাংলা রাইটার হয়ে প্যারী মানে জানেন না? প্যারী হল রাখার আর এক নাম। যেমন রাধিকাচরণ, তেমনি প্যারীচরণ।’

‘খ্যাত ইউ স্যার। যা হোক, যা বলছিলেন—ঘড়িটা ভাবছি আপনাকে দিয়ে দেব।’

ফেলুদা বেশ অবাক।

‘হ্যাঁ?’

‘একটা কিছু দেব দেব করছিলেন ক-দিন থেকে; আমার হিন্দি ছবিও সকলোর পিছনে তো আপনার অবদান কম নয়।—আর তার মানে এই পাড়িটা হওয়ার পিছনেও। হয়তো দেখবেন এ ঘড়িও সেই পেরিপেটার না কী বলছিলেন, সে জিনিস।’

‘সেটার চাল কম। তবে আপনি যে জিনিসটা অফার করলেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমার কাছে খুব বড়ো থাকবে এটা কথা দিতে পারি। ঊনবিংশ শতাব্দীর জিনিস তো আর ব্যবহার করা যায় না—তবে দম দেব রোজ। ঘড়িটা চলে?’

‘নিশ্চয়।’

ফেলুদাকে নামিয়ে দিয়ে যখন আমরা গোরস্থানে পৌঁছলাম তখন প্রায় বারোটা বাজে। এখানে কাজ সেরে ফেলুদাকে তুলে নিয়ে আমরা যাব নিজামে মর্টিন রোল খেতে। এটা ফেলুদারই প্ল্যান, ও-ই বাওঁয়াবে। অবিশ্যি তার আগে বাওঁরা হবে রিপন লেনে বাক্স ফেরত দিতে।

পার্ক স্ট্রিটে এ সময়টা ট্রাফিক কম, শুই দুপুর হওয়া সত্ত্বেও গোরস্থানের পরিবেশটা বেশ নিরিবিধি। গেট দিয়ে ঢুকে দু-একবার ডাকাডাকি করেও বরমদেও দারোগানের দেখা পেলাম না। সে আবার



ইদারের সংস্কার করতে কোনও যোগ্যের পিছনে গেছে কিনা কে জানে।

আমরা মাঝখানের পথটা নিয়ে এগিয়ে গেলাম। লালমোহনবাবুকে যতই ঠাট্টা করি না কেন, আর ফেঞ্চুলা কুসংস্কারের কথা যাই বলুক না কেন, এই গোরস্থানটার ভিতরে দু'বলে সহস্রের খানিকটা কম পড়ে যায় ঠিকই। শুধু সমাধিগুলো থাকলেও না হয় হত; তার উপরে এত গাছপালা, এত ঝোপঝাড় আগাছা কচুবনে ছেয়ে আছে জায়গাটা যে, ভাতে হুমহুমে ভাবটা আরও বেড়ে যায়। অবিশি লালমোহনবাবু যতটা বাড়াবাড়ি করছেন, ততটা করার মতো ভয়ের কারণ দিনের বেলা কী থাকতে পারে জানি না। উল্লসকে এসোতে এসোতে আড়াচোখে ফলকগুলোর দিকে দেখছেন আর সমানে মন্ত্র আওড়ানোর মতো করে বিড়বিড় করছেন। কী যে বলছেন সেটা কান পেতে শুনে তবে বুঝতে পারলাম। সেটা শোনার মতোই বটে।

‘দোহাই পামার সাহেব, দোহাই হ্যামিগলিন সাহেব, দোহাই শ্বিথ মেমসাহেব—ঘাড়টি মটকিও না বাবা, কাজে ব্যাগড়া দিয়ো না। তোমরা অনেক দিগ্বেচ, অনেক নিগ্বেচ, অনেক শিখিয়েচ, অনেক ঠেঠিয়েচ...ক্যামেল সাহেব, অ্যাক্সাম সাহেব, আর—হঁ হঁ—তোমার নামের তো বাবা উচ্চারণ জানি না।—দোহাই বাবা, তোমরা ধুলো, ধুলো হয়েই থাকে বাবা, ধুলো...ধুলো...’

আমি আর থাকতে পারলাম না। বললাম, ‘কী ধুলো-ধুলো করছেন?’

‘ছেলেবেলায় পড়িচি যে বাবা তপ্পল—ডাস্ট দাউ অর্ট, টু ডাস্ট রিটার্নেস্ট। এ সবই তো ধুলো।’

‘তাহলে আর ভয় কীসের?’

‘কবির বা লেখে সব কি আর সত্যি?’

আমরা বাঁয়ের মোড় ঘুরেছি। গাছ এখনও পড়ে আছে। মাটি শুকনো। অনেক মাটি। চমাস গডউইনের সমাধি ঘিরে মাটির টিবি।

‘ধুলো...ধুলো...ধুলো...’

লালমোহনবাবু খেন মনে সাহস আনার জন্যই যান্ত্রিক মানুষের মতো কথাটা বলতে বলতে গডউইনের সমাধির দিকে এগিয়ে

গেলেন। তারপর তাকে তিনবার 'ক' আর দু'বার 'কং' কথাটা বলতে শুনলাম, আর তারপরই তিনি দাঁত কপাটি লেগে কাটা গাছের মতো মটান পড়ে গেলেন মাটির ঢিবির ওপর।

তার পা দেখানে পাড়েছে তার পর থেকেই শুরু হয়েছে একটা গর্ত, সেটা প্রায় এক-মানুষ গভীর, আর সেই গর্তের মাটির ভিতর থেকে উঁকি মারছে একটা মড়ার খুলি।

॥ ৮ ॥

যদিও বিশেষ কাকুনীতে লালমোহনবাবুর জ্ঞান ফিরে না এলে সত্যিই মুশকিল হত। কারণ এরকম অবস্থায় এর আগে আমি কখনও পড়িনি। ভদ্রলোক গায়ের খুলোমাটি খেঁড়ে বললেন সাহিত্যিকদের নাকি সহজে অজ্ঞান হবার একটা টেনডেন্সি আছে, বিশেষত ভয় পেলে, কারণ তাদের কল্পনাশক্তি সাধারণ লোকের চেয়ে অনেক বেশি ধারালো। 'তোমার দাদা যে কুসংস্কারের কথাটা বললেন সেটা একদম বাজে। আমার মতো ওসব ইয়ে একদম নেই।'

আমরা অবিশ্যি আর এক মিনিটও সময় নষ্ট না করে সোজা চলে গিয়েছিলাম ফেলুদার কাছে। ওর কাজও শেষ হয়ে গিয়েছিল; না হলেও শু যে এমন খবর শুনে সব কাজ ফেলে গোরস্থানে চলে আসবে সেটা জ্ঞানতায়। গডউইনের সমাধি দেখে, মাটির ভিতর থেকে উঁকি মারা প্রায় দেড়শো বছরের পুরনো মড়ার খুলি দেখে আর চারিদিকটা ভাল করে সার্চ করে সমাধি থেকে হাত দশেক দূরে পড়ে থাকা একটা কেদার ছাড়া আর কিছু পেল না ফেলুদা।

এবারে অবিশ্যি দারোয়ানের সঙ্গে দেখা হল। সে বলল তার ভাতিজার পানের দোকান আছে কাছেই লোয়ারে সার্কুলার রোডের মোড়ে, সেখানে একটা ছরুনি কথা বলতে গিয়েছিল। সে কবর খোঁড়ার ঘটনা কিছুই জানে না। তার বিশ্বাস ঘটনাটা আগের রাতে ঘটেছে, আর যারা করেছে তারা পাঁচিল উপক্কে এসেছে। ফেলুদা দারোয়ানের সাহায্যে মিনিট পনেরোর মধ্যে মাটি আর গাছের পাতা দিয়ে গর্তটা মোটামুটি বুজিয়ে দিল। যাবার সময় দারোয়ানকে বলে



গেজ গটনাটা সে যেন কাউকে না বলে।

গোরস্থান থেকে আমরা সোজা চলে সেলাম রিপন লেনে।

চোদ্দ বাই একের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে আমাদের একটু বাধা পড়ল। একজন নামছেন সিঁড়ি দিয়ে, তার হাতে একটা লম্বা চামড়ার কেস। গিটারের কেস। বছর পঁচিশেক বয়সের একজন যুবক। এ ধরনের চেহারা যে কোনও সময়ে, বিশেষ করে সন্দের দিকে, পার্ক স্ট্রিটে গেলেই দেখা যায়, কাজেই কখনো দেবার দরকার নেই। ক্রিস গডউইন এই যে বেরল, ফিরবে বোধহয় সেই রাতে, ব্লু-ফ্লোর বাজনা সেয়ে।

দেতিলা আজ আর কালকের মতো নিস্তরু নয়; বৈঠকখানার গলাবাঁজি চলেছে। একটা গলা; আমাদের চেনা; অন্যটা মনে হয় তিন তলার সাহেবের। প্রথম গলা বিশী ভাষায় ধমকাচ্ছে, আর দ্বিতীয় গলা ইনিয়ে-বিনিয়ে দোষ অস্বীকার করছে। 'কাসকেট' কথাটা বার বার ব্যবহার করছেন দু জনেই।

কেলুদা বারান্দায় গিয়ে বৈঠকখানার দরজায় ঢোকা মারল। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণের মতো শোনা গেল 'কৌন হ্যায়'। আমরা তিনজনেনেই চৌকাঠ পেরোলাম। অচেনা ভদ্রলোকটির গায়ের রং হলদে, সর্বাস্থে মেচেতা, মাথায় টাক, দুটো দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো, বয়স ষাট-পঁয়ষাট। ভদ্রলোক আমাদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিলেন, কেলুদা তাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গিয়ে হাতের বাজটা মোড়ক খুলে সোফায় বসে। গডউইনের দিকে এগিয়ে দিল।

'এটা কাল নিয়ে ফাবার লোভ সামলাতে পারিনি। আমার রিসার্চে প্রচুর সাহায্য করবে।'

গডউইন বাজটা পেয়ে এক মুহূর্ত হতভম্ব থেকে তারপর অটোমাসিতে ফেটে পড়ল।

'সো ইউ কুলড দেম, ইউ কুলড দেম! দোজ ফুলস!—ধূর্ত, ঠগ, জোচ্ছোরা।'—এবার শুধু রাগ আর বিদ্বেষ, আর তার সবটা গিয়ে পড়েছে অন্য ভদ্রলোকটির উপর।—টম গডউইনের প্রেতাত্মা নিয়ে গেছে তার বাজ? ইনি কি টম গডউইনের প্রেতাত্মা?—দিস জেনটলম্যান? কী মনে হয় তোমার?—এই যে, ইনিই হচ্ছেন মিস্টার অ্যারাকিস, আমার তিনতলার প্রতিবেশী, যার টেবিলের ছটকটানি

আমার প্রত্যেক বিষ্ময়কর সঙ্কেতগুলোকে মাটি করে দেয়।’

মিস্টার অ্যারাকিস বোকার মতো বাস্তবতার দিকে ঝুঁয়ে ছিলেন; এবারে তাঁর দৃষ্টি গেল ফেলুদার দিকে। তারপর আবার বোকার মতো দৃষ্টি ঘুরিয়ে দরজার দিকে এগোতে গিছেই তাঁকে ধরে যেতে হল। ফেলুদা তার নাম ধরে ডেকেছে।

‘মিস্টার অ্যারাকিস!’

ভদ্রলোক ফেলুদার দিকে চাইলেন। ফেলুদা ধীরকণ্ঠে বলল, ‘এই বাস্তব একটা জিনিস বোধহয় আপনার কাছে রয়ে গেছে।’

‘সার্ভেনলি নট!’ অ্যারাকিস গর্জিয়ে উঠলেন। ‘আর সেটা আপনিই বা বুঝছেন কী করে? মার্কাস, তুমি বাস্তব খুলে দেখে নাও তো কোনও জিনিস কম পড়ছে কিনা।’

এতক্ষণে জানলাম মি. গডউইনের প্রথম নাম, আর সেই সঙ্গে অ্যাকিস-মার্কিস রহস্যের সমাধান হল।

মার্কাস গডউইন বাস্তব খুলে তার ভিতর হাতড়ে দেখে একটু কিঙ্ক-কিঙ্ক ভাব করে বললেন, ‘কই মি. মিটার, এতে তো সব জিনিসই আছে বলে মনে হচ্ছে।’

‘ওই নমির কৌটোটা একবার বার করবেন কি?—যেটার বর্ণনা শার্লট গডউইন তার ডায়ারিতে দিয়েছেন এবং বলেছেন ওর গায়ে পায়া চুনি এবং নীলা বসানো ছিল?’

মি. গডউইন কৌটো বার করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন।

ফেলুদা বলল, ‘বুঝতে পারছেন কি যে, শুটা একটা শস্তা নতুন কৌটো, যাতে কালো রং মাখিয়ে পুরনো করার চেষ্টা করেছিলেন মি. অ্যারাকিস?’

পাঁচ মিনিটের মধ্যে ওপর থেকে আসল নমির কৌটো এনে দিলেন মিস্টার অ্যারাকিস, আর মি. গডউইন তাকে দিয়ে ইশারার দোহাই দিয়ে বলিতে নিলেন যে, সামনের বিষ্ময়কর যদি আবার খটখটানি শোনে তা হলেই পুলিশে খবর দেবেন। কালো মুখ করে চোর অ্যারাকিস চোরের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

‘থ্যাংক ইউ, মিস্টার মিটার,’ হাঁপ ছেড়ে বললেন মার্কাস গডউইন।

শার্লট গডউইনের ডায়ারি যে কত মূল্যবান জিনিস সেটা আপনি

জানেন?’ প্রশ্ন ফেলল তার।

না। শার্গিট গডউইনের ডায়েরি ওই বাসে রয়েছে তা আমি জানতাম না।’ বললেন মার্কস গডউইন। ‘তবে একটা কথা আমি আপনাকে বলছি মি. মিটার—আমার পূর্বপুরুষদের নিয়ে আমার সম্প্রদায় কৌতূহল নেই। সন্তি বলতে কী আমার কোনও বিষয়েই কোনও কৌতূহল নেই। এখন শুধু মরার দিনটির জন্য অপেক্ষা। ওই বেড়াল ছাড়া আর আমার আপন বলতে কেউ নেই। সন্ধ্যাবেলা একজনকে বাড়িতে গিয়ে পোকের খেলতাম, এমন গাউন্টের জন্য তাও পারি না।’

‘তাহলে প্রশ্নগুলো করে বোধহয় লাভ নেই।’

‘কী প্রশ্ন?’

‘আপনার ঠাকুরদাদার বাবার নাম ছিল ডেভিড, যার সমাধি রয়েছে সার্কুলার রোড গোরস্থানে।’

‘ইয়েস।’

‘ডেভিডের আর কোনও ভাই বা বোন ছিল কি?’

‘মনে নেই। আমার এক পূর্বপুরুষ আত্মহত্যা করেছিলেন। সে কিনা মনে নেই।’

‘ডেভিডের ছেলে, অর্থাৎ আপনার ঠাকুরদাদার নাম ছিল অ্যান্ড্রু?’

‘ইয়েস। হি ওয়াজ ইন দি আর্মি।’

‘শার্গিট গডউইন তার এক ভাইঝি বা বোনঝির কথা লিখেছেন। হিসেব করে দেখা যাচ্ছে, তিনি আপনার ঠাকুরদার আপন বোন কিংবা—’

‘আমার ঠাকুরদাদার কোনও ভাই-বোন ছিল না।’

‘তাহলে কাজিন।’

‘তাদের সংক্ষেপে আমি কিছু বলতে পারব না, মি. মিটার। আমার অরুণশক্তি অনেকদিন থেকেই ক্ষীণ হয়ে আসছে। তা ছাড়া আমাদের পরিবার তোমাদের মতো কাছাকাছি থাকে না। তারা সব হিটকে ছড়িয়ে পড়ে। এ তো আর তোমাদের বাঙালিদের একান্তকর্তী পরিবার নয়।’

সেমাট সিনেমার সামনে নিখামেতে বসে মর্টন রোস খেতে

খেতে ফেলুদা লালমোহনবাবুকে একটা প্রশ্ন করল।

‘নরেন বিশ্বাস লোকটাকে আপনার কেমন মনে হয়?’

লালমোহনবাবু চিবনো শেষ করে ঢোক দিলে বললেন, ‘ভালই তো। চোখের মধ্যে বেশ একটা ইয়ে ভাব আছে।’

‘আগারও তাই মনে হয়েছিল।’

‘এখন আর হচ্ছে না?’

‘অবিশ্যি একটা সেরেই একটা মানুষের গোটা চরিত্র নষ্ট করে দেয় না। কিন্তু এটা বলতেই হয় যে, ভদ্রলোক একটা মারাত্মক অন্যায় করে ফেলেছেন।’

আমরা দু জনেই খাওয়া ধামালাম।

‘আজ প্রমাণ পেলাম যে, গর মানিব্যাংকের কাটিং দুটো ন্যাশনাল লাইব্রেরির রীডিং রুমে সফরে রাখিত দেড়শো দুশো বছরের পুরনো খবরের কাগজ থেকে ব্রেড নিয়ে কেটে নেওয়া। আমার মতে, এ অপরাধের জন্য মানুষের জেল হওয়া উচিত।’

আমি কল্পনা করতে চেষ্টা করলাম নরেনবাবু রিডিং রুমে বসে দম বন্ধ করে গোপনে কর্মচারীদের দৃষ্টি এড়িয়ে এই দুর্কর্মটি করছেন, কিন্তু পারলাম না। সত্যি, মানুষকে দেখে চেনার উপায় নেই।

‘এটা একটা রোগ বলতে পারেন,’ ফেলুদা বলে চলল, ‘আর এ ঘরনের অন্যায় কাজ খরা না পড়ে সাক্ষেসফুলি করতে পারলে মানুষ একটা উৎকট আনন্দও পায়, নিজেকে আর পাঁচজনের চেয়ে বেশি চতুর মনে করে একটা আত্মতৃপ্তি অনুভব করে। ভেরি স্যাড।’

মটিন রোলের পর লনিয়ার অর্ডারের সঙ্গে সঙ্গে ফেলুদা বিলটাও আনতে বলে দিল। যড়িতে বসছে আড়াইটা। আরও তিন ঘণ্টা সময় কাটিয়ে তারপর যেতে হবে ঘড়ি-পাগল মিস্টার চৌধুরীর বাড়িতে। আমি জানি পেরিগ্যাল রিপিটারের সমস্যা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত ফেলুদারে সোয়াস্তি নেই।

‘আচ্ছা মশাই, হাড়গিলেও কি এইভাবে খাবারের প্রত্যাশার ছানালার উপর বসে হাঁক পাড়ত নাকি?’

আমাদের পাশেই রুস্তার দিকে একটা ছানালা, তার উপর একটা কাক বসে বেশ কিছুক্ষণ থেকে কাক-কাক করছে। সেইটের দিকে

তাকিয়েই লালমোহনবাবু প্রস্তুত করেছেন।

‘সম্ভবত না’, বলল ফেলুদা, ‘অন্য বাড়ির আসমে বা ছাতের পাঁচিলে যে বসন্ত তার অনেক প্রমাণ পুরনো ছবিও আছে।’

‘আশ্চর্য, পাঁচিলের ওহারা যে কীরকম তাই জানি না।’

‘জানার একটা উপায় হচ্ছে চিড়িয়াখানায় যাওয়া। আর না হয় চলুন কর্পোরেশন স্ট্রিট দিয়ে বেরোব। মিউনিসিপ্যাল বিল্ডিং-এর সামনেই কর্পোরেশনের সিঙ্গেল হাউসিংয়ের ওহারা দেখিয়ে দেব।’

‘আপনি এখনও কর্পোরেশন স্ট্রিট বলাছেন?’ হেসে বললেন কটায়া।

‘থুড়ি, সুরেন ব্যানার্জি—’

ফেলুদা খেমে গেল। চোখের চাহনি চেপে। পকেট থেকে খাতা বার করে কী জানি দেখল। তারপরেই ছটফটে ডাব, কারণ বিল দিতে নেরি করছে। ফেলুদা বেয়ারা বলে হাঁক দিল—যোটা সচরাচর করে না। বিল দিয়ে গাড়িতে উঠে জ্বাইভার হরিপদকে নির্দেশ দিয়ে দিল। গাড়ি সুরেন ব্যানার্জি রোডে গিয়ে পড়ল। ফেলুদা বাড়ির নম্বর দেখছে, যদিও সব বাড়িতে নম্বর নেই—কলকাতার এই আরেকটা কেলেক্টারি। ‘আরেকটু এগিয়ে যাব তাই।...তোপসে, ১৪১ দেখলেই বলবি।’

যানে পড়ে গেল—১৪১ SNAR। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি। বুকটা টিপ্ টিপ্ করছে।

‘ওই যে একশো একচল্লিশ।’

গাড়ি থামল। বাড়ির গায়ে লেখা Bourne & Shepherd-BS! পাওয়া গেছে। মিলে গেছে।

ফেলুদার সঙ্গে আমরা দু জনও ভিতরে ঢুকলাম। লিফ্ট দিয়ে উঠতে হবে।

দোতলায় লিফ্ট থেকে বেরিয়েই একটা সোফা-বেঞ্চি পাতা ঘর। একজন কর্মচারী আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। ফেলুদার ইতস্তত ডাব, কারণ যে প্রস্তুত করতে হল সেটায় একটা বেকুবি গন্ধ থাকতে বাধ্য।

‘ইয়ে—ভিক্টোরিয়ার কোনও ছবি আছে আপনার এখানে?’

‘ভিক্টোরিয়া মোমোরিয়াল?’

‘না। কুইন ভিক্টোরিয়া।’

‘আজ্ঞে না। আমাদের এখানে শুধু তারা ভারতবর্ষে এসেছেন তাদের ছবি পাবেন। এডওয়ার্ড দা মেভেন্থ পাবেন—যখন প্রিন্স অফ ওয়েলস্ হিটেন—জর্জ দ্য ফিফ্‌থ, দি’স্টার দরবার...’

‘এ সব এখনও পওয়া যায়?’

‘প্রিন্স জেরি থাকে না। নেগেটিভ আছে; অর্ডার দিলে করে দিই। ১৮৫৪ থেকে সব নেগেটিভ রাখা আছে।’

‘বলেন কী! আঠারোশো চ্যাপট?’

‘কেন অ্যাণ্ড শেপার্ড হল পৃথিবীর দ্বিতীয় প্রাচীনতম ফোটোর দোকান।’

‘তার মানে তো হাজার হাজার নেগেটিভ থাকবে আপনার এখানে!’

‘আসুন না, দেখিয়ে দিছি। ওই যে দেখুন দেয়ালে ঝুলছে— ১৮৮৩-তে মনুমেন্টের উপর থেকে তোলা ছবি।’

এতক্ষণ দেখিনি, এবার বসতে চোখ গেল। এক হাত বাই পাঁচ হাত সাইজের ছবি। মনুমেন্টের উপর থেকে প্রায় একশো বছর আগের কলকাতা শহর। ডালহৌসি-এসক্যান্ড থেকে শুরু করে উত্তরে যতদূর দেখা যায়। গির্জাগুলির মাথা অন্য সব বাড়িকে ছাপিয়ে উঠেছে। ত্রিশোমানার একটাও হাইরইজ নেই। দেখলেই বোঝা যায় শান্ত শহর।

নেগেটিভের ঘর দেখে চোখ টেরিয়ে গেল। ঘরের চার দেয়ালের মোঝা থেকে সিলিং অবধি শেলফ উঠে গেছে, আর প্রত্যেকটি শেলফ ব্রডিন রঙের চ্যাপটা চ্যাপটা বাক্সে ঠাসা। প্রত্যেক বাক্সের গায়ে লেখা রয়েছে তাতে কোন সালের কী ধরনের ছবি রয়েছে।

ফেরুদা শেলফগুলোর সমনে ঘুরে ঘুরে লেখাগুলোর দিকে বিচক্ষণ খুব মন দিয়ে দেখে হাতের রিস্টওয়াচটার দিকে একবার চেয়ে আমাদের দিকে ফিরে বলল, ‘তোরা ঘটাখানেক ঘুরে আয়; আমার একটু কাজ আছে এখনো।’

লিফটে উঠে লালমোহনবাবু বললেন, ‘তোমার দাদার লুকুম শিরোধারী। ওই একটা পোককে না বলা যায় না। কী পার্সোনালিটি! চলো একটাবার ফ্র্যাঙ্ক রস্-এ।’

গাড়িটা সুরেন ক্যানার্জি রোডেই থেবে আমরা চৌরঙ্গি দিয়ে গ্র্যান্ড হোটেলের দিকে হাটতে লাগলাম। লালমোহনবাবু কী ওষুধ কিনবেন জানি না, জানার দরকারও নেই। উদ্দেশ্য কেবল সময় কাটানো।

ভিড়ের মধ্যে কসিনান বাঁচিয়ে কিছুদূর এগোনোর পর ভদ্রলোক বললেন, 'কিছু বুঝতে পারছ ভাই ভগ্নেশ—তোমার দাবার মতিগতি?'

বলতে বাধ্য হলাম যে কিছুই বুঝছি না, তবে এটুকু আন্দাজ করতে পারছি যে, ফেলুনা ছাড়াও আরেকজন কেউ শার্লট গডউইনের ডায়রি পড়েছে, আর সেই পড়ার সঙ্গে টমাস গডউইনের কবর খোঁড়ার একটা সম্পর্ক রয়েছে।

'দুশো বছর মাটির নীচে থাকার পরও যে দেহ কফাল অবস্থায় থাকে সেটা তুমি জানতে?' জটায়ু জিজ্ঞেস করলেন।

এ ব্যাপারে জোব চার্নকের মৃতদেহ নিয়ে একটা ঘটনা ফেলুনা আমাকে বলেছিল; সেটা লালমোহনবাবুকে বললাম। চার্নক মারা যাবার দুশো বছর পরে সেন্ট জন্স গির্জার একজন পাদ্রির মনে হঠাৎ সন্দেহ ঢোকে চার্নকের সমাধিটা সত্যিই সমাধি ভো, নাকি এমনিই একটা স্তম্ভ খাড়া করা হয়েছে। সন্দেহটা এমনিই পেয়ে বসে যে, পাদ্রি শেষে লোক দিয়ে মাটি খোঁড়ালেন। চার ফুট নীচে পর্যন্ত কিছু পাওয়া গেল না, কিন্তু আর দু ফুট খুঁড়তেই একটা কফালের হাত বেরিয়ে পড়ল। পাদ্রি মানে মানে গর্ত বুজিয়ে দিলেন।

ফ্র্যাঙ্ক রস—এ গিরে লালমোহনবাবু যখন কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন 'ওয়ান ফরহানস ফর দি গার্স ফ্যামিলি সাইড', ঠিক তখনই লক্ষ করলাম দোকানে একজন চেনা লোক ঢুকছেন। তিনি অবিষ্টি আমাদের দেখামাত্র চেনেননি; ব্যর দু-তিন আমাদের দিকে তাকিয়ে ভারপর মুখে হাসিটা এল। নরেনবাবুর ভাই গিরীনবাবু। হাতে একটা বড় বাস, 'তাতে লেখা হকং জুই ফ্রিনারস। বললেন, 'দাদার জন্য ওষুধ নিতে এসেছি।'

'কেমন আছেন নরেনবাবু?' জিজ্ঞেস করলেন জটায়ু।

'দাদা বেটার। ভাল কথা—আপনাদের সঙ্গে সেদিন যিনি ছিলেন তিনিই নাকি গোয়েন্দা প্রদেয় মিস্ত্রি? দাদা দিগেন খবরটা। ভদ্রলোকের নাম শুনেছি আগে। ভাবছিলাম—'

গিরীনবাবু ভুরু কুঁচকে একটু যেন অনমনস্ক হলেন। তারপর চললেন, 'ওঁকে বাড়িতে পাওয়া যায় কখন?'

'সেটা ঠিক বলা মুশকিল,' জামি বললাম, 'তবে ভিন্নেরকিভাবে নথর পারেন। আপনি আসতে চাইলে আগে ফোন করে নিতে পারেন।'

'হঁ...ওঁর সঙ্গে একটু...ঠিক আছে, আমি টেলিফোন করে নেব। কলকেন প্রদোষবাবুকে, সরকার পড়লে যাব—হেঁ হেঁ...'

আমরাও হেঁ হেঁ করতে করতে ভদ্রলোকের কাছে ফিলাফ নিয়ে বেরিয়ে এলাম।

নিউ মার্কেটে একটা চকর ঘেরে মতিশীল স্ট্রিট নিয়ে সুকেন বানার্জিতে পড়লাম। বোর্ন অ্যান্ড শেপার্ডের সম্মুখে এসে দেখি ফেলুদা বাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ওর বগল নাকি যা আন্দাজ করা গিয়েছিল তার একটু আগেই শেষ হয়ে গেছে। গিরীনবাবুর সঙ্গে দেখা হবার হবরটা ফেলুদাকে দিলাম। 'বাটে?' বলল ফেলুদা, 'কী বললেন ভদ্রলোক?' আমি জ্ঞানি ফেলুদাকে ভাসাভাসাভাবে কিছু বললে চলবে না, তাই যা কথা হল সব ভিটোলে বললাম। এমনকী ভদ্রলোকের হাতে লজ্জির বাসুটার কথাও বললাম। ফেলুদা চুপ করে শুনে গেল। 'কাজ কেমন হল?' লালমোহনবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'কার্ট ক্লাস,' বলল ফেলুদা, 'একেবারে নতুন। আর ওখান থেকে ফোন করে জেনে নিয়েছি মি. চৌধুরী বাড়ি ফিরেছেন। পাকা অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়ে গেছে। মঞ্চমন্ডের মতো মোলারেম গলায় কথা বলেন 'ভদ্রলোক'।'

॥ ৯ ॥

বাজা-ঘড়ি বা চাইমিং ক্লক অনেক শুনেছি, কিন্তু মহাদেব চৌধুরীর বাড়িও চুকতে না-চুকতে হুটা বাজার যে সব অদ্ভুত শব্দ একটার পর একটা ঘড়ি থেকে আমাদের কানে আসতে লাগল, সে বকম ঘড়ির বাজনা আমি কেনওদিন শুনিনি। লালমোহনবাবু বললেন, 'এ যেন শর্গধরে দিয়ে চুকছি মশাই। মাসলিক বাজছে। এ সিসেপ্পন ডায়া যায় না।'

তুচ্ছতাই যে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হল তা নয়। একজন কর্মচারী গোছের লোক এসে বলল, মি. চৌধুরী ব্যস্ত আছেন, আমাদের একটু অপেক্ষা করতে হবে। আমরা একটা অপিস ঘরে গিয়ে বসলাম। এই ছোট্ট ঘরেও দুটো বাহারের হাড়ি—একটা দেড়ালে, একটা বুকশেলফের ওপর।

বাড়ির শব্দ ধামতে এখন বাড়িটা খমখমে মনে হচ্ছে। পেছায় হাল ফ্যাশানের বাড়ি, পায়ে নীচে খেতপাথরের মেঝেতে মূখ দেখা যায়।

একটা গলার দর বাড়ির ভিতর থেকে মাঝে মাঝে শুনতে পাচ্ছি; কেলুদা বলল সেটাই নাকি মহাদেব চৌধুরীর গলা। মখমল কি না সেটা এখন থেকে বোঝা মুশকিল, তবে এই গলাটাই যে হঠাৎ সন্তমে চড়ে আর মখমল রইল না সেটা বেশ বুঝতে পারলাম।

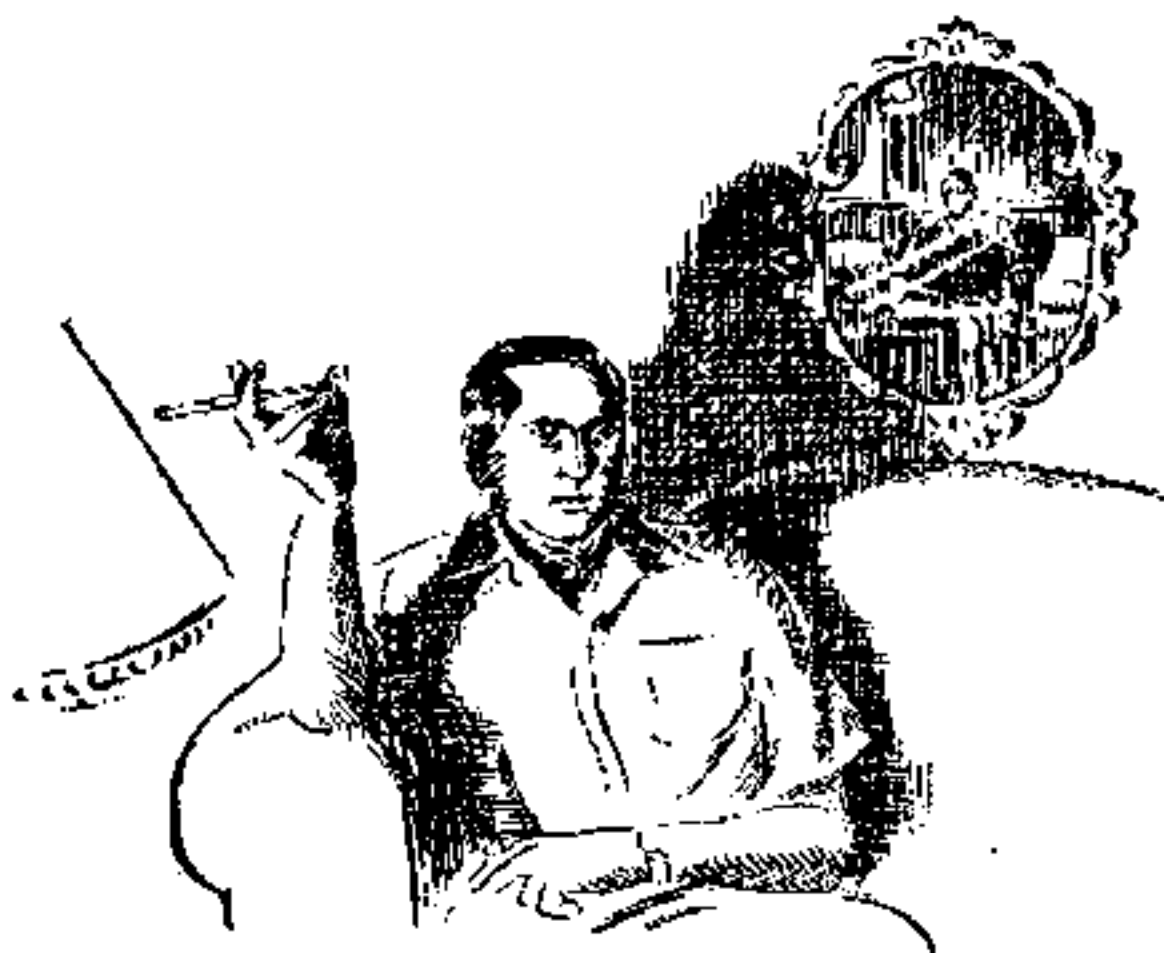
মহাদেব চৌধুরী কাকে যেন বেশম ধমক দিচ্ছেন। আমরা তিনজনে প্রায় দমক্ক করে অনিশ্চাসস্বপ্নে আড়ি পাতছি। দ্বিতীয় ব্যক্তি গলা তুলছে না, তাই তার কথা বুঝছি না। কথা হচ্ছে ইংরিজিতে। চৌধুরীর গলায় হমকানি শোনা গেল—

‘এ সব ব্যাপারে আমি অ্যাডভান্স দিই না—আপনি তত করে বললেন বলে দিলাম—আর এখন বলছেন, সে টাকা খরচ হয়ে গেছে? আপনার একটা কথাও আমি বিশ্বাস করি না। আর এই সামান্য কাজটা করতে এত টাকা কেন লাগবে সেটাও আমি বুঝছি না। যাই হোক, আমি দিছি টাকা, কিন্তু দু দিনের মধ্যে আমি মাল চাই। আমি কোনও অসুবিধার কথা শুনতে চাই না, বুঝেছেন?’

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ, তারপর একটা জুতোর শব্দ পেলাম: মনে হল সেটা সদর দরজার দিকে চলে গেল। এক মিনিটের মধ্যেই কর্মচারীটি অবার এসে—

‘আপলোগ আইরে।’

মি. চৌধুরীর মাথার চুল থেকে জুতোর ডগা পর্যন্ত সত্তাই মখমলের মতো। ভদ্রলোক দিনে দু বার নাড়ি কামান নিশ্চয়ই, নাহলে সন্ধ্যা ছ-টায় পুরুষ মানুষের গাল এত মসৃণ হয় না। (পরে লালমোহনবাবু বলেছিলেন, মনে হচ্ছিল গালে ঘাছি কসলে শিছলে যাবে)। যে বিশাল বৈঠকবানা ঘরটাতে আমরা বসেছি সেটাও মি.



চৌধুরীর মতোই পাশিশ করা। আনাচে-কানাচে কোথাও এক কণা ধুলো বা একটাও দিপড়ে বা আরশোল থাকতে পারে বলে মনে হয় না।

সোনার হোস্তারে ধরা সিগারেটে একটা টান দিখে খোঁয়া ছেড়ে ফেলুদার দিকে চেয়ে শ্রম করলেন মি. চৌধুরী—

‘ওয়েল—ঘড়িটা এনেছেন সঙ্গে?’

‘আমরা সকলেই অবাক ফেলুদা তো বটেই।

‘ঘড়ি? কী ঘড়ি বলুন তো?’ প্রশ্ন করল ফেলুদা।

‘আপনি যে বললেন একটা ঘড়ির ব্যাপারে দেখা করতে আসছেন? আমি ওটা ভাবলাম আমার বিজ্ঞাপন পড়ে ফেলন করছেন আমাদের।’

‘সাপ করছেন মিস্টার চৌধুরী—আমি আপনার বিজ্ঞাপন পড়িনি। আমার একটা ব্যাপার একটু জানার দরকার হয়ে পড়েছে, সেটা সম্ভবত

যদি সংক্রান্ত। শুভাগ আপনি যদিও বিবাহ অনেক কিছু জানেন, তাই—

মখমলে ভাঁধ পড়েছে। উদ্যোগ একটু যেন বিরক্তির সঙ্গেই
নড়েচড়ে এসে এগলেন—

‘আমার সময় বেশি নেই মি. মিটার। এতটুকু পরেই কলকাতার বাইরে
চলে যাব। আপনার কী জন্মের আছে সংক্ষেপে বলুন।’

‘পেরিগ্যাল রিপোর্টার ডিনিসটা কী সেটা জানতে চাইছিলাম।’

মখমল হঠাৎ পাথর হয়ে গেল। সিগারেট হোল্ডার ঠোঁটের কাছে
এসে দেখে গেছে। তাবের মনি পাথর, দৃষ্টি ফেলুদার দিকে, নিম্পন্দ।

‘আপনি কোথায় গেলেন নামটা?’

‘উনিবিংশ শতাব্দীর একটা ইংরেজি উপন্যাসে।’

তার কাজের সুবিধের জন্য যে ফেলুদা অলানবদনে মিথ্যে কথা
বলতে পারে সেটা আগেও দেখেছি।—‘রিপোর্টার যে যদিও হতে
পারে বন্ধুও হতে পারে সেটা অভিধানে দেখেছি, কিন্তু পেরিগ্যাল
সম্বন্ধে কেউ কিছু বলতে পারল না।’

মহাদেব টেবুলী এখনও সেইভাবেই চেয়ে আছেন ফেলুদার দিকে।
এর পরের প্রসঙ্গটাকে মখমলের সঙ্গে মেশানো একটা ধারালো ভাব
দেখা দিল।

‘আপনি কি সব সময়ই কথার মানে জানতে অচেনা লোকের বাড়ি
ধাওয়া করেন?’

‘বিশেষ প্রয়োজন হলে করি বইকী।’

আমি ভেবেছিলুম উদ্যোগ ডিজেস বসবেন বিশেষ প্রয়োজনটা
কী; কিন্তু তা না করে সেই একইভাবে ফেলুদার দিকে তাকিয়ে থেকে
যে কথাটা বললেন, তাতে আমার ডান পাশের টেবিলের উপরে ঘড়িটা
যেভাবে টিক্‌টিক্‌ করছে, আমার হৃৎপিণ্ডটাও ঠিক সেইভাবেই
টিক্‌টিক্‌ করতে আরম্ভ করে দিল।

‘আপনি ভো গোয়েন্দা, তাই না?’

ফেলুদার নার্ভের বলিহারি। জবাবটা দিতে বোধ হয় পাঁচ সেকেন্ড
দেরি হয়েছিল, কিন্তু যখন এল তখন তারও গলা মখমল।

‘আপনি খবর রাখেন দেখছি।’

‘রাখতেই হয় মিস্টার মিটার। খবর সংগ্রহের জন্য লোক থাকে।’

‘আমার হাতটা বেধ হয় ভুলে গেছেন। হয়তো উত্তরটা আপনার
জান নেই। আর যদি কেনেও জবাব না দিতে চান তা হলে আমি উঠি।
বুধা আপনার সময় নষ্ট করতে চাই না।’

‘সিট ডাউন, মিস্টার মিটার।’

ফেন্দুদা উঠে পড়েছিল, তাই এই শুকুম: লালমোহনবাবুকে দেখে
মনে হচ্ছে তার নিজের থেকে ওঁর অসহ্য নেই, ধরে উঠিয়ে দিতে হবে।

‘সিট ডাউন, পিঙ্ক।’

ফেন্দুদা বসল।

‘রিপিটার মানে কনকুও হয়’, বললেন মহাদেব চৌধুরী, ‘তবে তার
পক্ষে পেরিগ্যাল হোম দিলে সেটা হয় যদি। পকেট ওয়াচ। ফ্রান্সিস
পেরিগ্যাল। ইংলিশম্যান। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পেরিগ্যালের
মতো ঘড়ির কারিগর পৃথিবীতে কমই ছিল। দুশো বছর আগে
ইংল্যান্ডেই সবচেয়ে ভাল ঘড়ি তৈরি হত, সুইটজারল্যান্ডে নয়।’

‘আজকের দিনে একটা পেরিগ্যাল রিপিটারের দাম কত হতে পারে?’

‘সে যদি কেনার সামর্থ্য তো আপনার নেই মি. মিটার।’

‘তা জানি।’

‘আমর আছে।’

‘তাও জানি।’

‘তাহলে দাম কেনে কী হবে?’

‘কৌতুহল।’

‘ব্যর্থ কৌতুহল।’

মি. চৌধুরী সিগারেটে শেষ টান দিয়ে হোষ্টার থেকে সেটা খুলে
আশে কাঁচের আশ-ট্রেতে ফেলে দিয়ে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

‘আপনি যা জানতে চেয়েছিলেন সেটা আপনার জানা হয়ে গেছে’,
বললেন মি. চৌধুরী। ‘এবার আপনি আসুন। পেরিগ্যাল রিপিটার
চলকাতায় যেটা আছে সেটা আমিই পাব, আপনি পাবেন না।—
পদারেকাল!’

একজন কর্মচারী এসে দাঁড়াল। সেই একই লোক—যিনি আমাদের
ফ্রান্সিস ঘরে বসিয়েছিলেন। আমরা উঠে পড়লাম। যখন ঘর থেকে
বেরাচ্ছি, তখন মধ্যমালের মতো গলাটা আরেকবার শোনা গেল।

‘আমার কাছে অন্যরকম রিপিটারও আছে মি. মিটার; তবে তার আওয়াজ ঘড়ির মতো সুকোশল নয়।’

‘আপনার বর্তমান কাহিনীর নায়ক তো ইনিই বলে মনে হচ্ছে’, বললেন জটিল।

আমরা জাঙ্গিপুর্ পার্ক থেকে বিরছি। গাড়ির কাঁচ আবার ভুলে দিতে হয়েছে, কারণ বৃষ্টি। জাজেস কোর্ট রোডে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বৃষ্টিটা নেমেছে।

ফেলুদা লালমোহনবাবুর কথার কোনও জবাব না দিয়ে জানোয়ার বাইরে দৃশ্য দেখতে লাগল। লালমোহনবাবু একটানা বেশিক্ষণ কথা না বলে থাকতে পারেন না। বললেন, ‘জানি নায়ক না বলে ভিলেন বলা উচিত, কিন্তু আপনি যে বলেন ক্রাইমের ব্যাপারে সবসময়ই সন্দেহ করা উচিত—যে কেউ ভিলেন হতে পারে—তাই আর বললুম না। অবিশ্যি সন্দেহটাও যে ঠিক কী কারণে করা উচিত, সেটা এখনও আমার কাছে পরিষ্কার নয়। কবর খোঁড়াটা কি ক্রাইমের মধ্যে পড়ে?’

ফেলুদা কোনও কথারই জবাব দিচ্ছে না দেখে লালমোহনবাবু এবার অসহিষ্ণু হয়ে বললেন—‘ও মশাই, আপনি যে দমে গেলেন বলে মনে হচ্ছে! তাহলে আমাদের কী দশা হবে ভেবে দেখুন! একে তো ভদ্রলোকের হাবভাব দেখে হাড়গোড় নড়বড়ে হয়ে যাবার অবস্থা। তারপরে ওই অতগুলো ঘড়ির ঢং ঢং, আর তার উপরে আবার আপনি গুন, বাইরে বৃষ্টি, রাস্তায় গাড়ি...’

এতক্ষণে ফেলুদা মুখ খুলল।

‘আপনার অনুমান ভুল, মি. গাঙ্গুলী। আসি দমিনি মোটেই। জটিল গোলকর্ধার মধ্যে পথ পেয়ে গেছে কি লোকে দমে? বরং উল্টো!’

‘পথ পেয়ে গেছেন?’

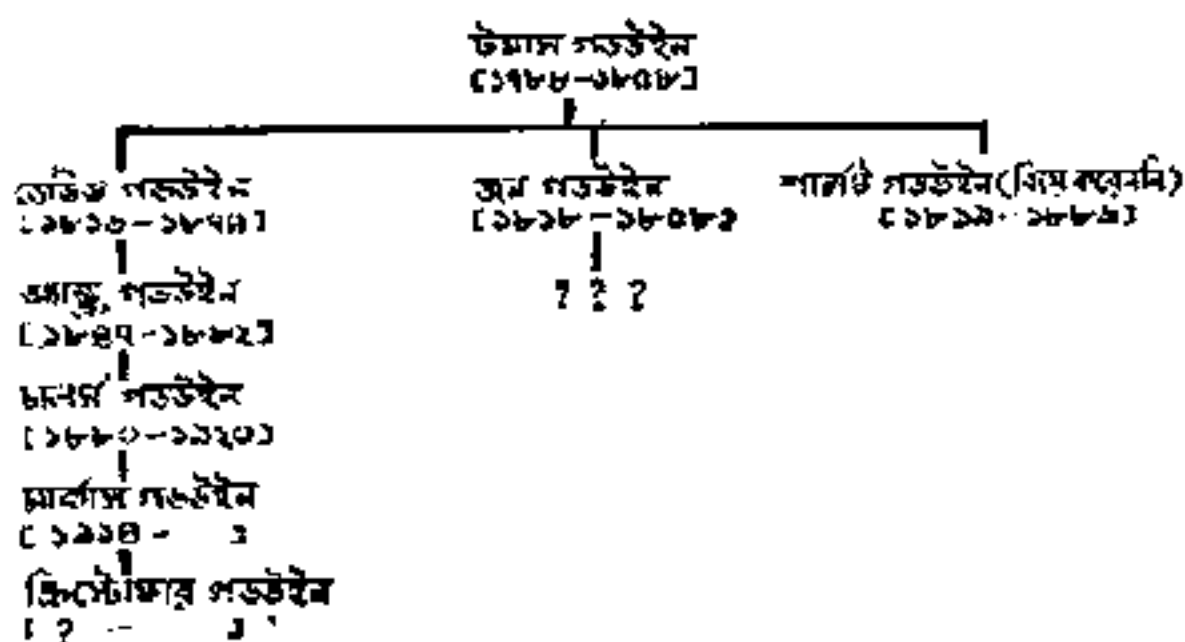
‘পেয়েছি, তবে পথের শেষে কী আছে তা এখনও জানি না। পথ অত্যন্ত ঘোরাপো। আরও বেশ কিছুটা এগালে পরে শেষ দেখা যাবে।’

আমরা বাড়ি ফেরার পরও টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়তে লাগল। লালমোহনবাবু বলে গেলেন কাল সকাল সকাল আসবেন।—‘এ ফেস্টায় আমি ছাড়া আপনার গতি নেই, ফেলুবাবু! বাস-বাসে

ধোঁয়াধূঁকি করতে গেলে আপনার কত সময় সাগত ভাবুন দিকি !'

আজ দুপুরে নিজামে এসে থাকতেই লক্ষ করেছিলাম, খেলুদা তার বাতায় কী যেন হিজিবিজি কাটছে; রাএ খাবার পর ওর ঘরে এসে জনতে পারলাম সেটা কী। ও যে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল তা নয়; এমনতেই আমার ওর জন্য ভাবনা হচ্ছিল; মহাদেব চৌধুরীকে দেখে আর তার কথা শুনে অবশি দৃষ্টিস্তা হচ্ছিল; ভদ্রলোকের মুখটা মনে করলেই কেমন জ্ঞানি বুকাটা কেঁপে উঠছিল। লালমোহনবাবু হিরো ভিলেন যা ইচ্ছে তাই বলুন না কেন, আমার কাছে উনি একটি ভয়াবহ চরিত্র। বাইরেটা মখমল হলে কী হবে, ভিতরটা থর মকড়মির কাটা-খোপের জঙ্গল।

অবিশ্যি খেলুদাকে দেখে মনেই হল না যে তার কোনও দৃষ্টিস্তা হচ্ছে। সে এখন সামনে গাতা খুলে বসে একমনে একটা নকশার দিকে দেখছে। আমি তুকাতে 'এই দ্যাখ শাখাঅশাখা' বলে খাতাটা আমার দিকে এগিয়ে দিল। তাতে যে জিনিসটা আঁক রয়েছে সেটা আমি তুলে দিছি---



‘ডান দিকটা কী রকম খালি-খালি লাগছে না?’ বলল ফেলুদা।

আমি বললাম, ‘তা তো লাগবেই। শার্টটো তো দিয়েই করেনি।’

‘শার্টটোকে নিয়ে সমস্যা নয়। সমস্যা ওই জন ব্যক্তিটিকে নিয়ে। ওই একটি খাবার ব্যক্তি অংশটা লুকিয়ে আছে। অবিশ্যি একটা জিনিস উলটো: অবস্থায় দেখেছি; সেটা সোজা দেখলে পরে কিছুটা আলোকপাত হতে পারবে। অর্থাৎ কাল সকালে।’

এটা ফেলুদার একটা মার্কামারা হৈয়ালি; আর যখন হৈয়ালি করে বলছে, তখন হৈয়ালি করার অন্যই বসেছে।

আমাদের কথার ফাঁকেই বৃষ্টিটা থেমে গিয়েছিল। ফেলুদাকে হঠাৎ বাস্তবভাবে বিছনা থেকে উঠতে দেখে অবাক লাগল।

বললাম, ‘বেরোবে নাকি?’

‘ইয়েস স্যার।’

‘সে কী? কোথায়?’

‘ভিউটি আছে।’

‘কীসের ভিউটি?’

‘পাহারা।’

তার হাষ্টিং বুট-জোড়া বার করে রেখেছে ফেলুদা সেটা এতক্ষণ দেখিনি। ওটা দেখলেই আমার গায়ে কাঁটা দেয়, কারণ ফেলুদার প্রত্যেকটা বিখ্যাত তদন্তের সঙ্গে ওটা জড়িয়ে আছে। মাঝরাতিরে গোরস্থানে চলতে ফিরতে হলে ওটা ছাড়া গতি নেই।

‘গোরস্থানে?’ ধরা গলায় জিজ্ঞেস করলাম আমি।

‘আর কোথায় বল।’

‘একা বাবে?’

‘চিন্তা নেই। সঙ্গী আছে। রিপোর্টার।’

ফেলুদা আলমারি থেকে তার ৩২ কোল্টটা বার করে পকেটে পুরল। আমার ভাল লাগছে না ব্যাপারটা মোটেই। বললাম, ‘কিন্তু শুধানে কী ঘটনা ঘটবে বলে আশা করছ? বলব তো বোঁড়া হয়ে গেছে। ঘড়ি যদি পেয়ে থাকে সে তো নিয়ে গেছে।’

‘নেয়নি। যে বা যারা খুঁড়ছিল তারা মড়ার খুলি দেখেই ভরে

পালিয়েছে। নইলে ওভাবে কোদাল ফেলে নিয়ে যায় না। হয় নিয়ে যাবে, না হয় তুকিয়ে রাখবে।’

এ জিনিসটা আমার একেবারেই খেয়াল হয়নি।

॥ ১০ ॥

ফেলুদা ফিরেছে কখন জানি না। আমি যখন উঠে নীচে নেমেছি, তখন ওর ঘরের দরজা বন্ধ; তখন বেজেছে সোয়া সাতটা। বুঝলাম দু'রাশি না খুমিয়ে সকালে একটু খুমিয়ে নিচ্ছে।

ন-টার সময় ও দরজা খুলল। ফিটফট দাড়ি কমানো চেহারা, চোখে-মুখে কোনও ক্লান্তির ছাপ নেই। বুড়ো আঙুল নেড়ে বুঝিয়ে দিল রাত্রে কিছু হটেনি।

সাড়ে ন-টার জটায়ু এলেন।

‘সেখুন তো কীরকম জিনিস।’

জটায়ু তাঁর কথামতো তাঁর ঠাকুরদাদার ঘড়িটা নিয়ে এসেছেন। রূপোর ট্যাকঘড়ি, তার সঙ্গে ঝুলছে রূপোর চেন।

‘বাঃ, দিবা জিনিস,’ ঘড়িটা হাতে নিয়ে বলল ফেলুদা। ‘কুব্বেলভির বেশ নাম ছিল এককালে।’

‘কিন্তু সে জিনিস তো হল না’—আক্ষেপের সুরে বললেন লালমোহনবাবু। ‘এ তো কলকাতার তৈরি ঘড়ি।’

‘কিন্তু আপনি সত্যিই এটা আমাকে দিচ্ছেন?’

‘উইথ মাই রেসিৎস অ্যান্ড বেস্ট কম্মিটমেন্টস। আপনার চেয়ে সাড়ে তিন বছরের বড় আমি, সুতরাং আমার কাছ থেকে আশীর্বাদ নিতে আপনার আপত্তি নেই নিশ্চয়ই।’

ফেলুদা ঘড়িটাকে রুমালে মুড়ে পকেটে রেখে টেলিফোনের দিকে এগোল। কিন্তু ডায়াল করার আগেই রাস্তার দিকের দরজায় কড়াটায় নাড়া পড়ল।

খুলে দেখি গিরীনবাবু। ইনি কাল ফিট দিলেও, সত্যি করে যে আসবেন, আর এত তাড়াতাড়ি আসবেন, সেটা ভাবিনি। কাজে বেরিয়েছেন সেটা বোঝা যাচ্ছে পোশাক দেখে—কোট প্যান্ট, হাতে

একটা স্মিফকস।

‘টেলিফোনে দশ মিনিট ডায়াল করেও লাইন পেলাম না। কিছু মনে করবেন না।’ ভদ্রলোকের হাবডাব চমকনে, নার্ভস।

‘মনে করবার কিছু নেই। টেলিফোন তো না থাকারই সম্ভাবনা। কী ব্যাপার বলুন।’

ভদ্রলোক সোফায় না বসে একটা চেয়ারে বসলেন। আশি আর ষটায় তত্পরভাবে, ফেলুদা সোফায়।

‘কার কাছে যাওয়া উচিত ঠিক বুঝতে পারছিলাম না’, কন্ডোল দিয়ে কপালগের যাম মুখে বললেন গিরীন বিশ্বাস, ‘পুলিশের ওপর খুব ভরসা নেই, ফ্যামলি বনছি। ঘটনাচক্রে আপনি যখন এসেই পড়লেন...’

‘সমস্যাটা কী?’

গিরীনবাবু গলা খা করে নিলেন। তারপর বললেন, ‘দাদার মাথায় গাছ পড়েছিল।’

আমরা তিনজনেই চুপ, ভদ্রলোকও কথাটা বলে চুপ।

‘তাহলে?’ প্রশ্ন করল ফেলুদা।

‘মাথার বাড়ি মেরে হত্যা করার চেষ্টা হয়েছিল তাকে।’

ফেলুদা শাস্তভাবে চারমিনারের প্যাকেটটা ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে দিলে তিনি প্রত্যাখ্যান করাতে সে নিজের জন্য একটা বার করে বলল, ‘কিন্তু আপনার দাদা নিজে যে বললেন গাছ পড়েছিল।’

‘তার কারণ দাদা মরে গেলেও তার নিজের ছেলের নাম প্রকাশ করবে না।’

‘নিজের ছেলে?’

‘প্রশান্ত। বড় ছেলে। ছোটটি বিলেতে।’

‘কী করে প্রশান্ত?’

‘কী না-করে সেইটে ডিভ্রেন্স করুন। যত রকম গর্হিত কাজ হতে পারে। গত তিন-চার বছরে এই পরিবর্তন। দাদা দুই ভাইকে সমান ভাগ দিয়ে উইল করেছিল। বউদি মারা গেছেন সেভেনটিতে। মাসখানেক আগে দাদা প্রশান্ত-র ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে তাকে শাসার; বলে তাকে উইলচ্যুত করবে, সব টাকা সুশান্তকে দিয়ে দেবে।’

‘প্রশান্ত আপনাদের বাড়িতেই থাকে তো?’

‘ধাকার অধিকার আছে, তার জন্য ঘর আছে আলাদা, তবে থাকে না। কেতায় থাকে বলা শক্ত। তার দল আছে। জখনওম তাইপের ওতা সব। আমার বিশ্বাস সেনিন ও খুনই করে ফেলত, যদি না সাম্প্রতিক ঝড়টা এসে পড়ত।’

‘আপনার দাদা এ বিষয় কী বলেন?’

‘দাদা বলছে সত্যিই গাছ পড়েছিল। সে জেনে-শনেও বিশ্বাস করতে চাইছে না যে তার ছেলে তার মাথার জখমের জন্য দায়ী। কিন্তু দাদা বাই বলুক না কেন—আমার নিজের ভাইপো হলেও বলছি—আপনি একটা কিছু বিহিত না করলে সে আবার খুনের চেষ্টা দেখবে।’

‘নরেনবাবু যদি নতুন উইল করেন তাহলে তো আর তার ছেলের তাকে খুন করে কোনও আর্থিক লাভ হবে না।’

‘আর্থিক লাভটাই কি বড় কথা মিস্টার মিস্তির? সে তো খেপে গিয়েও খুন করতে পারে। প্রতিশোধের জন্য কি মানুষ খুন করে না?—আর দাদা উইল তৈরি করবে না। তার মাথার ঠিক নেই। অপত্যস্নেহ যে কদুর যেতে পারে তা আপনি জানেন না মিস্টার মিস্তির। এ ক-দিন আমি বাড়িতেই ছিলাম, কিন্তু আজ আমাকে একটু বলকাতার বাইরে যেতে হচ্ছে দু-তিন দিনের জন্য, ব্যবসার কাজে। তাই আপনার কাছে এলাম। আপনি যদি ব্যাপারটা...’

‘মিস্টার বিশ্বাস,’ ফেলুদা প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা ছাইটা অ্যাশ-ট্রেতে ফেলে দিয়ে বলল, ‘আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি আমি আরেকটা তদন্তে জড়িয়ে পড়েছি। আপনার দাদার প্রোটেকশনের একটা ব্যবস্থা করা উচিত নিশ্চয়ই, কিন্তু এটাও ঠিক যে তিনি নিজেই যদি জোর গলায় বলেন যে তাঁর মাথায় গাছ পড়েছিল, তাঁকে কেউ হত্যা করার চেষ্টা করেনি—তাহলে পুলিশের বাবাও কিছু করতে পারবে না।’

গিরীনবাবু অনেকদিন-পরে-রোদ-ওঠা সকালের মেজাজটা বিগড়ে দিয়ে বিদায় নিলেন।

‘বিচিত্র ব্যাপার’, বলে ফেলুদা সোফা ছেড়ে উঠে গিয়ে টেলিফোনে নম্বর ডায়াল করল।

‘হ্যালো, সুহদ? আমি ফেলু বলছি রে...’

সুন্দর সেনসুপ্ত ফেলুদার সঙ্গে কলোজে পড়ত এটা আমি জানি।

‘শোন—তোরা বাড়িতে একটা সেন্সিভেসি কলোজ ন্যাপাস্কিনের শতাব্দিকী সংখ্যা দেখেছিলাম। তোর দাদুরে ক’প—যদূর মনে হয় পঞ্চাশতে বেরিয়েছিল—সেটা আছে এখনও?...বেশ, ওট’ তুই বেরোবার সময় তোর চাকরের হাতে রেবে হাস, আমি দশটা-সাত্বে দশটা নাগাত গিয়ে নিয়ে আসব...’

আমরা চা খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম। তিন জায়গায় যাবার আছে ফেলুদার—নরেনবাবু, বোর্ন অ্যান্ড শেপার্ড আর পার্ক ট্রিট গোরস্থান। নরেনবাবু শুনে একটু অবাক হলাম। ফেলুদাকে বলতে বসল, ‘গিরীনবাবুকে মুখে বাই বলি না বেশ, ওঁর কথাটা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারছি না। কাজেই একবার যাওয়া দরকার। তৃতীয় জায়গাটার তোদের না গেলেও চলবে, তবে রাষ্ট্রের পাহারাটার আজ ভাবছি তোদের নিয়ে যাব। সোরস্থানে মাঝরাতিরের অ্যাটমোসফিয়ারটা অনুভব না করা মানে একটা অসমান্য অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হওয়া।’

‘জর মা সন্তোষী,’ বললেন নালমোহনবাবু। তারপর মাঝপথে একবার বললেন, ‘মশাই, সনে অক টারজানর মতো সনে অফ সন্তোষী করা যায় না?’—বুঝলাম পুলক ঘোষালের অফারটা নিয়ে ভদ্রলোক এখনও ভাবা শেষ করেননি।

নরেনবাবু যদিও শরীরের দিক দিয়ে অনেকটা সুস্থ—বললেন ব্যাথা-ট্যাথা প্রায় সেরে গেছে, কয়েকদিনের মধ্যেই ব্যাডেজ খুলবেন—তবু ওঁর চাইনিটা ভাল লাগল না। কেমন যেন শুকনো, বিষন্ন ভাব।

‘আপনাকে শুধু দু-একটা প্রশ্ন করার আছে,’ বলল ফেলুদা, ‘বেশি সময় নেব না।’

ভদ্রলোক ফেলুদার দিকে একটা সন্দিগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে বললেন, ‘কিছু মনে করবেন না—আপনি কি কোনও তদন্ত চালাচ্ছেন? আপনি গোয়েন্দা কেনেই এ প্রশ্নটা করছি।’

‘আপনি ঠিকই আন্দাজ করেছেন,’ বলল ফেলুদা। ‘সে ব্যাপারে প্রচুর সাহায্য হবে যদি আপনি সত্য গোপন না করেন।’

ভদ্রলোক চোখ বন্ধ করলেন। অনেক সময় যন্ত্রণাবোধ করলে সেটাকে সহ্য করার চেষ্টায় মনুষ্যে যেভাবে চোখ বন্ধ করে এও সেই

রকম। মনে হল উনি আন্দাজ করেছেন যে ফেলুদার জেরাটা ওঁর পক্ষে
তটবরা হবে। ফেলুদা বলল, ‘আপনি হাসপাতালে জ্ঞান হবার
পরমুহুর্তে উইল সম্পর্কে কিছু বলতে চাইছিলেন।’

নরেনবাবু সেইভাবেই চোখ বন্ধ করে রইলেন।

‘উইলের উল্লেখ কেন সে স্বপ্নে একটু আলোকপাত করলেন কি?’

এবার নরেন বিশ্বাস চোখ খুললেন। তার ঠিঠি নড়ল, কাঁপল,
তারপর কথা বেরল।

‘আমি আপনার কথার জবাব নিতে বাধ্য নই নিশ্চয়ই?’

‘নিশ্চয়ই না।’

‘তাহলে দেব না।’

ফেলুদা কয়েক মুহূর্ত চুপ। আমরা সবাই চুপ। নরেনবাবু দৃষ্টি খুরিয়ে
নিরেছেন।

‘বেশ আমি অন্য প্রশ্ন করছি,’ বলল ফেলুদা।

‘জবাব দেওয়া না-দেওয়ার অধিকার কিন্তু আমার।’

‘একশোবার।’

‘বলুন।’

‘ভিক্টোরিয়া কে?’

‘ভিক-টোরিয়া...?’

‘এখানে বলে রাখি আমি একটা অন্যায় কাজ করে ফেলেছি।
আপনার ব্যাগের ভিতরের কাগজপত্র আমি দেখেছি। তাতে একটি
লিপ-এ—’

‘ও হো হো!’—ভদ্রলোক আমাদের বেশ চমকে দিয়ে হাসিতে
ফেটে পড়লেন।—‘ও তো মজার আমলের ব্যাপার! আমিও প্রায়
ভুলেই গিয়েছিলাম। আমি তখনও চাকরিতে। এক আংলো-ইন্ডিয়ান
কাজ করত আমাদের আপিসে—নর্টন— জিমি নর্টন। বললে তার
ঠাকুমার লেখা গুচ্ছের চিঠি রয়েছে তাদের বাড়িতে। সে চিঠি আমি
চোখেই দেখিনি। এই ঠাকুমা নাকি মিউজি়নির সময় বহরমপুরে
ছিলেন তখন পাঁচ সাত বছর বয়স। চিঠিগুলো পরে লেখা, কিন্তু
তাতে তার ছেলেকেবার অভিযন্ত্রণের কথা আছে। আজকাল তো এ সব
নিয়ে বই-টাই খুব বেয়েছে, তাই নর্টনকে বলেছিলাম কিছু বিলিতি

পাবলিশারের নাম দিয়ে দেব। সে নিজে এ সব ব্যাপারে একেবারে
আনাড়ি। দাঁড়ান—কাগজটা বার করি।’

নরেন্দ্রবাবু বাঁ হাত বাড়িয়ে টেবিলের উপরের দেওয়ালটা খুলে বাগ
থেকে তার ট্রিপটা বার করলেন।

‘এই যে—বোর্ন অ্যান্ড শেপার্ড। ওকে বলতে চেয়েছিলুম খোঁজ
করে দেখতে পারে, ওখানে গুর ঠাকুরমার কোনও ছবি পাওয়া যায় কি
না। আর এই যে সব পাবলিশারের নামের আদ্যকল্প। এ কাগজ আর
তাকে দেওয়া হয়নি, কারণ নটনের স্ক্রনডিস হয়। দেড়মাস ট্রিটমেন্টে
ছিল, তারপর চাকরি ছেড়ে দেয়।’

ফেলুদা উঠে পড়ল। ‘ঠিক আছে, মিষ্টার বিশ্বাস—শুধু একটা
ব্যাপারে আক্ষেপ প্রকাশ না করে পারছি না।’

‘কী ব্যাপার?’

‘আপনি ভবিষ্যতে কোনও লাইব্রেরির কোনও বই বা পত্রিকা থেকে
কিছু ছিঁড়ে বা কেটে নেবেন না। এটা আমার অনুরোধ। আসি।’

ঘর থেকে বেরোবার সময় ভদ্রলোক আর আমাদের মুখের দিকে
চাইতে পারলেন না।

বেদীনন্দন স্ট্রিটের সুহৃদ সেনগুপ্তের চাকর একটা জাউস বই এনে
ফেলুদাকে দিল। প্রেসিডেন্সি কলেজ স্টাধ্যাভিনের শতবার্ষিকী সংখ্যা।
সেটা ফেলুদা সারা রাত্তা কেন যে এত মন দিয়ে দেখল, আর দেখতে
দেখতে কেন যে বার তিনেক ‘বোঝো ব্যাপারখানা’ বলল সেটা বুঝতে
পারলাম না।

বোর্ন অ্যান্ড শেপার্ডে ঢুকে ফেলুদা দশ মিনিটের মধ্যে একটা বড়
লাল খাম নিয়ে বেরিয়ে এল। সেখান থেকে বোঝা যায় তার মধ্যে বড়
সাইজের ফোটা রয়েছে।

‘কীসের ছবি আনলেন মশাই?’ জিজ্ঞাসা করলেন জালামোহনবাবু।

‘মিউটিনি,’ বলল ফেলুদা। আমি আর জালামোহনবাবু মুখ চাওয়া-
চাওয়ি করলাম। ফেলুদার কথের মানে ছবিগুলো নট ফর দ্য পাবলিক।

‘গোরস্থানে আর আপনাদের ভেতরে টানব না; আমি শুধু দেখে
আসি সব ঠিক আছে কি না।’

আমরা গাড়িটা ঘুরিয়ে গোরস্থানের ঠিক সামনেই পার্ক করলাম।

ফেলুদা যখন গেট দিয়ে ঢুকল, তখন দেখলাম দারোগার বরমদেও বেশ একটা বড় রকমের সেলাম ঠেকল।

দশ মিনিটের মধ্যে ফেলুদা ফিরে এসে 'ওকে' বলে গাড়িতে উঠল।
টিক হল রাত সাড়ে দশটার আমরা আবার এখানে ফিরে আসছি।

আমার মন বলছে আমরা নাটকের শেষ অঙ্কের দিকে এসিয়ে চলেছি।

॥ ১১ ॥

ফেলুদার সঙ্গে এবার এক জায়গায় ঘুরেছি রহস্যের পিছনে
পিছনে—সিকিম, লখনৌ, রাজস্থান, সিমলা, কোরাস—কোনওখানেই
অ্যাডভেঞ্চারে কমতি পড়েনি; কিন্তু এই কলকাতাতে বসেই এমন
একটা রক্ত-হিম-করা রহস্যের জালে জড়িয়ে পড়েই হবে এটা
কোনওদিন স্বপ্নেও ভাবিনি।

বিশেষ করে আজকের দিনটা, লালমোহনবাবু যেটার নাম
দিয়েছিলেন ব্যাক-লেটার ডে—যদিও সেটাকে আবার পরে বদলিয়ে
করলেন ব্লক-লেটার নাইট। আর পার্ক স্ট্রিট সেমেন্টরি সম্বন্ধে
বলেছিলেন, 'ছেলেবেলায় মেজো জ্যাঠা দুখিয়েছিলেন ওটাকে বলে
গোরস্থান, কারণ ওখানে গোরাদের সমাধি আছে। এখন মনে হচ্ছে
নামটা হওয়া উচিত গেরোস্থান। এমন গেরোস্থান এর আগে পড়িচি
কখনও ভ্রমশ? তোমার মনে পড়চে ?'

সত্যি বলতে কী, অনেক ভেবেও মনে করতে পারিনি।

লালমোহনবাবু এমনতেই পাণ্ডুয়াল; গাড়ি হবার পর মেজাজটা
আরও মিলিটারি হয়ে গেছে। আগে কড়া নাড়তেন, অস্ত্র দেখি নক
করতেন। আমরা দু জনেই খোঁসেদেয়ে তৈরি হয়ে বসেছিলাম। আজ
ফেলুদার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও হাফিং বুট পরতে হয়েছে। আমারটা
পত বছর বেনা, ওরটা এগারো বছরের পুরনো। বোধহয় অবস্থাটা খুব
ভাল নয় বলে বিভ্রমে দেখেছিলিমে ও নিজেই সূকতদায় কী সব
হেয়ামতের কাজ করেছে। এখন একটু খোঁড়াগেছে দেখে মনে হল দুটি
ডাকিয়ে কাজটা করালেই ভাল হত। এই বিপদের রাতে খোঁড়াগে

চলবে কেন?

নরনারী টোকা পড়তেই আমরা ডাঠ পড়লাম। ফেলুদার কাছে খয়েরি রঙের শান্তিনিকেতনি খোলা, তার ভিতর থেকে লাল খামের খানিকটা বাইরে বেরিয়ে রয়েছে। এখানে বলে রাখি, ওরই হকুমমারফিক আঙু আমরা সকলে গাড়ি রঙের পোশাক পরেছি। লালমোহনবাবু পরেছেন একটা কালো টেরিকটের সুট।

ভদ্রলোক ঘরে ঢুকেই বললেন, ‘মর্ডান মেডিসিন কোথায় পৌছে গেল মশাই!—একটা নতুন নার্ভ-পিন বেরিয়েছে—নামটায় আমার দুটো ‘এক্স’—ভকেন ডাক্তারের সাক্ষেশনে ভিনারের পরে একটা খেয়ে নিলুম—এরই মধ্যে সমস্ত শরীরে বেশ একটা কলপ-দেওয়া ফিলিং হচ্ছে। তপেশ ভাই, যা থাকে রুপালে—লভে যাব, কি বলো?’ কীসের সঙ্গে লড়বেন সেটা অবিশ্যি উনিও জানেন না, আমিও জানি না।

ফেলুদা আগেই ঠিক করেছিল গাড়িটা গোরস্থানের গেট থেকে বেশ কিছুটা দূরে রাখবে—‘গাড়ির রংটা আপনার আজকের পোশাকের সঙ্গে ম্যাচ করলে ভদ্রটা চিন্তা করতাম না।’ সেট জেন্টিয়ার্স ছাড়িয়ে রডন স্ট্রিটের মোড়ের একটু আগেই ও গাড়িটা থামতে বলল। ‘তোরা এগিয়ে যা’ গাড়ি থেকে নেমে বলল ফেলুদা, ‘আমি হরিপদবাবুকে ফরেকটা ইনস্ট্রাকশন দিয়ে আসছি।’

আমরা এগিয়ে গেলাম। ফেলুদা কী ইনস্ট্রাকশন দিল জানি না, কিন্তু এটা জানি যে হরিপদবাবু এ ক-দিন আমাদের কাণ্ডকারখানা দেখে আর কথাকর্তা শুনে রীতিমত উৎসাহ পেয়ে গেছেন। এটা ওঁর হাবেভাবে বেশ বোঝা যায়।

মিনিট তিনেকের মধ্যেই ফেলুদা ফিরে এল। বলল, ‘আপনার লোক ভাল মি. গান্ধুলী যে আপনি এমন একটি ভ্রাইজার পেয়েছেন। ভদ্রলোককে কাজের দায়িত্ব দিয়ে বেশ নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।’

‘কী দায়িত্ব দিলেন মশাই?’

‘এদিকে গুপ্তগোপ না হলে কোনও দায়িত্ব নেই, আর হলে ওঁর উপর বেশ খানিকটা ভারসা রাখতে হবে।’

এর বেশি আর ফেলুদা কিছু বলল না।

লোহার ফটকের সামনে পৌছে দেখি সেটা খোলা। ফেলুদাকে



ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করতে ও ফিসফিস করে উত্তর দিল যে
এমনিতে এ সময় খোলা থাকে না। কিন্তু আজ সেটার ব্যবস্থা করা
হয়েছে। 'পার্টিলের উপর কাঁচ বসানো, টপকানো রিসকি, তাই এই
ব্যবস্থা। কিন্তু বরমদেও আছেন কি?'

দারোয়ানের ঘরে টিমটিন করে ব্যক্তি স্বপ্নে, কিন্তু সেখানে কেউ
আছে বলে মনে হল না। আমরা ঘরের আশপাশটি ঘুরে দেখলাম।
কেউ নেই। পার্ক ট্রি থেকে আসা ফিকে আলোতে দেখতে পাচ্ছি
ফেপুদার জাকুটি। বুঝলাম দারোয়ানের সঙ্গে যা ব্যবস্থা হয়েছিল তাতে
ওর থাকবার কথা।

আমরা এগিয়ে গেলাম। আর আর মাঝখানের সেই পথটা দিয়ে
 নয়। সেটা দিয়ে করেক পা গিয়েই ফেলুদা বাঁয়ে দুলল। আমরা
 সমাধির ভিত্তির মধ্যে দিয়ে এলোতে লাগলাম। বাতাস বইছে বেশ
 জোরে। আকাশে ফালি ফালি মেঘের স্রোত। তার ফাঁক দিয়ে ফাঁক
 দিয়ে ফিকে আধা-চাঁদটা উঁকি মেঝেই আবার লুকিয়ে পড়ছে। সেই
 চাঁদের আলোতে ফলকের নামগুলো এই আছে এই নেই। এই
 আলোতেই বুঝলাম আমরা স্যামুয়েল ক্যাথকট খর্নহিলের সমাধিতে
 আশ্রয় নিলাম। এটা সরু হয়ে উঠে যাওয়া ওবেলিঞ্চ নয়। এর নীচে
 বেদী, বেদীর উপর চারিদিকে বিরে খাম আর মাথায় গুম্বুজ। তিনজন
 লোকে দিখি যাপটি মেঝে থাকতে পারে। এখনে আলো পৌঁছোয় না,
 তবে সুবিধে এই যে ডান দিকে চাইলে অন্য সমাধির ফাঁক দিয়ে
 পোহার ফটকের একটা অংশ দেখা যায়।

এ গোরস্থানে এখন আমরা ছাড়া কেউ থাকতে পারে না ভেবেই
 ফেলুদা মুখ খুলল; তবে গলা তুলল না।

‘এটা ছড়িয়ে দিন তো একটু আশেপাশে।’

ফেলুদা কোলা থেকে একটা ছিপি-আটা বোতল বার করে
 লালমোহনবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়েছে।

‘ছোঙ্—ছড়িয়ে?’

‘কার্বনিক অ্যাসিড। সাপ আসবে না। চারদিকে হাত চারেক দূর
 অবধি ছিটিক দিলেই হবে।’

লালমোহনবাবু আঙা পাগল করে এক মিনিটের মধ্যেই ফিরে এসে
 বললেন, ‘যাক নিশ্চিৎ হওয়া গেল। সাপের ভয়টা মশাই নার্ড-পিলেও
 যায় না।’

‘ভুতের ভয় গেছে?’

‘টোট্যালি।’

যাঙ ডাকছে। বিঝি ডাকছে। একটা বিঝি বোধহয় আমাদের
 প্যাশের কবরেই আতলা গেড়েছে। চলও মেঘের এক-একটা খণ্ড
 বোধহয় একটু বেশি হন বলেই অন্ধকারটা হঠাৎ-হঠাৎ গাঢ় হয়ে
 উঠছে। তার কলে সমাধিগুলো ভালগোল পাকিরে চোখের সামনে
 একটা ছয়টি বাঁখা অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আবার

সেই চাঁদ বেয়ে গেল অমনি সমাধিস্তলার এক পাশে আসো পড়ে
সেগুলো পরস্পর থেকে ঝলসা হয়ে যাচ্ছে।

ফেলুদা পকেট থেকে চিকলেট বার করে আমাদের দিকে নিজে
দুটো মুখে পুরল।

গাড়ির শব্দ ক্রমেই কমে আসছে। এক দুই তিন করে সেকেন্ড গুনে
হিসাব করে দেখলাম একটানা প্রায় আধ মিনিট ধরে ব্যাঙ ঝিকি আর
নমক হাওয়ায় পাতার সরসর ছড়া আর কোনও শব্দ শোনা যাচ্ছে না।

‘মিডনাইট’, চাপা স্বরে লালমোহনবাবু বললেন।

মিডনাইট কেন বললেন? আমি দু মিনিট আগে হাত বাড়িয়ে আমার
নিস্টওয়ার্ড চাঁদের আলো কেলিরে দেখেছি বোজ্জছে এগারেটা
পঁচিশ। জিজ্ঞেস করাতে বললেন, ‘না, এমনি বলছি। মিডনাইটের
একটা বিশেষ ইয়ে আছে জে।’

‘কী ইয়ে?’

‘গোরস্থানে মিডনাইট তো!—তার একটা বিশেষ ইয়ে আছে।
কোথায় যেন পড়িচি।’

‘তখনই ভুল বেরায়?’

লালমোহনবাবু কয়েকবার ‘এক্স’ ‘এক্স’ বলে শেষের বার এক্স-এর
‘গ’টাকে সাপের মতো কিছুক্ষণ টেনে রেখে চুপ মেয়ে গেলেন। আমার
পাশে একটা প্রায়-শোনা-যায়-না খচ শব্দ থেকে বুঝলাম ফেলুদা
হাতের আড়ালে দেশলাই জ্বালান। তারপর হাতের আড়ালেই একটা
চাপমিলার ধরিয়ে হাতের আড়ালেই টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল।

আকাশে মেঘ বাড়ছে। গাড়ির আওয়াজ হাওয়া। হাওয়ার আওয়াজ
হাওয়া। সব সড়া, সব শব্দ শেষ। কাছের ঝিকি ঠাণ্ডা। আমার শরীর
ঠাণ্ডা, গলা শুকনো। ঠোঁট চেটে ঠোঁট ভিজল না।

টী-এর পরে একগাদা ঝ-ফসা দিয়ে একটা প্যাঁচা ডেকে উঠল। এক
মহল দুটো থান্ডের আওয়াজে বুঝলাম লালমোহনবাবু হাত দিয়ে
হাইম্পিঙে কান ঢাকলেন। ফেলুদা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ান।

একটা গাড়ি থেমেছে। কতদূরে, সেটা এত রাত্রে কোথায় যাবে না।
দরজা বন্ধের শব্দ। ঘন বজ্জছে শব্দটা উদরে পার্ক স্ট্রিট থেকে নয়,
পাশ্চাত্যের রজন স্ট্রিট থেকে। ওদিকে গেট নেই, প্যাঁচল আছে:

পাঁচিলের উপর কাঁচ বসানো।

আমাদের চোখ তবু জোয়ার গেটের নিকে। লালমোহনবাবু মুখ খুলতে বাঞ্ছিলেন, ফেলুদা আমার কাঁধের উপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে ওঁর কাঁধে চাপ দিয়ে ধামিয়ে দিল।

কিন্তু কেউ তো আসছে না গেটের নিকে।

হয়তো গাড়ি অল্প কোথাও অন্য কারণে থেমেছে। কত বাড়ি তো রয়েছে চারপাশে। হয়তো কেউ নাইট-শো দেখে ফিরল। আশা করি তাই; তাহলে আর এ গাড়িটা নিয়ে ডাববার কিছু থাকে না।

ফেলুদা কিন্তু সটান হাঁড়িয়ে আছে, পিছনের দেয়ালের সঙ্গে সঁশিয়ে। তার সামনেই একটা থাম। চারিদিকে বাদুড়ে অন্ধকার। কেউ দেখতে পাবে না আমাদের।

কিন্তু আমরা তাদের দেখব কী করে? যদি তারা এসে থাকে?

দেখবার দরকার নেই। একটু পরেই সেটা বুঝতে পারলাম। চোখের দরকার নেই। কান্ন করবে কান।

ঝুপ...ঝুপ...ঝুপ...ঝুপ...

মাটি খোঁড়ার শব্দ। কিছুক্ষণ চলল শব্দ। আমরা রুদ্ধশ্বাসে শুনিছি।

ঝুপ...ঝুপ...

শব্দ থেমে গেল।

একটা আলো। দূরে দুটো ওবেলিফের কাঁক দিয়ে ঘাসের উপর কীণ আলো। প্রতিফলিত আলো।

আলোটা স্থির নয়—দুলছে, নড়ছে, খেলছে। টর্চের আলো।

এবার নিভে গেল।

‘পাঁচিল টপকে এসেছে’ দাঁড় চিপে মন্তব্য করল ফেলুদা। তারপর বলল, ‘ফলো করব।’ বুঝলাম আবার গাড়ির আওয়াজের অপেক্ষা করছে ফেলুদা।

এক মিনিট।

দু মিনিট, তিন মিনিট, চার মিনিট।

‘ক্লেঞ্জ!’ বলল ফেলুদা।

কোনও শব্দ আসছে না তার পার্ক স্ট্রিট থেকে। রতন স্ট্রিট থেকেও না। যে গাড়িটা এসেছিল সেটা থেমেই আছে। তাহলে?

আরও দু'মিনিট গেল। আবার মেখে ফাটল। চাঁপ কেয়েল। কেউ
তোপাও নেই।

‘সর এটা’

ফেলুদা তার কোলটি আমার দিয়ে ঘাসে নামল। যেদিকে আলোটি
সেখতিলাম সেদিকে এগিয়ে গেল। ভয় নেই—এর পকেটে বেলট ৩২।
নাঃ এসেছে শিগগিরই তার গর্জনে এই গোরস্থানের তমট নিস্তব্ধতা
খান-খান হতে চলেছে। কিন্তু পা যে খোঁড়া ওর। সামান্য হলেও
খোঁড়া। কেন যে সর্দারি করে নিজে জুতো; সারাতে গেল জানি না।

কিও কই? কোন্টের গর্জন?

‘ভুল করলেন,’ খড়খড়ে গলায় বললেন জটাযু। ‘তোমার দাদা ভুল
করলেন।’

আর যেন কথা না বলেন তাই আমি ভিভ দিয়ে সাপের শব্দ করে
ওকে থামিয়ে দিলাম। ফেলুদা কয়েক পা এগিয়ে গিয়েই অঙ্ককারে
মিলিয়ে গেছে। কী ঘটছে ওই সমাধিস্তম্ভগুলোর মধ্যে কিছুই বুঝতে
পারছি না। একটা শব্দ পাওয়া গেল কি? কানের ভুল নিশ্চয়ই।

মিডনাইট? এটা কোন ঘড়ি? সেক্ট পলস? হাওয়া শুনিক থেকেই।
পশ্চিমে হাওয়া হলে রাস্তিরে আলিপুরের চিড়িয়াখানার সিংহের গর্জন
শেন্দা যায় আমাদের বাসিগঞ্জের বাড়ি থেকে।

ওই যে গাড়ির শব্দ!

দরজা বন্ধ হল। স্টার্ট নিল। তারপর হুস্।

আর বলে থাকা যায় না। ডর করছে না; শুধু ভাবনা।

উঠে পড়লাম দু'জনেই। লালমোহনবাবুর বিড়বিড়ানিতে কান দেব
না; সময় নেই।

এগিয়ে গেলাম দ্রুত পায়ে। ঘেরি এলিসের কবর। কবরের দেয়ালে
হাত বসে বসে এগোছি। জটাযু আমার শার্ট বাহচে আছেন পিছন
থেকে। পায়ের তলায় ঘাস এখনও ভিজ্জ, এখনও ঠাণ্ডা।

জন মার্টিনের কবর। সিনথিয়া কোনেট। ক্যাপ্টেন এভানস। এবার
একটা ওনেলিঙ্ক। কার্লো ফলকের উপরে—

২৫—

পায়ের তলায় কী জানি পড়ল। মৃদু শব্দ করে চেপটে গেল। পা

ধরিয়ে নীচের দিকে চাইলাম। চাঁদের আলো রয়েছে। হাতে কুলে
নিলাম জিনিসটা।

চারমিনারের প্যাকেট।

বালি না। অনেক সিগারেট রয়েছে ভিতরে। সব চ্যাপটা।

ফেলুদা—

আর কিছু মনে নেই—কেবল হুখের উপর একটা চাপ, আর
লালমোহনবাবুর এক চিলতে আর্তনাদ।

॥ ১২ ॥

জ্ঞান হয়ে প্রথমেই মনে হল পুরীর সমুদ্রের ধারে রয়েছে। এত
হাওয়া সমুদ্রের ধারেই হয়। কান ঠাণ্ডা, নাক ঠাণ্ডা, চুল উড়ছে।

কিন্তু জল কোথায়? বালি? ঢেউ কোথায়? এ পর্জন তো ঢেউয়ের
গর্জন নয়; এ তো চলন্ত গাড়ির শব্দ। অন্ধকারের মধ্যে খোলা রাস্তা
দিয়ে ছুটে চলেছি আমরা। গাড়ির পিছনে বসে আছি আমি। আমি
মাঝখানে, ডান পাশে লালমোহনবাবু, বাঁয়ে যে লোক তাকে চিনি না,
দেখিনি কখনও। সামনে ড্রাইভারের মাথায় পাগড়ি, তার পাশে
আরেকটা লোক। কেউ কথা বলছে না।

একটু মাথা তুলতেই পাশের লোকটা ঘাড় ফিরিয়ে দেখল। আধা-
শুণ্ডা টাইপের চেহারা। কোনও ধমক দিল না। কেন দেবে? আমাদের
ভয় করার তো কোনও কারণ নেই। আমাদের কাছে কোনও হাতিয়ার
নেই। হাতিয়ার ফেলুদার কাছে। সে এ গাড়িতে নেই। সে কোথায়
জানি না।

কিন্তু ফেলুদার সেই কোলাটা?

আমার মাথার পিছনে, কাঁচের সামনের তাকটায়। কোলার ষ্ট্র্যাপটা
আমার গালের পাশ অবধি কুলে আছে।

‘মিডনাইট’, পাশ থেকে বলে উঠলেন জটায়ু। আমি আড়চোখে
সেখলাম ওঁর চোখ এখনও বোজা।

‘মিডনাইট, মা।—জয় মা, মা সন্তোষী!... মিডনাইট...’

‘বকেল মং।’ পাশের লোক শাসাল।

আবার বিহুনি। আবার অঙ্ককরণ। গাড়ির শব্দ মিলিয়ে এল...

এর পর আবার যখন চোখ খুলল তখন মন বলছে দেখব কোনও মন্দিরের ভিতর বসে আছি। না, মন্দির না—গির্জা। এ তো পিওনের দিশি ঘন্টা নয়। এ সুর বিলিতি।

কিন্তু দেখলাম এটা মন্দির নয়। এটা বৈঠকখানা। মাথার উপর কাড় কাটা, ভরে সেটা জ্বলছে না। ঘরে আলো বেশি নেই - কেবল একটা ল্যাম্প। সেটা একটা মখমলে মোড়া সোফার পাশে একটা টেবিলের উপর রাখা। আমিও বসে আছি মখমলের সোফায়। বসে না; আধ-শোয়া। আমার পাশেই জালমোহনবাবু। তাঁর চোখ বন্ধ। আমার ডান দিকে পরের সোফায় বসে আছে ফেলুদা। তার মুখ গম্ভীর। তার কপালের ডান দিকে একটা অংশ কালো হয়ে ফুলে আছে। বাঁয়ে আমাদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে একটা লোক, যাকে আমরা পোয়ারেলাল বলে চিনি। তার হাতে গিডগড়ার। কোন্ট ৩২। নির্ঘাৎ ফেলুদারটা।

আরও তিনজন লোক দাঁড়িয়ে আছে আমাদের দিকে মুখ করে। কেউ কোনও কথা বলছে না। কথা বলার লোক বোধহয় এখনও আসেনি। আমাদের সামনে সবচেয়ে যে বড় সোফা, যার মখমলের রং কালো, সেটা এখনও খালি। মনে হয় সেটা কার্পাস অপেক্ষায় রয়েছে। বোধহয় মিস্টার চৌধুরী। কিন্তু এটা আলিপুরের কোনও হালের বাড়ি নয়। এ বাড়ি আদিকালের। এর সিলিং বিশ হাত উঁচু। লোহার কড়িবরগা। এর দরজা দিয়ে ঘোড়া চুকে যায়।

আরও আছে। বড়ি। খুলনো আর দাঁড়ানো ঘড়ি। তার মধ্যে একটা প্রায় দেড় মানুষ উঁচু, আমার ডান দিকে। এই ঘড়িগুলোই বাজছিল একটু আগে। এখনও মাঝে মাঝে বেজে উঠছে। রাত দুটো।

ফেলুদার সঙ্গে একবারই চোখাচোখি হয়েছে। ওর চোখের ভাবটা আমি জানি বলেই ভরসা পেয়েছি। ওর চোখ বলছে ঘাবড়াসনি, আমি আছি।

‘শুভ মর্নিং, মিস্টার মিটার!’

বিলিতি নিয়মে রাত বারোটায় পরেই মর্নিং।

ভদ্রলোককে দেখতে পাইনি, কারণ ল্যাম্পের ঠিক পিছনে দিকের দরজা দিয়ে চলেছেন। এখনও মন্ডল। আগের বার মা দেখেছিলেন তার চেহারা বেশি। না হবার কোনও কারণ নেই। এখন উনি আপ, ফেলুদা ডাউন।

‘ওতে কী আছে পেয়ারেলস? ওটা সার্ভ করা হয়েছে ভাল করে?’

ভদ্রলোকের চোখ গেছে ফেলুদার ঝোলের দিকে। ওটা যে কখন ফেলুদার কাছে চলে গেছে জানি না।

পেয়ারেলস জানাল যে ওতে বই খাতা আর ছবি ছাড়া আর কিছু নেই। একটা বোতল ছিল, সরিয়ে রাখা হয়েছে।

‘কিছু মনে করবেন না এইভাবে ধরে আনার জন্য’—গলায় একটু বেশি পালিশ দিয়ে ফেলুদাকে উদ্দেশ্য করে কথাটা বললেন মি. চৌধুরী। ‘ভালোম পেরিগ্যাল রিপোর্টের সম্পর্কে যখন আপনার এতই কৌতূহল, তখন জিনিসটা আমার হাতে এসে পড়ার মুহূর্তে আপনি থাকলে হয়তো খুশিই হবেন।—কেমন বললেন, সাফা হয়ে খড়ি?’

একজন ভৃত্য মাথা নেড়ে বলল, খড়ি সাফা হয়ে এসে, এতখুনি আসবে।

‘টু হাঙ্গেড ইয়ারস প্রেভার মধ্যে পড়েছিল,’ বললেন মি. চৌধুরী। উইলিয়াম এ কথাটা আগে আমাকে বলেনি। বলেছে তার কাছে পেরিগ্যাল খড়ি আছে। অথচ আনব-আনব করে দেরি করছে। তারপর চাপ দিতে বলল খড়ি আছে মাটির নীচে তাই দেরি হচ্ছে। ডেডবন্ডির পাশে পড়েছিল তাই বললাম বুরুশ দিয়ে ঝাড়ুন দিয়ে সাফা না করে আমার কাছে আনবে না। ডেটলের শৌঁছ দিয়ে দেবার কথাও বলেছি।’

ফেলুদা সটান চোরে আছে মি. চৌধুরীর দিকে। মুখ দেখে তার মনের ভাব বোঝার উপায় নেই। আমাদের ক্লোরোকর্ম দিয়ে অঙ্কন করেছিল; ওকে মাথায় বাড়ি মেরে।

‘আপনি কোথেকে জানলেন এ খড়ির কথা? মি. মিটার?’ প্রশ্ন করলেন মহাদেব চৌধুরী।

‘উনবিংশ শতাব্দীর একটা ডায়েরি থেকে। যার খড়ি তার মেয়ের ডায়েরি।’

‘ডায়েরি? চিঠি না?’

‘না, ডায়রি।’

মি. চৌধুরী তার বিলিভি সিগারেটের প্যাকেটটা বার করেছেন পকেট থেকে, আর সেইসঙ্গে সোনার লাইটার আর সোনার হোল্ডার।

‘আপনার সঙ্গে উইলিয়ামের পরিচয় নেই?’ ছোঁড়ারে সিগারেট ঢোকালেন মি. চৌধুরী:

‘উইলিয়াম নামে আমি কাউকে চিনি না।’

ফস্ করে মি. চৌধুরীর ডানহিন পাইটার কুলে উঠল।

‘তাহলে ওই ডায়রি শেঙেই আপনার ঘড়িটার উপর লোভ হয়েছিল?’

‘লোভ জিনিসটা তো আপনার একচেটিয়া, মি. চৌধুরী।’

মঞ্চমলের উপর মেঘের ছায়া। দুই অণ্ডুলে ধরা ছোঁড়ারটা ঈষৎ কাঁপছে।

‘আপনি মুখ সামলে কথা বলবেন, মি. মিতার।’

‘সত্যি কথা বলতে আমি মুখ সামলাই না, মি. চৌধুরী। আমার উদ্দেশ্য ছিল ঘড়ি যাতে গডউইনের কবরেই থাকে; আপনার মতো লোকের হাতে—’

ফেলুদার কথা শেষ হল না। একজন লোক হাতে একটা সিন্ধের রুমালের উপর একটা জিনিস এনে মি. চৌধুরীকে দিল। চৌধুরী জিনিসটা হাতে তুলে নেবার সঙ্গে সঙ্গে আমার পাশ থেকে একটা গোঁড়নির শব্দ উঠল—

‘আঁ...আঁ...আঁ...আঁম্...’

লালমোহনবাবুর জ্ঞান হয়েছে, আর হয়েই মি. চৌধুরীর হাতের জিনিসটা দেখেছেন। জিনিসটা তিনি খুব ভাল করেই চেয়েন।

মি. চৌধুরীর অবস্থা যে কী হল সেটা আমার পক্ষে লিখে বোঝানো খুব মুশকিল। ফেলুদাকেই বলতে শুনেছি যে গানের সাত সুর আর রামধনুর সাত রঙের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে, কিন্তু একটা মানুষের গলায় আর মুখে এত কম সময়ে এত রকম সুর আর এত রকম রং খেলতে পারে সেটা ভাবতে পারিনি। গালগালে যা বেরল মানুষটার মুখ দিয়ে সেটা শোনা যায় না, কলা যায় না, লেখা যায় না। ফেলুদা অবিশ্যি নির্বিকার। আমি বুঝতে পারছি এটা শুধুই কীর্তি; কাল যখন

দুপুরে দশ মিনিটের জন্য সে পোরস্থানে ঢুকেছিল তখনই সে এ কাজটা করে এসেছে। কিন্তু আসল ঘড়ি কি তাহলে নেই?

কুককেলভির ঘড়িটাকে মি. চৌধুরী উদ্ভাটনের মতো ছুঁড়ে ফেলে দিলেন তার ডান পাশে থালা লোকটার দিকে। আর তার পরেই তিনি হাজার দিয়ে উঠলেন—

‘উইলিয়াম সাহায্যকো বোলাও!—আর উথো রিভলভার নেও হামকো!’

পেয়ারেলস রিভলভারটা মি. চৌধুরীর হাতে দিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। মি. চৌধুরী দু-একবার ‘ক্যাভেল’ ‘সুইভলার’ ইত্যাদি বলে সোফা ছেড়ে উঠে অশ্রু অসহিষ্ণু ভাবে পাচচারি শুরু করলেন।

এবার পেয়ারেলস সেই পিছনের দরজাটা দিয়ে আরেকটা লোককে সঙ্গে নিয়ে ঢুকল। আবছা অন্ধকারে দেখলাম কাঁধ অবধি লম্বা মাথার চুল আর ঠোঁটের দু পাশে কুলে থাকা গোঁফ। পরনে প্যান্ট, শার্ট আর সুতির কোট।

‘কী ঘড়ি নিয়ে এসেছ তুমি কবর খুঁড়ে?’ বক্তৃতাশীল গলায় প্রশ্ন করলেন মি. চৌধুরী। তিনি আবার সোফার দিকে বসেছেন, তার হাতে এখনও রিভলভার, দৃষ্টি এখনও ফেলুদার দিকে।

‘না পেয়েছি তাই এনেছি, মি. চৌধুরী’—আগন্তুক কাতর স্বরে জবাব দিল। ‘আপনাকে ঠকিয়ে কি আমি পার পাৰ? আপনি এত বড় এক্সপার্ট!’

‘তাহলে সে চিঠির কথা কি মিথ্যা?’ ঘর কাঁপিয়ে প্রশ্ন করলেন মহাদেব চৌধুরী।

‘তা কী করে জানব মি. চৌধুরী? ওটার উপর ভরসা করেই তো সব কিছু। এই তো সেই চিঠি—দেখুন না!’

আগন্তুক একটা পুরনো চিঠি বার করে মি. চৌধুরীর হাতে দিল। চৌধুরী সেটায় চোখ বুলিয়ে বিরক্তভাবে সেটাকেও ছুঁড়ে ফেলে দিল। পানের সোফার উপর, আর ঠিক সেই সময় হেসে উঠল ফেলুদা। প্রাণাখোলা হাসি। এমন হাসি একে অনেকদিন হেসেতে দেখিনি।

‘হাসির কী পেলেন আপনি মি. মিটার?’ গর্জন করে উঠলেন মহাদেব চৌধুরী। কোনওমতে হাসিটাকে একটু চেপে ফেলুদা উত্তর দিল—

‘আপনার এত নাটকীয় আয়োজন সব ভেঙে গেল দেখে হাসি পেল, মি. চৌধুরী।’

চৌধুরী রিভলভার হাতে আখার সোফা ছেড়ে উঠে পুরু কার্পেটের উপর দিয়ে নিঃশব্দে হেঁটে এগিয়ে এলেন ফেলুদার দিকে।

‘আমার নাটক কি শেষ হয়ে গেছে ভাবছেন, মি. মিটার? আসল বস্তু যে আপনার কাছে নেই তার কী বিশ্বাস? আপনি তো গোরহানে অনেকবার গেছেন। আজও তো উইলিয়ামের আগে আপনি পৌঁছেছেন। আপনার কাছে বস্তু থাকলে সে ঘড়ি হাত না করে কি অধি হাড়ব? আপনি যেখানে সেটা লুকিয়ে এসেছেন সেখান থেকে আপনাকেই সেটা বার করে দিতে হবে মি. মিটার। আর ঘড়ি যদিও নাও থেকে থাকে—এই চিঠি যদি মিথো হয়ে থাকে—তাহলেও যে আমি আপনাকে ছেড়ে সেব এটা কী করে ভাবছেন? আপনার সব ব্যাপারে নাকি গলানোর অড্যাসটা যে আমার শব্দে বস্তু অসুবিধাজনক, মি. মিটার। কাজেই, নাটক ফুরিয়েছে কী বলছেন? নাটক তো শেষ শুরু!’

ফেলুদার গলায় এদার আমার একটা খুব চেনা সুর দেখা দিল। এটা ও নাটকের চরম মুহূর্তে ব্যবহার করে। লালমোহনবাবু বললেন, এ সুরটা নাকি ঠেকে ডিকেন্সি লিভার কথা মনে করিয়ে দেয়।

‘আপনি ফুল করছেন, মি. চৌধুরী। নাটক এখন আমার হাতে, আপনার হাতে নয়। এই মুহূর্ত থেকে আমি নাটকটা চলান। আমিই বিচার করব আপনাদের দু’জনের মধ্যে কার অপরাধ বেশি—আপনার, না যিনি উইলিয়াম বলে—’

ঘরে তোলাপাড় ব্যাপার। উইলিয়াম একটা প্রচণ্ড লাফ দিয়ে তার সামনে দাঁড়ান পেয়ারেলসালকে এক ঘূঁষিতে ধরাশায়ী করে বাইরের দরজার দিকে ধোঁয়া করেছে। চৌধুরীর রিভলভারের গুলি তাকে হাত দু’একের জন্য মিস করে দরজার বাঁ দিকের একটা দাঁড়ানো ঘড়ির কাঁচের ভায়াল খানখান করে দিল; আর সবাইকে অবাক করে সেই সঙ্গে শুরু হয়ে গেল সেই জখম ঘড়ির ঘন্টাধ্বনি।

মিটার উইলিয়ামকে ধরতে আরও দু’জন লোক ছুটছে; কিন্তু তারা বেশি দূর যেতে পারল না। তাদের পথ আটকেছে কয়েকজন মশক



লোক। তারা এবার উইলিয়াম সমেত সকলকে নিয়ে বৈঠকবানায় এসে
 চুপল। সামনের ভবনসকলকে দেখে বলে দিতে হয় না ইনি একজন
 পুলিশ ইন্সপেক্টর। সঙ্গে আরও পাঁচজন পুলিশ কনস্টেবল ইত্যাদি,
 অল্প সবার পিছন দিয়ে সাগ্রহে উঁকি দিচ্ছেন লালমোহনবাবুর ড্রাইভার
 হরিপদ দত্ত।

‘সাবাস, হরিপদবাবু!’ বঙ্গল ফেলুদা।

‘আপনিই তো ফেলু মিষ্টি?’ ঠিক লোকের দিকে চেয়েই প্রশ্নটা



করালেন ইন্সপেক্টর মশাই। 'কী ব্যাপার বলুন তো? মি. চৌধুরীকে জে
চিনি— কিন্তু ইনি কে, যিনি পালান্ধিলেন?'

ফেলুদা এর উত্তর দেবার আগে হতভম্ব মহাদেব চৌধুরীর হাত
থেকে নিজের রিভলভারটি অনায়াসে বার করে নিয়ে বসল। 'থ্যান্ক
ইউ, মি. চৌধুরী—এবার আপনি কাইন্ডলি আপনার নিজের কাহগায়
গিয়ে বসুন তো। নটকের বাকি অংশটি লেখার সুবিধে হবে। আর ভা
হাড়া আপনাকে কালো মশমলে মানায় বড় ভাল। আর মিস্টার
উইলিয়াম তো'—ফেলুদার দৃষ্টি ঘুরে গেছে—'আপনার চুপ আর
গৌখটাতে কিন্তু আপনাকে ওবহ আপনার প্রপিতামহের মতো
দেখাচ্ছে। ও দুটো খুলবেন কী দয়া করে?'

পুলিশ টান দিতেই উইলিয়ামের গৌখ আর পবচুলা খুলে এল, আর
অবাক হয়ে দেখলাম উইলিয়ামের জায়গায় সঁড়িয়ে আছেন নরেন
বিশ্বাসের ভাই গিরীন বিশ্বাস।

'এবার বলুন তো মি. বিশ্বাস,' বলল ফেলুদা, 'আপনার পুরো নামটা
কী?'

'বেন, আমার নাম আপনি জানেন না?'

'আপনার এখন দুটো নাম জানা যাচ্ছে। এই দুটো জুড়েই বোধহয়
আপনার আসল নাম, তাই না? উইলিয়াম গিরীন্দ্রনাথ বিশ্বাস—তাই
না? অস্বস্ত প্রেসিডেন্সি কলেজ ম্যাগাজিনে গোল্ড মেডেলিস্টদের
ভালিকায় ভোঁ তাই বলছে। আর আপনার ভাইয়ের নাম বলছে
মাইকেল নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। ভিকিটিং কার্ডের 'এম'টা হয়ে যাচ্ছে
মাইকেল, তাই না? আপনারা বাংলা নামটা ব্যবহার করতেন বলেই
বোধহয় নরেনবাবু ভিকিটিং কার্ডে "এম. এন" না ছেপে "এন. এম"
ছেপেছিলেন—তাই না?'

গিরীনবাবু চুপ। বোঝাই যাচ্ছে ফেলুদা ঠিকই বলেছে।

'আপনার দাদা আপনাকে কী বলে ডাকেন, মি. বিশ্বাস?'

'তাতে আপনার কী প্রয়োজন?'

'আপনি যখন বলছেন না, তখন আমিই বলছি। উইল। উইল বলে
ডাকেন আপনার দাদা। হাসপাতালে জ্ঞান হবার পর তিনি আপনারই
নাম উচ্চারণ করেছিলেন দু'বার—তাই না?'

এবার ফেলুদা ভাল হামটা থেকে একটা বড় ছবি টেনে বার করল।
‘দেখুন তো গিরীনবাবু এঁদের চেনেন কিনা। এ ছবি হয়তো আপনাদের
বাড়িতেও নেই। কিন্তু বোর্ন অ্যান্ড শেপার্ডে ছিল।’

হামী-হীর ছবি। যাকে বলে ওয়েডিং গ্রুপ। ভদ্রলোকের চেহারার
সঙ্গে গিরীনবাবুর চেহারার আশ্চর্য মিল। আর ভদ্রমহিলা মেমসাহেব।

ফেলুদা বলল, ‘চিনতে পারছেন এঁদের? ইনি হচ্ছেন পার্বতীচরণ—
অর্থাৎ মি. সি. বিশ্বাস, আপনার প্রপিতামহ। ইনি যে খ্রিস্টান হয়েছিলেন
সেটা তো এঁর পোশাক দেখেই বোঝা যাচ্ছে। আর এই মহিলাটি হচ্ছেন
টমাস গডউইনের নাতনি—ওই চিঠিটা যিনি লিখেছেন তিনি—
ভিক্টোরিয়া গডউইন। এঁর কুমারী অবস্থার ছবিও বোর্ন অ্যান্ড শেপার্ডে
রয়েছে। এই ভিক্টোরিয়া আপনার প্রপিতামহের মতো একজন নেতিভ
খ্রিস্টানকে ভালবেসে তার ঠাকুরদার বিরাগভাজন হয়েছিলেন! কিন্তু
মৃত্যুশয্যা টম গডউইন ভিক্টোরিয়াকে কমা করে যান। তার এক বছর
পরেই পার্বতীচরণ ভিক্টোরিয়াকে বিয়ে করেন। তার মানে হচ্ছে এই
যে, কলকাতায় একটি নয়, দুটি পরিবারের সঙ্গে টম গডউইনের নাম
জড়িত রয়েছে—একটি রিপন লেনে, আরেকটি নিউ আলিপুরে। আর
আশ্চর্য এই যে, দু জনের কাছেই এমন দলিল রয়েছে যাতে টমাসের
খড়ির উল্লেখ রয়েছে। এক হল ভিক্টোরিয়ার এই চিঠি, আর আরেক
হল টমাসের মেয়ে শার্লট গডউইনের ডায়েরি।’

আশ্চর্য ঘটনা! গল্পকে হার মানায়। ভিক্টোরিয়ার লেখা চিঠির একটা
ভাড়া বছরকাল থেকেই নাকি নরেনবাবুদের বাড়িতে রয়েছে পুরনো
ট্রাফের মন্ডে, কিন্তু কেউ গরজ করে পড়েনি। পুরনো কলকাতা নিয়ে
লিখতে শুরু করার পর নরেনবাবু চিঠিগুলো পড়েন। তখনই টমাস
গডউইনের খড়ির ঘটনাটা জানতে পারেন, আর ভাইকে সে সম্বন্ধে
বলেন।

গিরীনবাবু ফেলুদার জেরার ঠেলায় কাহিল, কিন্তু এখনও তাকে
গোহুই দেবার সময় আসেনি। ফেলুদা হঠাৎ প্রশ্ন করল—

‘আপনার কি রেসের মাঠে যাবার অভ্যাস আছে, মি. বিশ্বাস?’

ভদ্রলোক কিছু বলার আগে মি. চৌধুরী খেঁকিয়ে উঠলেন।

‘আমার কাছ থেকে টাকা আগাম নিয়ে সব কোড়ার পিছনে খুইয়েছে,

আর এখন কবর খুঁড়ে কৃতকেশভির ঘড়ি এনে হাজির করেছে—
অকর্মা কোথাকার !’

ফেলুদা টেবুলীর তথ্য কান না দিয়ে গিরীনবাবুকেই উদ্দেশ্য করে
বলে চম্প, ‘তার মানে টম গডউইনের একটি গুণ আপনি পেয়েছেন !
আর সেই কারণেই বোধহয় এও বড় একটা পুঁকি নিয়েছিলেন ?’

উত্তরটি এক বেশ স্বীকার সঙ্গে ।

‘মি. মিস্ত্রি, আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে, একশো বছর পেরিয়ে গেলে
কবরের ভিতরের কোনও জিনিসের উপর কোনও ব্যক্তিবিশেষের
আর কোনও অধিকার থাকে না। ওই ঘড়িটা এখন আর টম গডউইনের
সম্পত্তি নয়।’

‘নেটা জানি মি. বিশ্বাস। ও ঘড়ি সরকারের সম্পত্তি, আপনারও
নয়। কিন্তু কথাটা হচ্ছে, আপনার অপরাধ তো শুধু ঘড়ি চুরির চেঁতা
নয়, অন্য অপরাধও যে আছে।’

‘কী অপরাধ ?’ গিরীন বিশ্বাস এখনও একতরে ভাব করে চেয়ে
আছেন ফেলুদার দিকে।

এবার ফেলুদা তার পকেট থেকে ছোট্ট একটা জিনিস বার করল।

‘সেখি ভো, এই বোতামটা আপনার ওই কোটটা থেকেই পাড়েছে
কিনা—যে কোটটা আপনি এই দু দিন আগে হংকং লন্ড্রি থেকে নিয়ে
এলেন।’

ফেলুদা বোতাম নিয়ে এগিয়ে গেল।

‘এই দেখুন, মিলে যাচ্ছে।’

‘জ্যেতে কী প্রমাণ হল ?’ প্রশ্ন করলেন গিরীনবাবু। ‘এটা খুলে পড়ে
যায় গোরস্থানে। আমি তো অস্বীকার করছি না যে সেখানে
গিয়েছিলাম।’

‘আমি যদি বলি এটা আপনার কোট নয়, আপনার দাদার কোট, তা
হলে স্বীকার করবেন কি ?’

‘কী আবোল-তাবোল বকছেন আপনি ?’

‘আবোল-তাবোল আমি বকছি না, মি. বিশ্বাস, আপনি বকছেন।
কাল আমার বাড়িতে এসে বকেছেন, আবার এখানে বকছেন। এ কোট
আপনার দাদার। এটা পরে তিনি গোরস্থানে গিয়েছিলেন সেই বাড়ির

দিন। গিয়ে দেখেন গড়উইনের কবর খোঁড়া হচ্ছে, আপনি রহেয়েছেন।
তিনি আপনাকে কথা নিতে বান। আপনি তার মাথার বাড়ি মারেন—
কিটি বা ওই জায়গায় কিছু ফিরে। নরেন্দ্রবাবু অজ্ঞান হয়ে পড়েন। আপনি
স্নাত্তে তাকে মেবেই ফেলতেন, কিন্তু সেই সময় বাড়ীটা আসে।
আপনি পলাতে বান। গাই পড়ে—

‘গিরীনবাবু আবার কথা দিলেন।

‘আমার দাদাকে আপনি মিথোবাদী বানাতে চান? তিনি বলেছেন
তার মাথার পাহের ডাল—’

কিন্তু ফেলুদার কথা আটকানো এখন সহজ নয়। সে বলেই
চলল —

‘গাছের ডাল ভেঙে পড়ে আপনার পিঠে। আপনার গায়ে কোট ছিল
না। পিঠের তখন ঢাকবার জন্য আপনি দাদার কোট খুলে নিজে
পড়েন। কোটের বোতাম ছিড়ে যায়, পকেট থেকে মানিব্যাগ পড়ে
যায়। আপনার নিজের পকেট থেকে রেসের বই—’

গিরীনবাবু আবার পলাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। এবার
ফেলুদাই তাঁকে ধরে তার কোটটা খুলে গিয়ে দেখিয়ে দিল তার
টেরিলিনের শার্টের নীচে ব্যাণ্ডেজটা।

‘আপনার দাদা আপনাকে বাঁচাবার জন্য অনেক মিথো বলেছেন
গিরীনবাবু, কারণ তিনি আপনাকে অত্যন্ত বেশিরকম স্নেহ করতেন।’

ফেলুদা এবার তার কোলাটায় কুক্কলভির ঘড়িটা আর
ভিক্টোরিয়ার চিঠিটা ভরে নিয়ে, সেটা কাঁধে নিয়ে হতভম্ব মি. চৌধুরীর
দিকে ফিরে বলল, ‘আপনার সব ঘড়িতে এক সঙ্গে বারোটা বাজলে
কেমন শোনায়, সেটা শোনার আর সুযোগ হল না। হবে হয়তো
একদিন।’

তিনবার ডাকার পর ভট্টায় উঠলেন। তিনি যে এর কাঁকে আবার
ইল হারিয়ে নাটকের আসল দৃশ্যটাই মিস্ করে গেছেন সেটা এককল
বুঝতে পারিনি।

‘এ সব লোককে দাবিয়ে রাখা যায় না যে। পুলিশও কিছু করতে

পারে না। মহাদেব চৌধুরীর মতো লোকগুলো হল এক-একটা হিটলার। কাঙ ওছিয়ে নিতে এর কত লোককে যে তাঁকার ঘোরে হাতের মুঠোর মধ্যে রাখে তার ঠিক নেই।’

আমরা তিনজনে পেনেটির পঙ্গর ঘাটে এসে এসেছি। চৌধুরীর বাড়ি থেকে মিনিট পাঁচেকের শখ এই ঘাট। পূব আকাশের রং দেখে মনে হচ্ছে সূর্য এই উঠল বলে। হরিপদবাবু অন্ধরে অন্ধরে ফেলুদার নির্দেশ পালন না করলে আজ আমাদের কী দশা হত জানি না। (লালমোহনবাবু বললেন গঙ্গাপ্রাপ্তি)। একজন লোকের কতখানি দায়িত্ববোধ থাকলে তবে আমাদের গাড়ির পিছনে লাওয়া করে এসে সটান গিয়ে থানায় খবর দেয়, সেই ভাবতে অবাক লাগছে। লালমোহনবাবু হরিপদবাবুরই এনে দেওয়া ভাঁড়ের চায়ে একটা চুমুক দিয়ে বললেন, ‘গাড়ি কেনার ফলটা আশা করি টের পেলেন?’

‘মোক্ষমভাবে’, বলল ফেলুদা। ‘আপনার গাড়ির উপর অনেক অত্যাচার হয়েছে এই তিন দিনে। আজ শহরে ফিরে দুটো জায়গায় যাবার পর আর বেশ কিছুদিন ও গাড়ির ওপর জুসুম করব না।’

‘দুটো জায়গা মানে?’

‘এক হল নরেনবাবুর বাড়ি। তাকে খবরটা আর সেই সঙ্গে এই চিঠিটা ফেরত দেওয়া দরকার।’

‘আর দ্বিতীয়?’

‘সাউথ পার্ক স্ট্রিট গোরস্থান।’

‘আ-হা-হা-হা!’

‘কী সাবধানে পা ফেলতে হয়েছে জানিস জোপ্সে? এর জন্যে জুত করে লড়তে পারলাম না লোকগুলোর সঙ্গে!’

ফেলুদা তার বাঁ পায়ের হাণ্ডিং বুটটা খুলে তার ভিতর হাত ঢুকিয়ে প্রথমে বায় করল তার তৈরি ফলস সুকতলা, যার তলায় সোপ, যার মধ্যে তুলোর মোড়কে লুকিয়ে আছে একটি আশ্চর্য ফ্রিসিস, এত হলকুল কাণ্ডের মধ্যেও যার শুধু কাঁচটি ছাড়া আর সবই অক্ষত, আটুট রয়েছে।

‘এটা যথাস্থানে ফেরত দিতে হবে না?’

সেলুদার হাতে বুলছে টমাস গডউইনকে তার স্নানর জন্যে দেওয়া
পাখানো-এর নবাব সাদত আলির প্রথম বকশিশ—ইংল্যান্ডের অন্যতম
শ্রেষ্ঠ কারিগর জ্ঞানসিস পেরিগ্যানের তৈরি রিপটার পকেট ঘড়ি—
দুশো বছর তার মালিকের কঙ্কালের পাশে ভূগর্ভে থেকেও যার
জৌলুস সূর্যের প্রথম আলোতে এখনও আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে।



হিন্মস্তার অভিষাপ

Pradosh C. Mitter

Private Investigator



ହିନମନ୍ତାର ଅଭିଷାପ

୩୭

1

বহস্য-রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক লালমোহন গাঙ্গুলী ওরফে জটায়ু চৌধুরীর সামনে থেকে বইটা সরিয়ে ফেলুদার দিকে ফিরে বললেন, 'রামমোহন রায়ের ন্যস্তির মার্কস ছিল সেটা জানতেন ?'

ফেলুদার মুখের উপর রুমাল চাপা, তাই সে শুধু মাথা নাড়িয়ে না জানিয়ে দিল ।

প্রায় দশ মিনিট ধরে একটা পর্বতপ্রমাণ খড়বোকাই লরি আমাদের যে শুধু পাশ দিচ্ছে না তা নয়, সমানে পিছন থেকে রেলগাড়ির মতো কালো ঘোঁয়া ছেড়ে প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলেছে । লালমোহনবাবুর গাড়ির ড্রাইভার হরিপদবাবু বার বার হর্ন দিয়েও কোনো ফল হয়নি । লরির পিছনের ফুলের নকশা, নদীতে সূর্য অস্ত যাওয়ার দৃশ্য, হর্ন পীজ, টা-টা শুডবাই, খ্যাঙ্ক ইউ সব মুখস্থ হয়ে গেছে । লালমোহনবাবু মার্কস সম্বন্ধে বইটা কিছুদিন হল জোগাড় করেছেন ; অনেক দিন আগের লেখা বই, নাম 'বাঙালীর মার্কস' । বইটা ঠর ঝোলার মধ্যে ছিল, লরির জ্বালায় সামনে কিছু দেখবার জো নেই বলে সেটা বার করে পড়তে শুরু করেছেন । ইচ্ছে আছে মার্কস নিয়ে একটা বহস্য উপন্যাস লেখার, তাই ফেলুদার পরামর্শ অনুযায়ী বিষয়টা নিয়ে একটু পড়াশুনা করে রাখছেন । মার্কসের কথা অবিশিষ্ট এমনিতেই হচ্ছিল, কারণ আজ সকালেই রাঁচি শহরে দা ফ্রেট মার্জেন্টিক মার্কসের বিজ্ঞাপন দেখেছি । হাজারিবাগে এসেছে মার্কস, আর আমরা বাঙ্কিও হাজারিবাগেই । ওখানে সন্ধ্যাবেলা আর কিছু করার না থাকলে একদিন নিয়ে মার্কস দেখে আসব সেটাও তিনজনে ম্যান করে রেখেছি ।

শীতের মুহুরীতে কোথাও একটা যাবার ইচ্ছে ছিল ; লালমোহনবাবুর নতুন বই পুজোয় বেবিয়েছে, তিন সপ্তাহে দু হাজার বিক্রি, ভদ্রলোকের মেজাজ খুশ, হাত

খালি। নতুন বইয়ের নাম 'জানকুভারের ভ্যাম্পায়ার'-এ ফেলুদার আপত্তি ছিল ; ও বলেছিল জানকুভার একটা পোন্মায় আধুনিক শহর, ওখানে ভ্যাম্পায়ার থাকতেই পারে না : তাতে লালমোহনবাবু বললেন হর্নিম্যানের জিওগ্রাফির বই তন্নতন্ন করে খেঁটে ঠিক মনে হয়েছে ওটাই বেস্ট নাম। ফেলুদা কোডাময়ি একটা তদন্ত করে এসেছে গত সেপ্টেম্বরে, মক্কেল সর্বোত্তম সহায়ের একটা বাড়ি আছে হাজারিবাগে, সেটা প্রায়ই খালি পড়ে থাকে, তাই ফেলুদার কাজে খুশি হয়ে তদন্তকে তাঁর বাড়িটা অফার করেছেন দশ দশকের জন্য। চৌকিদার আছে, সে-ই দেখাশুনা করে, আর তার বৌ রান্না করে। যাওয়ার খরচ ছাড়া আর কোনো খরচ লাগবে না আমাদের।

লালমোহনবাবুর নতুন আফসোসওবেই যাওয়া ঠিক হল ; বললেন, 'লঙ বানে গাড়িটা কীরকম সার্ভিস দেয় সেটা দেখা নরকার।' গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক বোত দিয়ে আসানসোল-খানবাদ হয়ে আসা যেত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঝড়গপুর-বাঁচি হয়ে আসাই ঠিক হল। ঝড়গপুর পর্যন্ত ফেলুদা চালিয়েছে, তারপর থেকে ড্রাইভারই চালাচ্ছে। গতকাল সকাল আটটায় রওনা হয়ে ঝড়গপুরে লাঞ্চ সেরে সন্ধ্যায় বাঁচি পৌঁছই। সেখানে অ্যাডার হোটেলে থেকে আজ সকাল ন'টায় হাজারিবাগ রওনা দিই। পঞ্চাশ মাইল রাস্তা, খালি পেলে সোয়া ঘণ্টায় পৌঁছে যাওয়া যায়, কিন্তু এই লরির জ্বালায় সেটা নিশ্চিত বেড়ে গিয়ে দাঁড়াবে।

আরো মিনিট পাঁচেক হর্ন দেবার পর লরিটা পাশ দিল, আর আমবাও সামনে খোলা পেয়ে হাঁপ ছাড়লাম। দু'পাশে বাবলা গাছের সারি, তার অনেকগুলোতেই বাবুইয়ের বাসা, দূরে পাহাড় দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে পথের ধারেও টিলা পড়ছে। লালমোহনবাবু বই বন্ধ করে দৃশ্য দেখে আহা-বাহা করছেন আর মাঝে মাঝে বেমানান রবীন্দ্র-সঙ্গীত গুনগুন করছেন, যেমন অগ্রান মাসে ফাগুনের নদীন আনন্দে। ঠুঁর চেহারা গান মানায় না, গলার কথা ছেড়েই দিলাম। মুশকিল হচ্ছে, উনি বলেন কলকাতার ডামাডোল থেকে বেরিয়ে নেচারের কনট্রাস্ট এলেন নাকি ঠুঁর গান আসে, যদিও স্টক কম বলে সব সময়ে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট গান মনে আসে না।

ওবে এটা বলতেই হবে যে ঠুঁর দৌলতে এই চক্কিশ ঘণ্টার মধ্যে সার্কাস সম্বন্ধে অনেক তথ্য জেনে ফেলেছি। কে জানত আজ থেকে একশো বছর আগে বাঙালীর সার্কাস ভারতবর্ষে এত নাম কিনেছিল? সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল প্রোফেসর বোসের গ্রেট বেস্কল সার্কাস। এই সার্কাসে নাকি বাঙালী মেয়েরাও খেলা দেখাত, এমনকি বাঘের খেলাও। আর সেই সঙ্গে রাশিয়ান, আমেরিকান, জার্মান আর ফরাসী খেলোয়াড়ও ছিল। গাস্ বার্নস বলে একজন আমেরিকানকে রেখেছিলেন প্রোফেসর প্রিয়নাথ বোস বাঘ-সিংহ ট্রেন করার জন্য। ১৯২০-এ

প্রিয়নাথ বোস মারা যান। আর তার পর থেকেই বাঙালী সার্কাসের দিন ফুরিয়ে আসে।

‘এই গ্রেট ম্যাজেস্টিক কোন দেশী সার্কাস মশাই?’ জিগ্যাস করলেন লালমোহনবাবু।

‘দক্ষিণ ভারতীয়ই হবে’, বলল ফেলুদা, ‘সার্কাসটা আশ্রয়ল ওদের একচেটে হয়ে গেছে।’

‘ভালো ট্র্যাপীজ আছে কিনা সেইটেই হচ্ছে প্রশ্ন। ছেলেবেলায় হার্মস্টোন আর কার্লেকার সার্কাসে যা ট্র্যাপীজ দেখিছি তা ভোলবার নয়।’

লালমোহনবাবুর গল্পে নাকি ট্র্যাপীজের একটা বড় ভূমিকা থাকবে। শূন্যে সব লোমহর্ষক খেলার মাঝখানে একজন ট্র্যাপীজের খেলোয়াড় খুলন্ত অবস্থায় আরেকজনকে বিসাক্ত ইনজেকশন দিয়ে খুন করবে। রহস্যের সমাধান করতে হিরো প্রথমে ক্রমশে নাকি ট্র্যাপীজের খেলা শিখতে হবে। ফেলুদা শুনে বলল, ‘যাক, একটা জিনিস তাহলে আপনার হিরোর এখনো শিখতে বাকি।’

৭২ কিলোমিটারের পোস্টটা পেরিয়ে কিছুদূর গিয়েই আরেকটা আশ্বাসাড়র দেখা গেল। সেটা রাস্তার এক ধারে বনেট খোলা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে, আর তার পাশেই দাঁড়িয়ে এক ভদ্রলোক হাত তুলে যে ডিস্টি করছেন সেটা রেলের স্টেশনে খুব দেখা যায়। সেখানে সেটা ওড-বাই, আর এখানে হয়ে গেছে থামতে বলার সংকেত। হরিপদবাবু ব্রেক কষলেন।

‘ইয়ে, আপনারা হাজারিবাগ যাচ্ছেন কি?’

ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। গায়ের রং ফরসা, চোখে চশমা, পরনে খয়েরি প্যান্টের উপর সাদা শাট আর সবুজ হাত-কাটা পুলোভার। সঙ্গে ড্রাইভার আছে, যার শরীরের উপরের অর্ধেকটা এখন বনেটের নিচে।

প্রশ্নের উত্তরে ফেলুদা ‘আজ্ঞে হ্যাঁ’ বলায় ভদ্রলোক বললেন, ‘আমার গাড়িটা গণ্ডগোল করছে, বুকেছেন। বোধহয় সিরিয়াস। তাই ভাবছিলাম—’

‘আপনি আমাদের সঙ্গে আসতে চাইলে আসতে পারেন।’

‘সো কইন্ড অফ ইউ!’—ভদ্রলোক বোধহয় ভাবতে পারেননি যে না চাইতেই ফেলুদা অফারটা করবে।—‘আমি ওখান থেকে একটা মেকানিক নিয়ে টোল্লি করে চলে আসব। তাছাড়া তো আর কোনো ইয়ে দেখছি না।’

‘আপনার সঙ্গে লাগেজ কী?’

‘একটা সুটকেস, তবে সেটা অবিশ্যি পরে নিয়ে যেতে পারি। এখান থেকে যেতে আসতে তিন কোয়ার্টারের বেশি লাগবে না।’

‘চলে আসুন।’

ভদ্রলোক ড্রাইভারকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়ে আমাদের গাড়িতে উঠে আরো

দু'বার বললেন সো কাইন্ড অফ ইউ । তারপর বাকি পথটা আমরা কিছু না জিগোস করতেই নিজের বিষয়ে একগাদা বলে গেলেন । ঠিক নাম খ্রীষ্টীন্দ্র চৌধুরী । বাপ বছর দশেক হল বিটামার করে হাকবিবাগে বাড়ি করে আছেন, আগে রাঁচিতে আভভোকেট ছিলেন, নাম মহেশ চৌধুরী : এ অঞ্চলের নামকবা লোক ।

‘আপনি কমকাতাতেই থাকেন ?’ জিগোস করল ফেলুদা ।

‘হ্যাঁ । আমি আছি ইলেকট্রনিকসে । ইন্ডোভিশনের নাম শুনেছেন ?’

ইন্ডোভিশন নামে একটা নতুন টেলিভিশনের বিজ্ঞাপন কিছুদিন থেকে কাগজে দেখছি, সেটা নাকি এদেরই তৈরি ।

‘আমার বাবার সস্তর পূর্ণ হচ্ছে কাল’, বললেন ভদ্রলোক, ‘বড়না আমার স্ত্রী আর মেয়েকে নিয়ে দিন তিনেক হল পৌঁছে গেছেন । আমার আবার দ্বিগ্নিতে একটা কাজ পড়ে গেল, আসা মুশকিল হচ্ছিল, কিন্তু বাবা টেলিগ্রাম কবলেন মাস্ট কাম বলে ।—একটু থামাবেন গাড়িটা কাইন্ডলি ?’

গাড়ি থামল : কেন তা বুঝতে পারছি না । ভদ্রলোক তাঁর হাতের বাগটা থেকে একটা ছোট ক্যাসেট রেকর্ডার বার করে গাড়ি থেকে নেমে বাস্তব পাশেই একটা শালবনে ঢুকে মিনিট খানেকের মধ্যেই ফিরে এসে বললেন, ‘একটা ব্রাইক্যাচার ডাকছিল : লাকিলি পেয়ে গেলাম । পাখির ডাক রেকর্ড করাটা আমার একটা নেশা । সো কাইন্ড অফ ইউ ।’

ধন্যবাদটা অবিশ্যি তাঁর অনুরোধে গাড়ি থামানোর জন্য ।

আশ্চর্য, ভদ্রলোক নিজের সম্বন্ধে এত বলে গেলেনও, আমাদের কোনো পরিচয় জানতে চাইলেন না । ফেলুদা অবিশ্যি বলে যে একেকজন লোক থাকে যারা অন্যের পরিচয় নেওয়ার চেয়ে নিজের পরিচয় দিতে অনেক বেশি বাগ্র

হুজুরিবাগ টাউনে পৌঁছে ইউরেকা অটোমোবিলস-এ খ্রীষ্টীন্দ্রবাবুকে নামিয়ে দেবার পর আরেকবার সো কাইন্ড অফ ইউ বলে ভদ্রলোক হঠাৎ জিগোস করলেন, ‘ভালো কথা, আপনারা উঠছেন কোথায় ?’

জবাবটা দিতে ফেলুদার গলা তুলতে হল, কারণ গাড়ির কাছেই কেন জানি লোকের তিড় জমেছে, আর সবাই বেশ উত্তেজিতভাবে কথা বলছে । কী বিষয়ে কথা হচ্ছে সেটা অবিশ্যি পরে জেনেছিলাম ।

ফেলুদা বলল, ‘সঠিক নির্দেশ দিতে পারব না, কারণ আমরা এই প্রথম আসছি এখানে । এটা বলতে পারি যে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড রেস্ট হাউস আর কর্নেল মোহান্তির বাড়ির খুব কাছে ।’

‘ও, তার মানে আমাদের বাড়ি থেকে মিনিট সাতেকের হাটা পথ ।—টেলিফোন আছে ?’

‘সেভেন ফোর টু ।’

‘বেশ, বেশ ।’

‘আর আমার নাম মিত্র । পি সি মিত্র ।’

‘দেখেছেন, নামটাই জানা হয়নি ।’

তদ্রলোককে ছেড়ে দিয়ে রওনা হবার পর ফেলুদা বলল, ‘নতুন মাল বাজারে ছাড়ছে বলে বোধহয় টেন্স হয়ে আছে ।’

‘ব্যতিক্রম,’ বললেন লালমোহনবাবু ।

ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড রেস্ট হাউসের কথা জিগ্যেস করে আমাদের বাড়ির স্বাস্থ্য খুঁজে বার করতে কোনো অসুবিধা হল না । কর্নেল জি সি মোহান্তির নাম লেখা মার্বেল ফলক ওয়ালা গেট ছাড়িয়ে তিনটে বাড়ি পরেই এস সহায় লেখা বুগেনভিলিয়ায় ঢাকা গেটের বাইরে এসে হর্ন দিতেই একজন বৈটে মাঝবয়সী লোক এসে গেটটা খুলে দিয়ে সেলাম ঠুকল । মোরাম ঢাকা পথে স্বানিকটা এগিয়ে গিয়ে একতলা বাংলা টাইপের বাড়ির সামনে আমাদের গাড়ি থামল । মাঝবয়সী লোকটাও দৌড়ে এসেছে পিছন পিছন, জিগ্যেস করে জানলাম সে-ই চৌকিদার, নাম বুলাকিপ্ৰসাদ ।

গাড়ি থেকে নেমে বুঝলাম জায়গাটা কী নির্জন । বাংলাটা ঘিরে বেশ বড় কম্পাউন্ড (লালমোহনবাবু বললেন আট লীস্ট তিন বিঘে), একদিকে বাগানে তিন চার রকম ফুল ফুটে আছে, অন্য দিকে অনেকগুলো বড় বড় গাছ, তার মধ্যে তৈতুল, আম আর অর্জুন চিনতে পারলাম । কম্পাউন্ডের পাঁচিলের উপর দিয়ে উত্তর দিকে একটা পাহাড় দেখা যাচ্ছে, সেটাই নাকি কানারি হিল, এখান থেকে মাইল দুয়েক ।

বাড়িটা তিনজনের পক্ষে একেবারে ফরমাশ দিয়ে তৈরি । সামনে তিন খাপ সিঁড়ি উঠে চণ্ডা বারান্দার পর পাশাপাশি তিনটে ঘর । মাকেরটা বৈঠকখানা, আর দু’দিকে দুটো শোবার ঘর । পিছন দিকে আছে খাবার ঘর, রান্নাঘর ইত্যাদি । সানসেট দেখা যাবে বলে লালমোহনবাবু পশ্চিমের বেডরুমটা নিলেন ।

সুটকেস থেকে জিনিস বার করে বাইরে রাখছি, এমন সময় বুলাকিপ্ৰসাদ আমার ঘরে ঢা নিয়ে এসে ট্রেটা টেবিলের উপর রেখে যে কথাটা বলল, তাতে আমাদের দু’জনেরই কাজ বন্ধ করে ওর দিকে চাইতে হল । লালমোহনবাবু সব ঘরে ঢুকেছেন, তিনিও দরজার মুখটাতেই দাঁড়িয়ে গেলেন ।

‘আপলোগ যব বাহার যাঁয়ে,’ বলল বুলাকিপ্ৰসাদ ‘পরদল যানেসে যারা সমহালকে যানা ।’

‘চোব ডাকাতের কথা বলছে নাকি মশাই ?’ বললেন লালমোহনবাবু ।

‘নেহী, বাবু : বাঘ ভাগ গিয়া মজিসি সর্কস সে ।’

সর্বনাশ ! লোকটা বলে কী !

জিগোস করতে জানা গেল আজই সকালে নাকি একটা ভাগড়াই বাঘ সার্কাসের খাঁচা থেকে পালিয়েছে । কী করে পালিয়েছে সেটা বুলাকিপ্রসাদ জানে না, কিন্তু সেই বাঘের ভয়ে সারা হাজারিবাগ শহর ভুটস্থ । বাঘের খেলাই নাকি এই সার্কাসের যাকে বলে স্টার অ্যাট্রাকশন । সার্কাসের বিজ্ঞাপনও যা দেখেছি, তাতে বাঘের ছবিটাই সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে । ফেলুদার অবিশ্যি চোখই আলাদা, তাই সে আমাদের চেয়ে বেশি দেখেছে । বলল, বাঘের খেলা যিনি দেখান তিনি নাকি মারাঠী, নাম কারাভিকার, আর নামটা নাকি বিজ্ঞাপনে দেওয়া ছিল ।

লালমোহনবাবু খবরটা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বললেন তাঁর গল্পে বাঘ পালানোর ঘটনা একটা রাখা যায় কিনা সেটা তিনি ভাবছিলেন, কাজেই এটাকে টেলিগ্ৰাফি ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না ।—‘তবে আপনি মশাই একেবারে ইনকসিটো হয়ে থাকুন, গোয়েন্দা জানলে আপনাকে নিশ্চয় ওই বাঘ সন্ধানের কাজে লাগিয়ে দেবে ।’

ইনকসিটো অবিশ্যি ইনকগনিটোর জটায়ু সংস্করণ । লালমোহনবাবু মাঝে মাঝে ইংরিজি কথায় এরকম গুলট পালট করে ফেলেন । খবরটা শুনে এত অবাক হয়ে গিয়েছিলাম যে তাঁকে আর শুধরে দেওয়া হল না । ফেলুদা অবিশ্যি অকারণে কখনই ওর পেশাটা প্রকাশ করে না । আর গোয়েন্দা বলেই যে ওকে যে কেউ যে কোনো তদন্তে ফাঁসিয়ে দেবে সেটারও কোনো সম্ভাবনা নেই ।

বুলাকিপ্রসাদ আরও বলল যে সার্কাসটা নাকি আগে শহরের মাঝখানে কার্জন মাঠে বসত, এইবারই নাকি প্রথম সেটা শহরের এক ধারে একটা নতুন জায়গায় বসেছে । এই মাঠটার উত্তরে নাকি বিশেষ বসতি নেই । বাঘ যদি সৈদিক দিয়ে বেত্রায় তাহলে রাস্তা পেরিয়ে কিছুদূর গিয়েই জঙ্গল পাবে । কাছাকাছি আদিবাসীদের গ্রাম আছে, যিলে পেলে সেখান থেকে গরু বাছুর টেনে নিয়ে যাওয়া কিছুই আশ্চর্য নয় ।

মোটকথা, ঘটনাটা চাকল্যকর । আপসোস এই যে হাজারিবাগের মতো জায়গায় এসে বাঘের ভয়ে স্বচ্ছন্দে হেঁটে বেড়ানো যাবে না ।

চা খাওয়ার পর লালমোহনবাবু প্রস্তাব করলেন যে দুপুরে একবার গ্রেট ম্যাজেস্টিকে টু মারা হোক । ঘটনাটা ঠিক কীভাবে ঘটেছে সেটা জানতে পারলে নাকি ওর খুব কাজে দেবে । ‘টু মারা মানে কি টিকিট কেটে সার্কাস দেখার কথা ভাবছেন ?’ ফেলুদা জিগোস করল ।

‘ঠিক তা নয়,’ বললেন লালমোহনবাবু, ‘আমি ভাবছিলাম যদি খোদ আলিকের সঙ্গে দেখা করা যায়। অনেক ডিটেলস জানা যেও তাঁর কাছে।’
 ‘সেটা ফেলু মিড্রিরের সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়।’

॥ ২ ॥

দুপুরে বলাকিশাসনের বোয়ের নামা ‘মুবগীর কবি আর অড়হুড়ের ডাল খেতে গাড়িতে করেই বেরিয়ে পড়লাম আমরা। বুঝতে পারলাম ফেলুদারও যথেষ্ট কৌতুহল আছে এই বাঘ পালানোব ব্যাপারে। বেরোবার আগে থানায় একটা ফোন করল। কোডামায় ওকে বিশ্বাস পুলিশের সঙ্গে কাজ করতে হয়েছিল, মর্দেখুর সহায়কেও এখানে সবাই চেনে, তাই নাম করতেই ইনস্পেক্টর রাউত ফেলুদাকে চিনে ফেললেন। আসলে পুলিশের সাহায্য ছাড়া হয়ত এই জরুরী অবস্থায় সার্কাসের মালিকের সঙ্গে দেখা করা মূশকিল হত। রাউত বললেন, সার্কাসের সামনে পুলিশের লোক থাকবে, ফেলুদার কোনো অসুবিধা হবে না। ফেলুদা এটাও বলে দিল যে সে কোনোরকম তদন্ত করতে যাচ্ছে না, কেবল কৌতুহল মেটাতে যাচ্ছে।

সমস্ত শহরে যে সাড়া পড়ে গেছে সেটা গাড়িতে যেতে যেতে বেশ বুঝতে পারছিলাম। শুধু যে রাস্তার মোড়ে জটলা তা নয়, একটা চৌমাথায় দেখলাম ঢাড়া পিটিয়ে লোকদের সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে। ফেলুদা একটা পানের দোকানে চারমিনার কিনতে নেমেছিল, দেখানে দোকানদার বলল যে বাঘটাকে নাকি উত্তরে ডাহিরি বলে একটা আদিবাসী গ্রামের কাছাকাছি দেখা গেছে, তবে কোনো উৎপাতের কথা এখনো শোনা যায়নি।

সার্কাসের তাঁবু দেখলেই বুকের ভিতরটা কেমন জ্বলি করে ওঠে, ছেলেবেলা ফেলুদার সঙ্গেই কত সার্কাস দেখেছি সে কথা মনে পড়ে যায়। খ্রোম্যাডেস্টিকের সাদা আর নীল ডোলাকাটা ছিমছাম তাঁবুটা দেখলেই বোঝা যায় এটা জতে সার্কাস। তাঁবুর চুড়োয় ফরফর করে হলদে ফ্যাগ উড়ছে, চুড়ো থেকে বেড়া অর্ধ টেনে আনা দড়িতে আরো অল্পশ্রু ব্রিডিন ফ্যাগ। তাঁবুর গেটের বাইবে কমপক্ষে হাজার লোক, তারা অনেকেই টিকিট কিনতে এসেছে। বাঘ পালানোয় সার্কাস বন্ধ হয়নি, শুধু আপাতত বাঘের খেলাটাই স্থগিত। আরো কতরকম খেলা যে সে সার্কাসে দেখানো হয় সেটা হাতে আঁকা প্রকাণ্ড বড় বড় বিজ্ঞাপনে বোঝানো হয়েছে। শির্ষী খুব পাকা নন, তবে লোকের মনে চনমনে ভাব অন্তে এই যথেষ্ট।

পুলিশের লোক গেটের বাইরেই ছিল। ফেলুদা কার্ডটা দিতেই খুব খাতির করে

ভিতরে ঢুকিয়ে দিল। বলল, মালিক মিঃ কুটিকেও বলা আছে, তিনি তাঁর ঘরে অপেক্ষা করছেন।

তীব্রটাকে গিরে বেশ খানিকটা জাহগা ছেঁড়ে তারপর টিনের বেড়া এই বেড়ার মধ্যেই একবারে লুপ্তিয়ে আছে না গ্রেট ম্যাজেস্টিক সার্কাসেব মালিক মিঃ কুটির কারাভান। বলা যায় একটা সুদৃশ্য চলন্ত বাড়ি। দু'পাশের সব বাঁধা কাঁচের জানালায় নকশা করা পর্দার ফাঁক দিয়ে টুকরো টুকরো বেদ চুকেছে ভিতরে আবছা অন্ধকারে। মিঃ কুটি চেয়ার ছেঁড় উঠে আমাদের তিনজনের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে বসবার জন্য মিনি-সোফা লেংয়ে দিলেন। ওয়ালোকেব গায়ের রং মাজা, বয়স পঞ্চাশেও বেশি না হলেও মাথার চুল যথেষ্ট সাদা, হাসলে বোঝা যায় দাঁতও চুলের সঙ্গে মিলানসই, যদিও ফলস টীথ নয়।

ফেলুদা প্রথমেই বলে দিল যে ও পুলিশের লোক নয়, সার্কাস ওব খুব প্রিয় জিনিস, গ্রেট ম্যাজেস্টিকের খ্যাতির কথা ও জানে, রাজাবিবাগে এসে সার্কাস দেখার ইচ্ছে ছিল, আপসোস এই যে একটা দুখটনার জন্য আসল খেলাটাই দেখা হবে না। সেই সঙ্গে লালমোহনবাবুরও পরিচয় করিয়ে দিল একজন বিশিষ্ট লেখক বলে। —‘সার্কাস নিয়ে একটা গল্প লেখার কথা ভাবছেন মিঃ গান্ধলী।’

মিঃ কুটি বললেন, সার্কাসে আসাব আগে ছ'বছর উনি কলকাতায় একটা জাহাজ কোম্পানিতে ছিলেন, বাঙালীদের ভালোবাসেন, কারণ বাঙালীরাই নাকি সার্কাসের সত্যিকার বদর করে। আমরা সার্কাস দেখায় নিকুংসাই বোধ করছি ছেনে বললেন যে বাঘের খেলা ছাড়াও অনেক কিছু দেখাব আছে গ্রেট ম্যাজেস্টিকে। —‘কাল আমাদের স্পেশাল শো ছিল, রাজাবিবাগেব অনেক নামকরা লোককে আমরা ইনভাইট করেছিলাম আপনাদেরও ইনভাইট করছি।’

‘ব্যাপারটা হল কীভাবে?’ লালমোহনবাবু হিন্দি আর ইংরিজি মিশিয়ে জিগোস করলেন। (আসলে জিগোস করেছিলেন—‘শের ভো ভাগা, বাউ হাউ?’)

‘ভেরি আনফরচুনেট, মিঃ গ্যাংগুলী,’ বললেন মিঃ কুটি। ‘নাথেল খাঁচার দরজাটা ঠিকভাবে বন্ধ করা হয়নি। বাঘ নিজেই সেটাকে মাথা দিয়ে ঠেলে তুলে পালিয়েছে। তার উপর আরেকটা গলতি হয়েছে এই যে টিনের বেড়ার একটা অংশ কে জানি ফাঁক করে বাইরে যাবে বলে শটকাট করেছিল তারপর আর বন্ধ করেনি। কে দোষী সেটা আমরা বার করেছি, আর তার জন্য প্রপার স্টেপস নিচ্ছি।’

ফেলুদা বলল, ‘বসেতে একবার ঠিক এইভাবে বাঘ পালিয়েছিল না?’

‘হ্যাঁ, ন্যাশনাল সার্কাস। শহরের রাস্তায় বেরিয়ে গিয়েছিল বাঘ। কিন্তু বেশি দূর যাবার আগেই রিং-মাস্টার তাকে ধরে নিয়েছিল।’

এখনকার বাঘ পাল্যানোর ব্যাপারে আরো খবর জানলাম কুটির কাছে । কম করে জনা পঞ্চাশেক লোক নাকি বাঘটাকে ভাঁবুর বাইরে দেখেছে । এক পেট্রোল স্টেশনের মালিকের বাড়ির উঠানে নাকি বাঘটা ঢুকেছিল । ভত্রলোকের স্ত্রী সেটাকে দেখতে পেয়ে ভিরমি যান । এক নেপালী-ডল্ললোক খুটায়ে যাচ্ছিলেন, তিনি বাঘটাকে রাস্তা পেরোতে দেখে সোজা ল্যাম্পপোস্টে ধাক্কা মেরে পাঁজরার তিনশুট হাড় ভেঙে এখন হাসপাতালে আছেন ।

‘আচ্ছা, আপনাদের ভেরিং-মাস্টার আছে নিশ্চয়ই ?’

রিং-মাস্টার কথাটা নতুন শিখে সেটা ব্যবহার করার লোভে সামলাতে পারলেন না জটায়ু ।

‘কে কারাগতিকার ? তার শরীর কিছুদিন থেকে এমনিতেই খারাপ যাচ্ছে । বয়স হয়েছে নিয়ারলি ফাঁট । ঘাড়ে একটা ব্যথা হয় মাঝে মাঝে, তাই নিয়েই খেলা দেখায় । আমার কথা শুনবে না, ডাক্তারও দেখাবে না । মাস খানেক হল ওই আর্মি আরেকজন লোক রেখেছি । নাম চন্দ্রন । কেরলের লোক । ভেরি শুভ । সেও বাঘ ট্রেন করে, কারাগতিকার অসুস্থ হলে সে-ই খেলা দেখায় ।’

‘কাল স্পেশ্যাল শো-ওঁ কে দেখিয়েছিল ?’ ফেলুদা জিগ্যেস করল ।

‘কাল কারাগতিকারই দেখিয়েছিল । একটা খেলা ও ছাড়া আর কেউ দেখাতে পারে না । খেলার ক্লাইমাক্সে দু’হাতে বাঘের মুখ ফাঁক করে তার মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দেখে । দুঃখের বিষয়, কাল একটা বিশ্রী গুণগোল হয়ে যায় । দু’বার চেষ্টা করেও গখন বাঘ মুখ খুলল না, তখন কারাগতিকার হঠাৎ চেষ্টা থামিয়ে দিয়ে খেলা শেষ করে দেয় । ফলে হাতগুলির সঙ্গে তাকে কিছু টিটকিরিও শুনতে হয়েছিল ।’

‘আপনি তাতে কোনো স্টেপ নেননি ?’

‘নিরেছি বৈকি । পুরনো লোক, কিন্তু তাও কথা শোনাতে হল, ও সতেরো বছর কাজ করেছে সার্কাসে । প্রথম তিন বছর গোল্ডেনে ছিল, বাকি সময়টা এখানে । ওর যা নাম ওঁ আমার সার্কাসে খেলা দেখিয়েই । এখন বলছে কাজ ছেড়ে দেবে । খুবই দুঃখের কথা, কারণ অদ্ভুত আরো বছর তিনেক ও কাজ করতে পারত বলে আমার বিশ্বাস ।’

‘বাঘ ঝুঁজতে সার্কাসের লোক যায়নি ?’

‘কারাগতিকারেরই যাবার কথা ছিল, কিন্তু ও রাজি হয়নি । তাই চন্দ্রনকে যেতে হয়েছে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের লোকের সঙ্গে ।’

লালমোহনবাবুর সাহস বেড়ে গেছে । বললেন, ‘কারাগতিকারের সঙ্গে দেখা করা যায় ?’

‘কোনো গ্যারান্টি দিতে পারি না,’ বললেন মিঃ কুটি, ‘খুব যুড়ি লোক । মুরুগেশের সঙ্গে যান আপনারা, গিয়ে দেখুন সে দেখা করে কিনা ।’

মুরুগেশ হল মিঃ কুটির পার্সোনাল বেয়ারা। সে বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিল।
মনিবের হুকুমে আমাদের তিনজনকে নিয়ে গেল রিং-মাস্টারের তাঁবুতে।

তাঁবুর ভিতরে দুটো ডাগ : একটা বসার জায়গা, আরেকটা শোবার। আশ্চর্য
এই যে খবর দিতেই বেডরুম থেকে বেরিয়ে এলেন রিং-মাস্টার। ভদ্রলোকের
চেহারা দেখে বলে দিতে হয় না যে উনি একজন অত্যন্ত শক্তিশালী পুরুষ, ব্যাঘ্র
খেলা দেখানোর পক্ষে এর চেয়ে উপযুক্ত চেহারা আর হয় না। লম্বায় ফেপুদার
সমান, চওড়ায় ওর দেড়। ফর্সা রঙে কুচকুচে কালো চাড়া-সেওয়া গৌফটা
আশ্চর্য খুলেছে, চোখের দৃষ্টি এখন উদাস হলেও হঠাৎ হঠাৎ এক একটা কথা
বলতে ফলে ওঠে। ভদ্রলোক জানিয়ে দিলেন যে তিনি মারাত্মক মালয়ালম ভাষা
আর ভাড়া ভাড়া ইংরিজি আর হিন্দি জানেন। শেষের দুটো ভাষাতেই কথা হল।

কারাণ্ডিকার প্রথমেই জানতে চাইলেন আমরা কোনো খবরের কাগজ থেকে
আসছি কিনা। বুঝলাম ভদ্রলোক লালমোহনবাবুর হাতে খাড়া পেনসিল দেখেই
প্রশ্নটা করেছেন। ফেলুদা প্রশ্নের জবাবটা যেন বেশ হিসেব করে দিল।

‘যদি তাই হয়, তাহলে আপনার কোনো আপত্তি আছে?’

‘আপত্তি তো নেইই, বরং সেটা হলে খুশিই হব। এটা পারলিকের জন্য দরকার
যে বাঘ পালানোর জন্য ট্রেনার কারাণ্ডিকার দায়ী নয়, দায়ী সার্কাসের মালিক।
বাঘ দু’জন ট্রেনারকে খানে না, একজনকেই খানে। খানা ট্রেনার আসার পর
থেকেই সুলতানের মেজাজ খারাপ হতে শুরু করেছিল। আমি সেটা মিঃ কুটিকে
বলেছিলাম, উনি গা করেননি। এখন তার ফল ভোগ করছেন।’

‘আপনি বাঘটাকে খুঁজতে গেলেন না যে?’ ফেলুদা জিজ্ঞাস করল।

‘ওরাই খুঁজুক না,’ গভীর অভিমানের সঙ্গে বললেন কারাণ্ডিকার।

লালমোহনবাবু বিড়বিড় করে ফেলুদাকে বাংলায় বললেন, ‘একটু জিজ্ঞাস
করুন তো ভেতর তেমন দরকার পড়লে উনি যাবেন কিনা। খবরটা পেলো বাঘ খাবা
দেখা যেত। অবিশ্যি একা নয়, ইন ইওর কম্প্যানি। খুব ব্রিনিং ব্যাপার হবে
নিশ্চয়ই।’

ফেলুদা জিজ্ঞাস করতে কারাণ্ডিকার বললেন যে বাঘকে গুলি করে মারার
প্রস্তাব উঠলে তাঁকে যেতেই হবে বাধা দিতে, কারণ সুলতান ওর আত্মীয়ের
বাড়া।

আমিও একটা জিনিস জিজ্ঞাস করার কথা ভাবছিলাম, শেষ পর্যন্ত ফেলুদাই
করল।

‘আপনার মুখে কি বাঘ কোনোদিন আঁচড় মেরেছিল?’

‘নট সুলতান,’ বললেন কারাণ্ডিকার। ‘গোল্ডেন সার্কাসের বাঘ। গাল আর
নাকের খানিকটা মাংস তুলে নিয়েছিল।’

কথাটা বলে কারাগারিকার তাঁর সার্ট বুকে ফেসলেন। সেখানাম বুকে পিঠে
কোঁড়ে কত যে আঁচড়ের দাগ রয়েছে তার হিসেব নেই।

আমরা ভদ্রলোককে অনেক শন্যবাদ দিয়ে উঠে পড়লাম। তাঁর থেকে
বেরোবার সময় ফেলুদা বলল, 'আপনি এখন এখানেই থাকবেন ?'

কারাগারিকার গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আজ সাতেরো বছর আমি সার্কাসের তাঁবুকেই
ঘর বলে জেনেছি। এবার বোধহয় নতুন ডেরা দেখতে হবে।'

লালমোহনবাবু মিঃ কুট্টিকে বলে এবেছিলেন যে তিনি ম্যাজেস্টিকের
পশুশালাটা একবার দেখতে চান। ম্যুজগেশের সঙ্গে গিয়ে আমরা সার্কাসের
অবশিষ্ট দুটি বাঘ, একটা বেশ বড় ভাঙ্গুর, একটা জলহস্তী, তিনটে হাতী, গোটা
ছয়েক ঘোড়া আর সুলতানের গা হুমছম করা খালি বাঁচাটা দেখে বাড়ি ফিরতে
ফিরতে হয়ে গেল পাঁচটা। ঝুলাকিপ্রসাদকে ডা দেবার জন্য ডেকে পাঠাতে সে
বলল, চৌধুরী সাহেবের বাড়ি থেকে একজন বাবু এসেছিলেন, বলে গেছেন
আবার আসবেন।

সাড়ে ছটায় এলেন শ্রীতীন্দ্র চৌধুরী। ইতিমধ্যে সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে ঝপ
কারে ঝাণ্ডা পড়েছে, আমরা সবাই কোট পুলোভার চাপিয়ে নিয়েছি,
লালমোহনবাবুর মার্জিতকাপটা পরার মতো ঠাণ্ডা এখনো পড়েনি, কিন্তু ঠুঁর টাক
বলে উনি রিঙ্ক না নিয়ে এর মধ্যেই ওটা চাপিয়ে বসে আছেন।

'আপনি যে ডিটেকটিভ সেটাতো বলেননি।' আমাদের তিনজনকেই অন্যাক
করে দিয়ে বললেন শ্রীতীন্দ্র চৌধুরী।—'বাবা তো আপনার মকেল মিঃ সহায়কে
খুব ভালো করে জেনেন। সহায় ঠেকে জানিয়েছেন যে আপনারা এখানে
আসছেন। বাবা বিশেষ করে বলে দিয়েছেন আপনারা তিনজনেই যেন কাল
আমাদের সঙ্গে পিকনিকে আসেন।'

'পিকনিক ?' লালমোহনবাবু ভুরু কপালে তুলে প্রশ্ন করলেন।

'বলেছিলাম না—কাল বাবার জন্মদিন। আমরা সবাই যাচ্ছি রাজবাগা
পিকনিক করতে। দুপুরে ওখানেই খাওয়া। আপনাদের তো গাড়ি রয়েছে, নটা
নাগাদ আমাদের ওখানে চলে আসুন। বাড়ির নাম কৈলাস। আপনাদের
ড্রাইংকশন দিয়ে দিচ্ছি, খুন্সে পেতে কোনো অসুবিধে হবে না।'

রাজবাগা হাজারিবাগ থেকে মাইল পঞ্চাশেক দূর, জলপ্রপাত আছে, চমৎকার
দৃশ্য, আর একটা পুরানো কালীমন্দির আছে—নাম ছিন্নমস্তার মন্দির। এসব
আমরা আসবার আগেই জেনে এসেছি, আর পিকনিকের নেমস্তম্ভ না হলে
নিজেরাই যেতাম।

শ্রীতীনবাবু আরো বললেন যে আমরা যদি একটু আগে আগে যাই, তাহলে
মহেশবাবুর প্রজাপতি আর পাথরের কালেকশনটাও দেখা হয়ে যেতে পারে।



THE MAN IN THE STRIPED SHIRT
WAS THE ONLY ONE WHO WAS NOT
HOLDING HIM.

‘কিন্তু পিকনিকে যে যাচ্ছেন আপনারা, বাঘ পালানোর খবরটা জানেন কি ?
ধরা গলায় প্রসন্ন করলেন জটায়ু ।

‘জানি বৈকি !’ হেসে বললেন শ্রীতীনবাবু, ‘কিন্তু তার জন্য ভয় কী ? সঙ্গে
বন্দুক থাকবে । আমার বড়ল ক্যাক শট । তাছাড়া বাঘতো শুনেছি উত্তরে হানা
দিচ্ছে, রাজরাক্ষা তো দক্ষিণে, রামগড়ে দিকে । কোনো ভয় নেই ।’

ঠিক হল আমরা মাড়ে আটটা নাগাদ মহেশ চৌধুরীর বাড়িতে পৌঁছে যাব ।
লালমোহনবাবু ‘কৈলাস নাম দিল কেন, মশাই’-এর উত্তরে ফেলুদা বলল, শিবের
বাসস্থান কৈলাস, আর মহেশ শিবের নাম, তাই কৈলাস ।

শ্রীতীনবাবু চলে যাবার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুরঘুটি অন্ধকার হয়ে এস । আমরা
বারান্দায় বেড়ের চেয়ারে এসে বাঁতিটা জ্বললাম না, যাতে চাঁদের আলো
উপভোগ করা যায় । ছিন্নমস্তার মন্দিরের কথাটা লালমোহনবাবু জানতেন না, তাই
বোধহয় মাঝে মাঝে নামটা বিড়বিড় করছিলেন । সাতবারের বার ছিন্ বলেই
থেকে যেতে ওল, কাবণ ফেলুদা হাত তুলেছে ।

আমরা তিনজনেই চুপ, যিঝি পোকের ডাক ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই, এমন
সময় শোনা গেল—বেশ দূর থেকে, তাও গায়ের রক্ত জল করা—বাঘের গর্জন ।
একবার, দুবার, তিনবার ।

সুনতন ডাকছে ।

কোনদিক থেকে, কতদূর থেকে, সেটা বুঝতে হলে শিকারীর কান চাই ।

॥ ৩ ॥

আমি ভেবেছিলাম যে সাক্ষীর বাঘ পালানোটাই বৃদ্ধি হাজারিবাগের আসল
ঘটনা হবে ; কিন্তু তা ছাড়াও যে আরো কিছু ঘটবে, আর ফেলুদা যে সেই ঘটনার
জালে জড়িয়ে পড়বে, সেটা কে জানত ? ২৩শে নভেম্বর মহেশ চৌধুরীর বার্ষিকে
পিকনিকের কথাটা অনেকদিন মনে থাকবে, আর সেই সঙ্গে মনে থাকবে
রাজরাক্ষার আশ্চর্য সুন্দর রক্ত পরিবেশে ছিন্নমস্তার মন্দির ।

কাল রাতে বাঘের ডাক শোনার পর থেকেই লালমোহনবাবুর মুখটা জানি
কেনমন হয়ে গিয়েছিল, ভাবছিলাম বলি উনি আমাদের ঘরে আমার সঙ্গে শোন,
আর ফেলুদা পশ্চিমের ঘরটা নিক, কিন্তু সেদিকে আবার ভদ্রলোকের গৌ আছে ।
চৌকিনারের কাছে টাঙি আছে ছেনে, আর লোকটা বেঁটে হলেও সাহসী ভেনে
ভদ্রলোক খানিকটা আশ্বাস পেয়ে নিজের তিন সেলের টর্চের বদলে আমাদের পাঁচ
সেলটা নিয়ে দশটা নাগাদ নিজের ঘরে চলে গেলেন । বড় টর্চ নেওয়ার কারণ এই
যে, ফেলুদা বলেছে তীব্র আলো জেখে ফেললে বাঘ নাকি অনেক সময় আপনা

থেকেই সরে পড়ে ।—‘অবিশ্যি জানালার বাইরে যদি গর্জন শোনেন, তখন টর্চ জ্বালানোর কথা, আর সেই টর্চ জানালার বাইরে বাঘের চোখে ফেলার কথা, মনে থাকবে কিনা সেটা জানি না ।’

যাই হোক, রাতে বাঘ এসে থাকলেও সে গর্জন করেনি, তাই টর্চ ফেলারও কোনো দরকার হয়নি ।

আমরা খ্রীষ্টীনবাবুর নির্দেশ অনুযায়ী ঠিক সাড়ে আটটার সময় কৈলাসের লাল ফটকের সামনে গিয়ে হাজির হলাম । বাইরে থেকে বাড়িটা দেখে লালমোহনবাবু মন্তব্য করলেন যে বোঝাই যাচ্ছে এ শিব হল সাহেব শিব । সত্যিই, বছর দশেক আগে তৈরি হলেও বাড়ির চেহারাটা সেই পঞ্চাশ বছর আগের ব্রিটিশ আমলের বাড়ির মতো ।

দারোগান গোট খুলে দিতে আমরা গাড়িটা বাইরে রেখে কাকর বিছানো রাস্তা দিয়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম । আরো তিনটে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে কম্পাউন্ডের এক পাশে : একটা কালকের দেখা খ্রীষ্টীনবাবুর কাগো আমবাসাজর, একটা সাদা ফিয়াট, আর একটা পুরানো হলদে পনটিয়াক ।

‘একটা হু পাওয়া গেছে মশাই ।’

লালমোহনবাবু বাগান আর রাস্তার মাঝখানে সাদা রং করা ইটের বেড়ার পাশ থেকে একটা কাগজ কুড়িয়ে নিয়ে ফেলুদাকে দিলেন । ফেলুদা বলল, ‘আপনি বহুসের অবর্তমানেই কুয়ের সন্ধান পাচ্ছেন ?’

‘জিনিসটা কীরকম মিস্টিরিয়াস মনে হচ্ছে না ?’

একটা কপটানা খাতার পাতা, তাতে সবুজ কালিতে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা কিছু অর্থহীন ইংরিজি কথা । মিস্তির কিছুই নেই, বোঝাই যাচ্ছে সেটা ঝাচ্চার হাতের লেখা, আর সেই কারণেই কথাগুলোর কোনো মানে নেই । যেমন—OKAHA, RKAHA, LOKC ।

‘ওকাহা যে জাপানী নাম সেতো বোঝাই যাচ্ছে’ বললেন লালমোহনবাবু ।

‘বাঙলা নামটা না চিনে আগেই জাপানী নামটা চিনে ফেললেন ?’—বলে ফেলুদা কাগজটা পকেটে পুরে নিল ।

একজন ভীষণ বড়ো মুসলমান বেয়ারা দাঁড়িয়েছিল গাড়িবারান্দার নিচে, সে আমাদের সেলাম করে ‘আইয়ে’ বলে ভিতরে নিয়ে গেল । একটা চেনা গলা আগে থেকেই পাচ্ছিলাম, বৈঠকখানার চৌকাঠ পেরোতেই খ্রীষ্টীনবাবু আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন ।

‘আসুন, আসুন—সো কইন্ড অফ ইউ টু কাম ।’

ঘরে ঢুকে প্রথমেই চোখ চলে যায় দেয়ালের দিকে । তিন দেয়াল জুড়ে ছবির

বদলে টাঙানো রয়েছে ফ্রেমে বঁধানো মহেশ চৌধুরীর সংগ্রহ করা পিনে আঁটা সার সার ডানা মেলা প্রজাপতি । প্রতি ফ্রেমে আটটা, সব মিলিয়ে চৌষটি, আর তাদের রঙের বাহায়ে পুরো ঘরটা যেন হাসছে ।

যাঁর সংগ্রহ, তিনি সেফায় বসে ছিলেন, আমাদের দেখে হাসিমুখে উঠে দাঁড়ালেন । বুঝলাম এককালে ভদ্রলোক বেশ শক্ত সুপুরুষ ছিলেন । টকটকে রঙ, দাড়িগোফ পবিষ্কার করে কামানো, চোখে রিমলেস চশমা, পরনে ফিনফিনে ধুতি, গরদের পাঞ্জাবি আর ঘন কাল করা কাশ্মীরী শাল । বুঝলাম এটা মহেশ চৌধুরীর সম্ভব বহরের জন্মদিন উপলক্ষে স্পেশাল পোশাক ।

প্রীতীনবাবু শুধু ফেলুদার নামটাই জানেন, তাই বাকি দুজনের পরিচয় ফেলুদাকেই দিতে হল । ভদ্রলোক কিছু বলার আগেই লালমোহনবাবু আমাদের অন্যাক করে দিয়ে বললেন, 'হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, স্যার !'

ভদ্রলোক হো হো করে হেসে উঠলেন ।—'থ্যাক ইউ, থ্যাক ইউ !' বুড়োমানুষের আবার জন্মদিন । এসব আমার বৌমার কাণ্ড ।—যাক আপনারা এসে গিয়ে খুব ভালোই হল । হোয়ার ইজ দ্য ডেড বডি খুঁজে বার করতে অসুবিধা হয়নি তো ?'

প্রগটা শুনে আমার আর লালমোহনবাবুর মুখ একসঙ্গে হী হয়ে গেছে । ফেলুদা কিন্তু ভুরুটা একটু তুলেই নামিয়ে নিল । 'আজ্ঞে না, অসুবিধা হয়নি ।'

'তেরি গুড । আমি বুকেছিলাম আপনি যখন গোয়েন্দা তখন হয়ত আমার সাংকেতিক ভাষা বুঝতে পারবেন । তবে আপনার দুই বন্ধু মনে হচ্ছে বোঝেননি ।'

ফেলুদা বুঝিয়ে দিল । 'কৈলাস হচ্ছে "কই লাশ" ?'

এবারে লক্ষ করলাম ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা চিতাবাঘের ছালের উপর বসে একটি বছর পাঁচেকের মেয়ে ডান হাতে একটা চিমটির মতো জিনিস নিয়ে বাঁ হাতে ধরা একটি বিলিতি ডলের ভুরুর জায়গায় এক মনে চিমটি কাটছে । বোধহয় পুতুলের ভুরু থাক করা হচ্ছে । আমি ওর দিকে চেয়ে আছি বলেই বোধহয় মহেশবাবু বললেন, 'গুটি আমার নাতনী ; ওর নাম জোড়া মৌমাছি ।'

'আর তুমি জোড়া কাটারি', বলল মেয়েটি ।

'বুঝলেনতো মিঃ মিস্টার ?'

ফেলুদা বলল, 'বুঝলাম, আপনার নাতনী হলেন বিবি, আর আপনি তার দাদু ।'

লালমোহনবাবু আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছেন দেখে বুঝিয়ে দিলাম বিবি হচ্ছে Bee-Bee, আর দাদুর 'দা' হল কাটারি আর 'দু' হল দুই । ফেলুদা আর আমি অনেক সময়ই বাড়িতে বসে কথার খেলা তৈরি করে খেলি,



তাই এগুলো বুঝতে অসুবিধা হল না ।

প্রীতীনবাব 'দাদাকে ডাকি' বলে খর থেকে বেরিয়ে গেলেন ; আমরা তিনজনে সোফায় বসলাম । মহেশবাবুর চৌটের কোণে হামি, তিনি একদুট্টে চেয়ে রয়েছেন ফেলুদার দিকে । ফেলুদার তাতে কোনো উসখুসে ভাব নেই, সেও দিখি উন্টে চেয়ে আছে ভদ্রলোকের দিকে ।

'ওয়েল, ওয়েল, ওয়েল', অবশেষে বললেন মহেশ চৌধুরী, 'সহায় আপনার খুব সুখ্যাতি করছিল, তাই আপনি এসেছেন শুনে তিরিকে বলপূম, ভদ্রলোককে ডাকি, তাকে একবার দেখি' আমার জীবনেও তো অনেক রহস্য, দেখুন যদি তার দু' একটাও সমাধান করে দিতে পারেন ।'

'তিরি মানে আপনার তৃতীয় পুত্র কি ?' ফেলুদা জিগ্যাস করল ।

'বইট এগেন', বললেন ভদ্রলোক । 'আমি যে কথা নিয়ে খেলতে ভালোবাসি সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন ।'

'ও ব্যতিকটা আমারও আছে ।'

'সে তো খুব ভালো কথা । আমার নিজের ছেলেদের মধ্যে টেকা তবু একটু আদটু বোঝে, তিরির মাথা এদিকে একেবারেই খেলে না । তা থাক্ গে—আপনি গোয়েন্দাগিরি কবছেন ককিন ?'

'বছর আষ্টেক ।'

'আর উনি কী করেন ? মিঃ গান্ধী ?'

'উনি লেগেন । রহস্য উপন্যাস । ভটায়ু ছদ্মনামে ।'

'বাঃ ! আপনাদের কম্বিনেশনটি বেশ ভালো । একজন রহস্য-মিট পাকান, আরেকজন রহস্যের জট ছাড়ান । ভেরি গুড ।'

ফেলুদা বলল, 'আপনার প্রজাপতি আর পাখরের সংগ্রহ তো দেখতেই পাচ্ছি ; এ ছাড়া আরো কিছু জমিয়েছেন কি কোনোদিন ?'

পাখরগুলো রাখা ছিল ঘরের একপাশে একটা বড় কাঁচের আলমারির ভিতর । এত বকম বাঙের পাখর যে হয় তা আমার ধারণাই ছিল না । কিন্তু ফেলুদা হঠাৎ এ প্রশ্ন করল কেন ? ভদ্রলোকও বেশ অবাক হয়ে বললেন, 'অনা সংগ্রহেব কথা হঠাৎ জিগ্যাস করলেন কেন ?'

'আপনার নাভনীর হাতের চিমটেটাকে পুরানো টুইজারস বলে মনে হচ্ছে তাই—'

'ট্রিনিয়াট ! ট্রিনিয়াট !'—ভদ্রলোক ফেলুদার কথার উপর ভারি চাপিয়ে দিলেন ।—'আপনার অদ্ভুত চোখ । আপনি ঠিক ধরেছেন, ওটা স্ট্যাম্প কালেকটরের চিমটেই বাটে । ডাকটিকিট এককালে জমিয়েছি বইকি, আর বেশ যত্ন নিয়ে সিরিয়াসলি জমিয়েছি । এখনও মাঝে মাঝে গিবনসের কাটালগের

পাতা উলটাই। ওটাই আমার প্রথম হবি। যখন প্রকাশিত করি তখন আমার এক মক্কেল, নাম লোপ্রবর্তী, আমার উপর কৃতজ্ঞতা বশে তার একটি আশু পুরানো, অ্যালবাম আমাকে দিয়ে দেয়। তার নিজেও অবিশ্যি শখ মিটে গিয়েছিল, কিন্তু এ জিনিস সহজে কেউ দেয় না। বেশ কিছু দুস্তাপ্য টিকিট ছিল সেই অ্যালবামে।

আমি নিজে স্ট্যাম্প জমাई, আর ফেলুদারও এক সময় তাকটিকিটের নেশা হয়েছিল। ও বলল, 'সে অ্যালবাম দেখা যায়?'

'আজ্ঞে?'—ভদ্রলোক যেন একটু অনামনস্ক হয়ে পড়েছিলেন—'অ্যালবাম? অ্যালবাম তো নেই ভাই। সেটা খোয়া গেছে।'

'খোয়া গেছে?'

'বলছি না—আমার জীবনে অনেক রহস্য। বইসমূহ বলতে পারেন, ট্রাজিডিও বলতে পারেন। তবে আজকের দিনটায় সেসব আলোচনা থাক।—এসো টেকা, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।'

টেকা মানে বোকাই যাচ্ছে ভদ্রলোকের বড় ছেলে। প্রীতীনবাবুর সঙ্গে এসে ঘরে ঢুকলেন। বয়সে প্রীতীনবাবুর চেয়ে বেশ কিছুটা বড়। ইনিও মৃদুস্বভাব, যদিও মোটার দিকে, আর প্রীতীনবাবুর মতো ছটফটে নন। বেশ একটা ভারতীয় ভাব।

'তিরিক্তে মাইক সম্বন্ধে জিগ্যাস করলে আপনি ভালো জবাব পাবেন', বললেন মহেশ চৌধুরী, 'আর ইনি মাইকার কারবারি! অক্সফোর্ড। কলকাতায় অফিস, হাজারিবাগ যাতায়াত আছে কর্মসূত্রে।'

'আর দুরি বুঝি উনি?' ফেলুদা কপোর ট্রেমে বাঁধানো একটা চাঁদর দিয়ে দেখাল। ক্যামিলি গ্রুপ। মহেশবাবু, তাঁর স্ত্রী, আর তিন ছেলে। অস্ত্রও বছর ষাঁটশ আগে তোলা, কারণ বাপের দু'পাশে দাঁড়ানো দু'জন ছেলেই হাফ প্যান্ট পরা, আর তৃতীয়টি মায়ের কোলে। দাঁড়ানো ছেলে দুটির মধ্যে যে ছোট্ট সেই নিশ্চয় মহেশবাবুর দ্বিতীয় ছেলে।

'ঠিকই বলেছেন আপনি', বললেন মহেশবাবু, 'তবে দুরির সঙ্গে আলাপের সৌভাগ্য আপনার হবে কিনা জানি না, কারণ সে ভাগলওয়া।'

অরুণবাবু ক্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন। 'বীবেন বিলেও চলে যায় উনিশ বছর বয়সে; তারপর আর ফেরেনি।'

'ফেরেনি কি?'—মহেশবাবুর প্রশ্নে কোণায় যেন একটা খটকার সুর।

'ফিরলে কি আর তুমি জানতে না, বাবা?'

'কী জানি।'—সেই একই সুরে বললেন মহেশ চৌধুরী। 'গত দশ বছর তো সে আমাকে চিঠিও লেখেনি।'

ঘরে কেমন একটা থমথমে ভাব এসে গেছিল বলেই বোধহয় সেটা দূর করার

জনা মহেশবাবু হঠাৎ চাঙা হয়ে সোফা ছেড়ে উঠে পড়লেন।—‘চলুন, আপনাদের আমার বাড়িটা একটু ঘুরিয়ে দেখাই। অখিল আর ইয়ে যখন এখনো এল না, তখন হাতে কিছুটা সময় আছে।’

‘তুমি উঠছ কেন বাবা’, বললেন অরুণবাবু, ‘আমিই দেখিয়ে আনছি।’

‘নো স্যার, আমার প্ল্যান করা আমার বাড়ি, আমিই দেখাব। আসুন, মিঃ মিস্টার।’

দোতলায় উত্তরে বাস্তার দিকে একটা চমৎকার চওড়া বারান্দা, সেখান থেকে কানারি হিল দেখা যায়। বেডরুম তিনটে, তিনটেতেই এখন লোক রয়েছে। মাকেরটার থাকেন মহেশবাবু নিজে, এক পাশে বড় ছেলে, অন্য পাশে স্ত্রী আর মেয়েকে নিয়ে প্রীতীনবাবু। নিচে একটা গেস্টরুম আছে, তাতে এখন রয়েছেন মহেশবাবুর বন্ধু অখিল চক্রবর্তী। অরুণবাবুর দুই সন্তানের মধ্যে বড়টি ছেলে, সে এখন বিলেতে, আর মেয়েটির সামনে মাধ্যমিক পরীক্ষা বলে সে মায়ের সঙ্গে কলকাতায় রয়ে গেছে।

মহেশবাবুর বেডরুমেও দেখলাম কিছু পাপর আর প্রচ্ছপতি রয়েছে। একটা বুকশেলফে পাশাপাশি রাখা অনেকগুলো একরকম দেখতে বইয়ের দিকে ফেলুনার দৃষ্টি গিয়েছিল, ভদ্রলোক বললেন, ওগুলো ঠের ভায়রি। চল্লিশ বছর একটানা ওয়ারি লিখেছেন উনি। খাটের পাশে টেবিলে একটা ছোট্ট বাধানো ছবি দেখে লালমোহনবাবু বলে উঠলেন, ‘আরে, এ যে দেখছি মৃত্যুনন্দনব ছবি।’

মহেশবাবু হেসে বললেন, ‘আমার বন্ধু অখিল নিরোছে ওটা।’ তারপর ফেলুনার দিকে ফিরে বললেন, ‘তিনটে মহানেশের শক্তি এর পিছনে।’

‘কারেকট?’ বললেন লালমোহনবাবু, ‘বিরিট তাত্ত্বিক সাধু। ইন্ডিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা—সর্বত্র এর শিষ্য।’

‘আপনি তো অনেক খবর রাখেন দেখছি,’ বললেন মহেশ চৌধুরী, ‘আপনিও এর শিষ্য নাকি?’

‘আজ্ঞে না, তবে আমার পাড়ায় আছেন একজন।’

দোতলায় থাকতেই একটা গাড়ির শব্দ পেয়েছিলাম, নিচে এসে দেখি, যে-দুজনের কথা মহেশবাবু বলছিলেন, তাঁরা এসে গেছেন। একজন মহেশবাবুরই বয়সী, সখারণ ধৃতি পাঞ্জাবি আর গাড় খয়েরি রঙের আলোয়ান গায়ে। ইনি যে উকিল-টুকিল ছিলেন না কোনোদিন সেটা বলে দিতে হয় না, আর সাহেবীরও কোনো গন্ধ নেই এর মধ্যে। অন্য ভদ্রলোককে মনে হল চল্লিশের নিচে বয়স, বেশ হাসিখুশি সপ্রতিভ ভাব, মহেশবাবু আসতেই তাঁকে টিপ করে প্রণাম করলেন। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির হাতে মিষ্টি হাঁড়ি ছিল, সেটা তিনি প্রীতীনবাবুর হাতে চালান দিয়ে মহেশবাবুর দিকে ফিরে বললেন, ‘আমার কথা যদি শোনতো

শিকনিকের পরিকল্পনাটা বাদ নাও। একে যাত্রা অন্তত, তার উপর বাঘ পালিয়েছে। শাদুলবাবাজী যদি মুজানদের শিষ্যটিয়া হন তাহলে একবার ছিন্নমস্তায় হাজিরা দেওয়াটা কিছুই আশ্চর্য নয়।

মহেশবাবু আমাদের দিকে ফিরে বললেন, 'আলাপ করিয়ে দিই—এই কুড়াক-ডাকা ভদ্রলোকটি হলেন আমার অনেকদিনের বন্ধু শ্রীঅখিলবন্ধু চক্রবর্তী, এক্স-স্কুলমাস্টার, জ্যোতিষচর্চা আর আয়ুর্বেদ হচ্ছে এনার হবি; আর ইনি হলেন শ্রীহান শঙ্করলাল মিশ্র, আমার অত্যন্ত রেহের পাত্র, বলতে পারেন আমার মিসিং পুত্রের স্থান অনেকটা অধিকার করে আছেন।'

সবাই যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে দেখে অখিলবাবু আরেকবার বললেন, 'তাইলে আমার নিষেধ কেউ মানছে না?'

'না ভাই', বললেন মহেশ চৌধুরী, 'আমি খবর পেয়েছি বাঘের নাম সুলতান, কাজেই সে মুসলমান, তাত্ত্বিক নয়।—ভালো কথা, মিঃ মিস্ত্রি যদি সময় পানতো সার্কাসটা একবার দেখে নেবেন। আমাদের ইনভাইট করেছিল পরশু। বৌমা আর বিবিদিদিমণিকে নিয়ে আমি দেখে এসেছি। দিশী সার্কাস যে এত উন্নতি করেছে জানতাম না। আর বাঘের খেলার তো তুলনাই নেই।'

'কিন্তু পরশু নাকি বাঘের খেলায় গোলমাল হয়েছিল?' প্রশ্ন করলেন লালমোহনবাবু।

'সেটা খেলোয়াড়ের কোনো গুণগোলে নয়। জানোয়ারেরও তো মুড বলে একটা জিনিস আছে। সে-তো আর কলের পুতুল না যে চাবি টিপলেই লফকাপ্প করবে।'

'কিন্তু সেই মুডের ট্রেনাভো এখন সামলানো দায়,' বললেন অরুণবাবু। 'শহরে জোপ্যানিক। ওটাকে এক্ষুনি মেরে ফেলা উচিত। বিলিতি সার্কাস হলে এ জিনিস কখনো হত না।'

মহেশবাবু একটা শুকনো হাসি হেসে বললেন, 'হ্যাঁ—তুমি তো আবাব বন্যপশু-সংহার সমিতির সভাপতি কিনা, তোমার হাততো নিশাপিশ কদবেই।'

রাজরাধা রওনা হবার আগে আরেকজনের সঙ্গে আলাপ হল। উনি হলেন শ্রীতীনবাবুর স্ত্রী নীলিমা দেবী। একে দেখে বুঝলাম যে চৌধুরী পরিবারের সকলেই বেশ ভালো দেখতে।

বাজরাধা হাজরিবাগ থেকে আশি কিলোমিটার। ৪৮ কিলোমিটার গিয়ে রামগড় পড়ে, সেখান থেকে বায়ে রাস্তা ধরে গোলা বলে একটা জায়গা হয়ে

ভেড়া নদী পর্যন্ত গাড়ি যায়। নদী হেঁটে পেরিয়ে খানিকদূর গিয়েই রাজস্রাঙ্গা।

শঙ্করলাল মিশ্রের গাড়ি নেই। তিনি আমাদের গাড়িতেই এসেন। দু'জন বেয়াবাকেও নেওয়া হয়েছে পিকনিকের বলে, তাদের একজন হল বুড়ো নূর মহম্মদ, যে মহেশবাবুর ওকালতির জীবনের শুরু থেকে আছে। অন্য জন হল ঝগা মর্কা জগৎ সিং, যার জিন্মায় রয়েছে অরুণাবাবুর বন্দুক আর টোটোর ব্যাল।

মিঃ মিশ্রকে দেখেই বেশ ভালো লেগেছিল, তার সঙ্গে কথা বলে আরো ভালো লাগল। ভদ্রলোকের জীবনের ঘটনাও শোনবার মতো। শঙ্করলালের বাবা দীনদয়াল মিশ্র ছিলেন মহেশবাবুর দাবোয়ান। আজ থেকে ঠয়ত্রিশ বছর আগে, যখন শঙ্করলালের বয়স চার—দীনদয়াল নাকি একদিন হঠাৎ নিবৌজ হয়ে যায়। দু'দিন পরে এক কাঠুরে তার মৃত্যুদেহ দেখতে পায় মহেশবাবুর বাড়ি থেকে প্রায় সাত-আট মাইল দূরে একটা জঙ্গলের মধ্যে। কোনো কানোয়ারের হাতে তার মৃত্যু হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু দীনদয়াল ওই জঙ্গলে কেন গিয়েছিল সেটা জানা যায়নি। একটা পুরানো শিবমন্দির আছে সেখানে, কিন্তু দীনদয়াল কোনোদিন সেখানে যেত না।

এই ঘটনার পর থেকে নাকি মহেশবাবুর ভীষণ মায়া পড়ে যায় বাপহারা চার বছরের শিশু শঙ্করলালের উপর। তিনি শঙ্করলালকে মানুষ করার ভার নেন। শঙ্করলালও খুব বুদ্ধিমান ছেলে ছিল; পরীক্ষায় ব্যতি পায়, বি এ পাশ করে রাঁচিতে শঙ্কর বুক স্টোর্স নামে একটা বইয়ের দোকান খোলে। হাজারিবাগে ব্রাঞ্চ আছে, দু'জায়গাতেই যাতায়াত আছে ভদ্রলোকের।

এই খবরটা শুনে অবিশ্যি লালমোহনবাবু জিগোস করার লোভ সামলাতে পারলেন না এই বইয়ের দোকানে বাঙলা বইও পাওয়া যায় কিনা। 'নিশ্চয়ই', বললেন শঙ্করলাল, 'আপনার বইও বিক্রী করেছি আমরা।'

ফেলুদা সব শুনে বলল, 'মহেশবাবুর দ্বিতীয় ছেলে তাহলে আপনারই বয়সী ছিলেন?'

'বীরেন্দ্র ছিল আমার চেয়ে কয়েক মাসের ছোট', বললো শঙ্করলাল। 'আমরা দু'জন ইঞ্চলে এক ক্রাসেই পড়েছি, যদিও কলেজের পড়াটা ওরা তিন ভাইই করেছে কলকাতায় ওদের এক ক্যাঠামশাইয়ের বাড়িতে থেকে। বীরেনের পড়াশুনায় মন ছিল না। সে ছিল বেপবোয়া, রোম্যান্টিক প্রকৃতির ছেলে। উনিশ বছর বয়সে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়।'

ফেলুদা বলল, 'মহেশবাবু কি সাধুসংসর্গ-উর্গ করেন নাকি?'

'আগে করতেন না মোটেই, তবে ঠুর জীবনে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আমি যদিও দেখিনি, তবে শুনেছি এককালে মিলিটারি মেজাজ ছিল, প্রচুর মদ্যপান করতেন। সব ছেড়ে দিয়েছেন। সাধুসঙ্গ না করলেও, আমার বিশ্বাস আজ

রাজস্বাস্থ্য পিকনিকের কারণ ছিন্নমস্তার মন্দির ।’

‘এটা কেন বলছেন ?’

‘উনি বাইরে বিশেষ প্রকাশ করেন না, কিন্তু আমি এর আগেও কয়েকবার রাজস্বাস্থ্য গিয়েছি ঠর সঙ্গে । মন্দিরের সামনে এলে ঠর মুখের ভাব বদলে যায় এটা লক্ষ্য করেছি ।’

‘অতীতে কি এমন কোনো ঘটনা ঘটে থাকতে পারে যার ফলে এটা হওয়া সম্ভব ?’

‘সেটা আমি বলতে পারব না । ভুলে যাবেন না, আমি ছিন্নমস্তার দারোয়ানের ছেলে ।’

সাদে দশটা নাগাদ পরপর তিনখানা গাড়ি এসে থামল ভেড়া নদীর ধারে । আমাদের গাড়িটা ছিল সবচেয়ে পিছনে : আমাদের সামনে প্রীতীনবাবুর গাড়ি । তিনিই প্রথমে নামলেন গাড়ি থেকে, হাতে টেপ রেকর্ডার আর নেমেই চলে গেলেন বাঁয়ে জঙ্গলের দিকে । আমরা সবাই নামলাম । মহেশবাবু ছিলেন প্রথম গাড়িতে, তিনি আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বললেন, ‘তাড়া নেই, নদী পেরিয়েই রাজস্বাস্থ্য, সঙ্গে ফ্রাঙ্কো কফি আছে, একটু রিলাক্স করে তবে ওপারে যাত্রা ।’

আমরা সবাই নদীর দিকে এগিয়ে গেলাম । পাছোড়ে নদী, যাকে বলে খরস্রোতা । বর্ষার ঠিক পরে এ নদী পেরোনো নাকি মুশকিল, কারণ তখন জল থাকে হাটু অবধি । ছোট বড় মেজ্ঞা সেজ্ঞা নানান সাইজের সাদা কালো খয়েরি পার্টিকলে ছিটমার সব পাথর ভিত্তিয়ে পাশ কাটিয়ে, যুগ যুগ ধরে সেগুলোকে মোলায়েম করে, পালিশ করে বাস্তবগীশ ভেড়া নদী তড়িঘড়ি ছুটে চলেছে দারোয়ানের ঝাঁপিয়ে পড়বে বলে । এই ঝাঁপের জায়গাই হল রাজস্বাস্থ্য

নীলিমা সেবী কফি ঢেলে দিলেন কাগজের কাপে, আমরা সবাই একে একে গিয়ে নিয়ে নিলাম । প্রীতীনবাবুকে বোধহয় নদীর শব্দ বাঁচিয়ে পাখির ডাক বেকর্ড করতে হবে বলে বনের একটু ভিতর দিকে যেতে হয়েছে । পাখি যে ডাকছে নানারকম সেটা ঠিকই ।

এখানে এসে নতুন যাদের সঙ্গে আলাপ হল, ফেলুদার কায়দায় তাদের একটু স্টাডি করার চেষ্টা করলাম ।

বয়সে যে সবচেয়ে ছোট, সে তার ডলটাকে একটা পাথরের উপর বসিয়ে দিয়ে বলল, ‘চুপটি করে বসে থাক । দুটুমি করলেই ভেড়া নদীতে ফেলে দেব, তখন দেখবে মজা ।’

অরুণবাবু হাত থেকে কাগজের কাপ ফেলে দিয়ে একটু দূরে একটা ঝোপের পিছনে অদৃশ্য হলেন, আর তার পরেই ঝোপের মাথার উপর ঘোঁয়া দেখে বুঝলাম এই বয়সেও ভদ্রলোক বাপের সামনে সিগারেট খান না ।

মহেশ চৌধুরী হাত দুটো পিছনে জড়ো করে নদীর কাছেই দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে জলের দিকে চেয়ে আছেন।

ফেলুদা দুটো পাথর ঠোকাঠুকি করে সেগুলো চকমকি কিনা পরীক্ষা করছিল, অখিলবাবু তার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'আপনার রাশিটা কি জানা আছে?' ফেলুদা বলল, 'কুস্তি'। সেটা গোয়েন্দার পক্ষে ভালো না খারাপ?

নালিমা দেবী মাটি থেকে একটা বুন্দো হলদে কুল তুলে সেটা খোঁপায় ঝুঙে লালমোহনবাবুর দিকে এগিয়ে গিয়ে কী একটা বণায় লালমোহনবাবু মাথাটা পিছনে হেলিয়ে স্মার্টলি হাসতে গিয়ে এক লাফে বায়ে সরে গেলেন, আর নালিমা দেবী খোলা হাসি হেসে বললেন, 'সে কী, আপনি গিরগিটি সেবে ভয় পাচ্ছেন?'

শঙ্করলালকে খুঁজতে গিয়ে দেখি উনি ইতিমধ্যে কখন জানি নদী পেরিয়ে গিয়ে ওপারে একজন গেরুয়াশারী ডব্রলোকের সঙ্গে কথা বলছেন। একটা বাসে কিছু যাত্রী এসেছিল, তারা একটুক্ষণ আগেই নদী পেরিয়েছে সেটা দেখেছিলাম।

কফি খাওয়া শেষ, প্রীতীনবাবুও এসে গেছেন, তাই আমরা ওপারে যাবার জন্য তৈরি হলাম। খুঁটি, শাড়ি, প্যাণ্ট সবই একটু ওপরদিকে উঠে গেল, বিবি চড়ে বসল বুড়ো নুর মহম্মদেব পিঠে, লালমোহনবাবু জলে নামবার আগে মনে হল চোখ বুজে কী জ্ঞানি বিভ্রিভ করে নিলেন, পোয়োবাব সমস্ত বাব তিনেক বেসামাল হতে হতে সামলে নিলেন, আর ওপারে পৌঁছিয়েই বললেন ব্যাপারটা যে এত সহজ সেটা উনি ভাবতেই পাবেননি।

বাকি পথটির দু পাশে গাছপালা ছিল, যদিও সেটাকে জঙ্গল বলা চলে না। ভাও লালমোহনবাবু সেদিকে বারবার অড়চোখে চাওয়াতে কুন্ডলায় উনি বাঘের কথা ভোলেননি।

একটা মোড় ঘুবতেই থিয়েটারের পর্দা সরে যাওয়ার মতো দ্রোণের সামনে রাজবংশী বেরিয়ে পড়তে লালমোহনবাবু এত জোরে বাঃ বললেন যে পাশের গাছ থেকে একসঙ্গে দুটো ঘুঘু উড়ে পালাল।

অবিশ্যি বাঃ বলার যথেষ্ট কারণ ছিল। আমরা যেখানে এসে দাঁড়িয়েছি সেখান থেকে দুটো নদীই দেখা যাচ্ছে। বাঁ দিকে উত্তরে ভেড়া, আর ডাইনে নিচে দামোদর। জলপ্রপাতের জায়গাটা দেখতে হলে আরো এগিয়ে বাঁয়ে যেতে হবে, যদিও শকুটা এখান থেকেই পাচ্ছি। সামনে আর নদীর ওপারে বিশাল বিশাল কচ্ছপের পিঠের মতো পাথর, দূরে বন, আর আরো দূরে আবিষ্কার পাহাড়ের পাইন।

মান্নির আমাদের বাঁয়ে বিশ হাতের মধ্যে। বোকাই যায় অনেকদিনের পুরানো, কিন্তু সেটাকে আবার নতুন করে সাজগোজ পুরানো হয়েছে। এই কদিন আগেই কালীপুজোতে এখানে মোষ বলি হয়েছে বলে শুনলাম। লালমোহনবাবু বললেন এককালে নিঘাত নরবলি হত। অবিশ্যি সেটা যে খুব ভুল বলেছেন তা হয়ত না।

বাসে খেসব যাত্রী এসেছে তাদের দৃশ্য দেখার উৎসাহ নেই, তারা সবাই মন্দিরের সামনে জড়ো হয়েছে। শঙ্করলাল ঠিকই বলেছিলেন। মহেশ চৌধুরী প্রায় মিনিট খানেক ধরে মন্দিরের দরজার দিকে চেয়ে রইলেন, যদিও অন্ধকারে বিগ্রহটা দেখাই যায় না। তারপর ধীরে ধীরে চলে গেলেন অন্যরা যেদিকে গেছে সেইদিকে। আমরা তিনজনও সেইদিকেই এগিয়ে গেলাম।

খানিকটা যেতেই ফন্সটা দেখতে পেলাম। যেখানে বালির উপর শতরাঞ্চি পাতা হচ্ছে সেখান থেকে ওটা দেখা যাবে। লালমোহনবাবু বললেন, 'এটা কি ঝু ফাউ হয়ে গেল মশাই। হাজারিবাগ এসে সেকেন্ড দিনেই একজন প্রিটোরিয়ার্ড অ্যাডভোকেটের জন্মদিনে পিকনিকে ইনভাইটেড হবেন, এটা কি তাবতে পেরেছিলেন?'

'এ তো সবে শুরু', বলল ফেলুদা।

'বলছেন?'

'দাবা খেলেছেন কখনো?'

'রক্ষে করুন মশাই।'

'তাহলে ব্যাপারটা বুঝতেন। দাবার শেষ দিকে যখন দু'পক্ষের পাঁচটি কি সাতটি ঘুঁটি বোর্ডের এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন অনড় অবস্থাতেই তাদের পরস্পরের মধ্যে একটা বৈদ্যুতিক প্রবাহ চলতে থাকে। যারা খেলছে তারা তাদের প্রত্যেকটি শ্রাসু দিয়ে ব্যাপারটা অনুভব করে। এই চৌধুরী পরিবারটিকে দেখে আমার দাবার ঘুঁটির কথা মনে হচ্ছে, যদিও কে সাদা কে কালো, কে রাজা কে মন্ত্রী, তা এখনো বুঝিনি।'

আমরা মন্দির আর পিকনিকের জায়গার মাঝামাঝি একটা জায়গায় একটা অশ্বখগাছের তলায় পাথরের উপর বসলাম। এগারোটাও বাঙেনি এখনো, খাবার তাজা নেই, সবাইয়ের মধ্যে একটা নিশ্চিন্ত ঢিলেঢালা ভাব। অখিলবাবু বালিতে উবু হয়ে বসে বিবিকে হাত নেড়ে কী যেন বোঝাচ্ছেন; নীলিমা দেবী শওরপিণ্ডেও বাসে তাঁর ব্যাগের ভিতর থেকে একটা ইংরিজি পেপারবাক বার করলেন, সেটা নির্ঘাত ডিটেকটিভ বই; শ্রীতীনবাবু একটি চিবির উপর বসে তাঁর টেপ রেকর্ডারে একটা নতুন ক্যাসেট ভরলেন; অরুণবাবু জগৎ সিংয়ের কাছ থেকে তাঁর বন্দুকটা নিলেন, মহেশবাবু মাটি থেকে একটা পাথরের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে সেটা নেড়ে চেড়ে সেবে আবার ফেলে দিলেন; 'শঙ্করলালকে দেখছি না', বললেন লালমোহনবাবু।

'আছেন, তবে দূরে', বলল ফেলুদা।

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলাম মন্দির ছাড়িয়ে আরো বেশ কিছুটা দক্ষিণে, একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে শঙ্করলাল কিছুক্ষণ আগে সেখা সেই গেরায়াধারীটির

সঙ্গে কথা বলছেন। 'একটু যেন সাস্পিশাস বলে মনে হচ্ছে', মন্তব্য করলেন লালমোহনবাবু।

ফেলুদারও সাস্পিশাস মনে হচ্ছে কিনা সেটা জানবার আগেই আমাদের পাশে এসে দাঁড়ালেন অরুণবাবু, তাঁর হাতে বন্দুক। 'এটা দিয়ে কি বাধা মারা যায়?' জিগোস করল ফেলুদা।

'সার্কাসের বাঘ এতদূর আসবে না', হেসে বললেন অরুণবাবু। 'সাম্রাথ ঘেরেছি এটা দিয়ে, তবে সাধারণত পাখিটাখিই মারি। এটা টোয়েন্টি-টু।'

'তাই তো দেখছি।'

'আপনি শিকার করেন?'

'শুধু মানুষ।'

'আপনার কি কোনো এক্সেলি আছে নাকি? না প্রাইভেট?'

ফেলুদা তার প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর লেখা একটা কার্ড অরুণবাবুকে দিয়ে দিল। ভদ্রলোক বললেন, 'থ্যাঙ্কস। কখন কাজে লেগে যায় বলা তো যায় না।'

ভদ্রলোক যেদিক দিয়ে এসেছিলেন সেইদিকেই চলে গেলেন। ফেলুদা এই ফাঁকে কখন যে সেই সকালের কাগজটা পকেট থেকে বের করেছে সেটা দেখতেই পাইনি। লালমোহনবাবু কাগজটার দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'বাঙলা নামের কথা কী বলছিলেন মশাই?'

'এই দেখুন।'

ফেলুদা পাশাপাশি লেখা চারটে ইংরিজি অক্ষরের দিকে দেখাল। লালমোহনবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, 'ওটাভোমনে হচ্ছে লক্ লিখতে গিয়ে বানান ভুল করে LOKC লিখেছে।'

'এলোকেশী!' আমি ঠেঁচিয়ে উঠলাম। এরকম ভাবে ইংরিজি অক্ষরে বাঙলা কথা আমিও লিখেছি ছেলেবেলায়।

'বাঃ', বললেন লালমোহনবাবু, 'সত্যিই তো। আর এই জাপানী নামটা?'

'ওকাহা? এটা একটা বাংলা সেনটেন্স। OKAHA।'

'ও, কে, এ, এইচ, এ? এটা একটা বাংলা সেনটেন্স? একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না কি?'

'ও, কে, এ, এইচ, এ—এটা তাড়াতাড়ি বলুনতো, না খেমে। দেখুনতো কী রকম শোনায়।'

এবার লালমোহনবাবুর মুখে একটা বিস্ময় আর বৃশি যেশানো ডাব দেখা দিল। 'ও কে এয়েচে! ওয়াভারফুল!—বাঃ, বাঃ, এইত, জলের মতো সোজা—SO—এসো; DO—দিও; NADO—এনে দিও; NHE—এনেচি।—ও বাব্বা! এটা যে বিরাট সেনটেন্স; এর তো শেষ নেই

মশাই !—AKLO ATBB BBSO ADK SO RO ADK SO AT KLO
PC LO ROT OT DD OK OJT RO OG এ আমার সাধি নেই ।

‘ধৈর্য নেই বলুন । তোপসে পড় । পাকুয়েট করে নিলে জলের মতো সোজা ।’

‘খুব বেশি না ঠেকেই পড়ে গেলাম আমি ।—

‘এ কে এল ? এটি বিবি । বিবি এস । এদিকে এস । আরো এদিকে এস । এটি
কে এল ? পিসি এল । আর ওটি ? ওটি দিদি । ও কে ? ও জেঠি । আর ও ? ও
ঝি ।’

‘ওটা কোথায় পেলেন আপনারা ?’ মহেশবাবু হাসিমুখে আমাদের দিকে
এগিয়ে এসেছেন ।

‘আপনার বাগানের ধারে পড়ে ছিল,’ বলল ফেলুদা ।

‘বিবিদিদিমন্দির সঙ্গে একটু খেলা করছিলাম আর কী ।’

‘সেটা আদ্যাক্ষ করেছি,’ বলল ফেলুদা । আমরা তিনজনেই উঠতে যাচ্ছিলাম,
ভদ্রলোক বাধ্য দিয়ে আমাদের পাশেই পাথরের উপর বসে পড়লেন ।

‘আরেকটি কাগজ দেখাব আপনারা ।’

মহেশবাবু মুখে আর হাসি নেই । পকেট থেকে মানিবাগ বার করে তার
ভিতর থেকে একটা পুরানো ভাঁজ করা পোস্টকার্ড বার করলেন ।—‘আমার
দ্বিতীয় পত্রের শেষ পোস্টকার্ড ।’

ফেলুদা পোস্টকার্ডটা নিয়ে ভাঁজ বুলল । একদিকে রঙিন ছবি । লোক সমেত
জুরিখ শহরের দৃশ্য । উল্টোদিকে শুধুই নাম ঠিকানা দেখে আমরা সকলেই বেশ
অবাক ।

মহেশবাবু বললেন, ‘শেষের দিকে ও তাই করত । শুধু জানান দিয়ে দিত
কোথায় আছে । আগেও দু’এক লাইনের বেশি লেখেনি কখনো ।’

ভদ্রলোক ফেলুদার হাত থেকে পোস্টকার্ডটা নিয়ে আবার ভাঁজ করে ব্যাগে
গেঁথে দিলেন ।

ফেলুদা বলল, ‘বীরেনবাবু বিলেতে কী করতেন সেটা জানতে পেরেছিলেন ?’

মহেশবাবু মাথা নাড়লেন । মামুলি চাকরি করার ছেলে ছিল না বীরেন । সে
ছিল যাকে বলে রেবেল । একটি অগ্নিস্থলিস । গতানুগতিকের একেবারে বাইরে ।
তার আবার একটি হিরো ছিল । বাঙালী হিরো । একশো বছর আগে তিনিও নাকি
বাড়ি থেকে পালিয়ে জাহাজের খালাসী হয়ে বিলেত যান । তারপর শেষ পর্যন্ত
ব্রেজিল না মেক্সিকো কোথায় গিয়ে আর্মিতে ঢুকে কর্নেল হয়ে সেখানকার যুদ্ধে
অসাধারণ বীরত্ব দেখান ।’

‘সুরেশ বিশ্বাস কি ?’ ফেলুদা জিজ্ঞাস করল । লালমোহনবাবুরও চোখ চকচক
করে উঠেছে । বললেন, ‘ইয়েস ইয়েস, সুরেশ বিশ্বাস । ব্রেজিলে মারা যান

ভদ্রলোক । কর্নেল সুরেশ বিশ্বাস ।’

মহেশবাবু বললেন, ‘ঠিক বলেছেন । ওই নাম । কোথেকে তার একটা জীবনী জোগাড় করেছিল, আর সেটা পড়েই ওর আত্মজীবনের শব্দ হয় । আমি বাধা দিইনি । জানতাম দিলে কোনো ফল হবে না । উধাও হয়ে গেল । তারপর মাস দুয়েক পরে এল ইউরোপ থেকে এক চিঠি । হল্যান্ড, সুইডেন, জার্মানি, অস্ট্রিয়া...কী করেছে কিছু বলে না, শুধু জরুরি দেয় সে আছে । চলে গেছে বলে যেমন দুঃখ হত, তেমনি নিজের চেষ্টায় নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে বলে গর্বও হত । তারপর সিগ্গাটি সেভনের পর আর চিঠি নেই ।’

মহেশবাবু কিছুক্ষণ উদাস চোখে দূরের গাছপালার দিকে চেয়ে রইলেন । তারপর বললেন, ‘সে আর আমার কাছে আসবে না । এত সুখ আমার কপালে নেই । আমার উপরে যে অভিশাপ লেগেছে !’

‘সে কি হে, তুমি আমার অভিশাপ-টভিশাপে বিশ্বাস কর কবে থেকে ?—অখিলবাবু আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন । মহেশবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ‘তুমি আমার কোটীই বিচার করেছ অখিল, মানুষটাকে বিচার করনি ।’

‘ওইখানেই তো ভুল’, বললেন অখিলবাবু, ‘মানুষের কুটী, মানুষের রাশি গ্রহ নয়—এ সবের থেকেতো আলাদা নয় মানুষ । তোমায় বলেছিলুম সেই ফাঁটুতে, যে তোমার জীবনে একটা বড় ঢেঁকি আসছে—মনে আছে তোমার ?—তুনি মশাই—’ ফেলুদার দিকে ফিরলেন অখিলবাবু—‘এই যে দেখছেন ঐকে, এখন দেখলে বুঝতে পারবেন কি যে ইনি এককালে রাঁচি টু নেতারাট যাবার পথে ঐর একটা পুরানো ফোর্ড গাড়ি বিকল হয়ে যাওয়ায় তার উপর রাগ করে সেটাকে পাশাড়ে থেকে হাজার ফুট নিচে ফেলে দিয়েছিলেন ?’

মহেশবাবু উঠে পড়েছিলেন । বললেন, ‘বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বদলায় সেটা বলে দিতে কি জ্যোতিষীর দরকার হয় ?’

কথাটা বলে মহেশবাবু উত্তরদিকে চলে গেলেন, বোধহয় পাথরের সন্ধানে । অখিলবাবু বসলেন তাঁর জায়গায় । গল্প বলার মুহুর্তে ছিলেন ভদ্রলোক । বললেন, ‘আশ্চর্য লোক এই মহেশ । আমি তাঁর পড়শী ছিলাম । যদিও অন্য দিক দিয়ে ব্যবধান বিস্তর । আমি শিক্ষক, আর ও উদীয়মান আত্মজীবনী । ওর ছেলের টিউশনি করেছি কিছুদিন, সেই থেকে আলাপ । অ্যালোপ্যাথিতে আস্থা ছিল না, তাই অসুখ-টসুখ করলে মাঝে মাঝে শিকড় বাকল চেয়ে নিত আমার কাছে । সামাজিক ব্যবধানটা কোনোদিন বুঝতে দিত না । আমার ছেলেকেও নিজের ছেলের মতোই স্নেহ করত । কোনো সবারি ছিল না ।’

‘আপনার ছেলে কী করে ?’

‘কে, অধীর ? অধীর ইঞ্জিনিয়ার । বোকারোয় আছে । খড়গপুরে পাশ করে

ডুসেলডর্ফে চাকরি নিয়ে চলে গেসল । বিশেষেই ছিল বছর শশেক, তারপর—

একটা বিস্ফোরণের শব্দ অখিলবাবুর কথা ধামিয়ে দিল । 'বন্দুক !'—ঠেচিয়ে উঠল বিবি—'জেট্ট পাখি মেয়েছে ! আমরা বাড়িরে তিতিরেণ মাংস খাব !'

'দেখি মহেশ আবার কোথায় গেল ।' অখিলবাবু যেন কিছুটা চিন্তিত ভাবেই উঠে পড়লেন । 'পাখর ইঁততে গিয়ে পা হড়কে পড়ে-টড়ে গেলে জন্মদিনটাই—'

'পিকনিক বলে মনেই হচ্ছে না ।' শ্রীতীনবাবুর স্ত্রী হাতের বইটা বন্ধ করে শতরঞ্জির উপর রেখে উঠে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন । 'সবাই এমন ছড়িয়ে আছে কেন বলুন তো ?'

'বিদে পোলেই সুড়সুড় করে এসে হাজির হবে,' বলল ফেলুদা ।

'কিছু খেললে হত না ?'

'তাস ?' বললেন লালমোহনবাবু, 'আমি কিন্তু ক্রু ছাড়া আর কিছু জানি না ।'

'তাও আবার জিলে,' বলল ফেলুদা ।

'তাসতোআনিনি সঙ্গে,' বললেন নীলিমা দেবী । 'এমনি মুখে মুখে কিছু খেলা যেতে পারে ।'

'জল-মাটি-আকাশ হলে লালমোহনবাবু যোগ দিতে পারেন,' বলল ফেলুদা ।

'সেটা আবার কী মশাই ?'

'খুব সহজ,' বললেন নীলিমা দেবী, 'ধরুন, আপনার দিকে তাকিয়ে আমি জল, মাটি, আকাশ এই তিনটির যে কোনো একটা বলে দশ গুণতে শুরু করব । জল বললে জলের, মাটি বললে মাটির, আর আকাশ বললে আকাশের একটা প্রাণীর নাম করতে হবে আপনাকে ওই দশ গোনার মধ্যে ।'

'এটা খুব কঠিন খেলা বুঝি ?'

'খেলো দেখুন একবার । আমি আপনাকেই প্রশ্ন করছি ।'

'বেশ । রেডি ।' লালমোহনবাবু দম নিয়ে সোজা হয়ে যোগ্যসনে বসলেন । নীলিমা দেবী ভদ্রলোকের চোখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে হঠাৎ ঠেচিয়ে উঠলেন—

'আকাশ । এক দুই তিন চার পাঁচ—'

'ঐ-ঐ-ঐ—'

'ছয় সাত আট নয়—'

'বেঙুর !'

ফেলুদা অবিশ্যি জানতে চাইল বেঙুরটা কোন গ্রহের আকাশে চরে বেড়ায় । তাতে লালমোহনবাবু বললেন যে ব্যাঙ, ছাঙর আর বেলুন—এই তিনটে তিনি ভেবে রেখেছিলেন, বলার সময় তালগোল পাকিয়ে গেছে । তাতে ফেলুদা বলল যে বেলুনকে প্রাণী বলা যায় কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে ; কিন্তু লালমোহনবাবু



কথাটা মানতে চাইলেন না। বললেন, ‘বেলুনে অগ্নিজেন লাগে, প্রাণীরও অগ্নিজেন ছাড় চলে না, সুতরাং প্রাণী বলব না কেন মশাই?’ ফেলুদা বলল যে সে হাওয়া, হাইড্রোজেন আর হিলিয়ামের বেলুনের কথা শুনেছে, এমনকি কয়নার গ্যাসের বেলুনের কথাও শুনেছে, কিন্তু অগ্নিজেন বেলুনের কথা এই প্রথম শুনল।

নীলিমা দেবী তর্ক থামানোর জন্য হাত তুলেছিলেন, ঠিক সেই সময় এমন একটা ঘটনা ঘটল যে তর্ক আপনিই থেমে গেল।

প্রীতীনবাবু।

মানুষে একসঙ্গে দুঃখ আর আতঙ্ক অনুভব করলে তার কীরকম ভাবভঙ্গী হতে পারে, লিওনার্দো দা ভিন্চির করা তার একটা ড্রইং ফেলুদা একবার আমাকে দেখিয়েছিল। প্রীতীনবাবুর চেহারা অবিকল সেই ছবির মতো।

ভদ্রলোক একটা ঝোপের পিছন থেকে বেরিয়ে এসে কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে বসে পড়লেন।

নীলিমা দেবী ছুটে গেলেন স্বামীর দিকে, যদিও ফেলুদা তার আগেই পৌঁছে গেছে। কিন্তু ভদ্রলোকের মুখ দিয়ে কথা বেরোতে বেশ সময় লাগল।

‘বা...বা...বা...’ বললেন প্রীতীনবাবু, আর সঙ্গে সঙ্গে তার ডান হাতটা পিছন দিকে নির্দেশ করল।

II

মহেশবাবুকে যখন বাড়িতে আনা হয় তখন প্রায় আড়াইটা। তখনও জ্ঞান হয়নি ভদ্রলোকের। মাথায় চোট লেগেছে, দাঁড়ানো অবস্থা থেকে সটান পড়েছিলেন মাটিতে। ডাক্তার বলছেন হার্ট অ্যাটাক। ভদ্রলোকের হার্ট এমনভাবেই দুর্বল ছিল, তার উপর এই বয়সে হঠাৎ কোনো কারণে শক্ পেলো এরকম হওয়া অসম্ভাবিক নয়। মোট কথা, তাঁর অবস্থা ভালো নয়, সেটা ওঠার সম্ভাবনা আছে কিনা সেটা এখনো বলা যাচ্ছে না।

রাজবাড়ায় আমরা যেখানে বসেছিলাম, তার উত্তরে খানিকটা দূরে একটা বেশ বড় পাথরের পিছনে একটা খোলা জায়গায় মহেশবাবুকে পাওয়া যায়। এটা কোনোদিন ভুলব না যে আমরা যখন সেখানে পৌঁছলাম তখন তাঁর কাছেই দুটো হলদে প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছিল। প্রীতীনবাবু পাহাড় বেয়ে উপর দিকের কন্দলে গিয়েছিলেন, ফেরার পথে কিছুদূর নেমে এসে একটা ঝোপ পেরিয়ে নিচের দিকে চেয়ে দেখেন মহেশবাবু পড়ে আছেন মাটিতে। তিনি ভেবেছিলেন ভদ্রলোক মারাই গেছেন, তাই ওরকম চেহারা করে এসেছিলেন খবর দিতে। ফেলুদা গিয়েই

মহেশবাবুর নাড়ী ধরে বলল তিনি বেঁচে আছেন। তাঁর মাথাটা পড়েছিল একটা খান ইটের সাইজের পাথরের উপর, তার ফলে খানিকটা রক্ত বেরিয়ে পড়েছিল পাথর আর বালির উপর।

আমরা মহেশবাবুর কাছে পৌঁছানোর মিনিটখানেক পরে প্রথম এলেন অরুণবাবু, তাঁর হাতে বন্দুক। তারপর এলেন অখিলবাবু। সব শেষে এলেন শঙ্করলাল মিশ্র। শেষের ভদ্রলোকটিকে ঘেরকম ভেঙে পড়তে দেখলাম, তাতে বুঝলাম মহেশবাবুর প্রতি তাঁর টান কত গভীর।

এই অবস্থায় আমাদের পক্ষে মহেশবাবুকে তুলে ভেড়া নদী পেরিয়ে হাজারিবাগ নিয়ে আসা অসম্ভব, তাই ভদ্রলোকের দুই ছেলে তৎক্ষণাৎ চলে গেলেন শহরে। ডাক্তার আর অ্যাম্বুল্যান্স নিয়ে আসতে লাগল প্রায় আড়াই ঘণ্টা, কৈলাসে পৌঁছতে আরো এক ঘণ্টা। আমরা কিছুক্ষণ কৈলাসেই রয়ে গেলাম। পিকনিক আর হয়নি, তাই কারুর খাওয়া হয়নি। কিন্তু এই অবস্থার মধ্যেই প্রীতীনবাবুর স্ত্রী আমাদের জন্য পরোটা, আলুরদম, মাংসের কাবাব ইত্যাদি এনে দিলেন। অশ্চর্য শক্তি বলতে হবে ভদ্রমহিলা। বিবি অবিশ্যি ব্যাপারটা বুঝতেই পারছে না, বলাছে দাদু মাথা ঘুরে পড়ে গেছে। আমরা বৈঠকখানাতেই বসেছিলাম, অরুণবাবু ডাক্তারের সঙ্গে ছিলেন বাপের ঘরে, প্রীতীনবাবু মাঝে মাঝে এসে ভদ্রতার খাতিরে আমাদের সঙ্গে দু'একটা কথা বলে যাচ্ছিলেন। শঙ্করলাল নিরব, এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তিনি একবারও মুখ খোলেননি। অখিলবাবুর মুখে একটাই কথা—'এত করে বললাম, তাও কথা শুনল না। আমি জানতাম আজ একটা কিছু ঘটবে।'

চারটে নাগাদ আমরা উঠে পড়লাম। প্রীতীনবাবু ছিলেন, তাঁকে বললাম কাল এসে খবর নিয়ে যাব কেমন থাকেন মহেশবাবু।

বাড়ি ফিবে এসে হাত মুখ ধুয়ে বারান্দায় এসে বসলাম তিনজন। একদিনে অল্প সময়ের মধ্যে অনেকগুলো ঘটনা ঘটলে মাথাটা কেমন যেন ভৌঁ ভৌঁ করে, আমার সেই অবস্থা। ফেলুদা কথা বলছে না, তার মানে তার ভাবনা চিন্তাগুলোকে গুছিয়ে ফেলছে। আমি জানি ও এখন বেশি কথা বলা পছন্দ করে না, তাও একটা জিনিস না বলে পারলাম না।

'আচ্ছা ফেলুদা, ডাক্তার বলেছেন একটা শক্ পেলে এরকম হতে পারে, কিন্তু রাজরাষ্ট্রতে কী শক্ পেতে পারেন মহেশবাবু?'

'শুভ কোয়েস্টেন,' বলল ফেলুদা, 'আজকের ঘটনার ওই একটা ব্যাপারই আমার কাছে অর্থপূর্ণ। অবিশ্যি শক্ পেয়েছেন কিনা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না এখনো।'

'সেটা ভদ্রলোক সুস্থ হয়ে উঠলেই ক্রিয়ার হয়ে যাবে,' বললেন

লালমোহনবাবু ।

‘উঠবেন কি সুস্থ হয়ে ?’

মহেশবাবু সম্বন্ধে ফেলুদার মনে যে কৌতূহলের ডাব জেগে উঠেছে, সেটা আরও কৈলাসের বৈঠকখানায় বসেই বুঝতে পারছিলাম । বেশির ভাগ সময়টাই ও ঘরের জিনিসপত্র, আলমারির বই, এই সব দেখে কাটিয়েছে । ভাবটা যে ওদন্ত করছে তা নয়, বেশ টিলেঢালা, কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম যে ও সব কিছু মনে মনে নোট করে নিচ্ছে । সেই ফ্যামিলি গ্রুপটা ও হাতে তুলে নিয়ে দেখল প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে ।

আদিবাসী গ্রাম থেকে মাদলের শব্দ ভেসে আসছে । ইঠাৎ খেয়াল হল যে আরও ম্যাক্সেস্টিক সার্কাসের বাঘটার কোনো খবর পাওয়া যায়নি । অবিশ্যি ধরা পড়লে নিশ্চয়ই জানা যেত । অন্তত বুলাকিপ্রসাদ নিশ্চয়ই জানাত ।

ঠাণ্ডাটা পড়েছে, লালমোহনবাবু তাই মালিক্যাপটা আরো টেনে নাড়িয়ে নিয়ে বললেন, ‘সিগনিফিক্যান্ট ব্যাপার ।’

ভদ্রলোক বোধহয় ভেবেছিলেন আমরা দু’জনেই জিগোস করব ব্যাপারটা কী : সেটা না করাতে শেষে নিজেই বললেন, ‘যে সময়টা ঘটনাটা ঘটল, তখন কিন্তু মিসেস প্রীতীন আর খুকী ছাড়া আর কে কী করছিল তা আমরা কেউই জানি না ।’

‘কেন জানব না,’ বলল ফেলুদা । ‘অরুণবাবু পাখি মারার চেষ্টা করছিলেন, প্রীতীনবাবু পাখির ডাক বেকর্ড করছিলেন, অখিলবাবু মহেশবাবুকে খুঁজছিলেন, শক্তরলাল তাঁর সন্ন্যাসী বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছিলেন, আর বেয়ারা দু’জন আমাদের বিশ হাত দূরে শিমুল গাছের তলায় বসে বিড়ি খাচ্ছিল ।’

‘বেয়ারাদের তো আমিও দেখেছি মশাই, কিন্তু আর সবাই সত্যি কথা বলছে কিনা সেটা জানচেন কী করে ?’

‘যাঁদের সঙ্গে মাত্র কয়েক ঘণ্টার আলাপ তাঁদের আচরণ সম্বন্ধে এত চট করে সন্দেহ প্রকাশ করতে আমি রাজি নই ।’

‘তা বটে, তা বটে ।’

ভিনারের মাঝখানে লালমোহনবাবু ইঠাৎ একটা নতুন কথা ব্যবহার করলেন—‘সুপার-কেলেঙ্কারি’ । এটাও বলা দরকার যে কথাটা বলার সময় তিনি চেয়ার ছেড়ে প্রায় ছ’ইঞ্চি লাফিয়ে উঠেছিলেন । ফেলুদা স্বভাবতই জিগোস করল ব্যাপারটা কী ।

‘আরে মশাই, একটা জরুরী কথাই বলা হয়নি । সাংঘাতিক ক্রু । যেখানে ডেডবডি—ধড়ি, মহেশবাবু পড়েছিলেন, তার একপাশে পায়ে কী জানি ঠেকতে চেয়ে সেখি প্রীতীনবাবুর টেপ ব্রেকডার ।’

‘সেটা এনেছেন সঙ্গে ?’

‘ভাবলুম পরে তুলব, তুণে ভদ্রলোককে দেব, তা তখন যা অবস্থা....ফেরার সময় দেখি সেটা আর নেই।’

‘প্রীতীনবাবু তুণে নিয়েছিলেন বোধহয়।’

‘দূর মশাই, প্রীতীনবাবু ওই দিকটাতেই ঘেসেননি। তাছাড়া জিনিসটা পড়েছিল একটা ঝোপড়ার মধ্যে; পায়ে না ঠেকলে চোখেই পড়ত না।’

ফেলুদা ব্যাপারটা নিয়ে কী যেন মন্তব্য করতে যাচ্ছিল, এমন সময় একটা টেলিফোন এল।

অরুণবাবু।

ফেলুদা দু একটা কথা বলেই ফোনটা রেখে বলল, ‘কৈলাস চল। মহেশবাবুর জ্ঞান হয়েছে। আমার নাম করছেন।’

গাড়িতে কৈলাস যেতে লাগল এক মিনিট।

মহেশবাবুর ঘরে সকলেই রয়েছে, এক বিবি ছাড়া। ভদ্রলোকের মাথায় ব্যান্ডেজ, চোখ আধবোজা, হাত দুটো বুকের উপর ঝড়ো করা। ফেলুদাকে দেখে মুখে যে হাসিটা দেখা দিল সেটা প্রায় চোখে ধরাই পড়ে না। তারপর তাঁর ডান হাতটা উঠে তর্জনীটা সোজা হল।

‘কা কা...’

‘একটা কাজের কথা বলছেন কি?’ ফেলুদা জিগ্যাস করল।

ভদ্রলোকের মাথাটা সামান্য নড়ে উঠল হ্যাঁ-য়েব ভঙ্গিতে। তারপর তর্জনীর পাশে মাঝের আঙুলটাও উঠে দাঁড়াল। একের জায়গায় দুই।

‘উই...উই...’

এইটুকু বলে দুটো আঙুল আবার ভাঁজ হয়ে গিয়ে সেই জায়গায় বুড়ো আঙুলটা সোজা হয়ে উঠে এদিক ওদিক নড়ল।

তারপর ভদ্রলোক বেশ কষ্ট করে ঘাড়টা ডানদিকে ঘোরালেন। ওদিকে বেডসাইড টেবিল। তার উপর মুক্তানন্দের ছবি।

ছবির দিকে হাতটা বাড়ানোর চেষ্টা করতে অরুণবাবু ছবিটা বাপের দিকে এগিয়ে দিলেন। মহেশবাবু সেটা নিজে না নিয়ে ফেলুদার দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। অরুণবাবু ছবিটা ফেলুদাকে দেবার পর মহেশবাবু আবার দু আঙুল দেখালেন। কী যেন একটা বলতেও চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পারলেন না।

এর পরে আর কোনো কথা বলতে পারেননি মহেশ চৌধুরী।

তিন মহাদেশের শক্তি ঘাঁট পিছনে, সেই মুক্তানন্দের ক্ষেমে বাঁধানো পাসপোর্ট সাইজের ছবি এখন আমাদের ঘরে। আমরা চলে আসার ঘন্টা দুয়েকের মধ্যেই মহেশবাবু মারা যান। যাবার আগে ফেলুদার উপর যে তিনি কী দায়িত্ব দিয়ে গেছেন সেটা ফেলুদা বুঝলেও, আমি বুঝিনি। আর লালমোহনবাবুও নিশ্চয়ই বোঝেননি, কারণ উনি বললেন মহেশবাবু নাকি ফেলুদাকে মুক্তানন্দের শিষ্য হতে বলে গেছেন। ফেলুদা যখন জিগ্যেস করল যে ছবিটা দেবার পরে দুটো আঙুল দেখানোর মানে কী, তখন লালমোহনবাবু বললেন মুক্তানন্দের শিষ্য হলে ফেলুদার শক্তি ডবল হয়ে যাবে এটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন ভদ্রলোক। 'অবিশ্যি কাঁচকলা দেখালেন কেন সেটা বোঝা গেল না।' স্বীকার করলেন লালমোহনবাবু।

পরদিন সকালে অরিলবাবুর টেলিফোনে আমরা মৃত্যুসংবাদটা পেলাম।

এগারোটা নাগাদ স্বপ্নান থেকে ফেরার পথে লালমোহনবাবু জিগ্যেস করলেন, 'কৈলাসে যাবেন, না বাড়ি যাবেন?' ফেলুদা বলল, 'এবেলা ওদিকটা না মড়ানোই ভালো: অনেকে সমবেদনা জানাতে আসবে, কাজ হবে না কিছুই।'

'কী কাজের কথা বলছেন?'

'তথ্য সংগ্রহ।'

দুপুরে খাবার পর বারান্দায় বসে ফেলুদা ওর সবুজ খাতায় কিছু নোট লিখল। সেটা শেষ হলে পর এইরকম দাঁড়াল—

- ১। মহেশ চৌধুরী—জন্ম ২৩শে নভেম্বর ১৯০৭, মৃত্যু ২৪শে নভেম্বর ১৯৭৭ (স্বাভাবিক হার্ট আটাক? শক?)। হৈয়ালিপ্রিয়। ডাকটিকিট, প্রজাপতি, পাখর। দেয়াবজীর দেওয়া মূল্যবান স্ট্যাম্প আলবাম লোপাট (how?) মেজো ছেলের প্রতি টান। অন্য দুটির প্রতি মনোভাব কেমন? শঙ্করলালের প্রতি অপত্য স্নেহ। স্নাবি ছিল না। অতীতে মেজাজী, মদ্যপ। শেষ বয়সে সাদ্বিক, সদাশয়। অভিশাপ কেন?
- ২। ঐ স্ত্রী—মৃত্যু! কবে?
- ৩। ঐ বড় ছেলে অরুণেন্দ্র—জন্ম (আন্দাজ) ১৯৩৬। অপ্র ব্যবসায়ী। কলকাতা-হাজরিবাগ যাতায়াত। মৃগয়াপ্রিয়। স্বল্পভাষী।
- ৪। ঐ মেজো ছেলে বীরেন্দ্র—জন্ম (আন্দাজ) ১৯৩৯। 'অগ্নিস্থলিঙ্গ'। ১৯ বছর বয়সে দেশ-ছাড়া। কর্নেল সুরেশ বিশ্বাসের ভক্ত। বাপকে বিদেশ থেকে চিঠি লিখত '৬৭ পর্যন্ত। জীবিত? মৃত? বাপের ধারণা সে ফিরে এসেছে?

- ৫। ছোট ছেলে প্রীতীশ—অরুণের সঙ্গে ব্যবধান অন্তত ৯-১০ বছর (ভিত্তি : ফ্যামিলি গ্রুপ)। অর্থাৎ জন্ম (আনুমান) ১৯৪৫। ইলেকট্রনিকস। পাখির গান। মিস্ত্রকে নয়। কথা বললে বেশি বলে, নিজের বিষয়। টপ রেকর্ডার ফোনে এসেছিল রাজকুমার।
- ৬। প্রীতীনের স্ত্রী নীলিমা—বয়স ২৫/২৬। সহজ, সপ্রতিভ।
- ৭। অখিল চক্রবর্তী—বয়স আনুমান ৭০। এক্স-স্কুলমাস্টার। মহেশের বন্ধু। ভাগ্য গণনা, আয়ুর্বেদ।
- ৮। শঙ্করলাল মিশ্র—জন্ম (আনুমান) ১৯৩৯। দীয়েনের সমবয়সী। মহেশের দারোগ্যান দীনদয়ালের ছেলে। দীনদয়ালের মৃত্যু ১৯৪৩। প্রথম—জন্মলে গিয়েছিল কেন? শঙ্করকে মানুষ করেন মহেশ। বর্তমানে বইয়ের দোকানের মালিক। মহেশের মৃত্যুতে মুহূর্তমান।
- ৯। নূর মহম্মদ—বয়স ৭০-৮০। চম্পিশ বছরের উপর মহেশের বেয়ারা।

ফেলুদা ঠিকই আনুমান করেছিল। দুপুরে ঝাওয়ার পর কৈলাসে গিয়ে শুনলাম সকালে অনেকেই এসেছিলেন, কিন্তু একটা নাগাদ সবাই চলে গেছেন। বৈঠকখানা মহেশবাবুর দুই ছেলে আর অখিলবাবু ছিলেন, আমরা সেখানেই বসলাম। প্রীতীনবাবুর অস্থির ভাবটা যেন আরো বেড়ে গেছে; একটা আলদা মোফার এক কোণে বসে খালি হাত কচলাচ্ছেন। অখিলবাবু মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলাছেন আর মাথা নাড়ছেন। অরুণবাবু যথারীতি গম্বীর ও শান্ত। ফেলুদা ভীকেই প্রগাটা করল।

‘আপনারা কি কিছুদিন আছেন?’

‘কেন বলুন তো?’

‘আপনাদের একটু সাহায্যের দরকার। মহেশবাবু একটা কাজের ভার নিয়ে গেছেন আমাদের, কী কাজ সেটা অবিশ্যি স্পষ্ট করে বলার ক্ষমতা ছিল না তাঁর। আমি প্রথমে জানতে চাই—উনি কী বলতে চেয়েছিলেন সেটা আপনারা কেউ বুঝেছেন কিনা।’

অরুণবাবু একটু হেসে বললেন, ‘বাবার মুহূর্ত অবস্থাতেই তাঁর অনেক সংকেত আমাদের বুঝতে বেশ অসুবিধা হত। রাশভারী লোক হলেও তাঁর মধ্যে একটা ছেলেমানুষী দিক ছিল সেটার কিছুটা আভাস হয়ত আপনিও পেয়েছেন। আমার মনে হয় বাবা শেষ অবস্থায় যে কথাগুলো বললেন সেটার উপর বেশ গুরুত্ব না দেওয়াই ভালো।’

ফেলুদা বলল, ‘আমার কাছে নির্দেশগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ অর্থহীন বলে মনে হয়নি।’

‘তাই বুঝি?’

‘হ্যাঁ। তবে সব সংকেত ধরতে পেরেছি এটা বলতে পারব না। যেমন ধরুন, মুক্তানন্দের ছবি।’ ফেলুদা অখিলবাবুর দিকে ফিরল। ‘আপনি ওটা সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কিছু বলতে পারেন। ছবিটা তো বোধহয় আপনারই দেওয়া।’

অখিলবাবু বিষয় হাসি হেসে বললেন, ‘হ্যাঁ, আমারই দেওয়া। মুক্তানন্দ রাঁচিতে এসেছিলেন একবার। আমার তো এসবের দিকে একটু খোঁক আছেই চিরকাল। বেশ জেনুইন লোক বলে মনে হয়েছিল। আমি মহেশকে ঠাট্টা করে বলেছিলাম—‘তুমি তো কোনোদিন সাধু-সন্ন্যাসীতে বিশ্বাস-চিন্তাস করলে না, শেষ বয়সে একটু এদিকে মন দাও না। তোমাকে একটা ছবি এনে দেব। ঘরে রেখে দিও। মুক্তানন্দের প্রভাব খারাপ হবে না। তিনটি মহাদেশে এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে, না হয় তোমার উপরেও একটু পড়ল।—তা সে ছবি যে সে তার খাটের পাশে রেখে দিয়েছে সেটা কালই প্রথম দেখলাম। অসুখের আগেভাওর শোবার ঘরে যাইনি কখনো।’

‘আপনি ওটা সম্বন্ধে জানেন কিছু?’ ফেলুদা অরুণবাবুকে প্রশ্ন করল।

অরুণবাবু মাথা নাড়লেন। ‘ও জিনিসটা যে বাবার কাছে ছিল সেটাই জানতাম না। খাবার শোবার ঘরে আমিও কালই প্রথম গেলাম।’

‘আমিও জানতাম না।’—শ্রীতীনবাবুকে কিছু জিগ্যেস করার আগেই তিনি বলে উঠলেন।

ফেলুদা বলল, ‘দুটো জিনিস পেলে আমার কাজের একটু সুবিধা হতে পারে।’

‘কী জিনিস?’ অরুণবাবু জিগ্যেস করলেন।

‘প্রথমটা হল—মহেশবাবুকে লেখা তাঁর দ্বিতীয় পুত্রের চিঠি।’

‘বীরেনের চিঠি?’ অরুণবাবু অবাক। ‘বীরেনের চিঠি দিয়ে ‘কী হবে?’

‘আমার বিশ্বাস ওই ছবিটা মহেশবাবু বীরেনকে দেবার জন্য দিয়েছিলেন আমাকে।’

‘স্বাউ স্ট্রেন্স! এ খারগা কী করে হল আপনার?’

ফেলুদা বলল, ‘ছবিটা আমাকে দিয়ে মহেশবাবু দুটো আঙুল দেখিয়েছিলেন সেটা আপনাবাও দেখেছিলেন; একটা সম্ভাবনা আছে যে দুই আঙুল মানে দুটি। আমার ভুল হতে পারে, কিন্তু আপাতত এই বিশ্বাসেই আমাকে কাজ চালিয়ে যেতে হবে।’

‘কিন্তু বীরেনকে আপনি পাচ্ছেন কোথায়?’

‘ধরুন মহেশবাবু যদি ঠিকই দেখে থাকেন; যদি সে এখানে এসে থাকে।’

অরুণবাবু তাঁর বাপের মৃত্যুর কথা ভুলে গিয়ে হো হো করে হেসে উঠলেন।

‘বাবা গত পাঁচ বছরে কতবার বীরেনকে দেখেছেন তা আপনি জানেন? বিশ বছর যে ছেলে বিদেশে, বাবা তাঁর দুর্বল দৃষ্টি দিয়ে তাকে এক বলক দেখেই চিনে

ফেলবেন এটা আপনি ভাবছেন কী করে ?

‘আপনি ভুল করছেন অরুণবাবু, আমি নিজে একবারও ভাবছি না যে বীরেনবাবু কিরে এসেছেন । কিন্তু তিনি যদি দেশের বাইরেও কোথাও থেকে থাকেন, তাহলেও আমার দায়িত্ব দায়িত্বই থেকে যায় । তিনি কোথায় আছেন জেনে জিনিসটা তাঁর হাতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে আমাকে ।’

অরুণবাবু একটি নরম হয়ে বললেন, ‘বেশ । আপনি দেখবেন বীরেনের চিঠি । বাবা সব চিঠি এক জায়গায় রাখতেন । বীরেনের চিঠিগুলো আলাদা করে বেছে রাখব ।’

‘খনাবাদ’, বলল ফেলুদা, ‘আর দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে—মহেশবাবুর ডায়রি । সম্ভব হলে সেগুলোও একবার দেখব ।’

আমি ভেবেছিলাম অরুণবাবু এতে আপত্তি করবেন, কিন্তু করলেন না । বললেন, ‘দেখতে চান দেখতে পারেন । বাবা তাঁর ডায়রির ব্যাপারে কোনো গোপনতা অবলম্বন করতেন না । তবে আপনি হতাশ হবেন, মিঃ মিস্ত্রি ।’

‘কেন ?’

‘বাবার মতো ওরকম নীরস ডায়রি আর কেউ লিখেছে কিনা জানি না । অত্যন্ত মামুলি তথ্য ছাড়া আর কিছু নেই ।’

‘হতাশ হবার ঝুঁকি নিতে আমার আপত্তি নেই ।’

চিঠির ব্যাপারে ঠিক হল অরুণবাবু আর শ্রীতীনবাবু তাইয়ের গুলো বেছে আলাদা করে রাখলেন, সেগুলো কাল সকালে ফেলুদাকে দেখা হবে । ডায়রিগুলো আগুই নিয়ে যাব আমরা, আর কালই ফেরত দিয়ে দেব । বুঝলাম ফেলুদাকে আজ রাত জাগতে হবে, কারণ ডায়রির সংখ্যা চল্লিশ ।

তিনজনে ভাগাভাগি করে খবরের কাগজে মোড়া মহেশ চৌধুরীর ডায়রির সাতটা প্যাকেট নিয়ে কৈলাসের কৌকরবিছানো পথ দিয়ে যখন ফটকের দিকে যাচ্ছি, তখন দেখলাম জোড়া-মৌমাছি তার বিলিতি ডল হাতে নিয়ে বাগানে ঘোরফেরা করছে । পায়ের শব্দে সে হাঁটা থামিয়ে আমাদের দিকে ঘুরে দেখল । তারপর বলল, ‘দাদু আমাকে বলেনি ।’

হঠাৎ এমন একটা কথায় আমরা তিনজনেই থেমে গেলাম ।

‘কী বলেনি দাদু ?’ ফেলুদা জিগ্যেস করল ।

‘কী ঝুঁকছিল বলেনি ।’

‘কবে ?’

‘পরশু তরশু নরশু ।’

‘তিনদিন ?’

‘একদিন ।’

‘কী হয়েছিল বল তো ।’

বিবি দূরে দাঁড়িয়েই চুপে কথা বলছে, যদিও তার মন পুতুলের দিকে । সে পুতুলের মাথায় গৌড়ার জন্য বাগান থেকে ফুল নিতে এসেছে । ফেলুদার প্রশ্নের উত্তরে বলল, ‘দাদুর যে ঘর আছে দোতলায়, যেখানে টেবিল আছে, বই আছে, আর সব জিনিস-টিনিস আছে, সেইখানে ঝুঁকছিল দাদু ।’

‘কী ঝুঁকছিলেন ?’

‘আমি তো জিগোস করলাম । দাদু বলল, কী পাচ্ছি না, কী ঝুঁকছি ।’

‘আবোল তাবোল বকছে, মশাই,’ চাপা গলায় বললেন লালমোহনবাবু ।

‘আর কিছু বলেননি দাদু ?’ ফেলুদা জিগোস করল ।

‘দাদু বলল এটা হেয়ালি, পরে মানে বলে দেব, এখন ঝুঁকতে দাও । তারপর আর বলল না দাদু । দাদু মরে গেল ।’

ইতিমধ্যে ডলের মাথায় ফুল গৌড়া হয়ে গেছে, বিবি বাড়ির দিকে চলে গেল, আর আমরাও হল্যাম বাড়ি মুখে ।

॥ ৭ ॥

ফেলুদা এখন মহেশ চৌধুরীর ডাকারি নিয়ে এসেছে, একে ডিসটার্ভ না করাই ভালো, তাই আমরা দুজনে চারটে নাগাদ চা খেয়ে একটু ঘুরব বলে গাড়িতে করে বেরিয়ে পড়লাম । লালমোহনবাবুর ধারণা শহরের দিকে গেলে হয়ত সুনতনের লেটেস্ট খবর পাওয়া যেতে পারে ।—‘মহেশ চৌধুরীর মৃত্যুর ব্যাপারে তোমার দাদা যতই রহস্যের গন্ধ পেয়ে থাকুন না কেন, আমার কাছে বাঘ পালানোর ঘটনাটা অনেক বেশি রোমাঞ্চকর ।’

বাঘের খবর পেতে বেশি দূর যেতে হল না । পেট্রোল নেবার দরকার ছিল, মেন রোডে বৃজভূষণ তেওয়ারীর পেট্রোল পাম্পের সামনে ভিড় দেখেই বুঝলাম বাঘের আলোচনা হচ্ছে, কারণ একজন ভদ্রলোক থাবা মারার ভঙ্গি করলেন কথা বলতে বলতে ।

লালমোহনবাবু গাড়ি থেকে নেমে সটান এগিয়ে গেলেন জটলা’র দিকে । ভদ্রলোক এককালে রাজস্থান যাবেন বলে বই পড়ে কিছুটা হিন্দী শিখেছিলেন, কিন্তু এখন সেটা ফেলুদার ভাষায় আবার শ্রমালের স্ট্যাণ্ডার্ডে নেমে গেছে । তার মানে কেয়া ছয়া-ববেশি এগোনো মূশকিল হয় । তবু ভালো, ভিড়ের মধ্যে একজন বাঙালী বেরিয়ে গেল । তার কাছেই জানলাম যে হাজারিবাগের পুলে বিষ্ণুগড়ের

দিকে একটা বনের মধ্যে নাকি সুলতানকে পাওয়া গিয়েছিল। ট্রেনার চন্দ্রনের সঙ্গে বনবিভাগের শিকারী নাকি বাঘটার দিকে এগিয়ে যায়। একটা সময় মনে হয়েছিল যে বাঘটা ধরা দেবে, কিন্তু শেষ মুহুর্তে সেটা চন্দ্রনকে একটা থাৰা মেরে পালিয়ে যায়। গুলিও চলেছিল, কিন্তু বাঘটা ক্ষতম হয়েছিল কিনা জানা যায়নি। চন্দ্রন অবিশ্যি ক্ষতম হয়েছে, তবে তেমন গুরুতরভাবে নয়। সে এখন হাসপাতালে।

লালমোহনবাবু বললেন, 'কাণ্ডারিকারের কোনো খবর জানেন ?'

এটা শুধরাতেই হল। বললাম, 'কাণ্ডারিকার নয়, কারাণ্ডিকার—যিনি বাঘের আসল ট্রেনার।'

ভদ্রলোক বললেন তার খবর জানেন না, তবে এটা জানেন যে বাঘের অভাবে নাকি সার্কাসের বিক্রি কিছুটা কমেছে।

বাঘের দিকে গুলি চলেছে জেনে কারাণ্ডিকারের মনোভাব কী হল সেটা জানার জন্য ভীষণ কৌতূহল হচ্ছিল আমাদের দুজনেরই, তাই পেট্রোল নিয়ে সোজা চলে গেলাম থ্রেট ম্যাক্সেস্টিকে।

ফেলুদা সঙ্গে থাকলে নেবেছি লালমোহনবাবু নিজেকে থেকে আগ বাড়িয়ে কিছু করতে সাহস পান না; আজ দেখলাম সোজা গেটে গিয়ে বললেন, 'পুট মি থু টু মিস্টার কুট্রি প্লীজ।' গেটের লোকটা কী বুঝল জানি না। হয়ত সেদিন আমাদের চিনে রেখেছিল, তাই আর কিছু জিগোস না করে আমাদের ঢুকতে দিল, আর আমরাও সোজা গিয়ে হাজির হলাম মিঃ কুট্রির কারাভানে।

কুট্রির কাছে যে খবরটা পেলাম সেটাকেও একটা হৈয়ালি বলা চলে।

কারাণ্ডিকার নাকি কাল রাত থেকে হাওয়া।

'দুদিন থেকেই পাবলিক আবার বাঘের খেলা ডিম্বাক্ত করতে শুরু করেছে,' বললেন মিঃ কুট্রি। 'আমি নিজে কারাণ্ডিকারের কাছে গিয়ে কমা চেয়েছি। বলেছি সে ছাড়া আর কেউ বাঘ ট্রেন করবে না। কিন্তু তাও সে না বলে চলে গেল। এর মধ্যেও দু-একদিন বেরিয়েছে, কিন্তু ঘন্টাখানেকের মধ্যেই আবার ফিরে এসেছে। কিন্তু আজ সে এখনও ফিরল না।'

খবরটা শুনে সার্কাসের বাইরে বেরিয়ে এসে লালমোহনবাবু বললেন, 'সুলতান-কাপচারের দৃশ্য আর দেখা হল না, তপেশ। এমন সুযোগ আর আসবে না।'

আমরাও মনটা খরাপ লাগছিল, তাই ঠিক করলাম গাড়িতে করে কোথাও একটু বেড়িয়ে আসব। উত্তরে যাব না দক্ষিণে যাব—অর্থাৎ কানারি হিলের দিকে যাব না রামগড়ের দিকে যাব—সেটা ঠিক করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত টস করলাম। দক্ষিণ পড়ল। লালমোহনবাবু বললেন, 'ওদিকটাতেও একটা পাহাড়

আছে, সেদিন যাবাব পথে দেখেছি।' খাসা দৃশ্য।'

দৃশ্য ভালো ঠিকই, কিন্তু এগারো কিলোমিটারের পোস্টটা পেরিয়ে কিছু দূর গিয়েই একটা কালভার্টের ধারে যে ঘটনাটা ঘটল, সেটাকে মোটেই ভালো বলা চলে না।

মাত্র দু'মাস আগে কেনা লালমোহনবাবুর আদ্যাসাড়র বার তিনেক হৈচকি তুলে মিনিটখানেক গো ঘ্রো করে অবশেষে বেমালাম ধর্মঘাটের দিকে চলে গেল। 'বোধহয় তেল টানচে না', বললেন হরিপদবাবু।

ঘড়িতে পাঁচটা কুড়ি। সূর্য আকাশের নিচের দিকে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে না, কারণ পশ্চিমে দূরে শালবনের মাথার উপর মেঘ জমে আছে।

আমরা গাড়ি থেকে নেমে কালভার্টের উপর গিয়ে বসলাম, হরিপদবাবু গাড়ি নিয়ে পড়লেন। লালমোহনবাবুকে এ ব্যাপারে পুরোপুরি ভাইভারের উপর নির্ভর করতে হয়, কারণ উনি গাড়ি সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। উনি বলেন, 'আমার নিজের পায়ের ভেতর কটা হাড় আছে কটা মাসল আছে না শুনে যখন দিবা চলে ফিরে বেড়াচ্ছি, তখন গাড়ির ভেতর কী কলকল্লা আছে সেটা জানার কী নেসেসিটি ভাই?'

মেঘের গায়ে নিচের দিকে একটা খড়খড়ির মধ্যে দিয়ে একটিনার উঁকি দিয়ে সূর্যদেব যখন আঙুরের মতো ছুটি নিলেন, হরিপদবাবু সেই সময় জানালেন যে তিনি রেডি—'চলে আসুন, স্যার।'

কালভার্ট থেকে উঠে আরেকবার ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি পাঁচটা তেত্রিশ। সময়টা স্করুটী, কারণ ঠিক তখনই আমরা দেখলাম সুলতানকে।

স্বরটা আরো অনেক নাটকীয়ভাবে দিতে পারতাম, কিন্তু ফেলুদা বলে এটাই ঠিক।—'গানাগুচ্ছে মর্চে-মর্চে বিশেষণ আর তপকথিত লোম-খাড়া-করা শব্দ ব্যবহার না করে চোখে যা দেখলি সেইটে ঠিক ঠিক সোজাসুজি বলে গেলে কাজ দেবে ঢের বেশি।' আমিও সেটাই করার চেষ্টা করছি।

খাঁচার বাইরে বাঘ এর আগেও একবার দেখেছি, যেটার কথা রয়েল বেঙ্গল রহস্যে আছে। কিন্তু সেখানে আমাদের সঙ্গে আরো অনেক লোক ছিল। শিকারী আর বন্দুকভোছিলই, সবচেয়ে বড় কথা—ফেলুদা ছিল। তার উপরে আমি আর লালমোহনবাবু ছিলাম গাছের উপর, বাঘের নাগালের বাইরে। এখানে আমরা তিনজন দাঁড়িয়ে আছি খোলা রাস্তায়, যার দুদিকে বন, অদূরে একটা পাহাড়, যাতে ভয়ুক আছেই, আর সময়টা সন্ধ্যা। এই সময় এই অবস্থায় আমাদের থেকে হাত পঞ্চাশেক দূরে পশ্চিম দিকের বন থেকে বেরিয়ে বাঘটা রাস্তার উপর উঠল। আমরা তিনজনে ঠিক একসঙ্গে একই সময় বাঘটা দেখেছি, কারণ আমার সঙ্গে সঙ্গে অন্য দুজনও ঠিক সেইভাবেই কাঠ হয়ে গেল। হরিপদবাবুর বাঁ হাতটা

গাড়ির দরজার দিকে বাড়িয়েছিলেন, সেই বাড়ানোই রয়ে গেল ; লালমোহনবাবু নাক ঝড়বেন বলে ডান হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনীটা নাকের দুপাশে ধরে শরীরটা একটু সামনের দিকে ঝুকিয়েছিলেন, তিনি সেই ভাবেই রয়ে গেলেন ; আমি ধুলো ঝড়বার জন্য আমার ডান হাতটা আমার জীন্সের পিছন দিকে নিয়েছিলাম, তার ফলে শরীরটা একটু বেকে গিয়েছিল, বাঘটা দেখার ফলে শরীরটা সেইরকম বেকেই রইল ।

রাস্তায় উঠে বাঘটা ঠিক চার পা গিয়ে থেমে গেল । তারপর মাথাটা ঘোরালো আমাদের দিকে ।

আমার পা কাঁপতে শুরু করেছে, বুকের ভিতরে কে যেন হাতুড়ি শিটছে । অথচ আমার চোখ কিছুতেই বাঘের দিক থেকে সরছে না । সঙ্গে সঙ্গে এটাও বুঝতে পারছি যে আমার ডান পাশে আবছা কালো জিনিসটা হচ্ছে লালমোহনবাবুর মাথা, আর সেটা ক্রমশ নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে । আন্দাজে বুঝলাম তাঁর পা অবশ্য হয়ে যাবার ফলে শরীরের ভার আর বইতে পারছে না । এটাও বুঝতে পারছিলাম যে আমার দৃষ্টিতে কী জানি গণ্ডগোল হচ্ছে, কারণ বাঘের আউটলাইনটা বার বার আপসা হয়ে যাচ্ছে, আর গায়ের কালো ডোরাগুলো স্থির না থেকে ভাইব্রোট করছে ।

সুলতান যে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আমাদের দেখল সেটার আন্দাজ নেওয়া মুশকিল । মনে হচ্ছিল সময়টা অফুরন্ত । লালমোহনবাবু পরে বললেন কম করে আট-দশ মিনিট ; আমার মতে আট-দশ সেকেন্ড, কিন্তু সেটাও যথেষ্ট বেশি ।

দেখা শেষ হলে পর মাথা ঘুরিয়ে নিয়ে আরো চার পা ফেলে বাঘ রাস্তা পেরিয়ে গেল । সাহস একটু বাড়তে ধীরে ধীরে ডান দিকে মাথা ঘুরিয়ে দেখলাম শাল সেতুন সরল শিশু শিমূল আর আরো অনেক সব শুকনো গাছের জঙ্গলে সুলতান অদৃশ্য হয়ে গেল ।

অশ্চর্য এই যে, এর পরেও আমরা অন্তত মিনিটখানেক (লালমোহনবাবুর বর্ণনায় পনেরো মিনিট) প্রায় একই ভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম । তারপর তিনজনে কেবল তিনটে কথা বলে গাড়িতে উঠলাম—হরিপদবাবু ‘চলুন’, আমি ‘আসুন’ আর লালমোহনবাবু ‘ছঃ’ । খুব বেশি ভয় নিয়ে কথা বলতে গেলে লালমোহনবাবুর এরকম হয় এটা আমি আগেই দেখেছি । ডুয়ার্সে মহীতোষ সিংহরায়ের বাড়িতে আমরা তিনজন একঘরে শুয়েছিলাম । একদিন রাতে ঘরের বন্ধ দরজাটা হাওয়াতে খট্ খট্ করায় উনি ‘কে’ না বলে ‘বে’ বলেছিলেন ।

হরিপদবাবুর নাকটা দেখলাম মোটামুটি ভালো । ফেরার পথে স্টিয়ারিং হুইলে হাতটাত কাঁপেনি । উনি নাকি এর আগেও রাস্তায় বাঘ দেখেছেন, জামসেদপুরে ছুইভারি করার সময় ।



বাড়ি ফিরে দেখি ফেলুদা তখনো মহেশবাবুর ডায়রিতে ডুবে আছে। আমার মনে হচ্ছিল সুলতানের খবরটা লালমোহনবাবু দিতে পারলে খুশি হবেন, তাই আমি আর কিছু বললাম না। ভদ্রলোক লেখেন-টোখেন বলেই বোধহয় সরাসরি খবরটা না দিয়ে একটু পায়তারা কমে নিলেন। বার দু-তিন হুঁ হুঁ করে কী একটা গানের সুর ভেঙ্গে নিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, তপেশ, বাফের পায়ের তলায় বোধহয় প্যাডিং থাকে, তাই না?'

আমি মজা দেখছি; বললাম, 'তাই তো শুনেছি।'

'নিশ্চয়ই তাই; নইলে এত কষ্ট দিয়ে গেল আর কোনো শব্দ হল না?'

লালমোহনবাবুর পায়তারা কিন্তু মাঠে মারা গেল। ফেলুদা আমাদের দিকে চাইলও না, কেবল একটা ডায়রি সরিয়ে রেখে আরেকটা হাতে নিয়ে বলল, 'আপনারা যদি বাঘটাকে দেখে থাকেন, তাহলে ক'টার সময় কোন'খানে দেখেছেন সেটা বন বিভাগে ফোন করে জানিয়ে দেওয়া উচিত ইমিডিয়েটলি।'

লালমোহনবাবু বললেন, 'টাইম পাঁচটা তেত্রিশ, লোকেশন রামগড়ের রাস্তায় এগারো কিলোমিটারের পোস্টের পরের কালভার্টের কাছে।'

'বেশতো পাশের ঘরে ডিরেকটরি রয়েছে, আপিসে এখন কেউ নেই, আপনি একেবারে ডি-এফ-ওর বাড়িতে ফোন করে জানিয়ে দিন। ওদের উপকার হবে।'

'আচ্ছা, হুঁ, তাহলে....' লালমোহনবাবু দেখলাম মাসলগুলোকে টান করে নিচ্ছেন।—'কীভাবে পুট করা যায় ব্যাপারটা? ইংরিজিতেই বলব তো।'

'হিন্দি ইংরিজি যেটায় বেশি দখল তাতেই বলবেন।'

'দি টাইগার হুইচ এসকেপ্‌ড ফ্রম দি....এসকেপ্‌ডই বলব তো?'

'সহজ করে নিয়ে র‍্যান আওয়ে বলতে পারেন।'

'এসকেপটা বোধহয় মানেজ করতে পারব।'

'তাহলে তাই বলুন।'

নম্বর বার করে দিলাম আমি। ফোনটাও বোধহয় আমি করলেই ভালো হত, কারণ লালমোহনবাবু 'দি সার্কাস হুইচ এসকেপ্‌ড ফ্রম দি গ্রেট ম্যাজেস্টিক টাইগার—পুডি', বলে থেমে গেলেন। ভাগিন ভদ্রলোক কথাটা খুব চোঁচিয়ে বলেছিলেন। ফেলুদা পাশের ঘর থেকে শুনতে পেয়ে দৌড়ে এসে টেলিফোনটা ওর হাত থেকে ছিনিয়ে খবরটা নিজেই দিয়ে দিল।

ফেলুদার ধরেই চা এনে দিল বুলাকিপ্ৰসাদ। আমরা আসার আগেই বাঘের হাতে চন্দ্রনের জখম হবার খবরটা ফেলুদা বুলাকিপ্ৰসাদের কাছে পেয়ে

গিয়েছিল। ফেলুদার ধারণা কারাভিকার ছাড়া এই ব্যক্তি ধরার সাধ্য কারুর নেই।

লালমোহনবাবু গরম চায়ে একটা সশব্দ চুমুক দিয়ে বললেন, 'কিছু পেলেন ও ডায়রিতে? নাকি অরুণবাবুর কথাই ঠিক?'

'আপনিই বলুন না।'

ফেলুদা একটা ডায়রি খুলে লালমোহনবাবুর দিকে এগিয়ে দিল।

লালমোহনবাবু পড়লেন 'Self elected President of club—meeting on 8.4.46'—তারপর আরেকটা পাতা খুলে পড়লেন—Tea Party at Brig. Sudarshan's আর তার পরের পাতায়—'Trial for new suit at Shakur's—4 P.M.....কী মশাই, এসব খুব তাৎপর্যপূর্ণ বৃষ্টি?'

'তোপসে, তোর কী মনে হয়?'

আমি লালমোহনবাবুর পিছন দিয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখছিলাম, এবার ডায়রিটা হাতে নিয়ে নিলাম। 'আলোর কাছে আন', বলল ফেলুদা।

টেবিল ল্যাম্পের নিচে ডায়রিটা ধরে চোখটা কাছে নিতেই একটা শিহরন খেলে গেল আমার শিরদাঁড়ায়।

বেশ বড় সাইজের ডায়রি, তার পাতার মাঝখানে ফাউনটেন পেনে ইংরিজিতে লেখা ছাড়াও অন্য লেখা রয়েছে যেটা প্রায় চোখে দেখা যায় না। পাতার একেবারে উপর দিকে ছাপা তারিখেরও উপরে, খুব সরু করে কাটা হার্ড পেনসিল দিয়ে বুদে বুদে অঙ্করে হাল্কা লেখা।

'কী দেখলি?'

'বাংলা লেখা।'

'কী লেখা?'

'এই পাতাটায় লেখা—“পাঁচের বশে বাহন ধ্বংস”।'

'সর্বনাশ', বললেন লালমোহনবাবু, 'এ যে আবার হৈয়ালি দেখছি মশাই।'

'তাতো বটেই', বলল ফেলুদা, 'এবার এটা দেখুন। এটা ১৯৩৮ অর্থাৎ প্রথম বছরের ডায়রি, আর এটাই পেনসিলে প্রথম সাংকেতিক লেখা।'

১৯৩৮-এর ডায়রির প্রথম পাতাতেই লিখেছেন ভদ্রলোক "শব্দ দুই-পাঁচের বশ।"

'শব্দটি কে?' লালমোহনবাবু প্রশ্ন করলেন।

ফেলুদা বলল, 'ভদ্রলোক নিজের বিষয় বলতে গেলে সব সময়ই শিবের কোনো না কোনো একটা নাম ব্যবহার করেছেন।'

'শিবের নামতো হল, কিন্তু দুই-পাঁচের বশ তো বোঝা গেল না।'

‘রিপু বোঝেন ?’ জিগোস করল ফেলুদা ।

‘মানে হেঁড়া কাপড় সেলাই-টোলাই করা বলছেন ?’

‘আপনি ফারসী-সংস্কৃত গুলিয়ে ফেলছেন, লালমোহনবাবু । আপনি যেটা বলছেন সেটা হল রিফু । আমি বলছি রিপু ।’

‘ওহো—খড়রিপু ? মানে শত্রু ?’

‘শত্রু । এবার মানুষের এই ছটি শত্রুর নাম করুন তো ?’

‘ভেরি ইজি । কাম ক্রোধ লোভ মদ মোহ মাৎসর্য ।’

‘হল না । অর্ডারে ভুল । কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য । অর্থাৎ দুই আর পাঁচ হল ক্রোধ আর মদ ।’

‘ওয়াভারফুল !’ বললেন লালমোহনবাবু, ‘এ তো মিলে যাচ্ছে মশাই ।’

‘এবার তাহলে প্রথমটা আরেকবার দেখুন, এটাও মিলে যাবে ।’

এবারে আমার কাছেও ব্যাপারটা সহজ হয়ে গেছে । বললাম, ‘বুকেছি, দুইয়ের বাশে বাহন ধরসে হচ্ছে, বাগের মাথায় গাড়ি ভাঙা ।’

‘ভেরি গুড’, বলল ফেলুদা, ‘তবে দুই-পাঁচ নিয়ে একটা সংকেতের এখনো সমাধান হয়নি ।’

যে ডায়েরিগুলো দেখা হয়ে গেছে, সেগুলোর বিশেষ বিশেষ জায়গায় কাগজ গুঁজে রেখেছে ফেলুদা । তারই একটা জায়গা খুলে আমাদের দেখালো । লেখাটা হচ্ছে—২০৫-X ।

লালমোহনবাবু বললেন, ‘এক্স তো মশাই আননোন কোয়ান্টিটি । ওটা বাদ দিন । আর, সব সংকেতেরই যে একটা গুরুত্বপূর্ণ মানে থাকবে সেটাই বা ভাবছেন কেন ?’

ফেলুদা বলল, ‘যেখানে একটা লোক বছরে তিনশ পঁয়ষাট দিনে মাত্র পনেরো-বিশ দিন সংকেতের আশ্রয় নিয়েছে, সেখানে কারণটা যে ঝরুরী ভাতো বোঝাই যাচ্ছে । কাজেই X-এর রহস্য আমাকে উদ্ঘাটন করতেই হবে ।’

‘ওই তারিখের কাছাকাছি কোনো লেখা থেকে কোনো হেল্প পাচ্ছেন না ?’

‘ওর দশ দিন পরে আরেকটা সংকেত আছে । দেখুন—’

এটাও আমার কাছে অসম্ভব কঠিন বলে মনে হল । লেখাটা হচ্ছে—‘অনর্গল—ঘৃতকুমারী’ ।

ফেলুদা বলল, ‘লোকটা যে কথা নিয়ে কী না করেছে তাই ভাবছি ।’

‘আপনি ধরে ফেলেছেন ?’

‘আপনিও পারবেন—একটু হেল্প করলে ।’

‘ঘৃতকুমারী তো কবরজীর ব্যাপার মশাই,’ বললেন লালমোহনবাবু ।

‘হ্যাঁ,’ বলল ফেলুদা, ‘ঘৃতকুমারীর তেল মাথায় মাখলে মাথা ঠাণ্ডা রাখে ।’

অর্থাৎ রাগ কমায় ।’

‘কিন্তু তেল অনর্গল মাথতে হয় এতো জানতুম না মশাই ।’

ফেলুদা হেসে বলল, ‘আপনি ডায়রিটা অগ্রাহ্য করছেন কেন ? ওটারও একটা মানে আছে । আর অর্গল মানে জ্বলেন তো ?’

‘কপাট । ঝিল ।’

‘এবার ওই দ্বিতীয় মানেরটার সঙ্গে একটা নেগেটিভ জুড়ে দিন ।’

‘অখিল ।’ আমি চেষ্টা করে উঠলাম । ‘তার মানে অখিলবাবু ঠাকুর ঘড়কুমারী ব্যবহার করতে বলেছিলেন ।’

‘শাবাশ । এবার পরেরটা দ্যাখ ।’

তিন পাতা পরে পড়ে দেখলাম—‘আজ থেকে পাঁচ বাদ ।’ তার মানে মহেশবাবু মদ ছেড়ে দিলেন । কিন্তু তার এক মাস বাদেই মহেশবাবু লিখছেন—‘ভোলানাথ ভোলে না । আবার পাঁচ । পাঁচেরই বিশ্বাস ।’

ফেলুদা বলল, ‘কিন্তু একটা ভুলে থাকার জন্য মহেশবাবু আবার মদের আশ্রয় নিয়েছেন । প্রশ্ন হচ্ছে—কী ভুলতে চাইছেন ?’

লালমোহনবাবু আর আমি মাথা চুলকোলাম । মহেশবাবু বলেছিলেন তাঁর জীবনে অনেক রহস্য । এখন মনে হচ্ছে কথাটা ঠাট্টা করে বলেননি ।

ফেলুদা আরেকটা জায়গায় ডায়রিটা খুলে বলল, ‘এটা খুব মন দিয়ে পড়ে দেখুন । কথা নিয়ে খেলার একটা আশ্চর্য উদাহরণ । অনেক কথা, অনেক জটিল মনের ভাব এই কয়েকটি কথার মধ্যে পূরে দেওয়া হয়েছে ।’

আমরা পড়লাম—‘আমি আজ থেকে পালক । পালক - feather = হালকা । পালক = পালনকর্তা । আজ থেকে শমির ভার আমার । শমি আমার মুক্তি ।’

শমি যে শঙ্করলাল মিত্র সেটা আমি বুঝতে পারলাম । ফেলুদা বলল, ‘শঙ্করলালকে মানুষ করার ভার বহন করতে পেরে মহেশবাবুর মন থেকে একটা ভার নেমে গেছে । এই ভারটা কিসের ভার সেইটে জানা দরকার ।’

ফেলুদা খাট থেকে উঠে কিছুক্ষণ চিন্তিত ভাবে পায়চারি করল । আমি ডায়রিগুলোর দিকে দেখছিলাম । কী অদ্ভুত লোক ছিলেন এই মহেশ চৌধুরী । বেঁচে থাকলে ফেলুদার সঙ্গে নিশ্চয়ই ভাব জমে যেত, কারণ ফেলুদারও হৈয়ালির দিকে ঝোঁক আর হৈয়ালির সমাধানও করতে পারে আশ্চর্য চটপট ।

লালমোহনবাবু খাটের এক কোণায় ভুরু কঁচকে বসেছিলেন । বললেন, ‘অখিলবাবু ভদ্রলোকের এত বন্ধু ছিলেন, ঠাকুর কবরেজী শুধু দিয়েছেন, ঠাকুর কুষ্ঠী ঘেঁটেছেন, তাঁরতো মহেশবাবুর নাড়ীনক্সা জানা উচিত । আপনি ডায়রি না ঘেঁটে তাঁকেই জেরা করুন না ।’

ফেলুদা পায়চারি থামিয়ে একটা চারমিনার ধরিয়ে বলল, 'এই ডায়রিগুলোর মধ্যে দিয়ে আমি আসল মানুষটার সঙ্গে যোগ স্থাপন করার চেষ্টা করছি। ওই পেনসিলের লেখাগুলোতে আমার কাছে মহেশ চৌধুরী এখনো বেঁচে আছেন।'

'ঔর ছেলোদের সম্বন্ধে কিছু পেলেন না ডায়রিতে?'

'প্রথম পনেরো বছরে বিশেষ কিছু নেই, তবে পরে—'

একটা গাড়ি থামল আমাদের গেটের বাইরে। ফিফাটের হর্ন। চেনা শব্দ। আমরা তিনজনে বারান্দায় এসে দেখলাম অরুণবাবু হাতে একটা প্যাকেট নিয়ে গাড়ি থেকে নামলেন।

'মিঃ সিং-এর ওখানে যাচ্ছিলাম—এক্সানকার ফরেষ্ট অফিসার,' বললেন অরুণবাবু, 'তাই ভাবলাম বীরেনের চিঠিগুলো দিয়ে যাই। চিঠি অবিশ্যি নামেই। তাও আপনি যখন চেয়েছেন...'

'আপনাকে এই অবস্থায় এত কামেলার মধ্যে ফেললাম বলে আমি অত্যন্ত মজ্জিত।'

'দ্যাটস্ অল রাইট,' বললেন অরুণবাবু 'বাবা যে কী বলতে চাইছিলেন সেটা আমার কাছে বহুস্য। দেখুন যদি আপনি বুদ্ধি খাটিয়ে কিছু বার করতে পারেন। সত্যি বলতে কী, আমি বাবার সঙ্গ খুব বেশি পাইনি। হাজারিবাগে আসি মাঝে মাঝে আমার কাজের ব্যাপারে। এককালে প্রায়ই আসতাম শিকারের জন্য। জা, বড় শিকার তো এরা বন্ধই করে দিয়েছে। কাল একটা সুযোগ পাওয়া গেছে—দেখি!....'

'কী সুযোগ?'

'যে কারণে সিং-এর কাছে যাচ্ছি। খবর এসেছে রামগড়ের বাস্তায় আজ বিকেলেই নাকি বাঘটা দেখা গেছে। এদিকে একটি ট্রেনার তো হাসপাতালে, অন্যটি মালিকের সঙ্গে ঝগড়াটিগড়া করে নিখোঁজ। আমি সিংকে বলেছি যে বাঘটাকে যদি মারতেই হয়, তো আমাকে মারতে দাও। অলরেডি তো তার দিকে গুলি চলেছে; যদি জখম হয়ে থাকে তাহলে তোহি ইন্ড এ ডেক্সারাস হীস্ট।'

আমার বলার ইচ্ছে ছিল বাঘটাকে দেখেতো জখম বলে মনে হয়নি, কিন্তু ফেলুদার ইশারাতে সেটা আর বললাম না।

'আমি তো সঙ্গে থ্রি ওয়ান ফাইভটা নিচ্ছি,' বললেন অরুণবাবু, 'কারণ এমনিতেই চারিদিকে প্যানিক। গরু ছাগলও গেছে এক-আধটা। সার্কাসের খাঁচায় বন্দী অবস্থায় বড়ো হয়ে মরার চেয়ে জঙ্গলে গুলি বেয়ে মরাটা খারাপ কিসে?—বাই হোক, আপনার ইন্টারেস্ট থাকলে আপনিও আসতে পারেন। কাল সকালে বেরোব আমরা।'

'দেখি....' বললো ফেলুদা। 'আমার এই কাজটা কতদূর এগোয় তার উপর

নিৰ্ভৰ কৰছে। ভালো কথা—'

অকণবাবু যাবাৰ জনা পা বাড়িয়েছিলেন, ফেলুদাৰ কথাই থামলেন। ফেলুদা বলল, 'সেদিন পিকনিকে আপনিহঁতো বন্দুক কুঁড়েছিলেন, তাই না?'

ভদ্ৰলোক হেসে উঠলেন। 'আপনি বোধহয় ভাবছিলেন—বন্দুক চলল, অথচ শিকার নেই কেন? গোয়েন্দাৰ মন তো! ওয়েল, আই মিসড ইট। একটা বট্টেৰ। সেয়া শিকারীৰও লক্ষ্য কি সব সময় অক্যৰ্থ হয়, মিঃ মিণ্ডেৰ?'

॥ ৯ ॥

বিলেত পেকে লেখা মহেশবাবুৰ দ্বিতীয় ছেলের চিঠিগুলো পেকে সঁচাই বিশেষ কিছু জানা গেল না। চিঠি বলতে সবই পোস্টকাৰ্ড, তার একদিকে ছবি, অন্যদিকে ঠিকানা। যেখানে ঠিকানা ছাড়াও কিছু লেখা আছে, সেখানে বোলে তার বাবাৰ দেওয়া নাম ব্যবহাৰ কৰেছে—দুৰি।

ন'টায় বুলাকিপ্ৰসাদ ডিনাৰ গ্ৰেডি কৰে আমাদেৰ ডাক দিল। ফেলুদা ডায়ৰি আৰু খাতা নিয়ে সোঁতে বসল। যে-সংকেতগুলো তৎক্ষণাৎ সমাধান হ'ছে না, সেগুলো সে নিজের খাতায় লিখে ৰাখছে। বী হাতে লিখছে, এবং দিবা লিখছে। লালমোহনবাবু একবাৰ বললেন, 'লেখা বন্ধ না কৰলে আজকের মাংসেৰ কাণিটাৰ ঠিক জাসটিস কৰতে পাৰবেন না। দুৰ্ধৰ্ষ হ'য়েছে।'

ফেলুদা বলল, 'বোদৰ সমস্যা নিয়ে পড়েছি, এখন মাংস-টাংস বলে ডিসটাৰ্ভ কৰবেন না।'

আমি লক্ষ কৰছিলাম ফেলুদাৰ ভুৰুটা সাংঘাতিক কুঁচকে রয়েছে, যদিও ঠোঁটেৰ কোণে একটা হাসিৰ আভাসও রয়েছে। জিগোস কৰতেই হল বাপাৰটা কী। ফেলুদা ডায়ৰি থেকে পড়ে শোনাল—'অগ্নিৰ উপাসকের অসীম বদানাতা। নববত্ত বোদরের হিসাবে দু হাজাৰ পা।'

লালমোহনবাবু বললেন, 'বাঁচিও পাগলাগাৱদ আছে বলে ওখানকাৰ বাসিন্দাৰাও নাকি একটু ইয়ে হয় বলে শুনিচি। সেটাও একটু মনে ৰাখবেন।'

ফেলুদা এ কথায় কোনো মন্তব্য না কৰে বলল, 'অগ্নিৰ উপাসক পাৰ্শীদেৰ বলে জানি, কিন্তু বাকিটা সম্পূৰ্ণ ধোঁয়া।'

তাতে লালমোহনবাবু বললেন যে, প্ৰথমত নববত্ত বোদৰ বলে কোনোৱকম বোদৰ হয় কিনা সে বিষয়ে ঠাৱ সন্দেহ আছে; আৰু দ্বিতীয়ত, নটা বট্টেৰ কী কৰে দু হাজাৰ পা হয়, আৰু বোদৰ কী কৰে সে হিসেবটা কৰে সেটা কোনোমতেই বোধগম্য হ'ছে না—'এইবাৰ আপনি খাতা বন্ধ কৰে একটু বিশ্রাম কৰুন।'

লালমোহনবাবু বলিলেৰ জন্য নিশ্চয়ই নয়, হয়ত চোখ আৰু মাথাটাকে একটু

ব্রেস্ট দেবার জন্য ফেলুদা খাবার পরে হাটতে বেরোল। অবিশ্যি একা নয়, আমাদের দুজনকে সঙ্গে নিয়ে।

পূর্ণিমার চাঁদ এই কিছুক্ষণ হল উঠেছে, তার গায়ের রং থেকে এখনো হলুদের ছোপটা যায়নি। আকাশে মেঘ জমেছে, তাই দেখে জটায়ু বললেন, 'চন্দ্রালোক ক্ষণস্থায়ী বলে মনে হচ্ছে।' পশ্চিম দিক থেকে মাঝে মাঝে একটা নমুকা বাতাস দিচ্ছে, আর তার সঙ্গে একটা শব্দ ডেসে আসছে যেটা ভালো করে শুনলে বোকা যায় সাকসির ব্যান্ড।

ডাইনে মোড় নিয়ে দুটো বাড়ি পরেই কৈলাস। এক সারি ইউক্যালিপটাসের ফাঁক দিয়ে বাড়িটা দেখা যাচ্ছে। দোতলায় একটা ঘরের জানালা খোলা, ঘরে আলো জ্বলছে। সেই আলোর সামনে দিয়ে কে যেন দ্রুত পায়েচারি করছে। ফেলুদারও চোখ সেইদিকে। আমরা হাঁটা থামিয়েছি। ওটা কার ঘর? প্রীতীনবাবুর। পায়েচারি করছেন নীলিমা দেবী। একবার জানালায় এসে থামলেন, আবার সরে গিয়ে পায়েচারি। অস্থির ভাব।

আমরা আলার চপ্পা শুরু করলাম। জানালাটা ক্রমে দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেল। পরপর আরো বাড়ি। প্রত্যেকটাতেই বেশ বড় কম্পাউন্ড। রেডিওতে খবর বলছে; কোন্ বাড়িতে চলছে রেডিও জ্ঞানি না। লালমোহনবাবু আরেকটা বেমানান বদীপ্রসঙ্গীত ধরতে যাচ্ছিলেন—গুনগুনানি শুনে মনে হল ধানের ক্ষেতে ব্রৌহ্মহায়ায়—এমন সময় দেখলাম দূরে একজন লোক রাস্তা দিয়ে এগিয়ে আসছে আমাদেরই দিকে। গায়ে নীল রঙের পুলোভার।

আরেকটু কাছে এলেই চিনতে পারলাম।

'আপনাদের ওখানেই যাচ্ছিলাম,' নমস্কার করে বললেন শঙ্করলাল মিশ্র। চেহারা দেখে মনে হল অনেকটা সামলে নিয়েছেন, যদিও সেই হাসিখুশি ছোলেমানুষী ভাবটা এখনো ফিরে আসেনি।

'কী ব্যাপার?' বলল ফেলুদা।

'আপনাকে একটা অনুরোধ করব।'

'কী অনুরোধ?'

'আপনি তদন্ত ছেড়ে দিন।'

হঠাৎ এমন একটা অনুরোধে দীর্ঘনিশ্বাস হকচকিয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু ফেলুদা বেশ স্বাভাবিক ভাবেই বলল, 'কেন বলুন তো?'

'এতে কারুর উপকার হবে না, মিঃ মিস্ত্রি।'

ফেলুদা একটুক্ষণ চুপ থেকে একটা হালকা হেসে বলল, 'যদি বলি আমার নিজের উপকার হবে? মনে খটকা থাকলে আমি বড় উদ্বেগ বোধ করি মিঃ মিশ্র; সেটাকে দূর না করা অবধি শান্তি পাই না। তা ছাড়া মৃত্যুশয্যা একজন

একটা কাজের ভার আমাদের দিয়ে গেছেন, সেটা না করেও আমান শান্তি নেই। এইসব কারণে আমাদের তদন্ত চালাতেই হবে। উপকার-অপকারের প্রশ্নটা এখানে খুব বড় নয়। তেরি সরি, আপনার অনুরোধ আমি বাখতে পারলাম না। শুধু তাই নয়—এই তদন্তের ব্যাপারে আমি আপনাকে অনুরোধ করব যে অ'মাকে একটু সাহায্য করুন। মহেশবাবু সম্বন্ধে আর কেউ যাই ভাবুন না কেন, আপনি তাকে শ্রদ্ধা করতেন এটা তো ঠিক ?

'নিশ্চয়ই ঠিক।' ফেলুদার কথাটা মনে ধরতে কিছুটা সময় নিল বলেই বোম্বেয় জবাবটা এল একটু পরে। কিন্তু যখন এল তখন বেশ জোরের সঙ্গেই এল। 'নিশ্চয়ই ঠিক', আবার বললেন শঙ্করলাল। তারপর তার গলার সুরটা কেমন যেন বদলে গেল। বললেন, 'যে প্রকৃষ্টি বহুদিন ধরে ক্রমে ক্রমে গড়ে ওঠে, সেটাকে কি এক ধাক্কায় ভাঙতে দেওয়া উচিত ?'

'আপনি কি সেটাই করছিলেন ?'

'হ্যাঁ, সেটাই করছিলাম। কিন্তু সেটা ভুল। এখন বুঝেছি সেটা মস্ত ভুল, আগ বুঝতে পেরে মনে শান্তি পাচ্ছি।'

'তাহলে আপনার কাছে সাহায্য আশা করতে পারি ?'

'কী সাহায্য চাইছেন বলুন,' ফেলুদার দিকে সোজাসুজি চেয়ে বেশ সহজভাবে কথাটা বললেন শঙ্করলাল।

'তার দুই ছেলের প্রতি মহেশবাবুর মনোভাব কেমন ছিল সেটা জানতে চাই। জৈধুরী পরিবার সম্বন্ধে আপনি যতটা নিরপেক্ষভাবে বলতে পারবেন, তেমন অনেকেই পারবেন না।'

শঙ্করলাল বললেন, 'আমি যেটুকু বুঝেছি তা বলছি। আমার বিশ্বাস বেশ বয়সে বীরেন ছাড়া আর কারুর উপর টান ছিল না মহেশবাবুর। অরুণদা আর প্রীতীন দুজনেই তাকে হত্যা করেছিল।'

'সেটার কারণ বলতে পারেন ?'

'সেটা পারব না, জানেন, কারণ, ওই দু ভাইয়ের সঙ্গে আমার বিশেষ যোগাযোগ ছিল না অনেকদিন থেকেই। তবে অরুণদাকে যে জুয়াঘা নেশায় পেয়েছে সে কথা আমাকে একদিন মহেশবাবু বলেছিলেন। সোজা করে বলেননি, ওর নিজস্ব ভাষায় বলেছিলেন। আমি বুঝতে পারিনি; শেষে ওকেই বুঝিয়ে দিতে হল। বললে, "অরুণ শুভ হলে আমি বুশি হতুম, বেটার হয়েই আমার চিন্তায় ফেলেছে। শুনিছি নাকি আজকাল মহাজাতি ময়দানে যাতায়াত কবছে নিয়মিত।"—বেটার তো বুঝতেই পারছেন, আর জাতি হল রেস; মহাজাতি ময়দান হল মহেশবাবুর ভাষায় রেসের মাঠ।'

ফেলুদা বলল, 'কিন্তু প্রীতীনবাবু তাঁকে হত্যা করবেন কেন ? উনি তো

ইলেকট্রনিকসে বেশ—

‘ইলেকট্রনিকস’—শঙ্করলাল যেন আকাশ থেকে পড়লেন। ‘ও কি আপনাকে এই বলেছে নাকি?’

‘ইভোভিশনের সঙ্গে ওর কোনো সম্পর্ক নেই?’

শঙ্করলাল সমালোচনা থেকে উঠলেন। ‘হাঁ, হাঁ : ইভোভিশন : খ্রীষ্টীয় একটা সময়ের, আপিসে সাধারণ চাকরি করে। সেটাও ওর স্বত্ত্বের সুপারিশ পাওয়া। খ্রীষ্টীয় ছেলে স্বরূপ নয়, কিন্তু অত্যন্ত ইমপ্রাকটিক্যাল আর খামখেয়ালী। এককালে মারিট্রা-টাইট : কপতে চেঁচা করেছে, কিন্তু সেও খুব মামুলি। ওর স্ত্রী বড়লোক ব্যপের একমাত্র মেয়ে। ও যে গাড়িটাতে এসেছে সেটাও ওর স্বত্ত্বের। আপিস থেকে দুটি পাচ্ছিল না, ‘এই আসতে দেয়া হয়েছে।’

এবার আমাদের আকাশ থেকে পড়ার পালা।

‘তার ওর পার্থিব নেশাটা খাঁটি,’ বললেন শঙ্করলাল, ‘ওতে কোনো ফাঁকি নেই।’

ফেলুদা বলল, ‘আরেকটা প্রশ্ন আছে।’

‘বলুন।’

‘সেন্নিন বাজারায় যে যোগাযোগীটির সঙ্গে আপনি কথা বলছিলেন, তিনিই কি বৈদ্যুতিক?’

হঠাৎ এ রকম একটা প্রশ্ন শুনে শঙ্করলাল পতমত বেলেও, মনে হল চট করে শানলে নিলেন। কিন্তু উত্তর যেটা দিলেন সেটা সোজা নয়।

‘আপনার যা বুদ্ধি, আমার মনে হয় ক্রমে আপনি সব কিছুই জানতে পারবেন।’

‘এটা জিগোস করার একটা কারণ আছে,’ বলল ফেলুদা। ‘যদি তিনি বীরেন হন, তাহলে মহেশবাবুর শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁকে আমার একটা জিনিস দিতে হবে। আপনি প্রয়োজনে বীরেনের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারবেন কি?’

শঙ্করলাল বললেন, ‘মহেশবাবুর শেষ ইচ্ছা যাতে পূরণ হয়, তার চেঁচা আমি করব। এটা আমি কথা দিচ্ছি। এর বেশি আর কিছু বলতে পারব না। আমার মাপ করবেন।’

কথাটা বলে শঙ্করলাল যে পথে এসেছিলেন, আবার সেই পথেই ফিরে গেলেন।

আমরা যে ছটিতে হাঁটতে বেশ অনেকখানি পথ চলে এসেছিলাম সেটা বুঝতেই পারিনি। ফেলুদা টার্চের আলোয় ঘড়ি দেখে বলল সাড়ে দশটা। আমরা ফিরতি পথ ধরলাম। কৈলাসে সব বাতি নিভে গেছে, চাঁদ ঢেকে গেছে মেঘে, মার্কার্সের বাজনাও আর শোনা যাচ্ছে না। এই থমথমে পরিবেশে ফেলুদার

'বীদর' বলে ঠেঁচিয়ে ওঠাটা এত অপ্রত্যাশিত যে লালমোহনবাবুর সঙ্গে সঙ্গে 'কোথায়' বলতে কিছুই আশ্চর্য হলাম না। আমি অবিশিষ্ট বুকেঁচিলাম যে ফেলুদা মহেশবাবুর ডায়রির বীদরের কথা বলছে। 'কী অদ্ভুত মাথা ভুল্ললোকের !' বলল ফেলুদা। 'বীদরেও যে বই লিখেছে সেটা তো যেহালই ছিল না।'

'আপনি সিমপল ফ্র্যাকচারটাকে কম্পাউন্ড ফ্র্যাকচারে পরিণত করছেন কেন বলুনতো মশাই ? শুধু বীদরে শ্যনাচ্ছে না, তার উপর আবার বই-লিখিয়ে বীদর ?'

'গিবন ! গিবন ! গিবন !' বলে উঠল ফেলুদা।

আরেকবার ! সত্যিই তো। গিবন তো একককম বীদর বটেই।

কিন্তু ফেলুদা হঠাৎ কেন জানি মুবড়ে পড়ল। বাড়ির ফটকের কাচাকাছি যখন পৌছেছি তখন চাপা গলার বলতে শুনলাম, 'সাংঘাতিক নীও মেরোছে লোকটা, সাংঘাতিক !'

'কে মশাই ?' জিগ্যাস করলেন লালমোহনবাবু।

'স্ট্যাম্প-অ্যালবাম চোর,' বলল ফেলুদা।

রাত্তি বাবেটা পর্যন্ত আমাদের ঘরে থেকে লালমোহনবাবু ফেলুদার হৈয়ালি সমাধান দেখলেন। একটা হৈয়ালির উত্তরের জন্য এগারোটার সময় কৈল্যানে ফোন করতে হল। ১৯৫১-র ১৮ই অক্টোবর মহেশবাবু লিখেছেন He passes away। তার মৃত্যু সংবাদ ডায়রিতে লেখা রয়েছে জানবার জন্য অরুণবাবুকে জিগ্যাস করে জানা গেল ওই মিনে অরুণবাবুর মা মারা গিয়েছিলেন। মা-র নাম জিগ্যাস করতে বললেন হিরণ্ময়ী। তার ফলে বেরিয়ে গেল He হল 'হি'।

১৯৫৮-তে কিছু লেখা পাওয়া গেল যেগুলো পড়লে মনে হয় ইংরিজি 'মটো'। যেমন 'Be foolish', 'Be stubborn', 'Be determined'। তারপর যখন এল 'Be leaves for England' তখন বোকা গেল Be হচ্ছে বী অর্থাৎ বীদরেন।

১৯৭৫-এর পাতায় পাওয়া গেল 'এ তিনের কল'। কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য। তিন হল লোভ। 'এ' হচ্ছে A—অরুণবাবু।

শেষ লেখা মহেশবাবুর জন্মদিনের আগের দিন। —'ফিরে আসা। ফিরে আসা'—ব্যস—তারপর আর কিছু নেই।

ডায়রি দেখা যখন শেষ হল তখন রাত একটা। ফেলুদার তখনও ঘুম আসেনি, কারণ আমি যখন লেপটা গায়ের উপর টানছি, তখন দেখলাম ও লালমোহনবাবুর দেওয়া সার্কাসের খইটা খুঁজল। উনি কথাই দিয়েছিলেন ঠর পড়া হলে ফেলুদাকে পড়তে দেবেন, আর ফেলুদার পড়া হলে আমি পড়ব।

যখন তত্ত্বার ভাব আসছে, তখন শুনলাম ফেলুদা কথা বলছে, আর সেটা আমাদেরই বলছে।—

‘কোথাও খুন হলে পুলিশে গিয়ে খুনের জায়গার একটা নকশা করে লাল বেখানে পাওয়া গেছে সেখানে একটা চিহ্ন দেয়। সে চিহ্নটা কী জিনিস?’

‘এক্স মার্কস দ্য স্পট?’ আমি জিজ্ঞেস করলাম।

‘ঠিক বলেছি। এক্স মার্কস দ্য স্পট।’

এই এক্সটাই স্বপ্নে হয়ে গেল দু হাত তোলা পা ফাঁক করা কালী মূর্তি, যেটা অরুণবাবুর দিকে চোখ রাঙিয়ে বলছে ‘তুই দুইয়ের বশ, তুই দুইয়ের বশ, তুই দুইয়ের বশ,’ আর অরুণবাবু চিৎকার করে বলাছেন ‘আমি দেখছিলাম! আমি দেখছিলাম!’ তারপরই কালীর মুখটা হয়ে গেল লালমোহনবাবুর মুখ, আর যেই সেই মুখটা বলেছে ‘এক মাসে তিন হাজার বিক্রি—ঐ ঐ—কালমোহন বেসলী!’—অমনি স্বপ্নটা ভেঙে গেল একটা শব্দে।

দরজায় ধাক্কা লাগার শব্দ। আর তার সঙ্গে একটা অবসাদবস্তির শব্দ। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে এটাও বুঝতে পারলাম।

আমার হাতটা আপনা থেকেই টেবিল ল্যাম্পের সুইচটার দিকে চলে গেল। আলো জ্বলল না। বিহায়েও যে লোডশেডিং হয় এটা বেয়াল ছিল না।

যেহেতু ধূপ করে কী একটা পড়ার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ফেলুদার গলা—

‘টচ কাল, তোপসে—আমারট’ পড়ে গেছে!’

টেবিলের উপর হাতড়ে স্রালের গলাসটাকে মাটিতে ফেলে ভেঙে তবে টচটা পেলাম। ফেলুদা ইতিমধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছে। টর্চের আলোতে তার নিখল ক্রোধটা চোখে মুখে ফুটে বেরোচ্ছে।

‘কে ছিল ফেলুদা?’

‘দেখনি, তবে অনুমান করতে পারি। লোকটা বগা।’

‘কী মতলবে এসেছিল, বলতো?’

‘চুরি।’

‘কিছু নেয়নিতো?’

‘নেয়নি, তবে নিশ্চয় নিত—যদি আমার ঘুমটা এত পাতলা না হত।’

‘কী নিত?’

ফেলুদা এ প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে কেবল বিড়বিড় করে বলল, ‘এখন দেখছি ফেলু মিস্ত্রিরই একমাত্র লোক নয় যে মহেশ চৌধুরীর সংকল্পের মানে বুঝতে পারে। যদিও এটা একটু লেটে বুঝেছে।’—

পরদিন সকালে লালমোহনবাবু সব শুনে-টুনে বললেন, 'আমি প্রথম দিনই বলেছিলাম দরজা বন্ধ করে শোবেন। এ সব জায়গায় চোর ডাকাতির উপদ্রব তো হবেই।'

'আপনি তো বাঘের ভয়ে দরজা বন্ধ করেছিলেন।'

'আর আপনি চোরের জন্য খোলা রেখেছিলেন! বন্ধ রাখলে দুটোর হাত থেকেই সেফ। ওহে কুলাকিপ্রসাদ, চটপট ব্রেকফাস্টটা দাও তাই।'

'এত তাড়া কিসের,' বলল ফেলুদা।

'বাঘ ধরা দেখতে যাকেন না?'

'ধরবে কে? কারাণ্ডিকার তো নিখোঁজ।'

'নিখোঁজ হলে কী হবে? বাঘ মারার তাল হচ্ছে সে খবর কি তার কাছে পৌঁছয়নি?—ওঃ, কী প্রিলিং ব্যাপার মশাই! এ চাল ছাড়া যায় না। আপনি ব্যাপারটা কী করে এত কামলি নিচ্ছেন জানি না।'

আটটা নাগাদ ব্রেকফাস্ট সেরে ডায়রি আর চিঠির প্যাকেট নিয়ে কৈলাসে যাবার জন্য তৈরি হয়েছি, এমন সময় অখিলবাবু এলেন। বললেন তাঁর এক হোমিওপ্যাথ বন্ধু কাছেই থাকেন, তাঁর কাছেই যাচ্ছিলেন, আমাদের বাড়ি পথে পড়ে বলে টু মেরে যাচ্ছেন।

'ঘতকুমারীতে মহেশবাবুর মাথা ঠাণ্ডা হয়েছিল?' ফেলুদা প্রশ্ন করল হালকাভাবে।

'ও বাবা! এত কথাও লিখেছে নাকি মহেশ ডায়রিতে?'

'আরও অনেক কথাই লিখেছেন।'

অখিলবাবু বললেন, 'আমার ওষুধের চেয়েও অনেক বেশি কাজ নিয়েছিল ওর মনের জোর। যাকে বলে উইল পাওয়ার। সে যে কীভাবে মদ ছাড়ল সেতো আমি নিজের চোখে দেখেছি। সেতো আর ঘতকুমারীতে হয়নি।'

'উইলের কথাই যখন ভুললেন,' বলল ফেলুদা, 'তখন বলুন তো মহেশবাবুর উইল সহজে কিছু জানেন কিনা। আমি অবিশিষ্ট দলিলের কথা বলছি, মনের জোরের কথা বলছি না।'

'ডিটেল জানি না, তবে ঐটুকু জানি যে মহেশ একবার উইল করে পরে সেটা বাতিল করে আরেকটা উইল করে।'

'আমার ধারণা ঐই দ্বিতীয় উইলে বীরেনের কোনো অংশ ছিল না।'

অখিলবাবু অবাক হয়ে বললেন, 'এটা কি ডায়রিতে পেলেন নাকি?'

‘না। এটা উনি মৃত্যুশয্যা বলে গেছেন। সংকেতটা আপনার মনে আছে কিনা জানি না। প্রথমে দুটো আঙুল সেখালেন, তারপর উই উই বললেন, আর তারপর বুড়ো আঙুলটা নাড়ালেন। দুই আঙুল যদি দুরি হয়, তাহলে ও ছাড়া আর কোনো মানে হয় না।’

‘আশ্চর্য সমাধান করেছেন আপনি,’ বললেন অখিলবাবু। ‘প্রথম উইলে বীরেনের অংশ ছিল। তার কাছ থেকে চিঠি আসা বন্ধ হবার পর পাঁচ বছর অপেক্ষা করে ছেলে আর আসবে না ধরে নিয়ে গভীর অভিমানে বীরেনকে বাদ দিয়ে মহেশ নতুন উইল করে।’

‘বীরেন ফিরে এসেছে জানলে কি আবার নতুন উইল করতেন?’

‘আমারও তাই বিশ্বাস।’

এবার ফেলুদা একটু ভেবে প্রশ্ন করল—

‘বীরেন সম্যাসী হয়ে যেতে পারে এমন কোনো সম্ভাবনা তার মধ্যে কখনো লক্ষ্য করছিলেন কি?’

‘দেখুন, বীরেনের কুষ্ঠী আমিই করি। সে যে গৃহত্যাগী হবে সেটা আমি জানতাম। তাই যদি হয় তাহলে সম্যাসী হবার সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেওয়া যায় কি?’

‘আরেকটা শেষ প্রশ্ন।—সেদিন আপনি বললেন মহেশবাবুকে খুঁজতে যাচ্ছেন অথচ আপনি এলেন আমাদের পরে। আপনি কি পথ হারিয়েছিলেন? জায়গাটা জেতেমন গোলকধাঁধা নয় কিছু।’

‘এ প্রশ্ন আপনি করবেন সে আমি জানতাম,’ মৃদু হেসে বললেন অখিলবাবু। ‘জায়গাটা গোলকধাঁধা নয় ঠিকই, তবে পথটা দুভাগ হয়ে গেছে সেটা আপনি লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়ই। মহেশকে খুঁজে পাওয়া আমার পক্ষে সহজই ছিল। কিন্তু ব্যাপার কী জানেন, বুড়ো বয়সে ছেলেবেলার স্মৃতি মাঝে মাঝে জেগে ওঠে মনে; সেই রকম একটা স্মৃতি আমাকে অন্য পথে নিয়ে যায়। সেটা আব কিছুই না; পঞ্চাশ বছর আগে ওই দিকেই একটা পাথরে আমি আমার নামের আদ্যাক্ষর আর তারিখ খোদাই করে বেধেছিলাম। গিয়ে দেখি সে পাথর এখনো আছে, আর সে খোদাইও আছে—A. B. C.; 15.5.23—বিশ্বাস না হয় আপনি গিয়ে দেখতে পারেন।’

কৈলাসে গিয়ে নূর মহম্মদের কাছে শুনলাম অকলবাবু আকস্মিৎ আগে বেরিয়ে গেছেন বাঘের সন্ধানে—‘ছোটাবাবা’ আছেন।

প্রীতীনবাবু দোতলায় ছিলেন, খবর দিতে নিচে নেমে এলেন। তাঁর হাতে চিঠি আর ডায়ারির প্যাকেট তুলে দিয়ে চলে আসছি, এমন সময় বাধা পড়ল।

নীলিমা দেবী । তিনি ঘরে ঢুকতেই গ্রীতীনবাবুর মুখ শুকিয়ে গেছে সেটা লক্ষ করলাম ।

‘আপনাকে একটা কথা বলার ছিল, মিঃ মিত্র । সেটা আমার স্বামীই বলি উচিত ছিল, কিন্তু উনি বলতে চাইছেন না ।’

গ্রীতীনবাবু তাঁর স্ত্রীর দিকে কাতরভাবে চেয়ে আছেন, কিন্তু নীলিমা দেবী সেটা গ্রাহ্য করলেন না । তিনি বলে চললেন, ‘সেদিন বাবাকে ওই অবস্থায় দেখে আমার স্বামীর হাত থেকে টেপ রেকর্ডারটা পড়ে যায় । আমি সেটা তুলে আমার ব্যাগে রেখে দিই । আমার মনে হয় এটা আপনার কাছে লাগবে । এই নিন ।’

গ্রীতীনবাবু আবার বাধা দেবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না । ফেলুদা ধন্যবাদ দিয়ে চাপটা ক্যাসেট-রেকর্ডারটা কোটের পকেটে পুরে নিল ।

গ্রীতীনবাবুকে দেখে মনে হল তিনি একেবারে ভেঙে পড়েছেন ।

আমার মন বলছিল যে বাঘ ধরার ব্যাপারে ফেলুদারও যথেষ্ট কৌতূহল আছে । গাড়িতে উঠে ও হরিপদবাবুকে যা নির্দেশ দিল, তাতে বুঝলাম আমার অনুমান ঠিক ।

লালমোহনবাবু যতটা সাহস নিয়ে বেরিয়েছিলেন, তার কিছুটা বোধহয় কমেছে, কারণ যাবার পথে একবার ফেলুদাকে বললেন, ‘ভদ্রলোকের ভেতরে অনেক বন্দুক ছিল মশাই—একটা চেয়ে নিলেন না কেন ? আপনার কোন্ট বত্রিশ এ ব্যাপারে কোনো কাজে লাগবে কি ?’

তাতে ফেলুদা বলল, ‘বাঘের গায়ে মাছি বসলে সেটা মারা চলবে ।’

সারা পথ ফেলুদা টেপ রেকর্ডারটা চালিয়ে ডল্ল্যাম কমিয়ে কানের কাছে ধরে রইল । কী শুনল ওই জানে ।

কাল রাত্রে বৃষ্টি হওয়াতে রাস্তায় অনেক জায়গাই ভিজে ছিল । বড় রাস্তা থেকে একটা মোড়ের কাছে এসে কাঁচা মাটিতে টায়ারের দাগ দেখে বুঝলাম কিছু গাড়ি সেন রোড থেকে বেকে ওই দিকেই গেছে । আমরাও বাঁয়ের রাস্তা নিলাম, আর মাইল খানেক গিয়েই দেখলাম রাস্তার বাঁ ধারে একটা বটগাছের পাশে তিনটে তিনরকম গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে—একটা বন বিভাগের জীপ, একটা অক্লেশবাবুর ফিয়াট আর একটা বাঘের বাঁচাসমেত সার্কাসের ট্রাক । পাঁচজন লোক গাছটার ডলায় বসে ছিল, তারা বলল আধঘণ্টা হুস বাঘ খোঁজার দল বনের ভিতর চলে গেছে । কোনদিকে গেছে সেটাও দেখিয়ে দিল । লোকগুলোর মধ্যে একটাকে সেদিন সার্কাসের ভাঁবুতে দেখেছি ; ফেলুদা তাকেই জিগ্যেস করল ট্রেনারও এসেছে কিনা । লোকটা বলল যে দ্বিতীয় ট্রেনার চন্দ্রন এসেছে ।

আমরা রওনা দিলাম । সামনে কী অভিজ্ঞতা আছে জানি না, তবে এইটুকু

জানি যে অকশবাবুর হাতে বন্দুক আছে, হয়ত বন বিভাগের শিকারীর হাতেও আছে, কাজেই ভয়ের কোনো কারণ নেই। লালমোহনবাব মনে হল একটু মুগ্ধে পড়েছেন তার কারণ নিশ্চয়ই কারাধিকারের বদলে চক্রনের আসা।

ভিজে মাটিতে মাঝে মাঝে অস্পষ্ট পায়ের ছাপ গাইড হিসেবে কাজ করেছে। বন ঘন নয়, শীতকালে আগছাও কম, তাই এগোতে কোনো অসুবিধে হচ্ছিল না। এর মধ্যে দু' একবার ময়ূর ডেকে উঠেছে; সেটা যে বাঘের সংকেত হতে পারে সেটা আমরা সবাই জানি।

মিনিট দশেক চলার পর শব্দটা পেলাম।

বাঘের ডাক, তবে গর্জন বলব না। ইংরিজিতে এটাকে গ্রাউল বলে, বাঙলায় হয়ত গোঙানি, কিংবা গরগরানি বা গজগজানি। ঘন ঘন ডাক, আর বিরতির ডাক, বিক্রমের নয়।

আরো কয়েক পা এগিয়ে যেতেই দুটো গাছের ফাঁক দিয়ে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেলাম। অদ্ভুত কেননা এ জিনিস সার্কাসের বাইরে কখনো যে দেখতে পাব এটা স্বপ্নেও ভাবিনি।

আমাদের সামনে বাঁয়ে তিনজন লোক দাঁড়িয়ে আছে, তাদের দুজনের হাতে বন্দুক। একটা বন্দুক অকশবাবুর হাতে, সেটা উঁচিয়ে তাক করা আছে সামনের দিকে।

এই তিনজনের পিছনে একটা খোলা জায়গা, যেটাকে বলা যেতে পারে সার্কাসের রিং। এই রিং-এর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ডান হাতে চাবুক আর বাঁ হাতে একটা গাছের ডাল নিয়ে একটা লোক। বাঁ কঁধে ব্যান্ডেল দেখে বুঝলাম ইনিই হলেন ট্রেনার চন্দ্রন। আমার দিকে পিছন ফিরে হাতের চাবুকটা মাঝে মাঝে সঙ্গাৎ করে মাটিতে মেরে চন্দ্রন ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে যার দিকে সে হল আমাদের কালকের দেখা গ্রেট ম্যাজেস্টিক সার্কাস থেকে পালানো বাঘ সুলতান।

এ ছাড়া আরো চারজন লোক দাঁড়িয়ে আছে বাঁয়ে একটু দূরে, তাদের দুজনের হাতে যে শিকলটা রয়েছে সেটাই নিশ্চয়ই বাঘকে পরানো হবে, যদি সে ধরা দেয়।

সবচেয়ে অদ্ভুত লাগল সুলতানের হাবভাব। সে পালানোর কোনো চেষ্টা করছে না, অথচ ধরা দেবারও যেন বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই। শুধু তাই নয়, তার চোখে মুখে যে রাগ আর অবজ্ঞার ভাবটা ফুটে উঠেছে সেটা সে বার বার বুঝিয়ে দিচ্ছে টাপা গর্জনে।

চন্দ্রন যদিও এক পা এক পা করে এগোচ্ছে বাঘটার দিকে, তাকে দেখে মনে হয় না যে তার নিজের উপর সম্পূর্ণ আস্থা আছে। সে যে একবার স্তব্ধ হয়েছে এই বাঘেরই হাতে সেটা সে নিশ্চয়ই ভুলতে পারছে না।



আমি আড়চোখে মাঝে মাঝে দেখছি অরুণবাবুর দিকে । তিনি যেভাবে বন্দুক উচিয়ে স্থির লক্ষ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, বেশ বুঝতে পারছি সুলতান যেসামান্য কিছু করলেই বন্দুক গর্জিয়ে তাঁর তাকে হুশিয়ারী করে দেবে । আমার খী পাশে দু পা সামনে ফেলুদা পাথরের মতো দাঁড়ানো ডাইনে লালমোহনবাবু, তাঁর মুখ এমনভাবে হ্রী হয়ে রয়েছে যে মনে হয় না চোয়াল আর কোনেদিনও উঠবে । (ভদ্রলোক পড়ে বলেছিলেন যে তাঁর ছেলেরা যেন তিনি খণ্ড সাক্ষ্যে মৃত ব্যক্তির খেলা দেখেছিলেন, তার সমস্ত স্মৃতি নাকি মুছে গেছে আজকের হাজারিবাগের বনের মাধ্যমে দেখা এই সাক্ষ্যে) ।

চন্দ্রন গগন পাঁচ হাতের মধ্যে, তখন সুলতান হঠাৎ তার সমস্ত আঙ্গোশ্বী টান করে শরীরটা একটু নিচু করল, আর ঠিক সেই মুহূর্তে ফেলুদা একটা নিশেদ লাফে অরুণবাবুর ধারে পৌঁছে গিয়ে তাঁর বন্দুকের নলের উপর হাত রেখে মৃদু চাপে সেটাকে নামিয়ে দিল ।

‘সুলতান !’

গুরুগম্ভীর ডাকটা এসেছে আমাদের ডান দিক থেকে । যিনি ডাকটা দিয়েছেন, তাঁকে আগে থেকে দেখতে পেয়েই যে ফেলুদা এই কাজটা করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই ।

‘সুলতান ! সুলতান !’

গম্ভীর স্বরটা নরম হয়ে এল । অবাক হয়ে দেখলাম রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হলেন রিং-মাস্টার কারাগতিকার ; ঐরও হাতে চাবুক, পরনে সাধারণ প্যান্ট আর শার্ট । গলা অনেকখানি নামিয়ে নিয়ে পোষা কুকুর বা বেড়ালকে যেমন ভাবে ডাকে, সেই ভাবে ডাকতে ডাকতে কারাগতিকার এগিয়ে গেলেন সুলতানের দিকে ।

চন্দ্রন হতভম্ব হয়ে পিছিয়ে গেল । অরুণবাবুর বন্দুক ধীরে ধীরে নামে গেল । বন বিভাগের কর্তার মুখ লালমোহনবাবুর মুখের মতোই হ্রী হয়ে গেল । বনের মধ্যে এগারো জন হতবাক দর্শক দেখল গ্রেট ম্যাজেস্টিক সাক্ষ্যের রিং-মাস্টার কী আশ্চর্য কৌশলে পালানো বাঘকে বশ করে তার গলায় চেন পরিয়ে দিল, আর তারপর সেই চেন ধরে সুলতানকে জঙ্গলের মধ্যে থেকে বার করে নিয়ে এল একেবারে সাক্ষ্যের খাঁচার কাছে । তারপর খাঁচার দরজা খুলে তার বাইরে টুল রেখে দিল সাক্ষ্যের লোক, আর কারাগতিকার চাবুকের এক আছাড়ের সঙ্গে সঙ্গে ‘আপু !’ বলতেই সেই বাঘ তীরবেগে ছুটে গিয়ে টুলে পা দিয়ে আবার সাক্ষ্যের খাঁচায় বন্দী হয়ে গেল ।

আমরা একটু দূরে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখছিলাম ; বাঘ খাঁচায় বন্দী হওয়া মাত্র কারাগতিকার আমাদের দিকে ফিরে একটা সেলাম ঠুকল । তারপর সে একটা গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল । এটা একটা প্রাইভেট ট্যাক্সি, আগে ছিল না ।

কাঁড়টা চলে যাবার পর অরুণবাবুকে বলতে শুনলাম, 'ব্রিলিয়ান্ট'। তারপর ফেলুদার দিকে ফিরে বললেন, 'থাকস'।

১১১

কৈলাসে ফিরে এসে ফেলুদা প্রথমে অরুণবাবুর অনুমতি নিয়ে একটা টেলিফোন করল, কাকে জানি না। তারপর বৈঠকখানায় এল, যেখানে আমরা সবাই বসেছি। মীলিমা দেবী চা পাঠিয়ে দিয়েছেন। ঠাণ্ডা তিনজনকে কলকাতা ফিরে যাচ্ছেন। মহেশবাবুর শ্রদ্ধা কলকাতাতেই হবে। অরুণবাবুকে বাঘের খবরটা দেওয়াতে তিনি ঘটনাটা দেখতে পেলেন না বলে খুব আপসোস করলেন।

'আমিও ভাবছি কালই বেরিয়ে পড়ব,' বললেন অরুণবাবু, 'অবিশি যদি আপনার তদন্ত শেষ হয়ে থাকে।'

ফেলুদা জানাল সব শেষ।—'আপনার শিত্তদেবের শেষ ইচ্ছা পালনেও কোনো বাধা নেই। সে ব্যবস্থাও হয়ে গেছে।'

অরুণবাবু চায়ের কাপ থেকে দৃষ্টি তুললেন।

'সে কি, বীরেন্নের স্মৃতি পেয়ে গেছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার বাবা ঠিকই অনুমান করেছিলেন।'

'মানে?'

'তিনি এখানেই আছেন।'

'হাজারিবাগে?'

'হাজারিবাগে।'

'সুবই আশ্চর্য লাগছে আপনার কথাটা শুনে।'

আশ্চর্য লাগার সঙ্গে যে একটা অবিশ্বাসের ভাবও মিশে আছে সেটা অরুণবাবুর কথার সুরেই বোকা গেল। ফেলুদা বলল 'আশ্চর্য তো হবাবই কথা, কিন্তু আপনারও এ রকম একটা সন্দেহ হয়েছিল, তাই নয় কি?'

অরুণবাবু হাতের কাপটা নামিয়ে সোজা ফেলুদার দিকে চাইলেন।

'শুধু তাই নয়,' ফেলুদা বলে চলল, 'আপনার মনে এমনও ভয় ঢুকেছিল যে মহেশবাবু হয়ত আবার নতুন উইল করে আপনাকে বাদ দিয়ে বীরেন্নকে তাঁর সম্পত্তির ভাগ দেবেন।'

ঘরের মধ্যে একটা অদ্ভুত ধমধমে ডাব। লালমোহনবাবু আমার পাশে বসে সোফার একটা কুশন খামচে ধরেছেন। প্রীতীনবাবুর মাথায় হাত। অরুণবাবু উঠে দাঁড়িয়েছেন—তাঁর চোখ লাল, তাঁর কপালের রং ফুলে উঠেছে।

‘শুনুন মিঃ মিস্ত্রি,’ গর্জিয়ে উঠলেন অরুণবাবু, ‘আপনি নিজেকে যত বড়ই গোয়েন্দা ভাবুন না কেন, আপনার কাছ থেকে এমন মিথ্যা, অমূলক, ভিত্তিহীন অভিযোগ আমি বরদাস্ত করব না।—জগৎ সিং!’

পিছনের দরজা দিয়ে বেয়ারা এসে দাঁড়াল।

‘আর একটি পা এগোবে না ভূমি!’—ফেলুদার হাতে বিভলভার, সেটার লক্ষ্য অরুণবাবুর পিছনে জগৎ সিং-এর দিকে।—‘ওর মাথার একগাছা চুল কাল ব্রাডে আমার হাতে উঠে এসেছিল। আমি জানি ও আপনারই আচ্ছা পালন করতে এসেছিল আমার ঘরে। ওর মাথার খুলি উড়ে যাবে যদি ও এক পা এগোয় আমার দিকে!’

জগৎ সিং পাথরের মতো দাঁড়িয়ে বইল।

অরুণবাবু কঁপতে কঁপতে বসে পড়লেন সোফাতে।

‘আ-আপনি কী বলতে চাইছেন?’

‘শুনুন সেটা মন দিয়ে,’ বলল ফেলুদা, ‘আপনি উইল টেক করার ব্যস্তা বন্ধ করার জন্য আপনার বাবার চাবি লুকিয়ে রেখেছিলেন। বিবি দেখেছিল মহেশবাবুকে চাবি ঝুঁজতে। মহেশবাবু হেয়ালি করে তাঁর নাতনীকে বলেছিলেন তিনি কী হারিয়েছেন, কী ঝুঁজছেন। এই কী হল Key—অর্থাৎ চাবি। কিন্তু চাবি সরিয়েও আপনি নিশ্চিন্ত হননি। ওই আপনি সেদিন রাজরাজায় সুযোগ পেয়ে আপনার মোক্ষম অস্ত্রটি প্রয়োগ করেন আপনার বাবার উপর। আপনি জানতেন সেই অস্ত্রে মৃত্যু হতে পারে—এবং সেটা হলেই আপনার কার্যসিদ্ধি হবে—’

‘পাগলের প্রলাপ! পাগলের প্রলাপ বকছেন আপনি!’

‘সাক্ষী আছে, অরুণবাবু—একজন নয়, তিনজন—যদিও তাঁরা কেউই সাহস করে সেটা প্রকাশ করেননি। আপনার ভাই সাক্ষী—অখিলবাবু সাক্ষী—শঙ্করলাল সাক্ষী।’

‘সাক্ষী যেখানে নির্বাক, সেখানে আপনার অভিযোগ প্রমাণ করছেন কী করে, মিঃ মিস্ত্রি?’

‘উপায় আছে, অরুণবাবু। তিনজন ছাড়াও আরেকজন আছে যে নির্দিষ্ট সমস্ত সত্য ঘটনা উদ্ঘাটন করবে।’

কৈলাসের বৈঠকখানায় পাখির ডাক কেন? জলপ্রপাতের শব্দ কেন?

অবাক হয়ে দেখলাম ফেলুদা তার কোটের পকেট থেকে খ্রীষ্টীনবাবুর ক্যাসেট রেকর্ডার বার করেছে।

‘সেদিন একটি ঘটনা দেখে এবং কয়েকটি কথা শুনে বিহ্বল হয়ে খ্রীষ্টীনবাবু হাত থেকে এই যন্ত্রটা ফেলে দেন। নীলিমা দেবী এটা কুড়িয়ে নেন। এই যন্ত্রে পাখির ডাক ছাড়াও আরো অনেক কিছু রেকর্ড হয়ে গেছে, অরুণবাবু!’

এইবারে দেখলাম অরুণবাবুর মুখ ক্রমে লাল থেকে ফ্যাকাসের দিকে চলেছে । ফেলুদার জান হাতে রিভলভার, বাঁ হাতে টেপ রেকর্ডার ।

পাখির শব্দ ছাণিয়ে মানুষের গলা শোনা যাচ্ছে । ক্রমে এগিয়ে আসছে গলার স্বর, স্পষ্ট হয়ে আসছে । অরুণবাবুর গলা—

‘বাবা, বীক কিরে এসেছে এ ধাবণা তোমার হল কী করে ?’

তারপর মহেশবাবুর উত্তর—

‘বুড়ো ক্যাপের যদি তেমন ধারণা হয়েই থাকে, তাতে তোমার কী ?’

‘তোমার এ বিশ্বাস মন থেকে দূর করতে হবে । আমি জানি সে আসেনি, আসতে পারে না । অসম্ভব ।’

‘আমার বিশ্বাসেও তুমি হস্তক্ষেপ করবে ?’

‘হ্যাঁ, করব । কারণ বিশ্বাসের বশে একটা অন্যায় কিছু ঘটে যায় সেটা আমি চাই না ।’

‘কী অন্যায় ?’

‘আমার যা পাওনা তা থেকে বঞ্চিত করতে দেব না তোমাকে আমি ।’

‘কী বলছ তুমি !’

‘ঠিকই বলছি । একবার উইল বদল করেছ তুমি বীক আসবে না ভেবে । তারপর আবার—’

‘উইল আমি এমনিও চেষ্টা করতাম !’—মহেশবাবুর গলার স্বর চড়ে গেছে । তার পুরানো রাগ যেন আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে । তিনি বলে চলেছেন—

‘তুমি আমার সম্পত্তির ভাগ পাবার আশা কর কী করে ? তুমি অসহ, তুমি জুয়াড়ী, তুমি চোর !—সজ্জা করে না ? আমার আলমারি থেকে দোরবেচীর সেওয়া স্ট্যান্স আলবাম—’

মহেশবাবুর বাকি কথা অরুণবাবুর কথায় ঢাকা পড়ে গেল । তিনি উদ্ভ্রাণের মতো টেচিয়ে উঠেছেন—

‘আর তুমি ? আমি যদি চোর হই তবে তুমি কী ? তুমি কি ভেবেছ আমি জানি না ? দীনদয়ালের কী হয়েছিল আমি জানি না ? তোমার চিংকারে আমার দুঃখ ভেঙে গিয়েছিল । সব দেখেছিলাম আমি পদার ফাঁক দিয়ে । পয়ত্রিশ বছর আমি মুখ বন্ধ রেখেছি । তুমি দীনদয়ালের মাথার বাড়ি মেরেছিলে পিতলের বুদ্ধমূর্তি দিয়ে । দীনদয়াল মরে যায় । তারপর নূর মহম্মদ আর ড্রাইভারকে দিয়ে গাড়িতে করে তার লাশ—’

এর পরেই একটা ক্লপ শব্দ, আর কথা বন্ধ । তারপর শুধু পাখির ডাক আর জলের শব্দ ।

টেপ রেকর্ডার বন্ধ করে সেটা খ্রীষ্টানবাবুকে ফেরত দিয়ে দিল ফেলুদা ।

মিনিটখানেক সকলেই চুপ, আর সকলেই কাঠ, এক ফেলুলা ছাড়া ।

ফেলুলা হিউলভার ১'৮'৮" নিম্ন পকেটে । তারপর বলল, 'আপনার বাবা গর্হিত কাজ করেছিলেন, সামাজিক অন্যায় করেছিলেন, সেটা ঠিক, কিন্তু তাঁর জন্য তিনি পঁয়ত্টিশ বছর যত্নশীল ভোগ করেছেন, যত্ন বকসে পেয়েছেন প্রায়শ্চিত্ত করেছেন । তবুও তিনি শাস্তি পাননি । যেদিন সেই ঘটনা ঘটে, সেইদিন থেকেই তাঁর ধারণা হয়েছে যে, তাঁর জীবনটা অভিশপ্ত, তাঁর অন্যায়ের শাস্তি তাঁকে একদিন না একদিন পেতেই হবে । অবিশিষ্ট সেই শাস্তি এভাবে তাঁর নিজের ছেলের হাত থেকে আসবে, সেটা তিনি ভেবেছিলেন কিনা জানি না ।'

অরুণবাবু পাথরের মতো বসে আছেন মোকের বাঘছাগটার দিকে একনুঠে চেয়ে । যখন কথা বললেন, তখন মনে হল তাঁর গলায় স্বরটা আসছে অনেক দূর থেকে ।

'একটা কুকুর ছিল । আইরিশ টেরিয়ার । বাবার খুব প্রিয় । নীনদয়ালকে দেখতে পারত না কুকুরটা । একদিন কামড়াতো মাথা । নীনদয়াল লাঠির বাড়ি মাঝে । কুকুরটা ভুখ হয় । বাবা ফেব্রেন বাড়িরে—পাটি থেকে । কুকুরটা ঠিক ঘরেই অপেক্ষা করত । সেদিন ছিল না । নূর মহম্মদ ঘটনাটা বলে । বাবা নীনদয়ালকে ডেকে পাঠান । বাগাল কাটা আর মানুষ থাকতেন না—'

ফেলুলা সঙ্গে আঘরাও উঠে পড়লো । অখিলবাবুও উঠলেন দেখে ফেলুলা বলল, 'আপনি একটা আঘ্রাসের সঙ্গে আসতে পারেন কি ? কাঠ ছিল ।'

'চলুন', বললেন ভদ্রলোক, 'মহেশ চলে গিয়ে আমার প্রো এখন অমণ্ড অবসর ।'

॥ ১২ ॥

গাড়িতে অখিলবাবু বললেন— 'আমার নাম লেখা পাথরটার পাশে দাঁড়িয়েই আমি ওদের কথা শুনতে পাই । তাঁকে অনেক সময় জিগ্যেস করেছি সে হঠাৎ হঠাৎ এত অনামনস্ব হয়ে পড়ে কেন । সে ঠাট্টা করে বলত—'জু্মি শুনে বার কর, আমি বলব না ।' আশ্চর্য—তাঁর জীবনের এত বড় একটা ঘটনা—সেটা কুটীতে ধরা পড়ল না কেন বুঝতে পারছি না । হয়ত আমারই অক্ষমতা ।'

বাড়ির কাছাকাছি যখন পৌঁছেছি তখন বুঝতে পারলাম ফেলুলা কাকে ফোন করেছিল ।

ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন শঙ্করলাল মিশ্র ।

'আপনার মিশন সাকসেসফুল ?' গাড়ি থেকে নেমে জিগ্যেস করল ফেলুলা ।

'হ্যাঁ', বললেন শঙ্করলাল, 'বীরেন এসেছে ।'

আমরা বৈঠকখানায় ঢুকতে সেই গেলিয়াখারী সম্মাসী সোফা ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে নমস্কার করলেন। লম্বা চুল, কক্ষ লম্বা দাড়ি, লম্বা বলিষ্ঠ চেহারা।

‘বাপের শেষ ইচ্ছার কথা শুনে বীরেন আসতে রাজি হল,’ বললেন শঙ্করলাল, ‘মহেশবাবুর উপর কোনো আক্রোশ নেই ওর।’

‘যেমন আক্রোশ নেই, তেমনি আকর্ষণও নেই,’ বললেন বীরেন-সম্মাসী। ‘শঙ্কর এবার অনেক চেষ্টা করেছিল আমাকে ফিরিয়ে আনতে। বলেছিল— ওদের দেখলে তোমার টানটা হয়ত ফিরে আসবে। ওর কথাতেই আমি বাজরাঘায় গিয়েছিলাম সেদিন। কিন্তু দূর থেকে দেখেই আমি বুঝেছিলাম আমার আত্মীয়দের উপর আমার কোনো টান নেই। বাবা তবু আমাকে কিছুটা বুঝেছিলেন, তাই প্রথম প্রথম ঠেকে চিঠিও লিখেছি। কিন্তু তারপর—’

‘কিন্তু সে চিঠি তো আপনি বিদেশ থেকে লেখেননি,’ বলল ফেলুদা, ‘আমার বিশ্বাস আপনি দেশের বাইরে কোথাও যাননি কোনোদিন।’

বীরেনবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ হেনে ফেললেন। আমি হতভম্ব, কী যে হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছি না।

‘শঙ্কর আমাকে বলেছিল আপনার বুদ্ধির কথা,’ বললেন বীরেনবাবু, ‘তাই আপনাকে একটু পরীক্ষা করছিলাম।’

‘তাহলে আর কী। খুলে ফেলুন আপনার অতিরিক্ত সাজ পোশাক। হাজারিবাগের বাস্তার লোকের পক্ষে ওটা যথেষ্ট হলেও আমার পক্ষে নয়।’

বীরেনবাবু হাসতে হাসতে তাঁর দাড়ি আর পরচুলা খুলে ফেললেন। লালমোহনবাবু আমার পাশ থেকে চাপা গলায় ‘কান্—কান্—কান্’ বলে খেঁচা গেলেন। আমি জানি তিনি আবার ভুল নামটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু এবার বললেও আর শুধরোতে পারতাম না, কারণ আমার মুখ দিয়েও কথা বেরোচ্ছে না। কথা বললেন অখিলবাবু, ‘বীরেন বাইরে যায়নি মানে? ওর চিঠিগুলো তাহলে—?’

‘বাইরে না গিয়েও বিদেশ থেকে চিঠি লেখা যায় অখিলবাবু, যদি আপনার ছেলের মতো একজন কেউ বন্ধু থাকে বিদেশে, সাহায্য করার জন্য।’

‘আমার ছেলে!’

‘ঠিকই বলেছেন মিস্টার মিস্ত্রি,’ বললেন বীরেন কারাণ্ডিকার, ‘অধীর যখন ডুসেলডর্ফে, তখন ওকে চিঠি লিখে আমি বেশ কিছু ইউরোপীয় পোস্টকার্ড আনিতে নিই। সেগুলোতে ঠিকানা আর যা কিছু লিখবার লিখে খামের মধ্যে ভরে ওর কাছেই পাঠাতাম, আর ও টিকিট লাগিয়ে ডাকে ফেলে দিত। অবিশ্যি অধীর দেশে ফিরে আসার পর সে সুযোগটা বন্ধ হয়ে যায়।’

‘কিন্তু এই লুকোচুরির প্রয়োজনটা হল কেন?’ জিজ্ঞেস করলেন অখিলবাবু।

‘কারণ আছে’ বলল ফেলুদা । ‘আমি বীরেনবাবুকে জিজ্ঞেস করতে চাই আমার অনুমান ঠিক কিনা ।’

‘বলুন ।’

‘বীরেনবাবু কর্নেল সুরেশ বিশ্বাসের জীবনী পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন, এবং তাঁর মতো হতে চেয়েছিলেন । সুরেশ বিশ্বাস যে ঘর ছেড়ে খালসী হয়ে বিদেশে গিয়ে শেষে ব্রিজিলে যুদ্ধ করে নাম করেছিলেন সেটা আমার মনে ছিল । যেটা মনে ছিল না সেটা আমি কাল রাতে বাঙালীর সাকসি বলে একটা বই থেকে জেনেছি । সেটা হল এই যে সুরেশ বিশ্বাস ছিলেন প্রথম বাঙালী যিনি বাঘ সিংহ ট্রেন করে সাকসির খেলা দেখিয়েছিলেন । তাঁর সবচেয়ে আশ্চর্য খেলা ছিল সিংহের মুখ ফাঁক করে তার মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দেওয়া ।’

এখানে লালমোহনবাবু কেন জানি ভীষণ ছটফট করে উঠলেন ।

‘ও মশাই ! হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ এই সেদিন পড়লুম, তাও খেয়াল হল না, হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ...’

‘আপনি ছাছটা পরে করবেন, আগে আমাকে বলতে দিন ।’

ফেলুদার ধমকে লালমোহনবাবু ঠাণ্ডা হলেন । ফেলুদা বলে চলল, ‘বীরেনবাবুর আশ্বিন ছিল আসলে বাঘ সিংহ নিয়ে খেলা দেখানো । কিন্তু বাঙালী ভদ্রঘরের ছেলে আজকের দিনে ওদিকে যেতে চাইছে ওনলে কেউ কি সেটা ভালো চোখে দেখত ? মহেশবাবুই কি খুশি মনে মত দিতেন ? তাই বীরেনবাবুকে কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়েছিল । তাই নয় কি ?’

‘সম্পূর্ণ ঠিক,’ বললেন বীরেনবাবু ।

‘কিন্তু আশ্চর্য এই যে, আদিনি পরে ছেলেকে রিং-মাস্টার হিসেবে সেখান থেকে মহেশবাবু তাকে চিনতে পেরেছিলেন, যদিও অরুণবাবু সামনে থেকে সেখান চিনতে পারেননি । সেটার কারণ এই যে বীরেনবাবুর নাকে প্লাস্টিক সাজারি করানো হয়েছিল, যে কারণে ছেলেবেলার ছবির সঙ্গেও নাকের মিল সামান্যই ।’

‘তাই বলুন ।’ বলে উঠলেন অখিলবাবু, ‘তাই ভাবছি সবাই বীরেন বীরেন করছে, অথচ আমি সঠিক চিনতে পারছি না কেন !’

‘যাক গে,’ বলল ফেলুদা, ‘এখন আসল কাজে আসি ।’

ফেলুদা পকেট থেকে মুগ্ধানন্দের ছবিটা বাব করল । তারপর বীরেনবাবুর দিকে ফিরে বলল, ‘আপনি বোধহয় জানেন না যে, আপনি আর ফিরবেন না ভেবে মহেশবাবু আপনাকে তাঁর উইল থেকে বাদ দিয়েছিলেন । সেই উইল আর বদল করার উপায় ছিল না । অথচ আপনি একেবারে বঞ্চিত হন সেটাও উনি চাননি । তাই এই ছবিটা আপনাকে দিয়েছেন ।’

ফেলুদা ছবিটা উলটে পিছনটা খুলে ফেলল । ভিতর থেকে বেরোল একটা

ভাঁজ করা সেলোফেনের খাম, তার মধ্যে ছোট ছোট কতগুলো রঙিন কাগজের টুকরো।

‘তিনটি মহাদেশের ন’টি দুখাপা ডাকটিকিট আছে এখানে। অ্যালবাম চুরি যেতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি তাঁর সবচেয়ে মূল্যবান স্ট্যাম্প ক’টি এইভাবে লুকিয়ে রেখেছিলেন। গিবন্স ক্যাটাগোরি হিসেবে পঁচিশ বছর আগে এই ডাকটিকিটের দাম ছিল দু’ হাজার পাউন্ড। আমার ধারণা আজকের দিনে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা।’

বীরেন্দ্র কারাণ্ডিকার খামটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ দেখলেন সেটার দিকে। তারপর বললেন, ‘সার্কাসের রিং-মাস্টারের হাতে এ জিনিস যে বড় বেমানান, মিঃ মিস্ত্রি! আমি খুব অসহায় বোধ করছি। আমরা যাযাবর, ঘুরে ঘুরে খেলা দেখিয়ে বেড়াই, আমাদের কাছে এ জিনিস...?’

‘বুঝতে পারছি,’ বলল ফেলুদা, ‘এক কাজ করুন। শুটা আমাকেই দিন। কলকাতার কিছু স্ট্যাম্প ব্যবসায়ীর সঙ্গে চেনা আছে আমার। এর জন্য যা মূল্য পাওয়া যায় সেটা আমি আপনাকে পাঠিয়ে দেব। আমার উপর বিশ্বাস আছেতো আপনার?’

‘সম্পূর্ণ।’

‘কিন্তু আপনার ঠিকানাটা যে আমাকে দিতে হবে!’

‘গ্রেট ম্যাজেস্টিক সার্কাস,’ বললেন বীরেন্দ্রবাবু, ‘কুড়ি বুঝেছে যে আমাকে ছাড়া তার চলবে না। আমি এখনো কিছুদিন আছি এই সার্কাসের সঙ্গে। আজ রাতে সুলতানকে নিয়ে খেলা দেখাব। আসবেন।’

★

রাতে গ্রেট ম্যাজেস্টিক সার্কাসে সুলতানের সঙ্গে কারাণ্ডিকারের আশ্চর্য খেলা দেখে বেরোবার আগে আমরা বীরেন্দ্রবাবুকে খ্যাত ইউ আর শুড বাই জানাতে তাঁর ভাবুতে গেলাম। আইডিয়াটা লালমোহনবাবুর, আর কারণটা বুঝতে পারলাম তাঁর কথায়।

‘আপনার নামটার মধ্যে একটা আশ্চর্য কাণ্ডকারখানা রয়েছে,’ বললেন জটায়ু, ‘ডু ইউ মাইন্ড যদি আমি নামটা আমার সামনের উপন্যাসে ব্যবহার করি? সার্কাস নিয়েই গল্প, রিং-মাস্টার একটা প্রধান চরিত্র।’

বীরেন্দ্রবাবু হেসে বললেন, ‘নামটাতো আমার নিজের নয়! আপনি স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে পারেন।’

ধন্যবাদ জানিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসার পর ফেলুদা বলল, 'তাহলে ইনজেকশন বাদ ?'

'বাদ কেন মশাই ? ইনজেকশন দিচ্ছে বাঘকে । ভিলেন হচ্ছে সেকেন্ড ট্রেনার । বাঘকে নিশ্চেষ্ট করে কারাগারিকে ডাউন করবে দর্শকদের সামনে ।'

'আর ট্র্যাপীজ ?'

'ট্র্যাপীজ ইজ নাথিং,' অবস্থা আর বিরক্তি মেশানো সুরে বললেন লালমোহন গাঙ্গুলী ।

গোয়েন্দা ফেঙ্গুদার
রহস্য
অ্যাডভেঞ্চার

হত্যাপ্রবো

অ্যাড্‌জিৎ ব্রায়



ডুংকর কথা

ডুংকর পাশেই শিশির ভেজা ঘাসের উপর বাজনাটা রেখে শুধু-গলার গান ধরল। ওর কান ভাল, তাই দুদিন শুনেই তুলে নিয়েছে গানটা। হনুমান ফটকের বাইরে বসে যে ভিথিরি গানটা গায়, সে অবিশ্যি সঙ্গে সঙ্গে বাজনাও বাজায়। তাই ডুংকর শখ হয়েছিল সেও বাজাবে। এই বাজনাটা সবজিওয়ালা শ্যাম গুরুজের। ডুংকর একবেলার জন্য জেয়ে এনে রেখে দিয়েছে তিনদিন। ছড় টেনে সুর বার করা যে এত শক্ত তা কি ও জানত?

ডুংকর গলা ছাড়ল। সামনে ভুট্টা খেতের ওপরে দুটো মোর আর কয়েকটা ছাগল ছাড়া কাছে-পিঠে কেউ নেই। ডুংকর ঠিক পিছনেই খাড়া পাহাড়, তার নীচে একটা বাদাম গাছ, তারই ঠিক সামনে ডুংকর বসার টিবি। ওই যে দূরে ইটের তৈরি টালির ছাতওয়ালা দোতলা বাড়ি, ওটা ডুংকরের বাড়ি। ভুট্টার খেতটাও ওদের। উত্তরে কুয়াশায় আবছা পাহাড়ের পিছনে তিনটে কক্ষের ঢাকা পাহাড়ের মধ্যে যেটার চূড়ো মাছের পেজের মতো দু ভাগ হয়ে গেছে, যেটার নাম মাছাপুছরে, সেটার ডগা এখন গোলাপি।

প্রথম দুটো লাইন গাইবার পর তিনের মাধ্যম যেখানে সুরটা চড়ে, সেখানে আসতেই আকাশ ভাঙল। গুড় গুড় শব্দটা শুনেই ডুংকর এক লাফে পাঁচ হাত পাশে সরে গিয়েছিল, নইলে ওই প্রতির মাথার মতো পাথরটা বাজনাটির সঙ্গে সঙ্গে ওকেও খেঁতলে দিত।

ওরে বাব্বা! ওটা কী—বাদামগাছটার মাথা ফুড়ে সেটাকে তছনছ করে একরাশ ডালপালা খুবলে নিয়ে মাটিতে এসে মুখ খুবড়ে পড়ল ওটা কী?

একটা মানুষ।

না, একটা বাবু।

মাথায় রক্ত, খুতনিতে রক্ত, একটা পা হাঁটুর কাছ থেকে দুমড়ে আছে যেন খড়ের পুতুল। লোকটা মরে গেছে কি?

না, ওই যে মাথাটা নড়ল।

ডুংকর ধাঁ করে মনে পড়ে গেল ওদের কথা। ওই পুয়ের গমের খেতটা পেরিয়ে রাস্তার ওপারে পাহাড়ের গায়ে ঝরনার ধারে তাঁবু ফেলে যে চারজন আছে—যাদের দাড়ির দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে ডুংকর, কারণ ওর নিজের বাপ খুড়ো দাদু মামা মেসো কারু দাড়ি নেই—যদি কেউ কিছু করতে পারে তো ওরাই পারবে। ওরা চেনে ডুংকরকে। ডুংকর ওদের গান শুনিয়েছে, খেত থেকে ভুট্টা

মিয়ে গিয়ে দিয়েছে, ওরা ডুংরুকে পয়সা দিয়েছে—এক টাকা, দু টাকা, একদিন পাঁচ টাকা ।

ডুংরু দিল ছুট ।

‘হাই, হাই—কাম, জো, কাম !’

‘হোয়াটস আপ ?’

ডুংরু জিভ বার করে মাথা চিতিয়ে চোখ উলটিয়ে দেখিয়ে দিল । এরা বুঝল ।
এ ভাষা সকলেই বোঝে ।

‘গো !—জিপ, জিপ !—গো !’

এদের জিপের গায়ে রামধনুর রং । এমন গাড়ি ডুংরু দেখেনি কখনও । অনেক গাড়ি সে দেখেছে বড় রাস্তা দিয়ে পোখরার দিকে যেতে ।

জো, মার্ক, ডেনিস আর ব্রুস উঠে পড়ল জিপে । ডুংরুকে তুলে নিল সঙ্গে ।
একটা কিছু হয়েছে ; দেখা দরকার ।

হ্যাঁ, হয়েছেই বটে ।

জাম্পিং জেহোশাফাট ! সর্বনাশের মাথায় বাড়ি !

চারজনে ঝুঁকে পড়ল লোকটার উপর । মার্ক মিনেসোটায় ডাক্তারি পড়া ছেড়ে
দিয়ে চলে এসেছে নেপালে ।

বেইশ রক্তাক্ত লোকটাকে ধরাধরি করে তুলল ওরা জিপে ।

হাসপাতাল কাঠমাণ্ডুতে । এখান থেকে তেত্রিশ কিলোমিটার ।

মানুষের হাতে যে রেখাটাকে বিলিতি মতে হেডলাইন বা বুদ্ধির রেখা বলে, ফেলুদার যে সেটা আশ্চর্যকর লম্বা আর স্পষ্ট, সেটা আমি জানি। ফেলুদাকে জিজ্ঞেস করলে বলে ও পামিষ্টিতে বিশ্বাস করে না, অথচ পামিষ্টির বই ওর আছে, আর সে বই ওকে পড়তেও দেখেছি। একবার এটাও দেখেছি—ফেলুদা ওর মারামারা একপেশে হান্টিং হেসে লালমোহনবাবুকে ওর বুদ্ধির রেখাটা দেখাচ্ছে। লালমোহনবাবু অবিশ্যি ঐ সব বোলো আনা বিশ্বাস করেন। তাই ফেলুদার হেডলাইনের বহর দেখে দুবার চাখা গলায় ‘অ্যামেজিং’ কথাটা বলেছিলেন, আর মিনিটখানেক পরে কথার ফাঁকে নিজের ডান হাতের মূঠো খুলে চোখ নামিয়ে রেখাগুলোর দিকে দেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন।

হাত দেখে মোটামুটি অতীত-ভবিষ্যৎ বলতে আমার ছোট কাকাই পারেন। এমনকী মুখ দেখে ভাগ্য বলে দেবার ক্ষমতাও কাকের কাকের আছে বলে শুনেছি। কিন্তু কোনও লোকের কপালের ঠিক মধ্যখানে কঙ্কে আঙুলের ডগা ঠেকিয়ে রেখে চোখ বুজে সেই লোকের ভাগ্য গণনার ক্ষমতা যে কাকের থাকতে পারে, সেটা এই পুরী এসে প্রথম শুনলাম।

কলকাতায় লোডশেডিং—এ নাজেহাল অবস্থা, তার উপর একটানা শুরম চলেছে একশো দশ ডিগ্রি। ছাপাখানায় লোডশেডিং—এর জন্য রহস্য-রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক লালমোহন গাঙ্গুলী ওরফে জটায়ুর নতুন উপন্যাস বৈশাখে বেরোতে পারেনি। ভ্রমলোকের আরও আপশোস এই জন্য যে, এটা ওর প্রথম ভৌতিক উপন্যাস। ফেলুদাই ওঁকে বলেছিল যে মোমবাতির আলোয় রহস্য-কাহিনীর চেয়ে ভূতের গল্প জমবে বেশি। সত্যি বলতে কী, ‘পিঠাপুরমের পিশাচ’ গল্পের আইডিয়াটা ফেলুদাই জটায়ুকে দিয়েছিল। কিন্তু সে বই সময় মতো বেরোল না দেখে লালমোহনবাবু রীতিমতো খান্না হয়ে এক রোববারের সকালে আমাদের বাড়িতে এসে বললেন, ‘নাঃ, এ শহরে আর থাকা চলবে না। আর শুনেচেন তো স্কাইল্যাবের ব্যাপার?’

স্কাইল্যাব কলকাতায় পড়বে এ খবর কোথাও বেরোয়নি, কিন্তু লালমোহনবাবুর দৃঢ় বিশ্বাস কলকাতার উপর শনির দৃষ্টি পড়েছে, তাই স্কাইল্যাবের একটা বড় অংশ এখানে না পড়ে যায় না।

ফেলুদাকে দেখেছি ও প্রায় যে কোনও অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে চলতে পারে। ওয়েটিং রুমে জায়গা না পেলে প্লাটফর্মে চাদর বিছিয়ে শুয়ে দিবা ঘুমিয়ে রাত কাটাতে দেখেছি কতবার। বালিশও লাগে না—হাত ভাঁজ করে তার উপর

মাথা । কিন্তু বাড়িতে বিজ্ঞানায় শুয়ে ঘণ্টাখানেক না পড়লে বার ঘুম আসে না, তার পক্ষে সেই অভ্যাসটা বন্ধ হয়ে গেলে আর কতদিন মাথা ঠিক রাখা যার ? বই পড়া ছেড়ে কিছুদিন ভাস নিয়ে হাত সাফাই অভ্যাস করল । তারপর কিছুদিন মুখে মুখে লিমেरिक বানাল, তার একটা লালমোহনবাবুকে নিয়ে—

বুঝে দেখে জটায়ুর কলমের জোর
ঘুরে গেছে রহস্য কাহিনীর মোড়
খোড় বড়ি খাড়া
সিখে তাড়াতাড়ি
এইবারে সিখেছেন খাড়া বড়ি খোড় ।

এটা অবিশ্যি জটায়ুকে বলা হয়নি, আর এই লিমেरिक লেখাও বেশিদিন চলেনি । ডাবলে মনে হয়, শহরে রাস্তিরে বাড়ি না থাকলে হয়তো খুন-রাহজানি অনেক বাড়বে ; কিন্তু দুঃখের বিষয় গত তিন মাসে ফেলুদার কোনও কেস জোটেনি, আর ড্রাইমও যা হয়েছে, সেগুলোর কিনারা পুলিশেই করেছে ।

ডুই বোধহয় ফেলুদা লালমোহনবাবুর কথায় সার দিয়ে বলল, 'সত্যি, কল্লোলিনী তিলোত্তমা বড় জ্বালাচ্ছে ; শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্যটা মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু ক্রমাগত কাজের ব্যাক্ত, পড়াশুনার ব্যাক্ত, যশের কামড়ে চিন্তার ব্যাক্ত—এগুলো বরদাস্ত করা কঠিন ।'

'উড়িয্যাতে তো একসেস্ তাই না ?'

লালমোহনবাবুর এই প্রশ্ন থেকে এল পুরীর কথা, আর পুরী থেকে এল সি-বিচের কাছে নতুন তৈরি নীলাচল হোটেলের কথা, যার মালিক শ্যামলাল ব্যরিক লালমোহনবাবুর বাড়িওয়ালা সুধাকান্তবাবুর ক্রাস-ফ্রেন্ড ।

কিন্তু তা হলে কী হবে ? সুধাকান্তবাবু খোঁজ নিয়ে জানলেন জুনের মাঝামাঝির আগে ঘর পাওয়া যাবে না ।

ভাতের অবিশ্যি আমরা পেছপা হইনি । জুনের মধ্যে কলকাতার অবস্থার উন্নতির কোনও আশা নেই । একুশে জুন আমরা পুরী এক্সপ্রেসে দিয়ে দিলাম রওনা । একবার কথা হয়েছিল যে লালমোহনবাবুর আশ্বাসভরে যাওয়া হবে, শেষে ভ্রমলোক নিজেই 'এই সময়টার লং জার্নিতে মাঝপথে বাড়বাগল হলে ফাসোস হতে পারে মশাই' বলে পিছিয়ে গেলেন । গাড়ি যাবে, তবে সেটা ড্রাইভার হরিপদবাবু নিয়ে যাবেন ; আমাদের একদিন পরে পৌছবে । পুরী ছাড়াও আরও দু-একটা জায়গা ঘুরে দেখার ইচ্ছে আছে, সেটা নিজেদের গাড়ি থাকলে সুবিধে হবে ।

ট্রেনের খটনার মধ্যে একটাই লেখার মতো । আমাদের ফের-বার্খ কামরার একটা আপার বার্থে একজন ভ্রমলোক ছিলেন যিনি সিগারেট খাচ্ছিলেন একটা হোন্ডারে যেটা ফেলুদা বলল সোনার । যে লাইটারে সিগারেট ধরাচ্ছিলেন সেটা নাকি গোল্ড-স্মেটেড, আর তার দাম নাকি তিন হাজার টাকা । যে কেস থেকে সিগারেট বার করলেন সেটা সোনার, চশমা সোনার, শার্টের কাফ-লিংকস

সোনার । দুহাত মিলিয়ে তিনটে আংটি সোনার, আর ওপর থেকে পা ঝুলিয়ে
নীচে নামতে গিয়ে লালমোহনবাবুর কাঁধে বুড়ো আঙুল লাগাতে যখন হেসে 'সরি'
বললেন, তখন দেখলাম একটা দাঁত সোনার । পুরী স্টেশনে নেমে কুলির মাথায়
জিনিস তুলে ভদ্রলোকটি যখন ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন, তখন লালমোহনবাবু
বললেন, 'ইস, এমন সোনায়ে মোড়া ভদ্রলোকটির নামটা জিজ্ঞেস করা হল না ।'
ফেলুদা বলল, 'সেটা জানার একটা সহজ উপায় ছিল । কামরার বাইরে
রিজার্ভেশন চার্ট টাঙানো ছিল হাওড়া থেকেই । ভদ্রলোকের নাম এম. এল.
হিসোরানি ।'

নীলাচল হোটেলে একবেলা থেকেই সেটাকে সিন্স-স্টার হোটেলে বলে ঘোষণা করলেন লালমোহনবাবু। ফেলুদা বলল, 'হোটেলে সুইমিং পুল না থাকলে সেটা পাঁচ তারার পর্যায়ে ওঠে না; আর পাঁচের উপর রেটিং নেই। আপনি কি দুশো গজ দূরে ওই সমুদ্রটাকে নীলাচলের নিম্নতম সাঁতারের চৌবাচ্চা বলে ধরছেন? তা হলে অবিশ্যি আপনার রেটিং-এ ভুল নেই।'

আসলে দুপুরে খাওয়াটা ক্লেশ ভাল হয়েছিল। লালমোহনবাবুকে লোডী বলা চলে না, তবে তিনি রসিক থাইয়ে তাতে সন্দেহ নেই। বললেন, 'কাঁচকলার কোফতা এত উপাদেয় হয় জানা ছিল না মশাই। এদের কুকিং-এর ক্ষমতা নেই। তা ছাড়া তকতকে বেডরুম-বাথরুম, সলালাপী ম্যানেজার, ইনস্ট্যান্ট পাখা-বাতি, সমুদ্রের নৈকট্য—সিন্স-স্টার বলব না কেন মশাই?'

পুরনো হলে কী হবে জানি না, নতুন অবস্থায় হোটেলেটা সত্যিই বেশ ভাল। ফেলুদা আর আমি দোতলায় একটা ডাবলরুমে আছি, পাশের ডাবল রুমটা লালমোহনবাবু গড়িয়াহটার এক কাপড়ের দোকানের মালিকের সঙ্গে শেয়ার করে আছেন। ম্যানেজার শ্যামলাল বারিকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, বললছেন সম্ভাব্যেবলা একটু কাক পেলেই আমাদের ঘরে আসবেন।

হোটেলের গেট থেকে বেরিয়ে ডানদিকে মিনিটখানেক গেলেই পার্কের তলায় বাগি শুরু হয়ে যায়। আমি শেষ পুরী এসেছি যখন আমার বয়স পাঁচ বছর। ফেলুদা বছর দুয়েক আগে রাউরকেল্লা এসেছিল একটা কেসে, তখন উড়িষ্যার অনেক জায়গাই দেখে গেছে, পুরী তো বটেই। কেবল লালমোহনবাবু বললে বিশ্বাস করা কঠিন—এই প্রথম নাকি পুরী এলেন। আমরা অবাক ভাব দেখানোর উনি বললেন, 'আরে মশাই, কলকাতার ভেতরেই কত কী আছে এখনও দেখলুম না, আর পুরী! ভাবতে পারেন, আমার বাড়ির তিন মাইলের মধ্যে জৈন টেম্পল; জগন্নে অবধি নাম শুনে আসছি, এখনও চোখে দেখিনি।'

সমুদ্র দেখে লালমোহনবাবু যে কবিতাটা আবৃত্তি করলেন সেটা আমি কক্ষনও শুনিনি। জিজ্ঞাসা করতে বললেন সেটা বৈকুণ্ঠনাথ মল্লিকের লেখা। তিনি নাকি এথেনিয়াম ইনস্টিটিউশনের বাংলার মাস্টার ছিলেন। লালমোহনবাবু যখন ক্লাস সেভেনে পড়েন, তখন নাকি এই কবিতাটা আবৃত্তি করে প্রাইজ পেয়েছিলেন। বললেন শেষের দুটো লাইন নাকি পার্টিকুলারলি ভাল—'আরেকবার মন দিয়ে শোনো তপেশ, তা হলেই বিউটিটা ধরতে পারবে—



‘অসীমের ডাক শুনি কল্লোল মর্মরে
এক পায়ে খাড়া থাকি একা বালুচরে।’

ফেলুদা মন্তব্য করল, ‘কবি নিশ্চয়ই এখানে নিজেকে সারসের সঙ্গে আইডেন্টিফাই করছেন, কারণ এই খোড়ো বাতাসে বালির উপর মানুষের পক্ষে এক পায়ে খাড়া থাকা চাটখানি কথা নয়। বাই হোক, এবার বলুন তো বালির উপর ওই ছাপগুলোর কোনও বিশেষ তাৎপর্য আছে কি না।’

বালির উপর দিয়ে কেউ হেঁটে গেছে পূর্ব থেকে পশ্চিমে। জুতোয় ছাপের সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা ছাপ চলেছে, সেটা নিশ্চয়ই লাঠি। লালমোহনবাবু বেশ কিছুক্ষণ ছাপগুলোর দিকে চেয়ে থেকে বললেন, ‘জুতো অ্যান্ড লাঠি সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে, তবে বিশেষ তাৎপর্য...’

‘তোপসে, তোর কী মনে হয়?’

আমি বললাম, ‘লোকে তো সাধারণত ডান হাতে লাঠি ধরে। এখানে দেখছি ছাপটা বাঁদিকে।’

ফেলুদা আমার পিঠে একটা চাপড় মেরে দিল, যার মানে সাবাস। তারপর

বলল, 'ভদ্রলোক ন্যাটা হলে আশ্চর্য হব না ।'

আমরা যেখানটায় এসে দাঁড়িয়েছি সেখানে লোক বলতে তিনটে নুলিয়ার বাচ্চা, তার মধ্যে একটা কাঁকড়া ধরছে, আর দুটো খিনুক কুড়োচ্ছে । ভিড়টা আরম্ভ হয় আরও এগিয়ে গিয়ে, যেখানে কাছাকাছির মধ্যে বেশ কয়েকটা বাঙালি হোটেল রয়েছে । আমরা আরও এগিয়ে যাব যাব করছি, এমন সময় পিছন থেকে ডাক এল ।

'মিস্টার গাঙ্গুলী !'

ঘুরে দেখি জটাঘুর কুমমোট, সেই দোকানের মালিক । গোলগাল হাসিখুশি মিশুক লোক, আপ্যায় হতে জ্ঞানলাভ নাম শ্রীনিবাস সোম, দোকানের নাম হেমাবিনী স্টোর্স, হেমাবিনী ভদ্রলোকের মায়ের নাম ।

'যাইবেন না ?' ভদ্রলোক লালমোহনবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন । 'ছয়টায় টাইম দিসে কিন্তু ।'

লালমোহনবাবু কিছুক্ষণ থেকেই মাঝে মাঝে পিছন ফিরে দেখছিলেন ; এবার কারণটা বুঝলাম । কিন্তু-কিন্তু ভাব করে ফেলুদার দিকে চেয়ে বললেন, 'আপনি তো বোধহয় নট ইন্টারেস্টেড তাই আপনাকে জ্ঞোর করব না ।'

'ব্যাপারটা কী ?'

'ইয়ে, ইনি এক আশ্চর্য গণকের কথা বলছিলেন । কপালে আঙুল রেখে ভাগ্য বলে দেন ।'

'কার কপালে ?'

'যার ভাগ্য বলেছেন তার, ন্যাচারেলি ।'

'কপালের লিখন পড়তে পারেন বলেছেন ?'

'শুনে তো তাই মনে হচ্ছে ।'

ফেলুদা অবিশ্যি কপালের লেখা পড়াতে রাজি হল না । তাও আমরা দুজনে গণৎকারের বাড়ি অবধি গেলাম ঠুন্দের সঙ্গে । গণৎকারের বাড়ি-বলাটা অবিশ্যি ঠিক হল না ; একটা তিনতলা বাড়ির একতলার দুটো ঘর নিয়ে থাকেন ভদ্রলোক । সমুদ্রের ধার দিয়ে সোজা পূর্বদিকে নুলিয়া বস্তি লক্ষ রেখে গিয়ে যেখানে চেঞ্জারদের ভিড় পাতলা হয়ে এসেছে, সেখানে বাঁয়ে বালির চড়াই উঠে ত্রিশ চল্লিশ গজ গেলে বালিতে বসা একটা পোড়ো বাড়ির কিছুটা দূরেই এই তিনতলা বাড়িটা । গেটের একদিকে শ্বেত পাথরের ফলকে লেখা 'সাগরিকা,' অন্যদিকে 'ডি. জি. সেন' । পুরনো খাঁচের হলেও, বেশ বাহারের বাড়ি । গেট দিয়ে ঢুকে একটা মাঝারি বাগানও আছে ।

'মালিক থাকেন ওই তিনতলার ঘরে,' বললেন শ্রীনিবাস সোম, 'আর একতলার বারান্দার পিছনে ওই যে দরজা, ওইটা হইল লক্ষ্মণ ভট্টাচার্যের ঘর ।'

গণৎকারের নামটা এই প্রথম শুনলাম । বারান্দায় যে আট-দশজন লোক দাঁড়িয়ে আছে, তারাও যে গণৎকারের কাছেই এসেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই ।

লালমোহনবাবু 'জয় গুরু' বলে সোম মশাইয়ের সঙ্গে গেট দিয়ে ঢুকে গেলেন ।

‘কপাল কী বলছে?’ ফেলুদা জিজ্ঞেস করল। লালমোহনবাবু ভীষণ উদ্বেজিতভাবে এইমাত্র ঢুকেছেন আমাদের ঘরে।—‘অবিশ্বাস্য, অলৌকিক, অসামান্য।’ বললেন ভদ্রলোক,—‘সাদে সাদে ছপিং কক, অঠারোয় আছাড়ে শড়ে মালাই চাকি ডিসকোকেশন, প্রথম উপন্যাস, স্পেকট্যাকুলার পপুলারিটি, সামনের বই কটা এডিশন হবে—সব গড় গড় করে বলে দিলেন।’

‘স্টাইল্যাব মাথায় পড়বে কি না বলেছে?’

‘ঠাট্টাই করুন আর যাই করুন মশাই, আপনাকে একবারটি ধরে নিয়ে যানই। আর, ইয়ে, বলেছেন আমার বন্ধুভাগ্য ভাল। শুধু তাই নয়, বন্ধুর চেহারার ডেসক্রিপশনও দিলেন।’

‘আর বন্ধুর পেশা?’

‘বলেছেন বন্ধু মেধাবী, কর্মঠ, অনুসন্ধিৎসু, গভীর পর্যবেক্ষণ-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি। মিলছে? আর কী চাই?’

‘মে আই কাম ইন?’

হোটেলের ম্যানেজার শ্যামলাল বারিক ঘরে ঢুকতেই সুগন্ধি জলদি গন্ধে ঘর ভরে গেল।—‘আসুন।’ পানের জিবে খুলে এগিয়ে দিলেন আমাদের দিকে। আমরা ইতস্তত করছি দেখে আশ্বাস দিলেন যে এ পানে জরী নেই।

ফেলুদা একটা পান মুখে পুরে চারমিনিটের পটাকোটো পকেটে থেকে বার করে বলল, ‘আচ্ছা, এই ডি. জি. সেন ভদ্রলোকটির পুরো নামটা কী?’

‘দেখেছেন?’ বলে উঠলেন লালমোহনবাবু, ‘ওর কাড়ি থেকেই ঘুরে এলুম, অথচ ওর পুরো নামটা জেনে এলুম না। দোলগোবিন্দ নর জো?’

আমি জানি, ভদ্রলোকের ‘পিঠাপুরমের পিণাচ’ বইতে একটা আধপাগলা চরিত্র আছে যার নাম দোলগোবিন্দ দত্ত রায়।

শ্যামলালবাবু হেসে বললেন, ‘মাপ করবেন মশাই, ওর পুরো নাম আমারও জানা নেই। কেউই জানেন কি না সম্ভব। সবাই ডি. জি. সেন বলেই বলেন। এমনকী ‘ডিজিবাবু’ও বলতে শুনেছি কাউকে কাউকে।’

‘বেশি মেশেন-টেশেন না বুঝি?’

‘গোড়ায় শুঁকু এখানে সেখানে দেখা যেত। গত বছর সিকিম না ভূটান কোথায় ঘেঁষে গিয়েছিলেন; মাস ছয়েক হল ফিরে একেবারে গুটিয়ে নিয়েছেন নিজেকে।’

‘কেন, সেটা জানেন?’

শ্যামলালবাবু মাথা নাড়লেন।

‘বাড়িটা কি ওরই তৈরি?’ ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

‘না। ওর বাপের। বাপের পরিচয় দিলে হয়তো চিনতে পারেন। সেন পারফিউমারস-এর নাম শুনেছেন তো?’

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ—কিন্তু সে ব্যবসা তো উঠে গেছে অনেককাল। ‘এস. এন. সেন’স সেনসেশন্যাল এসেনসেস—সেই সেন তো?’

‘ঠিক বলেছেন। ইনি ওই এস. এন. সেনের ছেলে। জোর ব্যবসা ছিল। কলকাতায় তিনটে বাড়ি, মধুপুরে একটা, পুরীতে একটা। ভদ্রলোক মারা যাবার পর ব্যবসা আর বেশিদিন টেকেনি। দুই ছেলের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ করে দেন উইল করে। ডি. জি. সেন বোধহয় ছোট ছেলে; তিনি এই বাড়িটা পান। দুই ছেলের কেউই ব্যবসায় যায়নি। ইনি এককালে চাকরি-টাকরি করে থাকতে পারেন, এখন আর্ট নিয়ে আছেন।’

‘আর্ট?’ ফেলুদার হঠাৎ কী যেন মনে পড়েছে। ‘এনারই কি পুঁথির কালেকশন?’

আমাদের সিধু জ্যাঠার কাছে পুঁথি দেখেছি আমি। তিনশো বছরের পুরনো তিনটে পুঁথি আছে ওঁর কাছে। ছাপাখানার আগের যুগে বই লেখা হত হাতে; তাকেই বলে পুঁথি। সবচেয়ে পুরনো কালে একরকম গাছের ছাল সরু লম্বা করে কেটে তাতে লেখা হত, তাকে বলত ভূর্জিপত্র, তারপরে তালপাতা আর কাগজে লেখা হত। সিধু জ্যাঠা বলে পুঁথি জিনিসটা যে আমাদের আর্টের একটা বড় অঙ্গ, সেটা অনেকেই মনে রাখে না।

শ্যামলালবাবু বললেন, ‘পুঁথি নিয়েই তো আছেন। দেশ-বিদেশ থেকে লোক এসে ওঁর পুঁথি দেখে যায়।’

‘ভদ্রলোকের ছেলেপিলে নেই?’

‘একটি ছেলে তো মাঝে মাঝে আসত, বউকে নিয়ে। অনেককাল দেখিনি। ভদ্রলোক নিজেই এসেছেন বছর তিনেক হুজ। নিজে থাকেন তিনতলার; একাই থাকেন। বিপত্নীক। এক তলায় কিছুকাল থেকে এক পার্মানেন্ট বাসিন্দা এসে রয়েছেন, এক গণৎকার; দোতলাটা সিঁজনে ডাড়া দেন। এখন রয়েছে সত্বীক এক রিটার্ড জজ সাহেব।’

‘হু...’

ফেলুদা ফুরিয়ে যাওয়া চারমিনারটা আশট্রেতে ফেলে দিল।

‘আপনার কি আলাপ করার ইচ্ছে?’ শ্যামলালবাবু জিজ্ঞাস করলেন। — ‘ডারী পিকিউলিয়ার লোক কিন্তু; কস করে কারুর সঙ্গে দেখা করতে চান না। অবিশ্যি আপনার যদি পুঁথিতে ইন্টারেস্ট থাকে, তা হলে—’

‘ইন্টারেস্ট কেন থাকবে না; সেই সঙ্গে কিছুটা জ্ঞানও তো থাকা চাই। একটু হোমওয়ার্ক না করে এসব লোকের সঙ্গে দেখা করার কোনও মানে হয় না।’

‘কোনও চিন্তা নেই,’ বললেন শ্যামলালবাবু, ‘বতীশ কানুনগোর বাড়ি আমার এই হোটেল থেকে পাঁচ মিনিটের হাটা পথ। ব্যাভেনশ কলেজের প্রোফেসর ছিলেন, এখন রিটার্ডার করেছেন। জ্ঞানেন না এমন বিষয় নেই। ওঁর সঙ্গে দেখা করুন, আপনার হোমওয়ার্ক হয়ে যাবে।’

ফেলুদা যে সত্যিই পরদিন ভোরে উঠে টেলিকোনে আপয়েন্টমেন্ট করে তক্ষুনি প্রোফেসর কানুনগোর সঙ্গে দেখা করতে চলে যাবে, সেটা আমি ভাবিনি। আমার ইচ্ছা ছিল আজ সমুদ্রে স্নান করব; ও থাকলে একজন সঙ্গী জুটত, কারণ লালমোহনবাবুকে বলাতে উনি আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'দেখো তপেশ, তোমাদের বয়সে বেঙলার সাঁতার কেটেছি। আমার বাটারফ্লাই স্ট্রোক দেখে লোকে ক্র্যাপ পর্যন্ত দিচ্ছে। কিন্তু হেদো আর বে অফ বেঙ্গল এক জিনিস নয় ডাই। আর পুরীর ঢেউ বড় ট্রোলরস। বোম্বাই-এর সমুদ্র হলে দিখা করতুম না।'

সত্যি বলতে কী, আজকের দিনটা স্নানের পক্ষে খুব সুবিধের নয়। সারা রাত টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়েছে, এখনও মেঘলা আর গুমোট হয়ে রয়েছে। তাই শেষ পর্যন্ত ঠিক হল স্নানটা না হয় ফেলুদার সঙ্গেই করা যাবে, আজ শুধু একটু বিচে হেঁটে আসব। সাঁতার মাধ্যেই চা-ডিম-কুটি খেয়ে আমরা দুজন বেগিয়ে পড়লাম। লালমোহনবাবুর কাল রাত থেকেই বেশ খুশি-খুশি জ্বর; মনে হয় লক্ষ্মণ গণৎকারই তার জন্য দায়ী।

বিচে এসে দেখি খাঁ খাঁ। এই দিনে এত সকালে কে আর আসবে? দূরে জলে দু-তিনটে নুলিয়াদের নৌকো দেখা যাচ্ছে। তবে কালকের সেই নুলিয়া বাচ্চাগুলো নেই। তার বদলে কয়েকটা কাক রয়েছে, ঢেউ-এর জল সরে গেলেই তিড়িং তিড়িং করে এগিয়ে গিয়ে কেনায় ঠোকর দিয়ে কী যেন খাচ্ছে, আবার ঢেউ এলেই তিড়িং তিড়িং করে পিছিয়ে আসছে।

দুজনে ভিজ্জে বালির উপর দিয়ে হাঁটছি, এমন সময় লালমোহনবাবু বললেন, 'সি-বিচে শুয়ে রোদ পোয়ানোর ব্যতিক আছে সাহেব-মেমদের এটা শুনিচি, কিন্তু মেঘ-পোয়ানোর কথা তো শুনিনি!'

আমি জানি কথাটা কেন বললেন ভদ্রলোক। একজন লোক চিত হয়ে শুয়ে আছে বালির উপর, হাত পঞ্চাশেক দূরে। বাঁয়ে যেখানে বিচ শেষ হয়ে পাড় উঠে গেছে, সেই দিকটায়। আরেকটু বাঁয়ে শুলেই লোকটা একটা কোপড়ার আড়ালে পড়ে যেত।

'কেমন ইয়ে মনে হচ্ছে না?'

আমি জবাব না দিয়ে পা চালিয়ে এগিয়ে গেলাম। খটকা লেগেছে আমারও।

দশ হাত দূর থেকেও মনে হয় লোকটা ঘুমোচ্ছে, কিন্তু আরেকটু এগোতেই বুঝলাম তার চোখ দুটো খোলা আর মাথার কোঁকড়ানো ঘন চুলের পাশে বালির



উপর চাপ-বাঁধা রক্ত ।

পুক গৌঁক, ঘন ভুরু, রং বেশ ফরসা, গায়ে ছাইরঙের সুতির কোট, সাদা প্যান্ট আর নীল স্ট্রাইপড শাট । জুতো আছে, মোজা নেই । ডান হাতের কড়ে আঙুলে একটা নীল পাথর-বসানো আংটি, হাতের নখ কাটা হয়নি অন্তত এক মাস । কোটের বুক পকেট কুলে উঁচু হয়ে আছে ; মনে হয় কাগজপত্রর আছে । ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছিল কাগজগুলো খার করে দেখতে, কারণ পুলিশ তাই করবে, আর তা হলে হয়তো লোকটা কে তা জানা যাবে ।

‘ড্রোস্ট টাচ,’ বললেন লালমোহনবাবু, যদিও সেটা বলার কোনও প্রয়োজন ছিল না । ফেলুদার সঙ্গে থেকে এসব আমার জানা আছে ।

‘আমরাই তো ফার্স্ট ?’ বললেন লালমোহনবাবু । ‘ভদ্রলোক পকেটে হাত ঢুকিয়ে রেখেছেন, যেন কিছুই হয়নি এমন ভাব, কিন্তু গলার ধরে বোকা যায় ওঁর তলে শুকিয়ে গেছে ।’

আমি বললাম, ‘তাই তো মনে হচ্ছে ।’

ভদ্রলোক আবার বিভ্রমিত করে বললেন, ‘যাক, তা হলে আমরাই ডিসকাভার করলাম ।’

আমি ৭ ডাবটা কাটিয়ে নিছক বললাম, ‘চলুন, রিপোর্ট করতে হবে ।’

‘ইয়েস ইয়েস—রিপোর্ট ।’

পাঁচ মিনিটের মধ্যে হোটেলে ফিরে এলাম । ইতিমধ্যে ফেলুদা হাজির । —‘পাপোশে বখন পা না মুছেই ঢুকলেন, এবং ঘরের মেঝেতে ছটাক খানেক বালি ছড়ালেন, তখন বেশ বুঝতে পারছি আপনি সবিশেষ উত্তেজিত,’ কফি হাতে ষাটে বসে ফেলুদা লালমোহনবাবুকে উদ্দেশ্য করে বলল ।

লালমোহনবাবু ঘটনায় রং চড়াতে গিয়ে দেরি করে ফেলবেন বলে আমি দু-কথায় ব্যাপারটা বলে দিলাম । এক মিনিটের মধ্যে ফেলুদা নিজেই কোন করে থানায় খবরটা দিয়ে দিল । ওই ভাবে সংক্ষেপে শুধিয়ে আমি বলতে পারতাম না, লালমোহনবাবু তো নয়ই ।

দুই সম্পর্কে ফেলুদা শুধু একটাই প্রশ্ন করল—

‘লোকটার পাশে কোনও অস্ত্র পড়ে থাকতে দেখেছিলি, পিস্তল-টিস্তুল ?’

‘না, ফেলুদা ।’

‘তবে বাঙালি নয়, এ বিষয়ে আমি ডেফিনিট,’ বললেন লালমোহনবাবু ।

‘কেন বলছেন ?’ ফেলুদা জিজ্ঞেস করল ।

‘জোড়া ভুরু,’ ভয়ংকর কনফিডেন্সের সঙ্গে বললেন জটায়ু—‘বাঙালিদের হয় না । আর ওরকম চোয়ালও হয় না । বাজরার কুটি আর গোস্ত খাওয়া চোয়াল । যন্ত্র মনে হয় বুদ্ধেলখন্দের লোক ।’

ফেলুদা যে ইতিমধ্যে ডি. জি. সেনের সঙ্গে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ করে ফেলেছে সে কথা এতক্ষণ বলেনি । সাড়ে আটটার টাইম দিয়েছেন তাঁর সেক্রেটারি, আর বলেছেন পনেরো মিনিটের বেশি থাকা চলবে না । আমরা পনেরো মিনিট হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম ।

এবারে বিচে পৌঁছে নর থেকেই বুঝলাম যে লাশের পাশে বেশ ভিড়। খবর এতক্ষণে ছড়িয়ে পড়েছে, পুরীর সমুদ্রতটে এভাবে এর আগে খুন হয়েছে কি না সন্দেহ।

আমি জানতাম যে এখানকার থানার কিছু অফিসারের সঙ্গে রাউরকেরার কেসটার সময় ফেলুদার আলাপ হয়েছিল। যিনি ফেলুদাকে দেখে হেসে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এসেছেন তিনি স্তন্যাম সাব-ইনস্পেক্টর মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র।

‘এবার কী, ছুটি ভোগ?’ মহাপাত্র জিজ্ঞেস করলেন।

‘সেই রকমই তো বাসনা,’ বলল ফেলুদা। ‘কে খুন হল?’

‘স্থানীয় লোক নয় বলেই তো মনে হচ্ছে। নাম দেখছি রূপচাঁদ সিং।’

‘কীসে পেলেন?’

‘ড্রাইডিং লাইসেন্স।’

‘কোথাকার?’

‘নেপাল।’

পুরু চশমা পরা একজন বাঙালি উদ্বলোক পুলিশের ফোটোগ্রাফারকে টোলে সরিয়ে এগিয়ে এসে বললেন, ‘আমি লোকটাকে দেখেছি। কাল বিকেলে স্বর্গদ্বার রোডে একটা চায়ের স্নেকসমের বাইরে বসে চা খাচ্ছিল। আমি পান কিনছিলাম পাশের দোকান থেকে; স্নেকসটা আমার কাছে থেকে দেখল্যাই চেয়ে নিয়ে সিগারেট ধরায়।’

‘মরল কীভাবে?’ ফেলুদা মৃত্যুঞ্জয়কে জিজ্ঞেস করল।

‘প্রিভলভার বলেই তো মনে হচ্ছে।’ তবে ওরপন পাওয়া যায়নি। এইটে দেখতে পারেন, লাইসেন্সের ভিতর গোল্লা ছিল।’

উদ্বলোক একটা মাঝারি সাইজের ডিজিটিং কার্ড ফেলুদার দিকে এগিয়ে দিলেন। একদিকে কাঠমাঠুর একটা সরকারি মোকদ্দমের নাম-ঠিকানা, অন্যদিকে বেশ কাঁচা হাতে ইংরিজিতে লেখা—‘এ. কে. সরকার, ১৪ মেহের আলি রোড, ক্যালকটা।’ বানান ভুলগুলোর কথা আর বললাম না।

ফেলুদা কার্ডটা ফেরত দিয়ে বলল, ‘ইন্টারেস্টিং ফ্যাকরা যদি বেরোয় তো জানাবেন। আমরা নীলাচল হোটেলে আছি।’

আমরা লাশ পিছনে ফেলে এগিয়ে গেলাম।

কাল যে বাড়িটাকে দেখে আমরা ভাবিক না করে পারিনি, আজ মেঘলা দিনে সেটা যেন মেদা মেরে গেছে, ভেতরে যাবার জন্য আর হাতছানি দিয়ে ডাকেই না।

গেটের বাইরে একজন লোক দাঁড়িয়ে, বরষ পঁচিশের বেশি না, দেখলে মনে হয় ঢাকার, সে আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বলল, ‘মিঃবাবু?’

ফেলুদা এগিয়ে গেল। —‘আমিই মিঃবাবু?’

‘আসুন ভিতরে।’

বাগানটাকে দুভাবে চিরে একটা নুড়ি-ফেলা পথ বারান্দার দিকে চলে গেছে। দেখলাম সেটা আমাদের পথ নয়। তিনতলার যেতে হলে বাড়ির বাঁ পাশ দিয়ে

গলির মধ্য দিয়ে যেতে হয়, কারণ তিন ভুলার দরজা আর সিঁড়ি বাড়ির গিছন দিকে। গলির মাঝামাঝি এসে লালমোহনবাবু হঠাৎ ‘হিক’ শব্দ করে তিন হাত গিছিয়ে গিয়েছিলেন, তার কারণ মাটিতে পড়ে থাকা একটা সরু লম্বা সাদা কাগজের ফালি। লালমোহনবাবু সেটাকে সাপ মনে করেছিলেন।

সিঁড়ির সামনে গিয়ে চাকর আমাদের ছেড়ে দিল, কারণ ওপর থেকে একটি ভদ্রলোক নেমে এসেছেন।

‘মিস্টার মিত্র ? আসুন আমার সঙ্গে।’

ফেলুদাকে চিনেছেন নাকি ? মুখের হাসি তো তাই বলছে। ভদ্রলোকের চোখে মাইনাস পাওয়ারের চশমা, গায়ের চামড়া বলছে বয়স পঁয়ত্রিশের বেশি নয়, কিন্তু মাথার চুল এর মধ্যেই বেশ পাতলা হয়ে গেছে।

‘আপনার পরিচয়টা ?’ সিঁড়ি উঠতে উঠতে জিজ্ঞেস করল ফেলুদা।

‘আমার নাম নিশীথ বোস। আমি দুর্গাবাবুর সেক্রেটারি।’

‘দুর্গাবাবু ? ওর নাম তা হলে—’

‘দুর্গাপতি সেন। এখানে সবাই ডি. জি. সেনই বলে।’

সিঁড়ি দিয়ে উঠে ডাইনে একটা ঘর, বোধহয় সেটাতেই সেক্রেটারি থাকেন, কারণ একটা তক্তাপোশের পাশে একটা ছোট্ট টেবিলের উপর একটা টাইপরাইটার চোখে পড়ল। বাঁয়ে একটা প্যাসেঞ্জার দুমিকে দুটো ঘর, শেষ মাথায় ছাত। সেই ছাতেই যেতে হল আমাদের।

মাঝারি ছাত, একপাশে একটা কাচের খরের মধ্যে কিছু অর্কিড। ছাতের মাঝখানে একটা বেতের চেয়ারে বসে আছেন একটি বছর ষাটেকের ভদ্রলোক। লালমোহনবাবু পরে যে বলেছিলেন ‘ব্যক্তিগত উইথ এ ক্যাপিটাল বি’, সেটা খুব ভুল বলেননি। টকটকে রং, ভাসা ভাসা চোখ, কাঁচা-পাকা মেলানো ফ্রেঙ্ককাট দাড়ি আর মুগুরভাজা চওড়া কাঁধ। চেয়ারে বসেই নমস্কার করছেন দেখে প্রথমে একটু কেমন-কেমন লাগছিল, তারপর কারণটা বুঝলাম। নীল প্যান্টের তলা দিয়ে ভদ্রলোকের বাঁ পায়ের যেটুকু দেখা যাচ্ছে, সবটুকুই ব্যান্ডেজে ঢাকা।

আমাদের জন্য আরও তিনটে চেয়ার বার করে রাখা হয়েছে ; আমরা বসলে পর ফেলুদা বলল, ‘আপনি যে আমাদের সময় দিয়েছেন তার জন্য আমরা সত্যিই কৃতজ্ঞ। আপনি পুরনো পুঁথি সংগ্রহ করেন শুনে আসার লোভ সামলাতে পারলাম না।’

‘ওটা আমার অনেকদিনের শখ।’—আমাদের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে কথটা বললেন ভদ্রলোক। চেহারার সঙ্গে মানানসই গলার স্বর।

ফেলুদা বলল, ‘আমার এক জ্যাঠামশাই আছেন, নাম সিজেন্দ্র বোস, তাঁর তিনটে পুঁথি আছে। আপনি বোধহয় একবার সেগুলো দেখতে গিয়েছিলেন।’

‘কী পুঁথি ?’

‘তিনটেই বাংলা। দুটো অন্নদামঙ্গল, আর একটা গৌরববিস্ময়।’

‘তা গিয়ে থাকতে পারি। পুঁথির পেছনে ঘুরেছি অনেক।’

‘আপনার কি সব বাংলা পুঁথি?’

‘অন্য ভাষাও আছে। যেটা বেস্ট সেটা সংস্কৃত।’

‘কবেকার পুঁথি?’

‘টুয়েল্ফথ সেক্সুরি।’

আমি মনে মনে বললাম, জিনিসটা যদি আমাদের দেখার ইচ্ছেও থাকে, বলে কোনও লাভ হবে না। ভবলোকের মর্জি হলে দেখাবেন, না তো নয়।

‘লোকনাথ!’

বুকলাম চাকরের নাম লোকনাথ। কিন্তু তাকে হঠাৎ ডাকা কেন?

চাকরের বদলে যুহুর্তের মধ্যে চলে এলেন নিশীথবাবু। পনার বাইরেই দাঁড়িয়েছিলেন কি?

‘লোকনাথ নেই, ম্যার। বেরিয়েছে। কিছু বলবেন কি?’

মিঃ সেন ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। নিশীথবাবু সেটা ধরে ভবলোককে চেয়ার থেকে উঠতে সাহায্য করলেন।

‘আসুন।’

ভবলোকের পিছন পিছন আমরা ছাত্ত থেকে প্যাসেজ ও প্যাসেজ থেকে শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকলাম।

বেশ বড় ঘর, বাঁয়ে একটা প্রকাণ্ড খাট, যাকে ইংরিজিতে বলে ফোর-পোস্টার। খাটের পাশে একটা কান্ট্রি টেবিলে একটা ল্যাম্প, দুটো ওয়ুমের শিশি আর একটা কাচের গেলাস। ডাইনে একটা মাঝারি সাইজের রোলটপ ডেস্ক, একটা চেয়ার, আর দেয়ালে লাগানো পাশাপাশি দুটো গোলব্রেন্ডের আলমারি।

‘খোলো।’

ছকুমটা হল সেক্রেটারিকে। নিশীথবাবু খাটের উপর রাখা বালিশের তলা হাতড়িয়ে একটা চাবির গোছা বার করে ডেস্কের ঠিক পাশের আলমারিটা খুললেন।

ভিতরে চারটে শেল্ফ। তার প্রত্যেকটাতে পাশাপাশি ধরে ধরে সাজানো শালুতে মোড়া লম্বা লম্বা প্যাকেট। সব মিলিয়ে আন্দাজ চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশটা।

‘এতেও আছে কিছু’, অন্য আলমারিটা দেখিয়ে বললেন দুর্গাগতি সেন।—‘তবে আসলটা—’

আসলটা বেরোল শেল্ফ থেকে নয়, নীচের দিকের একটা দেওয়াল থেকে। লক্ষ করলাম তার নীচে আরেকটা পুঁথি রয়েছে।

নিশীথবাবু ছকুম পেয়ে শালুর উপর ফিতের বাঁধনটা খুলে ফেললেন। ভিতর থেকে বেরিয়ে এল দুদিকে কাঠের পাটার মধ্যখানে স্যান্ডউইচ করা দ্বাদশ শতাব্দীর সংস্কৃত পুঁথি।

‘অষ্টাদশশতাব্দীক প্রজ্ঞাপারমিতা’, বললেন দুর্গাগতি সেন,—‘অন্যটা কল্পসূত্র।’

কাঠের পাটার উপরে আশ্চর্য সুন্দর রঙিন ছবি, এতদিনের পুরনো হওয়া সত্ত্বেও রঙের জৌলুস কমেনি। পুঁথিটা কাগজের নয়, তালপাতার। হাতের লেখা যে এত পরিপাটি আর এত সুন্দর হতে পারে তা আমার ধারণাই ছিল না।



লালমোহনবাবু চাপা গলায় মন্তব্য করলেন, 'ধন্যি ছেলের অধ্যবসায় ।'

ফেলুদা বলল, 'এটা কোথায় পেলেন জানতে পারি কি ?'

'ধরমশালা', বললেন ভদ্রলোক ।

'তার মানে কি এ জিনিস তিব্বত থেকে দালাই লামার সঙ্গে এসেছিল ?'

'হ্যাঁ ।'

ভদ্রলোক পুঁথিটা ফেলুদার হাত থেকে নিয়ে নিশীথবাবুকে দিয়ে দিলেন । সেটা আবার ফিতে বাঁধা অবস্থায় যেখানে ছিল সেখানে চলে গেল ।

'আপনি কি আপনার জ্যাঠার হয়ে সুপারিশ করতে এসেছেন ?'

প্রশ্নটা শুনে বেশ হকচকিয়ে গিয়েছিলাম । ফেলুদা কিন্তু নানান বেয়াড়া প্রশ্নের সামনে পড়েও নিজেকে দিবি ঠাণ্ডা রাখতে পারে । বলল, 'আজ্ঞে না ।'

'আমি এসব জিনিস নিয়ে ব্যবসা করি না,' বললেন মিঃ সেন, 'কেউ যদি দেখতে চায় তো দেখতে পারি—এই পর্যন্ত ।'

'আমার জ্যাঠার সামর্থ্য নেই এ জিনিস কেনার,' হেসে বলল ফেলুদা । 'অবিশ্যি আমার কোনও ধারণা নেই এর কত দাম হতে পারে ।'

'অমূল্য ।'

'কিন্তু এসবও তো দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে ?'

‘চামার । যারা বিক্রি করে তারা চামার ।’

‘আপনার ছেলের এ সবে ইন্টারেস্ট নেই ?’

দুর্গাগতিবাবু কেমন যেন অনামনস্ক হয়ে পড়লেন প্রশ্নটা শুনে । খাটের পাশের টেবিলটার দিকে চেয়ে কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে বললেন, ‘ছেলেকে আমি চিনি না ।’

‘স্যার, ইনি একজন বিখ্যাত গোয়েন্দা, স্যার ।’

নিশীথবাবু হঠাৎ এই সময় এই কথাটা কেন বললেন বুঝলাম না । দুর্গাগতিবাবু একবার ফেলুদার মুখের দিকে চেয়ে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, ‘তাতে ভয়ের কী ? আমি কি খুন করেছি ?’

শ্যামলালবাবু ঠিকই বলেছিলেন । ডব্রলোকের হাবডাব কথাবার্তা সত্যিই পিকিউলিয়ার । অবিশ্যি এর পরের কথাটা আরও তাজ্জব, প্রায় একেবারে হৈয়ালির মতো । —

‘যা হারিয়েছে, তা ফিরিয়ে আনা গোয়েন্দার কস্মো নয় । যে পারে সেই করছে চেষ্টা, বন্ধ দরজা খুলছে একে একে । গোয়েন্দার কিছু করার নেই ।’

পনেরো মিনিট হয়ে গেছে, তাই ফেলুদা দরজার দিকে ফিরল । নিশীথবাবু যেন একটু ব্যস্ত হয়ে বললেন, ‘আসুন ।’ আমরা পুঁথির মালিককে ধন্যবাদ জানিয়ে নীচে রওনা দিলাম ।

‘ডব্রলোকের পায়ে কী ব্যাপার ?’ ফেলুদা নীচে নামতে নামতে প্রশ্ন করল ।

‘ওঁকে গাউটে ধরেছে । গাঁটে বাত,’ বললেন নিশীথবাবু, ‘খুব শক্ত-সমর্থ লোক ছিলেন আগে । এই মাস তিনেক হল কাহিল হয়ে পড়েছেন ।’

‘যে ওষুধগুলো দেখলাম সে কি গাউটের ?’

‘আজ্ঞে হ্যাঁ । কেবল একটা ঘুমের ওষুধ । লক্ষ্মণবাবুর দেওয়া ।’

‘গণৎকার লক্ষ্মণ ভট্টাচার্যি ?’ প্রশ্ন করলেন জালমোহনবাবু ।

‘আজ্ঞে হ্যাঁ । উনি অ্যালোপ্যাথি আয়ুর্বেদ দুটোই বেশ ভাল জানেন । বেশ কোয়ালিফায়েড লোক । অনেক কিছু জানেন ।’

‘বটে ?’

‘কতরি সঙ্গে মাঝে মাঝে পুঁথি নিয়েও কথাবার্তা বলতে শুনিচি ।’

‘আশ্চর্য লোক !’ বললেন জটায়ু ।

ফেলুদার ভুরুটা যে কেন কুঁচকে রয়েছে সেটা বুঝতে পারলাম না ।

লালমোহনবাবুর ইচ্ছে ছিল লক্ষ্মণ ভট্টাচার্যের সঙ্গে ফেলুদার আলাপ করিয়ে দেবেন, কিন্তু সেটা আর হল না, কারণ গণংকারের দরজায় তালা। আমরা সাগরিকা থেকে বেরিয়ে হোটেলমুখো হলাম। সমুদ্রের ধারে ভিড় হয়ে গেছে এই পনেরো মিনিটের মধ্যেই, কারণ মেঘ পাতলা হয়ে গিয়ে সূর্যটা উকি মারব মারব করছে। ডাইনে রেলওয়ে হোটেলটা দেখা যাচ্ছে, ফেলুদা বলল এই ভিড়ের বেশির ভাগ লোকই নাকি ওই হোটেলের। আমরা ভিড় ছাড়িয়ে কয়েক পা যেতেই পিছন থেকে অচেনা গলায় ডাক এল।

‘মিস্টার মিস্ত্রি!’

অন্যদের থেকে একটু আলাগা হয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে একজন লম্বা ভদ্রলোক ফেলুদার দিকে চেয়ে হাসছেন। বোঝা যাচ্ছে ইনি বেশ কয়েকদিন সমুদ্রতটে ঘোরাফেরা করেছেন, কারণ সানগ্লাসটা খুলতেই চোখ থেকে কান অবধি একটা ফিকে লাইন দেখা গেল যেখানে চশমার ডাঁটিটা চামড়ায় রোদ লাগতে দেয়নি।

ভদ্রলোক আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। প্রায় ফেলুদার মতোই লম্বা, সুপুরুষ বলা চলে, কালো চাপ দাড়ি আর গোঁফটা বেশ হিসেব করে ছাঁটা, কালো ট্রাউজারের ওপর চিজব্রথের শার্টটা হাওয়ায় সঁটে আছে শরীরের সঙ্গে।

‘আপনার নাম শুনেছি,’ বললেন ভদ্রলোক। ‘এসেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন নাকি?’

‘কেন বলুন তো?’

‘একটা খুন হয়েছে শুনলাম যে। তাই ভাবলাম আপনি আবার জড়িয়ে পড়লেন কি না।’

ফেলুদা হেসে বলল, ‘খুন হলেই জড়িয়ে পড়তে ইচ্ছে হয় ঠিকই, কিন্তু কেউ না ডাকলে আর কী করে যাই বলুন।’

‘আপনি তো নীলাচলে উঠেছেন?’

‘আজ্ঞে হ্যাঁ।’

‘হোটলে ফিরছেন?’

‘হ্যাঁ।’

‘ইয়ে—’

ভদ্রলোক কী যেন বলতে গিয়ে ইতস্তত করছেন। ফেলুদা বলল, ‘আপনাকে খুঁধি আংটি সামলাতে হচ্ছে?’

এটা আমি আগেই লক্ষ করেছি। ভদ্রলোক ডান হাতের তেলোয় তিনটে সোনার আংটি নিয়ে রয়েছেন, ফলে বেশ বোকা বোকা দেখাচ্ছে :

‘অ’র বলবেন না,’ বললেন ভদ্রলোক, ‘আমাদের হোটেলের এক বগিস্কা, কাজই আলাপ হয়েছে, জঙ্গে নামবেন, তা বললেন এগুলো নাকি আঙুল থেকে খুলে আসে। কলুন ভো কী বলি।’

আংটির মালিক যে কে সে আর বলতে হবে না। ওই যে, নুলিয়ার হাত ধরে ছপ্ ছপ্ করে এগিয়ে আসছেন তিনি। সোনায মোড়া মিঃ হিন্সেরানি। ফেলুদাকে দেখে ভদ্রলোক ‘গুড মর্নিং’ বলে একটা হাঁক দিলেন, তারপর আরও এগিয়ে এসে ‘থ্যাঙ্ক ইউ’ বলে আংটিগুলো ফেরত নিয়ে আঙুলে পরে জানিয়ে নিলেন যে গোয়া, ওয়াইকিকি, মায়ামি, আকাপুলকো, নিস্ ইত্যাদি অনেক জায়গার সমুদ্রতটের অভিজ্ঞতা আছে তাঁর, কিন্তু পুরীর মতো বিচ নাকি কোথাও নেই।

নতুন ভদ্রলোকটি এবার হিন্সেরানির কাছে বিদায় নিয়ে আমাদের সঙ্গে নিলেন। ফেলুদা বলল, ‘আপনার নামটা কিন্তু এখনও জানা হয়নি।’

ভদ্রলোক বদু হেসে বললেন, ‘আমার নাম বললে হয়তো চিনবেন না, একটা বিশেষ লাইনে আমার কিছুটা কনট্রিবিউশন আছে, তবে সেটা সকলের জানানোর কথা নয়। আমার নাম বিলাস মজুমদার।’

ফেলুদা তুর কুঁচকে ভদ্রলোকের দিকে চাইল। —‘আপনার কি পাহাড়-টাহাড়ের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক আছে?’

ভদ্রলোক অবাক। —‘বাবা, আপনার জ্ঞানের পরিধি দেখছি—’

‘না, না,’ ফেলুদা বিলাসবাবুর কথা শেষ করতে দিল না—‘তেমন কিছু নয়। গত মাসখানেকের মধ্যে কোথায় যেন বিলাস মজুমদার নামটা দেখেছি—বোধহয় কোনও পত্রিকায় বা খবরের কাগজে। মনে হচ্ছে ভাতে মাউন্টেনিয়ারিং বা ওই জাতীয় কিছুর উল্লেখ ছিল।’

‘ঠিকই দেখেছেন। আমি মাউন্টেনিয়ারিং শিখেছিলাম দার্জিলিং-এর ইনস্টিটিউটে। আমার আসল কাজ হচ্ছে ওয়াইল্ড-লাইফ ফোটোগ্রাফি। একটা জাপানি দলের সঙ্গে স্নো-লেপার্ডের ছবি তুলতে যাবার কথা ছিল। জানেন বোধহয়—হিমালয়ের হাই অলটিটিউডে স্নো-লেপার্ডের আবাসনা। দেখেছে অনেকেই, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনও ছবি তোলা সম্ভব হয়নি জানোয়ারটার।’

পথে আর কোনও কথা হল না। লালমোহনবাবু বার বার সপ্রশংসে দৃষ্টিতে ভদ্রলোকের দিকে দেখছেন সেটা লক্ষ করেছি।

হোটলে ফিরে এসেই ফেলুদা চাবের অভরি দিল। ভদ্রলোক চেয়ারে বসে প্রথমেই পকেট থেকে একটা ছবি বার করে আমাদের দিকে এগিয়ে দিলেন।

‘দেখুন ভো একে চেনেন কি না।’

পোস্টকার্ড সাইজের ছবি। মাটিতে উবু হয়ে বসা চ্যাপ্টা টুপি পরা একটা লোক একটা অঙ্কুরত জানোয়ারকে জাপটে ধরে আছে, আর আট-দশজন লোক সেই জানোয়ারটাকে দেখছে। মিঃ মজুমদার যে লোকটির দিকে আঙুল দেখাচ্ছেন তাঁকে আমরা চিনি।



‘এঁর কাছ থেকেই তো আসছি আমরা,’ বলল ফেলুদা, ‘যদিও চিনতে একটু সময় লাগে, কারণ ডব্লোক দাড়ি রেখেছেন।’

মিঃ মজুমদার ছবিটা ফেরত নিয়ে বললেন, ‘এইটেই আমার দরকার ছিল। বাড়ির গেটে ‘ডি. জি. সেন’ নাম দেখলাম, কিন্তু তিনি এই ছবির ডি. জি. সেন কি না সে বিষয়ে শিওর হতে পারছিলাম না।’

‘জানোয়ারটি প্যাস্কেলিন বলে মনে হচ্ছে!’ বলল ফেলুদা।

ঠিক তো!—ওই প্যাস্কেলিন নামটা কিছুতেই মনে পড়ছিল না। একরকম পিসীলিকাভুক্ত। দেখে মনে হয় গায়ে বর্ম পরে রয়েছে।

বিলাসবাবু বললেন, ‘প্যাস্কেলিনই ঝটে। নেপালে পাওয়া যায়। কাঠমাণ্ডুর এক হোটেলের বাইরে তোলা। ডি. জি. সেন ছিলেন তখন ওই হোটеле। আমিও ছিলাম।’

‘এটা কবেকার ঘটনা?’

‘গত অক্টোবরে। আমি গেছি সেই জাপানি টিম আসবে বলে। জাপানের কাগজেও আমার তোলা ছবি-টবি বেরিয়েছে। জাপানি দলটা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে। স্বভাবতই আমি খুব উৎসাহিত হয়ে পড়ি। কিন্তু শেষ অবধি আর যাওয়া হয়নি।’

‘কেন, কেন?’ ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করলেন জটায়ু। বুকলাম লেপার্ড-টেপার্ড শুনে ডব্লোক একটা রোমাঞ্চের গন্ধ পেয়েছেন।

‘কপাল !’ বললেন মিঃ মজুমদার । ‘একটা অ্যান্ড্রিডেস্টে জখম হয়ে হাসপাতালে পড়ে ছিলাম তিন মাস ।’

‘আপনার বাঁ পা কি জখম পা ?’ হঠাৎ প্রশ্ন করল ফেলুদা ।

‘কেন বলুন তো ? বাঁ পায়ের শিন্ বোনটা ভেঙেছিল বটে ; কিন্তু আমার হাঁটা দেখলে কি বোঝা যায় ?’

‘তা যায় না,’ বলল ফেলুদা, ‘কাল একটা পায়ের ছাপ দেখেছিলাম বালিতে—জুতো-পরা পা, সঙ্গে-সঙ্গে বাঁ পাশে লাঠির ছাপ । ভাবলাম, হয় নাটা, না হয় বাঁ পায়ে জখম । তা আপনি লাঠি ব্যবহার করেন না দেখছি ।’

‘মাঝে মাঝে করি,’ বললেন বিলাস মজুমদার, ‘কারণ বালিতে হটিতে কষ্ট হয় । কিন্তু উনচল্লিশ বছর বয়সে হাতে লাঠি ধরতে ইচ্ছে করে না ।’

‘তা হলে জ্ঞান কেউ হবে ।’

‘অবিশিষ্ট শিন্ বোন ভাঙাই একমাত্র ইনজুরি নয় । শাহাড়ের গা দিয়ে পাঁচশো ফুট গড়িয়ে পড়েছিলাম । একটা গাছের উপর পড়ি তাই জখমটা তবু কম হয় । এক চাকার ছেলে কয়েকজন হিপিকে খবর দেয়, ভাঙাই আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যায় । শিন্ বোন ছাড়া সাতটা পাঁজরের হাড় আর কলার বোন ভেঙেছিল । দুতনি খোঁতলে গিয়েছিল ; দাড়ি যেখেঁচি ক্ষতচিহ্ন ঢাকবার জন্য । দুদিন পরে জ্ঞান হয় । স্মৃতিশক্তি তখনই হয়ে গিয়েছিল । জঙ্গলি থেকে নাম ঠিকানা বার করে কলকাতার বাড়িতে খবর দেয় । এক ভাইপো জল আসে । তাকে চিনতে পারিনি । হাসপাতালে থাকতেই কিছুটা স্মৃতি ফিরে আসে । চিকিৎসার ফলে আরও খানিকটা ইম্প্রুভ করেছে, কিন্তু অ্যান্ড্রিডেস্টের ঠিক অগ্রসর ঘটনা এখনও ঠিক মনে পড়েনি । যেমন, ডি. জি. সেন বলে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, সেটা আমার ডায়রিতে পাঞ্জি কিন্তু তার চেহারাটা মনে পড়েছে স্বপ্ন দুদিন আগে ।’

‘ডি. জি. সেন কেন গিয়েছিল কাঠমাণ্ডু, সেটা মনে পড়ছে ?’ ফেলুদা জিজ্ঞেস করল—‘পুঁথি সংক্রান্ত কোনও ব্যাপার কি ?’

‘পুঁথি ?’ একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক । —‘যা দিয়ে মালা গাঁথে ?’

‘না,’ ফেলুদা হেসে বলল । —‘পুঁথি বা পুঁথি । পুস্তিক । হাতে লেখা প্রাচীন বই । ভদ্রলোকের খুব ভাল কালেকশন আছে পুঁথির ।’

‘ও, তাই বলুন ।’

ভদ্রলোক চুপ করে কী যেন ভাবলেন । তারপর বললেন, ‘কী রকম দেখতে হয় বলুন তো এই পুঁথি ?’

‘সরু, লম্বা, চ্যান্টা,’ বলল ফেলুদা । —‘ধরুন স্টেট এন্ট্রপ্রেসের একটা কার্টনের সাইজ । তার চেয়ে একটু ছোট বা বড়ও হতে পারে । সাধারণত শালুতে মোড়া থাকে ।’

ভদ্রলোক আবার কিছুক্ষণ চুপ । একদৃষ্টে চেয়ে আছেন টেবিল ল্যাম্পটার দিকে, আর আমরা চেয়ে আছি ভদ্রলোকের দিকে ।

বেশ মিনিটখানেক পরে বিলাস মজুমদার বললেন, ‘তা হলে বলি শুনুন ।’

কাঠমাণ্ডুতে যে হোটেল ছিলাম, বিক্রম হোটেল, সেখানে ভারী এক অদ্ভুত ব্যাপার ছিল। দু'একটা ঘর ছিল যার চাবি অন্য ঘরে লেগে যেত—যেটা হোটেলের কখনওই হবার কথা না। একদিন আমি আমার ঘরের চাবি নিয়ে ভুল করে আমার পাশের ঘরের দরজায় লাগিয়ে ঘোরাতেই দরজা খুলে গেল। সেটা ছিল ডি. জি. সেন-এর ঘর। প্রথমে ঠিক ধরতে পারিনি। ভাবছি আমার ঘরে এরা কারা, ঢুকল কী করে। আসল ব্যাপারটা বুঝতেই সারি বসে বেরিয়ে আসি, কিন্তু ততক্ষণে একটা ঘটনা আমি দেখে ফেলেছি। খাটে বসে আছেন মিঃ সেন, আর চেয়ারে দুটি অচেনা লোক, তাদের একজন একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স থেকে একটি প্যাকেট বার করছে। যতদূর মনে পড়ে প্যাকেটটা ছিল লাল, তবে সেটা কাগজ কি কাপড় তা মনে নেই।

‘তারপর?’ ফেলুদা প্রশ্ন করল।

‘তারপর বাক্স। অনেক চেষ্টা করেও মনে করতে পারিনি। এর পরের মেমরি হচ্ছে হাসপাতালে জ্ঞান হওয়া।’

লালমোহনবাবু হঠাৎ জীবন ব্যাপ্ত হয়ে উঠলেন—‘আরে মশাই, এমন ভাল গণকর রয়েছেন এই পুরীতে, আপনি তার কাছে যান না একবারটি। যা ভুলে গেছেন, সব ডিটেলে বলে দেবেন।’

‘কার কথা বলছেন?’

‘লক্ষণ ভট্টাচার্য্য দি গ্রেট। ওই ডি. জি. সেনেরই বাড়ির এক তলার ডাডাটে। যদি দ্বিধা হয় তো বলুন, আমি আপয়েন্টমেন্ট করে আমিই আপনাকে নিয়ে যাব। আপনি একটবার ট্রায়াল দিয়ে দেখুন।’

‘বলছেন?’

ভদ্রলোকের যেন আইডিয়াটা ভালই লেগেছে।

‘একশোবার!’ বললেন লালমোহনবাবু—‘আপনার কপালে ওই আঁচিলটার উপর আঙুল রেখে সব গড়গড় করে বলে দেবেন।’

এটা এতক্ষণ বলা হয়নি—বিলাসবাবুর কপালের ঠিক মত্থানে একটা আঁচিল, হঠাৎ দেখলে মনে হবে ভদ্রলোক বুদ্ধি টিপ পরেছেন।

‘ভদ্রলোক কি ডিজিটর আল্ট্রি করেন?’ ফেলুদা প্রশ্ন করল।

‘হোয়াই নট?’ বললেন লালমোহনবাবু। ‘আপনি আর তপেশ যাবেন তো? সে আমি ঠেকে বলে রাখব, কোনও চিন্তা নেই।’

ঠিক হল, আজই সন্ধ্যা ছটায় আপয়েন্টমেন্ট করা হবে। ভদ্রলোকের ফি পাঁচ টাকা পঁচাত্তর শুনে বিলাসবাবু হেসেই ফেলেছিলেন কিন্তু ফেলুদা হিসেব করে দেখিয়ে দিল দশজন খন্দের হলেও ভদ্রলোকের মাসিক আয় হয়ে যায় প্রায় দু হাজার টাকা।

আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম যে নিজের ভাগ্য গণনা করার ইচ্ছে না থাকলেও, বিলাস মজুমদারের স্মৃতি উদ্ধার হয় কি না দেখার জন্য ফেলুদার যথেষ্ট কৌতূহল রয়েছে।

আজ ঠিকই করে রেখেছিলাম যে বিকেলে একটু মন্দিরের দিকটায় যাব। মন্দিরের চেয়েও রথটা দেখার ইচ্ছে বেশি। ফেলুদার কাছেই শুনলাম যে এই বিশাল রথ নাকি প্রতিবারই রথযাত্রার পর ভেঙে ফেলা হয় আর তার কাঠ দিয়ে খেলনা তৈরি করে বাজারে বিক্রি করা হয়। পরের বছর আবার ঠিক একই রকম নতুন রথ তৈরি হয়।

যাবার পথে ফেলুদাকে কেন যেন অন্যান্যমনে মনে হচ্ছিল। হয়তো এই দুদিনে নতুন আলাপীদের সঙ্গে যে সব কথাবার্তা হয়েছে, সেগুলো ওর মাথায় ঘুরছিল। একটা কথা ওকে না বলে পারলাম না—

‘আচ্ছা ফেলুদা, নেপালটা কী রকম বারবার এসে পড়ছে, তাই না? যে লোকটা খুন হল সে নেপালের লোক, বিলাসবাবু কাঠমাণ্ডু গিয়েছিলেন, দুর্গাগতিবাবু ঠিক সেই সময় কাঠমাণ্ডুতে ছিলেন...’

‘তুই কি এতে কোনও তাৎপর্য খুঁজে পেলি?’

‘না। তবে—’

‘সমপাত মানে জানিস?’

‘না তো।’

‘সমপাত হল ইংরিজিতে যাকে বলে কোইনসিডেন্স। যতক্ষণ না আরও এভিডেন্স পাওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ কাঠমাণ্ডুর ব্যাপারটা একটা কোইনসিডেন্স বলে ধরতে হবে—ঝুঝি?’

‘ঝুঝি।’

পুরীর বিখ্যাত রথ দেখে মন্দিরের সামনে বিশাল চওড়া রাস্তার একপাশে দোকানগুলোয় ঘুরে ঘুরে পাথরের তৈরি খুদে খুদে মূর্তি, কোনারকের ঢাকা, এইসব দেখছি, এমন সময় সাব-ইনস্পেক্টর মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্রের আবির্ভাব। হঠাৎ চিনতে পারিনি, কারণ এই ফাঁকে কখন জানি চুল ছেঁটে এসেছেন। আমাদের এক দূর সম্পর্কের কাকা আছেন, যিনি হেয়ার কাটিং সেলুনে চেয়ারে বসলেই ঘুমিয়ে পড়েন; ফলে নাপিত বেহিসাবি কিছু করলেও টের পান না। ঘুম ভাঙার পর অবিশ্যি প্রতিবারই কুরুক্ষেত্র বেধে যায়। মহাপাত্রকে দেখে মনে হল এনারও সে বাতিক আছে।

ফেলুদা ভদ্রলোককে দেখে জিজ্ঞেস করল, ‘তদন্ত এগোল? মেহেরালি রোডের মিস্টার সরকার কী বলেন?’

‘ইনফরমেশন এসেছে আজ আড়াইটেয়,’ বললেন মহাপাত্র। ‘চোন্দা নম্বর মেহেরালি রোড হল একটা ফ্ল্যাট বাড়ি! সবসুদ্ধ আটটা ফ্ল্যাট, সরকার থাকেন তিন নম্বরে। দিন সাতেক হল ঐ ঘর ভাড়াবদ্ধ। প্রায়ই নাকি বাইরে যান।’

‘এবার কোথায় গেছেন জানতে পারলেন?’

‘পুরী।’

‘বটে? কে বলল?’

‘চার নম্বরের বাসিন্দা। তাকে নাকি বলেছে চেক্কে যাচ্ছে।’

‘চেহারা কেমন জানতে পারলেন?’

‘লম্বা, মাঝারি রং, দাড়ি-গোফ নেই, বয়স পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ। এ ধরনের বর্ণনার অবিশিষ্ট কোনও মূল্য নেই।’

‘পেশা?’

‘বলে ট্রাভেলিং সেলসম্যান। কী সেল করে তা কেউ জানে না। বছর ধানেক হল ওই ফ্ল্যাটে এসেছে।’

‘আর রূপচাঁদ সিং?’

‘সে এখানে এসেছে গতকাল সকালে। বাসস্ট্যান্ডের কাছে একটা হোটেল ছিল। ভাড়া চুকোয়নি। কাল রাতে নাকি একটা ফোন করতে চেয়েছিল হোটেল থেকে, ফোন খারাপ ছিল। শেষে একটা ডাঙারি দোকান থেকে কাজ সারে। কম্পাউন্ডার পাশেই দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু খন্দের ছিল বলে কী কথা হয়েছে তা শোনেনি! এগারোটা নাগাদ হোটেল থেকে বেরোয়। আর ফেরেনি। ঘরে একটা সুটকেস পাওয়া গেছে, তাতে জামা-কাপড় রয়েছে কিছু। দুটো টেরিলিনের শার্ট দেখে মনে হয় লোকটা বেশ শৌখিন ছিল।’

‘সেটা কিছুই আশ্চর্য না,’ বলল ফেলুদা, ‘আজকাল ড্রাইভারের মাইনে আপিসের কেয়নির চেয়ে অনেক বেশি।’

কথাই ছিল রেলওয়ে হোটেল থেকে বিলাসবাবুকে আমরা ড়াল নেব; ছটা বাজতে পনেরো মিনিটে আমরা হোটলে গিয়ে হাজির হলাম। ব্রিটিশ আমলের হোটেল, এখন রং ফেরানো হলেও চেহারা পুরনো যুগের ছাপটা রয়ে গেছে। সামনে বাগান, সেখানে রঙিন ছাতার তলায় বেতের চেয়ারে বসে হোটেলের বাসিন্দারা চা খাচ্ছে। তারই একটা থেকে উঠে পাশের চেয়ারে বসা দুজন সাহেবকে ‘এক্সকিউজ মি’ বলে বিলাসবাবু আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন।

‘চলুন, রূপালী কী আছে দেখা যাক।’

আজ লালমোহনবাবু আমাদের গাইড, তাই তাঁর হাবভাব একেবারে পালটে গেছে। দিবা গটগটিয়ে সাগরিকার গেট দিয়ে ঢুকে বাগানের মধ্যখানের নুড়ি ফেলা পথ দিয়ে সটান গিয়ে বারান্দায় উঠে কাউকে না দেখে একটু থতমত খেয়ে তৎক্ষণাৎ আবার নিজেকে সামলে নিয়ে সাহেবি মেজাজে ‘কোই হাম’ বলতেই বাঁদিকে একটা দরজা খুলে গেল।

‘স্বাগতম!’

বুঝলাম ইনিই লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য। পরনে সিঁকের লুঙ্গি আর চিকণের কাজ করা

সাদা আঙ্গুর পাঞ্জাবি। মাঝারি হাইটের চেহারার বিশেষত্ব হল সবুজ গোলকটা, যেটা
ঠোঁটের দুপাশ দিয়ে প্রায় আধ ইঞ্চি নেমে এসেছে নীচের দিকে।

লালমোহনবাবু আলাপ করতে যাচ্ছিলেন, ভদ্রলোক বাধা দিয়ে বললেন, 'ওটা
ভিতরে গিয়ে হবে। আসুন।'

লক্ষণ ভট্টাচার্যের বৈঠকখানার বেশির ভাগটা দখল করে আছে একটা
তক্তপোশ; বুঝলাম ওটার উপরে বসেই ভাষণগণনা হয়। এ ছাড়া আছে দুটো
কাঠের চেয়ার, একটা মোড়া, একটা নিচু টেবিলের উপর ওড়িশা হ্যান্ডিক্রাফটসের
একটা অ্যাশট্রে, আর পিছনে একটা দেয়ালের আলমারিতে দুটো কাঠের বাস, কিছু
বই, কিছু শিশি-বোতল-বয়াম ইত্যাদি ওষুধ রাখার পাত্র, আর একটা ওয়েস্ট এন্ড
অ্যালার্ম ঘড়ি।

'আপনি বসুন এইখেনটায়'—তক্তপোশের একটা অংশ দেখিয়ে বিলাসবাবুকে
বললেন গণংকার।—'আর আপনারা এইখানে।'

চেয়ার আর মোড়া দখল হয়ে গেল।

লালমোহনবাবু এইবারে আমাদের সঙ্গে আলাপটা করিয়ে দিলেন। ফেলুদার
বিষয় বললেন, 'ইনিই আমার সেই বন্ধু,' আর বিলাস মজুমদারের নামটা বলে 'ইনি
হচ্ছেন বিখ্যাত ওয়াই'—বলেই জিভ কেটে চুপ করে গেলেন। আমি জানি উনি
বলতে গিয়েছিলেন ওয়াইল্ড লাইফ কোটোগ্রাফার; নিজের বুদ্ধিতেই যে নিজেকে
সামলে নিয়েছেন সেটা আশ্চর্য বলতে হবে।

ফেলুদা বোধহয় কলেক্টারিটা চাপা দেবার জন্যই বলল, 'আমরা দুজন
অতিরিক্ত লোক এসে পড়েছি বসে আশা করি আপনি বিরক্ত হননি।'

'মোটাই না,' বললেন লক্ষণ ভট্টাচার্য।—'আমার আপত্তি যেটাতে সেটা হচ্ছে
স্টেজে উঠে ডিমনার্শন দেওয়ায়। সে অনুরোধ অনেকেই করেছে। আমি যে
যাদুকর নই সেটা অনেকেই বিশ্বাস করতে চায় না। এই যেমন—'

ভদ্রলোকের কথা থেমে গেল। তাঁর দৃষ্টি চলে গেছে বিলাস মজুমদারের
দিকে।—'কী আশ্চর্য!' বললেন লক্ষণ ভট্টাচার্য—'আপনার কপালে ঠিক থার্ড
আই-এর জায়গায় দেখছি একটি উপমাংস!'

উপমাংস মানে যে আঁচিল সেটা জানতাম না।

'ঠিক ওইখানে খুলির আবরণের তলায় কী থাকে জানেন তো?' ভদ্রলোক
ফেলুদার দিকে চেয়ে প্রশ্নটা করলেন।

'পিনিয়াল গ্ল্যান্ডের কথা বলছেন?' ফেলুদা বলল।

'হ্যাঁ—পিনিয়াল গ্ল্যান্ড। মানুষের মগজের সবচেয়ে রহস্যময় অংশ। অন্তত
পশ্চিমের বৈজ্ঞানিকরা তাই বলেন। আমরা যদিও জানি যে ওটা আসলে প্রমাণ
করে যে আদিম যুগে প্রাণীদের তিনটি করে চোখ ছিল, দুটি নয়। ওই থার্ড
আইটাই এখন হয়ে গেছে পিনিয়াল গ্ল্যান্ড। নিউগিনিতে একরকম সরীসৃপ আছে,
নাম টারটুগা, যার মধ্যে এখনও এই থার্ড আই দেখতে পাওয়া যায়।'

ফেলুদা বলল, 'আপনার কপালে আঙুল রাখার উদ্দেশ্য কি এই পিনিয়াল
গ্ল্যান্ডের সঙ্গে যোগস্থাপন করা?'

‘তা একরকম তাই বলতে পারেন,’ বললেন লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য । —‘অবিশ্যি যখন প্রথম শুরু করি তখন পিনিয়াল গ্ল্যান্ডের নামও শুনিনি । জগৎকে ইনস্টিটিউশনে ক্লাস সেভেনে পড়ি তখন । এক রবিবার আমার জ্যাঠামশাইয়ের মাথা ধরল । বললেন, ‘লখনা, আমার মাথাটা একটু টিপে দিবি ? আমি তোকে আইসক্রিমের পয়সা দেব ।’ কপাল টনটন করছে, কপালের মধ্যখানে বুড়ো আঙুল আর তর্জনী নিয়ে টিপছি, এমন সময় অভূত একটা ব্যাপার হল । চোখের সামনে বায়োস্কোপের ছবির মতো পরপর দেখতে লাগলাম—জ্যাঠার পৈতে হচ্ছে, জ্যাঠা পুলিশের ভ্যানে উঠছেন—মুখে বন্দেমাতরম্ স্লোগান, জ্যাঠার বিয়ে, জেঠিয়ার মৃত্যু, এমনকী জ্যাঠার নিজের মৃত্যু পর্যন্ত, কীসে মরছেন, কোন খাটে শুয়ে মরছেন, খাটের পাশে কে কে রয়েছেন, সব । ...তখন কিঙ্কু বলিনি, কিন্তু এই মৃত্যুর ব্যাপারটা যখন অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল, তখন...বুঝতেই পারছেন—’

লালমোহনবাবুকে দেখে বেশ খুঁচছিলাম যে ঠাঁর গায়েই লোম খাড়া হয়ে উঠেছে । বিলাসবাবু দেখলাম একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছেন গণৎকারের দিকে ।

ফেঙ্গুদা বলল, ‘আপনি তো শুনেছি ডাক্তারিও করেন, আর তার চিহ্নও দেখছি ঘরে । নিজেকে কী বলেন—ডাক্তার, না গণৎকার ?’

‘দেখুন, গণনার ব্যাপারটা আমি শিখিনি । আয়ুর্বেদটা শিখেছি । অ্যালোপ্যাথিও যে একেবারে জ্ঞানি না তা নয় । পেশা কী জিজ্ঞেস করলে ডাক্তারিই বলব । আসুন, এগিয়ে আসুন, কাছে এসে বসুন ।’

শেষের কথাগুলো অবিশ্যি বিলাসবাবুকে বলা হল । ভদ্রলোক এগিয়ে এসে তক্তপোশে পা তুলে বাবু হয়ে বসে বললেন, ‘দেখুন, কপালের ব্র্যাক স্পটটি যদি ইনফরমেশনের সহায়ক হয় ।’

লক্ষ্মণবাবুর পাশেই যে একটা ছোট্ট অ্যালুমিনিয়ামের বাটি রাখা ছিল সেটা এতক্ষণ লক্ষ করিনি । তার মধ্যে তরল পদার্থটা যে কী তা জ্ঞানি না, কিন্তু দেখলাম লক্ষ্মণবাবু তাতে ডান হাতের কড়ে আঙুলের ডগাটা তিনবার চুবিয়ে নিলেন । তারপর একটা ধবধবে পরিষ্কার রুমালে আঙুলটা মুছে নিয়ে চোখ বুঁজে মাথা হেঁট করে আঙুলের ডগাটা মোক্ষম আন্দাজে ঠিক বিলাসবাবুর কপালের আঁচিলের উপর বসিয়ে দিলেন !

তারপর মিনিটখানেক সব চুপ । সবাই চুপ । কেবল ঘড়ির টিকটিক আর—এই প্রথম খেয়াল হল—বাইরে থেকে আসা একটানা ঢেউ ভাঙার শব্দ ।

‘তেত্রিশ—তেত্রিশ—উনিশ শো তেত্রিশ—তুলা লগ্ন, সিংহ রাশি—পিতামাতার প্রথম সন্তান...’

লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য চোখ বন্ধ করেই বলতে শুরু করেছেন ।

‘সাড়ে আটে টনসিল অ্যাডিনয়েডস— পরীক্ষায় বৃদ্ধি— স্বর্ণপদক...বিজ্ঞান— পদার্থ বিজ্ঞান— উনিশে গ্র্যাজুয়েট— তেইশে উপার্জন শুরু— চাক...না, চাকরি না— ফ্রিলান্স— ফটোগ্রাফার— ষ্ট্রাগল...ষ্ট্রাগল দেখছি, ষ্ট্রাগল— উদ্যম, একগ্রতা, অধ্যবসায়— পর্বতারোহণে পটুতা— বন্যপশুপক্ষী-প্ৰীতি— বেপরোয়া জীবন— ভ্রাম্যমাণ— অকৃতদার...’



ভদ্রলোক একটু থামলেন। ফেলুদা গভীর মনোযোগের সঙ্গে ওড়িশা হ্যান্ডিক্রাফটসের আশাটোটা দেখছে। লালমোহনবাবু হাতদুটো মুঠো করে টান হয়ে বসেছেন। আমার বুক টিপ টিপ করছে। বিলাসবাবুর মুখ দেখলে কিছু বোঝার উপায় নেই, তবে ওঁর চোখ যে গগনকারের দিক থেকে একবারও সরেনি, সেটা আমি লক্ষ করেছি।

‘সেভেনটি এইট—সেভেনটি এইট...’

আবার কথা শুরু হয়েছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। বেশ স্ট্রেন হচ্ছে ভদ্রলোকের সেটা বোঝা যায়।

‘বন দেখছি, বন—হিমালয়—অপঘাত—অপ—না—’

পাঁচ সেকেন্ড চুপ থেকে ভদ্রলোক হঠাৎ বিলাসবাবুর কপাল থেকে আঙুল নামিয়ে নিয়ে চোখ খুললেন। তারপর সটান বিলাসবাবুর দিকে চেয়ে বললেন, ‘আপনার বেঁচে থাকার কথা নয়, কিন্তু রাখে হরি মারে কে?’

‘অ্যাক্সিডেন্ট নয়?’ বিলাসবাবু ধরা গলায় প্রশ্ন করলেন।

লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য মাথা নেড়ে পকেট থেকে পানের ডিবে বার করে একটা পান মুখে পুরে বললেন, ‘যতদূর দেখছি, নট অ্যাক্সিডেন্ট। আপনাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল পাহাড়ের প্রান্ত থেকে। অর্থাৎ, ডেলিবারেট অ্যাটেম্প্ট অ্যাট মার্ডার। মরেননি সেটা আপনার পরম ভাগ্যি।’

‘কিন্তু কে ঠেলল সেটা—?’

প্রশ্নটা করেছেন লালমোহনবাবু। লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য মাথা নাড়লেন। —‘স্যরি।

হা দেখেছি তার বাইরে বলতে পারব না । বললে মিথ্যে বলা হবে । দেবতা রুষ্ট
হবেন ।’

‘দিন আপনার হাতটা ।’

বিলাসবাবু করমর্দনের জন্য তাঁর ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছেন লক্ষ্মণ ভট্টাচার্যের
দিকে ।

‘এটাকে কী বলবেন ? ফাইভ স্টার না সিল্ল স্টার ?’ লালমোহনবাবুকে প্রশ্নটা করল ফেলুদা ।

আমরা রেলওয়ে হোটেলে এসেছি ডিনার খেতে । বিলাসবাবু সাগরিকা থেকে বেরিয়েই আমাদের নেমস্তন্ন করলেন । বললেন, ‘আপনারা আমার অশেষ উপকার করেছেন ; আমার এই অনুরোধটা রাখতেই হবে ।’

রেলওয়ে হোটেলের খাওয়া যে অপূর্ব তাতে কোনও সন্দেহ নেই আর সেটা লালমোহনবাবুও না স্বীকার করে পারলেন না । বললেন, ‘রেলের খাওয়ার যা ছিরি হয়েছে আজকাল মশাই, আমি ভাবলুম রেলওয়ে হোটেলের খাওয়াও বুঝি সেই স্ট্যান্ডার্ডের হবে । সে ভুল ভেঙে গেছে—থ্যাক্স টু ইউ ।’

বিলাসবাবু হেসে বললেন, ‘এবার সুফ্লেটা খেয়ে দেখুন ।’

‘কী খাব সুপ প্লেটে ? সুপ তো গোড়াতেই খেলুম ।’

‘সুপ প্লেট নয় । সুফ্লে—মিষ্টি ।’

এই সুফ্লে খেতেই বিলাসবাবু লক্ষ্মণ ভট্টাচার্যের দৌলতে মনে পড়ে যাওয়া ঘটনাটা বললেন । —

‘মিস্টার সেনের ঘরে দেখা সেই ঘটনাটা আমার মনে কোনওরকম খটকার সৃষ্টি করেনি । পরদিন ভদ্রলোক পোখরা যাচ্ছিলেন ; আমাকে সঙ্গে যাবার জন্য ইনভাইট করলেন । জাপানি দল আসতে আরও তিনদিন দেরি, তাই রাজি হয়ে গেলুম । পোখরা কাঠমাণ্ডু থেকে প্রায় দুশো কিলোমিটার । পথে একটা জঙ্গল পড়ল, ভদ্রলোক সেখানে গাড়ি থামাতে বললেন । বললেন নাকি ভাল অর্কিড পাওয়া যায় ওই জঙ্গলে । আমিও ক্যামেরা নিয়ে নামলুম । আর কিছু না হোক, এক-আধটা ভাল পাখিও যদি পাই, তা হলেই বা মন্দ কী ?—আমি পাখি খুঁজছি, উনি অর্কিড । দুজনে ভাগ হয়ে গেছি, কথা আছে আধ ঘণ্টা বাদে দুজনেই গাড়িতে ফিরব । ওপরে গাছের দিকে চোখ রেখে এগোচ্ছি, এমন সময় পিছন থেকে মাথায় একটা বাড়ি, আর তারপরেই অন্ধকার ।’

ভদ্রলোক থামলেন । আর কিছু বলার নেই, কারণ বাকি ঘটনা উনি আগেই বলেছেন । ফেলুদা বলল, ‘আঘাতটা কে মেরেছিল সেটা সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিত নন ?’

বিলাসবাবু মাথা নাড়লেন । —‘একেবারেই না, তবে এটা বলতে পারি যে সেই জঙ্গলে ত্রিসীমানার মধ্যে আর কোনও মানুষ চোখে পড়েনি । গাড়িটা ছিল মেন

রোডে, প্রায় কিলোমিটার খানেক দূরে ।’

‘তা হলে অ্যাপ্টেপটেড মার্ভারটা যে মিঃ সেনের কীর্তি, আদালতে সেটা প্রমাণ করার কোনও উপায় নেই ?’

‘আজ্ঞে না, তা নেই ।’

লালমোহনবাবু কিছুক্ষণ থেকেই উশখুশ করছিলেন, এবার বুঝলাম কেন । ভদ্রলোক বললেন, ‘আপনি একবারটি সেনমশাইয়ের সামনে গিয়ে হাজির হন না । উনিই যদি কালপ্রিট হন, তা হলে আপনাকে দেখে বেশ একটা ভূত দেখার মতো ব্যাপার হতে পারে । সেটা মন্দ হবে কী ?’

‘সে কথা আমি ভেবেছি, কিন্তু সেখানে একটা মুশকিল আছে । উনি আমাকে নাও চিনতে পারেন । কারণ আমার তখন দাড়ি ছিল না । এটা রেখেছি খুতনির ক্ষতচিহ্নটা ঢাকবার জন্য ।’

আরও মিনিট পাঁচেক থেকে বিলাসবাবুকে ধন্যবাদ দিয়ে আমরা উঠে পড়লাম । ভদ্রলোক আমাদের গेट অবধি পৌঁছে দিলেন । মেথ কেটে গেছে, শুমোট ডাবটাও আর নেই । ফেলুদার পকেটে একটা ছোট্ট জোরালো টর্চ আছে জানি, কিন্তু ফিকে চাঁদের আলো থাকার দরুন সেটা আর জ্বালাবার দরকার হবে না ।

রাস্তা পেরিয়ে সমুদ্রের ধার অবধি বাঁধানো পথটা দিয়ে চলতে চলতে লালমোহনবাবু বললেন, ‘এবার ত্র্যাঙ্কলি বলুন তো মশাই, কী রকম দেখলেন লক্ষ্মণ ভট্টাচার্যকে । তাজ্জব ব্যাপার নয় কি ?’

‘হতে পারে তাজ্জব,’ বলল ফেলুদা, ‘কিন্তু অত জেনেও গোয়েন্দার ভাত মারতে পারবে না । বিলাস মজুমদারকে দুর্গাগতি সেনই হত্যা করার চেষ্টা করেছিল কি না সেটা জানতে হলে ফেলু মিস্তির ছাড়া গতি নেই ।’

‘আপনি তদন্ত করছেন তা হলে ?’

চাঁদের আলোতেই বুঝলাম লালমোহনবাবুর চোখ ঝিলিক দিয়ে উঠেছে ।

ফেলুদা কী উত্তর দিত জানি না, কারণ ঠিক তখনই সামনে একজন চেনা লোককে দেখে আমাদের কথা খেমে গেল । মাটির দিকে চেয়ে আপন মনে বিড়বিড় করতে করতে ব্যস্তভাবে এগিয়ে আসছেন আমাদেরই পথ ধরে মিঃ হিন্ডোরানি ।

ভদ্রলোক আমাদের দেখে থমকে দাঁড়ালেন ; তারপর ফেলুদার দিকে আঙুল নেড়ে বেশ বাঁজের সঙ্গে বললেন, ‘ইউ বেঙ্গলিজ আর ভেরি স্টার্ন, ভেরি স্টার্ন !’

‘ইঠাৎ এই আক্রোশ কেন ?’ ফেলুদা হালকা হেসে ইংরিজিতে প্রশ্ন করল । ভদ্রলোক বললেন, ‘আই অফার্ড হিম টোয়েন্টি ফাইভ থাউজ্যান্ড, অ্যান্ড হি স্টিল সেড নো !’

‘পঁচিশ হাজারের লোভ সামলাতে পারে এমন লোক তা হলে আছে বিশ্বসংসারে ?’

‘আরে মশাই, ভদ্রলোক যে পুঁথি সংগ্রহ করেন সেটা আগে জানতাম । তাই অ্যাপপয়েন্টমেন্ট করে দেখা করতে গেলাম । বললাম তোমার সবচেয়ে ভাল্লুয়েবল



পিস কী আছে সেটা দেখাও। তৎক্ষণাৎ আলমারি খুলে দেখালেন—দ্বাদশ শতাব্দীর সংস্কৃত পুঁথি। অসাধারণ জিনিস। চোরাই মাল কি না জানি না। আমার তো মনে হয় গত বছর ভাতগাঁওয়ের প্যালেস মিউজিয়াম থেকে তিনটে পুঁথি চুরি গিয়েছিল, এটা তারই একটা। দুটো উদ্ধার হয়েছিল, একটা হয়নি। আর সেটাও ছিল প্রজ্ঞাপারমিতার পুঁথি।

‘হোয়ার ইচ্ছ ভাতগাঁও?’ জিজ্ঞেস করলেন লালমোহনদাবু। জামগাটার নাম আমিও শুনিনি।

‘কাঠমান্ডু থেকে দশ কিলোমিটার। প্রাচীন শহর, আগে নাম ছিল ভক্তপুর।’

‘কিন্তু চোরাই মাল কি কেউ চট করে দেখায়?’ ফেলুদা জিজ্ঞেস করল—‘আর

আমি হতদুর জগনি প্রজ্ঞাপারমিতার পুঁথি একটা নয়, বিস্তর আছে ।’

‘আই নো, আই নো,’ অসহিষ্ণুভাবে বললেন মিঃ হিঙ্গেরানি । ‘উনি বললেন এটা দজাই লামার সঙ্গে এসেছিল, উনি নাকি ধরমশালা গিয়ে কিনে এনেছিলেন । কত নিরে কিনেছিলেন জানেন ? পাঁচশো টাকা । আর আমি দিচ্ছি পঁচিশ ছাজার—ভেবে দেখুন !’

‘তার মানে কি বলছেন পুরী আসাটা আপনার পক্ষে ব্যর্থ হল !’

‘ওয়েল, আই ভোট গিড আপ সো ইজিসি । মহেশ হিঙ্গেরানিকে ভো চেনেন না মিস্টার সেন ! ঠাণ্ড আরেকটা ডাল পুঁথি আছে, ফিফটিন্থ সেনচুরি । আমাকে দেখালেন । আরও দুটো দিন সময় আছে হাতে । দেখা যাক কদিন ওর গো টেকে ।’

ভদ্রলোক সংক্ষেপে শুডনাইট জানিয়ে গজগজ করতে করতে চলে গেলেন হোটেলের দিকে ।

‘একটু সাসপিশাস লাগছে না ?’ লালমোহনবাবু প্রশ্ন করলেন । ফেলুদা বলল, ‘কার বা কীসের কথা বলছেন সেটা না জানলে বলা সম্ভব নয় ।’

‘পাঁচশ টাকা দিয়ে কেনা জিনিস পঁচিশ হাজারে ছাড়ছে না ?’

‘কেন, মানুষ নিলোভি হতে পারে এটা আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না ? সিধুজ্যাঠা দুর্গাগতিবাবুকে পুঁথি বিক্রি করতে বিঝিউজ করেছেন সেটা আপনি জানেন ?’

‘কই, সেটা ভো মিঃ সেন বললেন না ।’

‘সেটা ভো আমার কাছে আরও সাসপিশাস । ঘটনাটা ঘটেছে মাত্র এক বছর আগে ।’

‘আমার মনে হল দুর্গাগতিবাবু শুধু পিকিউলিয়ার নন, বেশ রহস্যজনক চরিত্র । আর বিলাসবাবু যা বলছেন তা যদি সত্যি হয়...

‘সাসপিশন কিন্তু একজনের উপর পড়ে নেই,’ বলল ফেলুদা, ‘নিউক্লিয়ার ফল-আউটের মতো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে । কাকে বান দেবেন বলুন । আপনার গণক্যার যে তৃতীয়-চক্র-সম্পন্ন সন্ন্যাসপের কথা বললেন, সেটার নাম টারাতুয়া নয়, টুয়াটুয়া । আর তার বাসস্থান নিউ গিনি নয়, নিউজিল্যান্ড । এ ধরনের ভুল ছটায়ুর পক্ষে অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু লক্ষণ ভট্টাচার্য যদি তার জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে লোককে ইমপ্রেস করতে চান, তা হলে তাঁকে আরও অ্যাকুরেট হতে হবে । তারপর ধরুন নিশীথবাবু । আড়িপাতার অভ্যাস আছে ভদ্রলোকের ; সেটা মোটেই ডাল নয় । তারপর দুর্গাগতিবাবু বললেন ওর গাউট হয়েছে কিন্তু ওর টেবিলের ওষুধগুলো গাউটের নয় ।’

‘তবে কীসের ?’

‘একটা ওষুধ ভো সবে গত বছর বেরিয়েছে, টাইম ম্যাগাজিনে পড়ছিলাম ওটার কথা । কীসের ওষুধ ঠিক মনে পড়ছে না, কিন্তু গাউটের নয় ।’

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘আচ্ছা, ভদ্রলোককে এত অন্যমনস্ক কেন মনে হয় বলো ভো ? আর তা ছাড়া বললেন, ওর ছেলেকে চেনেন না...’

‘সেটারও ভো কারণ ঠিক বুঝতে পারছি না ।’

লালমোহনবাবু বললেন, 'ধরুন যদি উনি সত্যিই বিলাস মজুমদারকে খুন করার চেষ্টা করে থাকেন, তা হলে সেটাই একটা অন্যমনস্কতার কারণ হতে পারে। এখানে অবিশ্যি অন্যমনস্কতা ইজ ইকুয়াল টু নার্ভসনেস।'

এখানে আমাদের কথা থেমে গেল। শুধু কথা না, হাঁটাও।

বালির উপরে জুতোর ছাপ, আর তার সঙ্গে সঙ্গে বাঁ পাশে লাঠির ছাপ।

ছাপটা হয়েছে গত কয়েক ঘণ্টার মধ্যে।

কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে বিলাসবাবু লক্ষ্মণ ভট্টাচার্যের বাড়ি থেকে সোজা হোটেলে ফিরে গিয়ে স্নান-টান সেরে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি এর মধ্যে আর নীচে আসেননি।

তা হলে এ ছাপ কার ?

আর কে বাঁ হাতে লাঠি নিয়ে হেঁটে বেড়ায় পুরীর বিচে ?

পরদিন সকালে আমরা চা খেয়ে বেরোব বেরোব ভাবছি, এমন সময় লালমোহনবাবুর গাড়ি চলে এল। ড্রাইভার হরিপদবাবু বললেন যে যদিও সকাল সকাল রওনা হয়েছিলেন, বালাসোরের ৩০ কিলোমিটার আগে নাকি প্রচণ্ড বৃষ্টি নামে, ফলে ওঁকে ঘণ্টা চারেক বালাসোরেই থাকতে হয়েছিল। গাড়ি নাকি দিব্যি এসেছে, কোনও ট্রাবল দেয়নি।

হরিপদবাবুর জন্য আমাদের হোটেলের কাছেই নিউ হোটেলে একটা ঘর বুক করে রাখা হয়েছিল, কারণ নীলাচলে জায়গা ছিল না। গাড়িটা নীলাচলে রেখে ভদ্রলোক চলে গেলেন নিজের হোটেলে। আমরা বলে দিলাম দিন ভাল থাকলে দুপুরের দিকে ভুবনেশ্বরটা সেরে আসতে পারি। একটার মধ্যে মন্দির-টন্দির সব দেখে ঘুরে আসা যায়।

ফেলুদা বলেই রেখেছিল সকালে একবার স্টেশনে যাবে। ওর আবার স্টেটসম্যান না পড়লে চলে না, হোটেলে দেয় শুধু বাংলা কাগজ।

হাঁটা পথে হোটেল থেকে স্টেশনে যেতে লাগে আধ ঘণ্টা। আমরা যখন পৌঁছলাম তখন পৌনে নটা। কলকাতা থেকে জগন্নাথ এক্সপ্রেস এসে গেছে সাতটায়; পুরী এক্সপ্রেস এক ঘণ্টা লেট, এই এল বলে। কোথাও যাবার না থাকলেও স্টেশনে আসতে দাক্ষিণ লাগে। বিশেষ করে কোনও বড় ট্রেন আসামাত্র ঠাণ্ডা স্টেশন কী রকম টগবগিয়ে ফুটে ওঠে, সে জিনিস দেখে দেখেও পুরনো হয় না।

বুক-স্টলে গিয়ে লালমোহনবাবু প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন বিখ্যাত রহস্যরোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক জটায়ুর কোনও বই আছে কি না। এটা করার কোনও মানে হয় না, কারণ ওই সিরিজের গোটা দশেক বই সামনেই রাখা রয়েছে, আর তার মধ্যে তিনটে যে জটায়ুর সেটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

ফেলুদা খবরের কাগজ কিনে অন্য বই ঘাটছে, এমন সময় একটা গলা পেলাম।

‘জ্যেষ্ঠের রহস্য মাসিকটা এসেছে?’

পাশ ফিরে দেখি নিশীথবাবু। ভদ্রলোক প্রথমে আমাদের দেখেননি; চোখ পড়তেই কান অবধি হেসে ফেললেন।

‘দেখুন। পাশে গোয়েন্দা দাঁড়িয়ে, আর আমি কিনছি রহস্য মাসিক।’

‘আপনার কন্স-এর কী খবর?’ ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

‘আর বলবেন না’, বললেন নিশীথবাবু, ‘অ্যাপয়েন্টমেন্ট না করে লোক চলে আসে, আর দেখা করার জন্য কুলোয়ুলি করে। পৃথিবী এত সমৃদ্ধদার আছে জানতুম না মশাই।’

‘আবার কে এল?’

‘লব্ধা, চাপ দাড়ি, চোখে কালো চশমা। নাম জানতে চাইলে বললেন নাম বললে চিনবেন না তোমার মনিব। বলো ভাল পৃথিবী স্বর আছে। বললুম কতাকি, বললেন নিয়ে এসো। হাতে নিয়ে গিয়ে বসালুম। আরও কিছু চিঠি টাইপ করার ছিল, ঘরে চলে গেছি, ও মা, তিন মিনিটের মধ্যেই হাঁকডাক। গিয়ে দেখি কতরি মুখ ফ্যাকাশে, এই বুঝি হার্ট ফেল করবেন। বললেন ঠিক নিয়ে যাও। ভদ্রলোককে তৎক্ষণাৎ নিয়ে চলে এসুম। সে আবার যাবার সময় বলে কী, তোমার মনিবের হার্টের ব্যামো আছে নিশ্চয়ই, ডাক্তার দেখাও!’

‘এখন কেমন আছেন উনি?’

‘এখন অনেকটা ভাল।’ ভদ্রলোক প্রাটফর্মের ঘড়িটার দিকে দৃষ্টি দিয়েই আঁতকে উঠেছেন—‘এত যে লেট হয়ে গেছে সেটা খেয়ালই করিনি। শুনুন মশাই আছেন তো কনি? একদিন সব বলব। সে অনেক ব্যাপার। আ—জ্ঞা!’

ইতিমধ্যে পুরী এক্সপ্রেস এসে পড়েছিল, গার্ডের হুইসেলের সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন ছেড়ে দিল, আর নিশীথবাবুও ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন।

ফেলুদা একটা চটি বই রেখে রেখেছিল, সেটা কিনে নিল। দাম সতেরো পঞ্চাশ। নাম—এ গাইড টু নেপাল।

ফেরার পাথে ফেলুদা বলল, ‘আপনারা বরং আজই ভুবনেশ্বরটা দেখে আসুন। একটা ফিপিং হচ্ছে, আমার এখানে থাকা দরকার। এখুনি কিছু হবে বলে মনে হয় না, তবে আবহাওয়া সুবিধের নয়। তা ছাড়া আমার কিছু কাজও আছে। কাঠমাণ্ডুতে একটা ফোন করা দরকার। তথ্যগুলো জট পার্কিয়ে যাবার আগে একটু শুকিয়ে ফেলা দরকার।’

আমি ফেলুদার এই মুডটা ভাল করে জানি। ও এখন গুটিয়ে নেবে নিজেকে, মৌনী হয়ে যাবে। খাটে চিত হয়ে শুয়ে শূন্য চেয়ে থাকবে। আমি লক্ষ করেছি এই অবস্থায় ওর প্রায় তিন-চার মিনিট ধরে চোখের পাতা পড়ে না। আমরা যদি এ সময়ে ঘরে থাকি তো ফিস্ ফিস্ করে কথা বলি। সবচেয়ে ভাল হয় ঘরে না থাকলে। আর ফেলুদার সঙ্গই যদি না পাই তো ভুবনেশ্বরে যেতে ক্ষতি কী?

আমি লালমোহনবাবুকে ইশারায় বুঝিয়ে দিলাম যে আমাদের খাওয়াই উচিত।

হোটেলের কাছাকাছি যখন পৌঁছেছি তখন দেখি একজন চেনা লোক গেট দিয়ে বেরোচ্ছেন।

‘দেখেছেন, আর এক মিনিট এদিক-ওদিক হলেই আর দেখা হত না,’ বললেন বিল্যাস মজুমদার।

‘চলুন ওপরে!’

বিল্যাসবাবু আমাদের ঘরে এসে চেয়ারে বসে কপালের ঘাম মুছলেন।

‘আপনি তো আমার অ্যাডভাইস নিয়েছেন শুনলাম,’ একগাল হেসে বললেন

লালমোহনবাবু ।

‘শুধু তাই না,’ বললেন ডব্ললোক, ‘আপনি ঠিক যেমনটি বলেছিলেন একেবারে
হুবহু তাই । যাকে বলে ভূত দেখা । আমি তো অপ্রত্যাশিতই পড়ে গেসলাম
মশাই । দাড়ি সঙ্গেও লোকটা চিনে ফেলল !’

ফেলুদা বলল, ‘আপনি বোধহয় খেয়াল করেননি যে আপনার চেহারার একটি
বিশেষত্ব আছে যেটা চট করে ভোলবার নয় ।’

বিলাসবাবু একটু অবাক হয়ে বললেন, ‘কী কলুন তো ?’

‘আপনার কপালে খাঁড় আছি,’ বলল ফেলুদা ।

‘ঠিক বলেছেন । ওটা আমার খেয়ালই হয়নি । যাকগে, একটা আশ্চর্য ব্যাপার
হল, জামেন । লোকটার দশা দেখে ওর ওপর মায়্যা হল । আর, ওই ঘটনাটির
ফলেই বোধহয়, ঠেকে কাঠমাগুতে যেমন দেখেছিলাম তেমন আর উনি নেই । এই
ছয়-সাত মাসে বড়স যেন বেড়ে গেছে দশ বছর । আজ দেখা ওরে খুব ভাল
হল । এবার ঘটনাটা মন থেকে মুছে ফেলাতে কোনও অসুবিধা হবে না ।’

‘এটা সুখবর,’ বলল ফেলুদা—‘শুধু অনুমানের ওপর ভিত্তি করে আপনি বেশি
দূর এগোতেও পারতেন না ।’

ডব্ললোক উঠে পড়লেন ।

‘আপনাদের ম্যান কী ?’

ফেলুদা বলল, ‘এঁরা দুজন যাচ্ছেন ভুবনেশ্বর, সন্ধ্যায় ফিরবেন । আমি এখানেই
আছি ।’

‘আমি ভাবছি কালই বেরিয়ে পড়ব । উড়িষ্যার ফরেস্টগ্যুপো দেখা
হয়নি ।...‘যদি পারি যাবার আগে ওডবাই করে ফক ।’

আমাদের বেরোতে বেরোতে সাড়ে বারোটা হলোও, দিনটা ভাল থাকায়, আর
চমৎকার রাস্তায় হরিপদবাবু স্পিডোমিটারের কাঁটা ৮০ কিলোমিটারের নীচে নামতে
না দেওয়ার দরুন আমরা ঠিক বেয়াল্লিশ মিনিটে ভুবনেশ্বর পৌঁছে গেসাম ।

আমরা প্রথমে চলে গেলান রাজারানী মন্দির দেখতে, কারণ এঁই গায়ের একটা
ফকীর মাথা চুরি হয়ে গিয়েছিল, আর ফেলুদা তার আশ্চর্য গোয়েন্দাগিরির ফলে
সেটা উদ্ধার করে দিয়েছিল । সেটাকে মন্দিরের গায়ে চিনতে পেরে শিরদাঁড়
এমন একটা শিহরন খেলে গেল যে বলতে পারি না ।

অবিশ্যি মন্দির তো শুধু ওই একটাই নয়—লিঙ্গরাজ, কেমারগৌরী, মুক্তেশ্বর,
ব্রহ্মেশ্বর, ডাক্ষরেশ্বর আর আরও কত যে ঈশ্বর তা মনেও নেই । লালমোহনবাবুর
আবার সবগুলো দেখা চাই, কারণ এথিনিয়াম ইনস্টিটিউশনের সেই কবি-শিক্ষক
বৈকুণ্ঠনাথ মল্লিকের নাকি চার লাইনের একটা গ্রেট পোয়েম আছে ভুবনেশ্বর গিয়ে,
যেটা ঠেকে হট করে । মুক্তেশ্বরের চাতালে দাঁড়িয়ে প্রায় চল্লিশ জন দেশি-বিদেশি
টুরিস্টের সামনে উনি সেটা গলা ছেড়ে আবৃত্তি করলেন—

‘কত শত অজ্ঞাত মাইকেল এঙ্কেলো

একদা এই ভারতবর্ষে হেলো—



নীরবে ঘোষিছে তাহা ডাক্ষর্ষে ভাস্বর
ভুবনেশ্বর !

ভদ্রলোক যাতে কষ্ট না পান তাই আমি মুখে 'বাঃ' বললাম, যদিও এঞ্জেলোর সঙ্গে মিল দেবার জন্য 'ছিল'কে 'ছেলো' করাটা আমার মোটেই গ্রেট পোয়েটের লক্ষণ বলে মনে হল না। কথাটা নরম করে ওঁকে বলাতে ভদ্রলোক রেগেই গেলেন।

'পোয়েটের ব্যাকগ্রাউন্ড না জেনে ভাঁস ক্রিটসাইজ করার বদ অভ্যাসটা কোথায় পেলো, তপেশ ? বৈকুণ্ঠ মল্লিক চুচড়োর লোক ছিলেন। ওখানে ছিলকে ছেলই বলে। ওতে ভুল নেই।'

ভুবনেশ্বর ছিমছাম শহর তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু আমার মতে, সমুদ্র না থাকায় পুরীর পাশে দাঁড়াতে পারে না। কাজেই সাতটা নাগাদ আবার নীলাচল হোটেলে ফিরে আসতে দিব্যি ভাল লাগল।

তিন ধাপ সিঁড়ি দিয়ে হোটেলের বারান্দায় উঠতেই ম্যানেজার শ্যামলাল বারিক তাঁর ঘর থেকে হাঁক দিলেন।

'ও মশাই, মেসেজ আছে।'

আমরা হস্তদস্ত হয়ে ঢুকলাম তাঁর ঘরে।

'মিণ্ডির মশাই এই দশ মিনিট হল বেরোলেন। বললেন আপনারা যেন ঘরেই

থাকেন ।’

‘কী ব্যাপার ? কোথায় গেলেন ?’

‘থানা থেকে ফোন করেছিল ওঁকে । ডি. জি. সেনের বাড়িতে চুরি হয়েছে ।
একটি মহামূল্য পুঁথি ।’

আশ্চর্য ! ফেলুদার মন বলছিল কিছু একটা হবে, আর সত্যিই হয়ে গেল ।

জান করে চা খেয়ে শরীরের ক্রান্তি দূর হল ঠিকই। কিন্তু মন ছটফট, বুকের ভিতর টিপ টিপ। ফেলুদা তদন্তে লেগে গেছে। পুরী আমাদের হতাশ করেনি।

কিন্তু সেই সঙ্গে এও মনে হচ্ছে, এতে ফেলুদার টাঁকে কিছু আসবে কি? অবিশ্যি কেস তেমন জমাটি হলে রোজগার হল কি না হল সেটা ফেলুদা ভুলে যায়। অনেক সময় রোজগার যেগুলোতে হয়—মানে, যেখানে মক্কেল ঘরে এসে ফেলুদাকে তদন্তের ভার দেয়, সেখানে পকেট ভরলেও মন ভরে না, কারণ রহস্যটা হয় মামুলি। আবার এমন অনেকবার হয়েছে যে ফেলুদা শখ করে তদন্ত করেছে, পরসা হয়তো কিছুই আসেনি, অথচ রহস্য জটিল হওয়াতে সমাধান করে মন মেজাজ মগজ সব একসঙ্গে চাঙিয়ে উঠেছে।

‘কাকে মাসপেঙ্কি করছ, তপেশ?’ আঁটটা নাগাত প্রশ্ন করলেন লালমোহনবাবু। উনি এতক্ষণ হাত দুটোকে পিছনে জড়ো করে আমাদের ঘরে পায়চারি করেছেন।

আমি বললাম, ‘চুরি করার সুযোগ সবচেয়ে বেশি নিশীথবাবুর, কিন্তু সেইজন্যেই উনি করবেন বলে মনে হয় না। এ ছাড়া হিন্দোরানির তো লোভ ছিলই ওই পুথির ওপর। বিলাস মজুমদারও টাকা আর প্রতিশোধের জন্য করতে পারেন। তারপর লক্ষ্মণ ভট—’

‘না না না,’ ভীষণভাবে প্রতিবাদ করে উঠলেন লালমোহনবাবু। ‘এমন একজন লোককে এর মধ্যে টেনো না—প্রিজ। কী অলৌকিক ক্ষমতা ভেবে দেখো তো ভদ্রলোকের।’

‘আপনার কী মনে হয়?’ আমি পালটা প্রশ্ন করলাম।

‘আমার মনে হয় তুমি আসল লোকটাকেই বাদ দিয়ে গেলে।’

‘কে?’

‘সেন মশাই হিমসেলফ।’

‘সে কী? উনি নিজের জিনিস চুরি করতে যাবেন কেন?’

‘চুরি নয়, চুরি নয়, পাচার। চোরাই মাল পাচার করলেন অ্যান্ডিনে। হিন্দোরানি হাইয়ার প্রাইস অফার করেছেন, আর উনি বেচে দিয়েছেন। লোককে বলছেন চুরি।’

আমি ভেবে দেখছিলাম লালমোহনবাবুর কথা ঠিক হতে পারে কি না, এমন সময় ক্রম বয় এসে খবর দিল যে, আমার টেলিফোন আছে। ফেলুদা।

রুদ্ধস্থানে নীচে গিয়ে ফোন ধরলাম।

‘কী ব্যাপার?’

‘শ্যামলাবাবু বলেছেন?’

‘হ্যাঁ। কিন্তু কিছু বুঝতে পারলে?’

‘নিশীথবাবু হাওয়া।’

‘তাই বুঝি? পুলিশে খবর দিল কে?’

‘সে সব গিয়ে বলব। আমি আশ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরছি। ভুবনেশ্বর কেমন লাগল?’

‘ভাল। ইয়ে—’

ফেলুদা ফোন রেখে দিয়েছে।

লালমোহনবাবুকে বললাম। ভদ্রলোক মাথা চুলকে বললেন, ‘সিন অফ ক্রাইমে একবার গিয়ে পড়তে পারলে ভালই হত, তবে তোমার দাদা বোধহয় চাইছেন না।’

আরও এক ঘণ্টা অপেক্ষা করেও যখন ফেলুদা এসে না, তখন সত্যিই চিন্তা হতে শুরু করল। কম-বয়সকে বলে আরেক দফা চা আনিয়ে নিলাম। দুজনে পালা করে পায়চারি করছি। ইতিমধ্যে একটা অন্যায় কাজ করে ফেলেছি, কিন্তু না করে পারলাম না। ফেলুদার খাতাটা খাটের উপরই ছিল, তাতে আজ দুপুরে ও কী লিখেছে সেটা দেখে ফেলেছি, যদিও মাখামুখু কিছুই বুঝিনি। ওর ধনী ব্যবসায়ী মক্কেল হরিহর জরিওয়ালার দেওয়া ‘ক্রস’ মার্কা ডট পেনে একটা পাতায় ছড়িয়ে লেখা রয়েছে—

ডায়বিড?—গাউট—সাপ?—কী ফিরে আসবে? ছেলেকে চেনে না কেন?—কালোডাক? কাকে? কেন?—স্যাটি হাতে কে হাঁটে?...

নটা নাগাত ধৈর্য ফুরিয়ে গেল। যা থাকে কপালে বলে দুজনে বেরিয়ে পড়লাম। সাগরিকা থেকে ফিরতে হলে ফেলুদা সমুদ্রের ধার দিয়ে শার্টকাটাই নেবে। আমরা তাই হোটেল থেকে বেরিয়ে ডাইনেই ঘুরলাম।

কালও রাত্রে রেলওয়ে হোটেল থেকে সমুদ্রের ধার ধরে ফিরবার সময় মনে হয়েছে, দিনে আর রাতে কত তফাত। ঢেউ-এর গর্জন যেমন দিনে তেমনি রাত্তিরেও চলে, কিন্তু রাত্রে সমস্ত ব্যাপারটা আবছা অন্ধকারে ঘটে বলে গা ছমছম করে অনেক বেশি। প্রকৃতির কী অদ্ভুত খেলা। জঙ্গলের ফসফরাস না থাকলে এমন মেঘলা রাত্তিরে কি ঢেউগুলো দেখা যেত?

দূরে বাঁয়ে আকাশটা যে ফিকে হয়ে আছে, সেটা শহরের আলোর জন্য। সামনে দূরের টিমটিমে আলোর বিন্দুগুলো নিশ্চয় নুলিয়া বস্তির।

আমরা দুজনে যতটা পারা যায় জল দূরে রেখে বার্নিক ধরে চলতে লাগলাম। ঢেউয়ের ফেনা আমাদের বিশ-পঁচিশ হাত দূর অবধি গড়িয়ে এসে থেমে যাচ্ছে। লালমোহনবাবুর সঙ্গে টর্চ আছে, কিন্তু অপ্রয়োজনে সেটা ব্যবহার করার কোনও মানে হয় না।

আজ সারাদিন বৃষ্টি না হওয়ায় বালি শুকনো কিন্তু তাও পা বসে যায়। এ বালি দিঘার মতো জমটি নয় যে প্লেন ল্যান্ড করবে। লালমোহনবাবু কেড্‌স পরেছেন, আর আমি চম্পল। এই চম্পলেই হঠাৎ জ্বালি কীসের সঙ্গে ঠোঁক খেলাম, আর

খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখ খুবড়ে বাগিতে । লালমোহনবাবুও ‘কী হল, কী হল’ করে এগিয়ে এসে কীসে জানি বাধা পেয়ে ছড়মুড়িয়ে পড়ে দুবার ‘হেল্প হেল্প’ বলে বিকট চিৎকার করে উঠলেন । আমি খরা গলায় বললাম, ‘আমার পেটের নীচে দুটো ঠাং ।’

‘বলো কী !’

আমরা দুজনেই কোনওরকমে উঠে পড়েছি, লালমোহনবাবু টর্চটা জ্বালাতে চেষ্টা করে পারছেন না বলে সেটার পিছনে থাবড়া মারছেন ।

একটা গোঙানির শব্দ, আর তারপর একটা মানুষের শরীর বালি থেকে উঠে বসল । চোখে যত না দেখছি, তার চেয়ে বেশি আন্দাজে বুঝছি ।

‘হাতটা দে—’

ফেলুদা !

আমি ডান হাতটা বাড়লাম । ফেলুদা সেটা ধরে এক ঝটকায় উঠে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ আমার পিঠে হাত রেখে টলল ।

টর্চ জ্বলেছে । লালমোহনবাবু কাঁপা হাতে আলোটা ফেলুদার মুখে ফেললেন । ফেলুদা নিজের ডান হাতটা সাবধানে মাথার উপর রেখে যত্নপূর্ণ মুখটা বিকৃত করে হাতটা নামিয়ে নিল ।

টর্চের আলোতে দেখলাম হাতের তেলোয় রক্ত ।

‘ফে ফ্—ফেটে গেছে ?’ ফাটা গলায় প্রশ্ন করলেন জটায়ু ।

কিন্তু ফেলুদার চোখে ভুকুটি । —‘কী রকম হল ?’

ফেলুদাকে এত হতভম্ব হতে দেখিনি কখনও । ও নিজের পকেট থেকে ছোট্ট টর্চটা বার করে এদিক ওদিক ফেলল । এক জোড়া জুতো পরা পায়ের ছাপ ফেলুদা যেখানে পড়েছিল তার পাশ থেকে চলে গেছে উচু পাড়টার দিকে, যেখানে বালি শেষ হয়ে গেছে ।

আমরা এগিয়ে গেলাম পায়ের ছাপ ধরে । পাড় এখানে বুক অবধি উচু । উপরে ঘাস আর ঝোপড়া । কাছাকাছির মধ্যে বাড়ি-টাড়ি নেই । যেখানে লোকটা ওপরে উঠে গেছে, সেখানে বালিতে কিছু ঘাসের চাবড়া পড়ে থাকতে দেখে বুঝলাম, লোকটাকে বেশ কসরত করে উঠতে হয়েছে ।

ফেলুদা হোটেলমুখে ঘুরল, আমরা তার পিছনে ।

‘আপনি কতক্ষণ এই ভাবে পড়ে ছিলেন বলুন তো ?’ লালমোহনবাবুর গলার স্বর এখনও স্বাভাবিক হয়নি । ফেলুদা রিস্টওয়াচের ওপর টর্চ ফেলে বলল, ‘প্রায় আধ ঘণ্টা ।’

‘মাথায় তো স্টিচ দিতে হবে মনে হচ্ছে ।’

‘না,’ বলল ফেলুদা । —‘আমার মাথায় শুধু বাড়ি লেগেছে, জখম হয়নি ।’

‘তা হলে রক্ত— ?’

ফেলুদা কোনও জবাব দিল না ।

হোটেলের এসে মাথায় বরফ দিয়ে ফেলুদার ব্যথাটা কমল। এই কীর্তির জন্য কে দায়ী সে সম্বন্ধে ফেলুদার কোনও ধারণা নেই। সাগরিকা থেকে ফেরার পথে জনমানবশূন্য বিচে হঠাৎ চোখের উপর আচমকা টর্চের আলো, আর তারপরেই মাথায় বাড়ি। ফেলুদা ফোন করে মহাপাত্রকে ঘটনাটা বলায় ভদ্রলোক বললেন, 'আপনি একটু বুঝে-সুঝে চলুন মশাই। কিছু অত্যন্ত বেপরোয়া লোক যে আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আপনি চূপচাপ থেকে পুরো ব্যাপারটা আমাদের শ্যান্ডল করতে দিলে সবচেয়ে ভাল হয়। ফেলুদা উত্তরে বলে যে এই ঘটনাটা ঘটবার আগে সেটা বললে ও হয়তো ভেবে দেখতে পারত, এখন টু লেট।

রাত্রে খাওয়া সেরে ঘরে এসেছি, ঘড়িতে বলছে পৌনে এগারোটা, এমন সময় শ্যামলাল বারিক একটি ভদ্রলোককে নিয়ে আমাদের ঘরে ঢুকলেন। বছর চল্লিশেক বয়স, ফরসা ফিটফিট চেহারা, চোখে পুরু কালো ফ্রেমের চশমা। শ্যামলালবাবু বললেন, 'ইনি আধ ঘণ্টা হল অপেক্ষা করছেন। আপনারা খাচ্ছিলেন, তাই আর ডিসটার্ব করিনি।'

ভদ্রলোককে বসিয়ে শ্যামলালবাবু বিদায় নিলেন।

আগন্তুক ফেলুদার দিকে চেয়ে হেসে বললেন, 'আমি আপনার নাম শুনেছি। ইন ফ্যাক্ট, আপনার কীর্তিকলাপ পড়ার দরুন এঁদের দুজনকেও চিনতে পারছি। আমার নাম মহিম সেন।'

ফেলুদার ভুরু কুঁচকে গেল। 'তার মানে— ?'

'দুর্গাগতি সেন আমার বাবা।'

আমরা তিনজনেই চূপ। ভদ্রলোকই কথা বলে চললেন।

'আমি এসেছি আজই দুপুরে। মোটরে। আমাদের কোম্পানির একটা গেস্ট হাউস আছে, সেখানে উঠেছি।'

'আপনার বাবার সঙ্গে দেখা করেননি ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'ফোন করেছিলাম এসেই। ওর সেক্রেটারি ধরেছিলেন। আমি আমার পরিচয় দিলাম। উনি বাবার সঙ্গে কথা বলে জানালেন বাবা ফোনে আসতে চাইছেন না।'

'কারণ ?'

'জানি না।'

ফেলুদা বলল, ‘আপনার বাবার সঙ্গে কথা বলে আমার খারশা হয়েছে, তিনি আপনার প্রতি খুব প্রশংসা মন । কেন, সেটা আপনি অনুমান করতে পারছেন না ?’

ভদ্রলোক ফেলুদার অফার করা চারমিনির প্রত্যাখ্যান করে নিজের একটা রথম্যান ধরিয়ে বললেন, ‘দেখুন, বাবার সঙ্গে আমার খুব একটা মেলামেশা কোনওদিনও ছিল না ; তাই বলে অসন্তোষও ছিল না । আমি ঠাঁর হুবি সম্বন্ধে কোনওদিন বিশেষ ইন্টারেস্ট দেখাইনি ; আর্টের চোখ আমার নেই । আমি থাকি কলকাতায় ; কোম্পানির কাজে বছরে বার-দুয়েক বিদেশে যেতে হয় । চিঠি লিখে সব সময়ই উত্তর পেয়েছি, তা পোস্টকার্ডে দুটো লাইনই হোক । বাবা এখানে আসবার পর দুবার আমি আর আমার স্ত্রী ঠাঁরই বাড়ির দোতলায় হুণ্ডা-দুয়েক করে থেকে গেছি । আমার একটি বছর আর্টেকের ছেলে আছে, তাকে উনি অত্যন্ত স্নেহ করেন । কিন্তু এবার যেটা করলেন সেটা আমার কাছে একেবারে রহস্য । বাবার মতো শক্ত লোকের বাষট্টি বছরে ভীমরতি ধরবে এটা বিশ্বাস করা কঠিন । কোনও তৃতীয় ব্যক্তি এর জন্য দায়ী কি না তাও জানি না । তাই যখন সুনলাম আপনি এসে রয়েছেন পুরীতে, তাবল্যাম একবার দেখা করে যাই ।’

‘আপনার বাবার সেক্রেটারিটি কদিন রয়েছেন ?’

‘তা বছর চারেক হবে । আমি সেভেনটি সিক্স এসে ঠাঁকে দেখেছি ।’

‘কী রকম লোক বলে মনে হয়েছে আপনার ?’

‘আমার পক্ষে বলা শক্ত । এটুকু বলতে পারি যে চিঠি টাইপ করা ইত্যাদি মোটামুটি জানলেও, বাবা ঠাঁর সঙ্গে কথা বলে নিশ্চয়ই আনন্দ পেতেন না ।’

‘তা হলে আপনাকে খবর দিই—আপনার বাবার সংগ্রহের সবচেয়ে মূল্যবান পুঁথিটি আজ চুরি হয়েছে । এবং সেই সঙ্গে সেক্রেটারিও উধাও ।’

মহিমাবাবুর মুখ হাঁ হয়ে গেল ।

‘বলেন কী ! আপনি গিয়েছিলেন ওখানে ?’

‘আজ্ঞে হ্যাঁ ।’

‘কী রকম দেখলেন বাবাকে ?’

‘স্বভাবতই মুহূর্তমান । ঠাঁর দুপুরে ওখুধ খেয়ে সুমোনের অভ্যাস হয়েছে আজকাল ; আগে ছিল কি না জানি না । আজ বিকেলে সাড়ে ছটায় নাকি একজন আমেরিকান ভদ্রলোকের আসবার কথা ছিল । নিশীথবাবুই অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যাপারটা দেখেন, কেউ এলে উনিই সঙ্গে করে নিয়ে যান । আজ উনি ছিলেন না । চাকর ছিল, সে-ই সাহেবকে নিয়ে যায় ওপরে । আপনার বাবা সাধারণত সাড়ে চারটের মধ্যে উঠে পড়েন, কিন্তু আজ উঠতে হয়ে গেছিল প্রায় ছটা । যাই হোক, সাহেব পুঁথি দেখতে চায় । মিঃ সেন আলমারির দেওয়াল খুলে দেখেন শালুর মোড়ক ঠিকই আছে, কিন্তু তার ভিতরে রয়েছে দুটো কাঠের মাথখানে ফালি করে কাটা এক গোছা সাদা কাগজ । আপনার বাবা খুবই বিচলিত হয়ে পড়েন, শেষটায় ওই আমেরিকানই পুলিশে ফোন করেন ।’

‘কিন্তু তার মানে নিশীথবাবুই কি— ?’

‘তাই তো মনে হচ্ছে । ভদ্রলোকের সঙ্গে সকালে স্টেশনে দেখা হয়েছিল ।’

এখন মনে হচ্ছে টিকিট কিনতে গিয়েছিলেন ; কারণ ঠাঁর ঘরে সুটকেস-বেডিং নেই । স্টেশনে গিয়েছিল পুলিশ, কিন্তু ততক্ষণে পুরী এক্সপ্রেস, হাওড়া প্যাসেঞ্জার দুটোই চলে গেছে । অবিশ্যি ওরা পরের স্টেশনগুলোতে খবর পাঠিয়ে দিয়েছে ।’

আমরা তিনজনেই চুপ । এর মধ্যে এত ঘটনা ঘটে গেছে শুনে মাথা ভোঁ ভোঁ করছে ।

‘আপনার বাবা গত বছর নেপালে গিয়েছিলেন সে খবর জানেন ?’

মহিমবাবু বললেন, ‘অগাস্টের পর গিয়ে থাকলে জানার কথা নয়, কারণ আমি তখন থেকে সাত মাস দেশের বাইরে । বাবা পুথির খোঁজে অনেক জায়গায় যেতেন । কেন, নেপালে কী হয়েছিল ?’

ফেলুদা এ প্রশ্নের কোনও জবাব না দিয়ে বলল, ‘আপনার বাবার গাউট হয়েছে এটাও কি আপনার কাছে নতুন খবর ?’

মহিমবাবু যেন আকাশ থেকে পড়লেন ।

‘গাউট ? বাবার গাউট ?’

‘বিশ্বাস করা কঠিন ?’

‘খুবই । গত বছর যে মাসেও দেখেছি বাবা ভোরে আর সন্ধ্যায় সমুদ্রের ধারে বালির উপর দিয়ে হনহনিয়ে হেঁটে চলেছেন । ওনার খাওয়া-দাওয়া ছিল পরিমিত, ড্রিংক করতেন না, কোনওরকম অনিয়ম করতেন না । স্বাস্থ্য নিয়ে ঠাঁর একটা অহংকার ছিল । বাবার গাউট হলে খুবই আশ্চর্য হব, এবং খুবই ট্রাজিক ব্যাপার হবে ।’

‘এটাই কি ঠাঁর বর্তমান মানসিক অবস্থার কারণ হতে পারে ?’

‘তা তো পারেই,’ বেশ জোরের সঙ্গে বললেন মহিমবাবু । ‘নিজেকে পক্ষ বলে মেনে নেওয়াটা বাবার পক্ষে খুবই কঠিন হবে ।’

ফেলুদা বলল, ‘আমি রয়েছি আরও কয়েকদিন । দেখি যদি কিছু করতে পারি । আমার কাছে অনেক কিছুই এখনও পর্যন্ত ধোঁয়াটে ।’

মহিমবাবু উঠে পড়ে বললেন, ‘আমি এসেছি বাবার সঙ্গে আমাদের পুরনো ব্যবসা সংক্রান্ত কিছু জরুরি ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে । সেটা যদিই না সম্ভব হচ্ছে, তদিন আমাকেও থাকতে হবে ।’

ভদ্রলোক চলে যাবার পর শুতে শুতে প্রায় বারোটা হল ।

পাশের ঘর থেকে লালমোহনবাবু শুড়নাইট করতে এলেন, যেমন রোজই আসেন । ঠাঁর রুমমেট আজ সকালে চলে গেছেন, উনি এখন একা । বললেন, ‘ভাল কথা, আপনি তো আজ কাঠমাগুতে যোন করেছিলেন ।’

‘তা করেছিলাম ।’

‘কী ব্যাপার মশাই ?’

‘বীর হাসপাতালের ডাঃ ভার্গবকে স্কিঙ্ডেস করলাম, গত অক্টোবরে বিলাস মঞ্জুমদার নামে কোনও ব্যক্তি হেভি ইনজুরি নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল কি না ।’

‘কী বললেন ?’

‘বললেন, হ্যাঁ । শিন্‌বোন, কঙ্গারবোন, পাঁজরার হাড়, খুতনি—সব বললেন ।’

‘আপনার বুঝি মজুমদারের কথা বিশ্বাস হয়নি ?’

‘সন্দেহ জিনিসটা গোয়েন্দাগিরির একটা অপরিহার্য অঙ্গ লালমোহনবাবু । কেন, আপনার গল্পের গোয়েন্দা প্রথর রুদ্র কি এই বাতিক থেকে মুক্ত ?’

‘না না, তা তো নয়—মোটাই নয়...’ বিড়বিড় করতে করতে ভদ্রলোক ফিরে গেলেন ওঁর ঘরে ।

বেশি রাত হলেই সমুদ্রের গর্জন শোনা যায় আমাদের ঘর থেকে । আমি জানি ফেলুদার মনের মধ্যেও ঢেউয়ের ওঠা-নামা চলেছে, যদিও বাইরে দেখছি শান্ত গাভীর । এটাও অবিশ্যি সমুদ্রেরই একটা রূপ । এই রূপটা নুজিয়ারা দেখতে পায় মাছের নৌকো করে ব্রেকারস পেরিয়ে গেলে পর ।

‘ওটা কী ফেলুদা ?’

বেডসাইড ল্যাম্পটা নেভাতে গিয়ে দেখি ফেলুদা পকেট থেকে একটা চ্যাপ্টা চৌকো ব্রাউন রঙের জিনিস বার করে দেখছে ।

ভাল করে দেখে বুঝলাম সেটা একটা মানিব্যাগ ।

ব্যাগটার ভিতর থেকে কয়েকটা দশ টাকার নোট বার করে অন্যমনস্ক ভাবে দেখে সেগুলো আবার ভিতরে পুরে দিয়ে ফেলুদা বলল, ‘এটা নিশীথবাবুর দেয়ালে কিছু কাগজপত্রের তলায় ছিল । আশ্চর্য । লোকটা বাস্তব বিছানা নিয়েছে, অথচ পার্সটাই ভুলে গেছে ।’

চোখ খুলতেই যখন দেখলাম ফেলুদা যোগ ব্যায়াম করছে, তখন বুঝলাম সূর্য উঠতে এখনও অনেক দেরি। অথচ এটা জানি যে ও অনেক রাত পর্যন্ত ল্যাম্প জ্বালিয়ে কাজ করেছে।

একটা শব্দ শুনে বারান্দার দিকের জানালাটার দিকে চাইতে দেখি, লালমোহনবাবুও এরই মধ্যে উঠে পড়ে টুথব্রাশে ওঁর প্রিয় লাল সাদা ডোরাকাটা সিগন্যাল টুথপেস্ট লাগাচ্ছেন। বুঝলাম, আমাদের দুজনের মনের একই অবস্থা।

ফেলুদা ব্যায়াম শেষ করে বলল, 'চা খেয়েই বেরিয়ে পড়ব।'

'কোথাও যাবার আছে বুঝি?'

'মাথাটা পরিষ্কার করা দরকার। বিশালত্বের সামনে পড়লে সেটা সময় সময় হয়। ভোরের সমুদ্রের দিকে চাইলেই একটা টনিকের কাজ দেয়।'

বেরোবার আগে শ্যামলাল বারিকের ঘরে গিয়ে ফেলুদা বলল, 'শুনুন, কয়েকটা ব্যাপার আছে। নেপালে একটা কল বুক করতে হবে, এই নিন নম্বর। আর মহাপাত্রের কাছ থেকে কোনও মেসেঞ্জ এলে রেখে দেবেন। আর, হ্যাঁ—এখানে খুব ভাল অ্যাপোপ্যাথিক ডাক্তার কে আছে?'

'কটা চাই? আপনি কি ভাবছেন অজ পাড়ারগায়ে এসে পড়েছেন?'

'বুড়ো হাবড়া হলে চলবে না। ইয়াং টৌকস ডাক্তার চাই।'

'বেশ তো, ডাঃ সেনাপতি আছেন। গ্র্যান্ড রোডে উৎকল কেমিস্টে চেম্বার আছে। সকালে দশটার পর গেলেই দেখা পাবেন।'

আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

সমুদ্রের ধারে স্নানের লোক এখনও কেউ আসেনি, শুধু নুলিয়া ছাড়া আর কোনও মানুষ দেখা যাচ্ছে না। পূর্বের আকাশ ফিকে লাল, ছাই রঙের মেঘের টুকরোগুলোর নীচের দিকটা গোলাপি হয়ে আসছে। সমুদ্র কালচে নীল, শুধু তীরে এসে ভাঙা ঢেউয়ের মাথাগুলো সাদা।

প্রথমদিন এসে যে তিনটে নুলিয়া ছেলেকে তীরে বসে খেলতে দেখেছিলাম, কাঁকড়া সম্বন্ধে তাদের ভীষণ কৌতূহল। ওই কাঁকড়াই হল লালমোহনবাবুর মতে পুরীর সমুদ্রতটের একমাত্র মাইনাস পয়েন্ট।

'কী নাম রে তোর?'

তিনটে নুলিয়া ছেলের একটার মাথায় পাগড়ির মতো করে বাঁধা লাল কাপড়; সে ফেলুদার প্রশ্নে দাঁত বার করে হেসে বলল, 'রামাই, বাবু।'

আমরা এগিয়ে চললাম। লালমোহনবাবুর কবিত্ত্বভাব জেগে উঠেছে, বললেন, 'এই উন্মুক্ত উদার পরিবেশে রক্তপাত ! ভাবা যায় না মশাই।'

'ই—ব্রাট ইনস্ট্রুমেন্ট...' অন্যমনস্কভাবে বলল ফেলুদা। আমি জানি অল্প দিয়ে খুনটা সাধারণত তিন রকমের হয়। এক হল আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে—যেমন বিভলভার পিস্তল; দুই : শার্প ইনস্ট্রুমেন্ট, যেমন ছোরা-ছুরি-চাকু ইত্যাদি; তিন হল ব্রাট ইনস্ট্রুমেন্ট বা ভোঁতা হাতিয়ার, যেমন ডাণ্ডা জাতীয় কিছু। বেশ বুঝতে পারলাম ফেলুদা কাল রাতে ওর মাথায় বাড়ি লাগার কথাটা ভাবছে। সত্যি, ভাবলে রক্ত জল হয়ে যায়। ভাগ্যে আঘাতটা মোক্ষম হয়নি।

'ফুটপ্রিন্টস...' ফেলুদা বলে উঠল।

একটু এগিয়ে গিয়েই দেখতে পেলাম টাটকা পায়ের ছাপ। জুতো, আর সেই সঙ্গে বাঁ হাতে ধরা লাঠি।

'বিলাসবাবু খুব আলি রাইজার বলে মনে হচ্ছে', মন্তব্য করলেন লালমোহনবাবু।

'বিলাসবাবু ? বিলাসবাবু বলে মনে হচ্ছে কি ? দেখুন তো ভাল করে—দূরে সামনের দিকে দেখিয়ে বলল ফেলুদা।

এত দূর থেকেও বুঝতে পারলাম, যিনি বালিতে দাগ ফেলতে ফেলতে এগিয়ে চলেছেন তিনি মোটেই বিলাসবাবু নন।

'তাই তো।' বললেন লালমোহনবাবু, 'তিনি তো দেখছি আমাদের সেনসেশন্যাল সেন সাহেব।'

'ঠিক ধরেছেন। দুর্গাগতি সেন।'

'কিন্তু তা হলে গেঁটে বাস্তব ?'

'সেইখানেই তো ভেজকি। লক্ষ্মণ ভট্টাচার্যের ওষুধের গুণ বোধহয়।'

মনে ধাঁধাটে ভাব নিয়ে আবার হাঁটা শুরু করলাম। রহস্যের পর রহস্য যেন ঢেউয়ের পর ঢেউ।

বাঁয়ে রেলওয়ে হোটেল দেখা যাচ্ছে। ডাইনে গোটা পাঁচেক নুলিয়া আর সুইমিং ট্রাঙ্কস পরা তিনজন সাহেব। তার মধ্যে একজন ফেলুদার দিকে হাত তুললেন।

'গুড মর্নিং।'

আন্দাজে বুঝলাম ইনিই কালকের সেই পুলিশকে ফোন করা আমেরিকান।

আমরা এগিয়ে গেলাম। ওই যে হিন্দোরানি আসছেন, কাছে তোয়ালে। ভারী অগ্রসর মনে হচ্ছে ভদ্রলোককে। আমাদের দিকে দেখলেনই না।

আমার মন কেন জানি বলাছে ফেলুদা সাগরিকায় যাচ্ছে, কারণ ও সমুদ্রের ধাবের বাগি ছেড়ে বাঁয়ে চড়াইয়ে উঠতে শুরু করেছে। সূর্যের আধখানা কিন্তু এর মধ্যেই উঠে বসে আছে। ফেলুদার মাথা বিশালত্বের সামনে পড়ে পরিষ্কার হয়েছে কি ?

'প্রাতঃপ্রণাম !'

গণৎকার মশাই এগিয়ে এসেছেন বাগির উপর দিয়ে, লুঙ্গিটা খাটো করে পরা,

কাঁধে তোয়ালে, হাতে নিমের দাঁতন ।

‘কাল কোথায় ছিলেন ?’ ফেলুদা জিজ্ঞেস করল ।

‘কখন ?’

‘সন্ধ্যাবেলা ; আপনার খোঁজ করেছিলাম ।’

‘ওহো । কাল গেসলাম কের্তন শুনতে । মংগলাঘাট রোডে একটা কের্তনের দল আছে ; মাঝে-মাঝে যাই ।’

‘কখন গিয়েছিলেন ?’

‘আমার তো ছটার আগে ছুটি নেই । তারপরেই গেসলাম ।’

‘আপনি তো ও বাড়ির বাসিন্দা, তাই ভাবছিলাম চুরির ব্যাপারে যদি কোনও আলোকপাত করতে পারেন । আপনার ঘর থেকে পশ্চিমের গলিটা তো দেখা যায় ।’

‘তা তো যাকই, তবে পশ্চিমের গলিতে যা দেখেছি তাতে খুব অবাক হইনি,’ বললেন লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য । ‘মিশীখাবাবুকে দেখলাম তল্লিতল্লা নিয়ে বেরুতে । তা উনি যে কলকাতায় থাকেন সেটা তো কদিন থেকেই ঠিক ছিল ।’

‘তাই বুঝি ?’

‘ওঁর মা-স্ব যে এখন-তখন অবস্থা । টেলিগ্রাম এসেছিল কদিন আগে ।’

‘বটে ? আপনি দেখেছিলেন সে টেলিগ্রাম ?’

‘শুধু আমি কেন ? সেন মশাইও দেখেছিলেন ।’

ফেলুদা অবাক ।

‘আশ্চর্য ! সেন মশাই তো সে কথা বললেন না ।’

‘সে আর কী বলব বলুন ! উনি মানুষটা কী রকম সেটা তো আপনারাও দেখলেন । দুর্ভাগ্য আছে আর কী । কপালের লিখন খণ্ডার কার সাধি বলুন !’

‘আপনি মিঃ সেনেরও ভাগ্য গণনা করেছেন নাকি ?’ ভারী ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন লালমোহনবাবু ।

‘এ তল্লাটে কার করিনি ? কিন্তু করলে কী হবে ? সবাইকে তো আর সব কথা বলা যায় না । অবিশি ব্যাবাম-ট্যারামের লক্ষণ দেখলে বলি ; তাই বলে, আপনি খুন করবেন, আপনার জেল হবে, ফাঁসি হবে, অপঘাতে মৃত্যু আছে আপনার—এ সব কি বলা যায় ? তা হলে আর কেউ আসবে না মশাই । আসলে লোকে ভালটাই শুনতে চায় । তাই অনেক হিসেব করে ঢেঁকে-ঢুকে বলতে হয় ।’

লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য বিদায় জানিয়ে সমুদ্রের দিকে চলে গেলেন । আমরা এগিয়ে চললাম সাগরিকার দিকে । সকালের রোদ পড়ে বাড়িটাকে সত্যিই সুন্দর দেখাচ্ছে ।

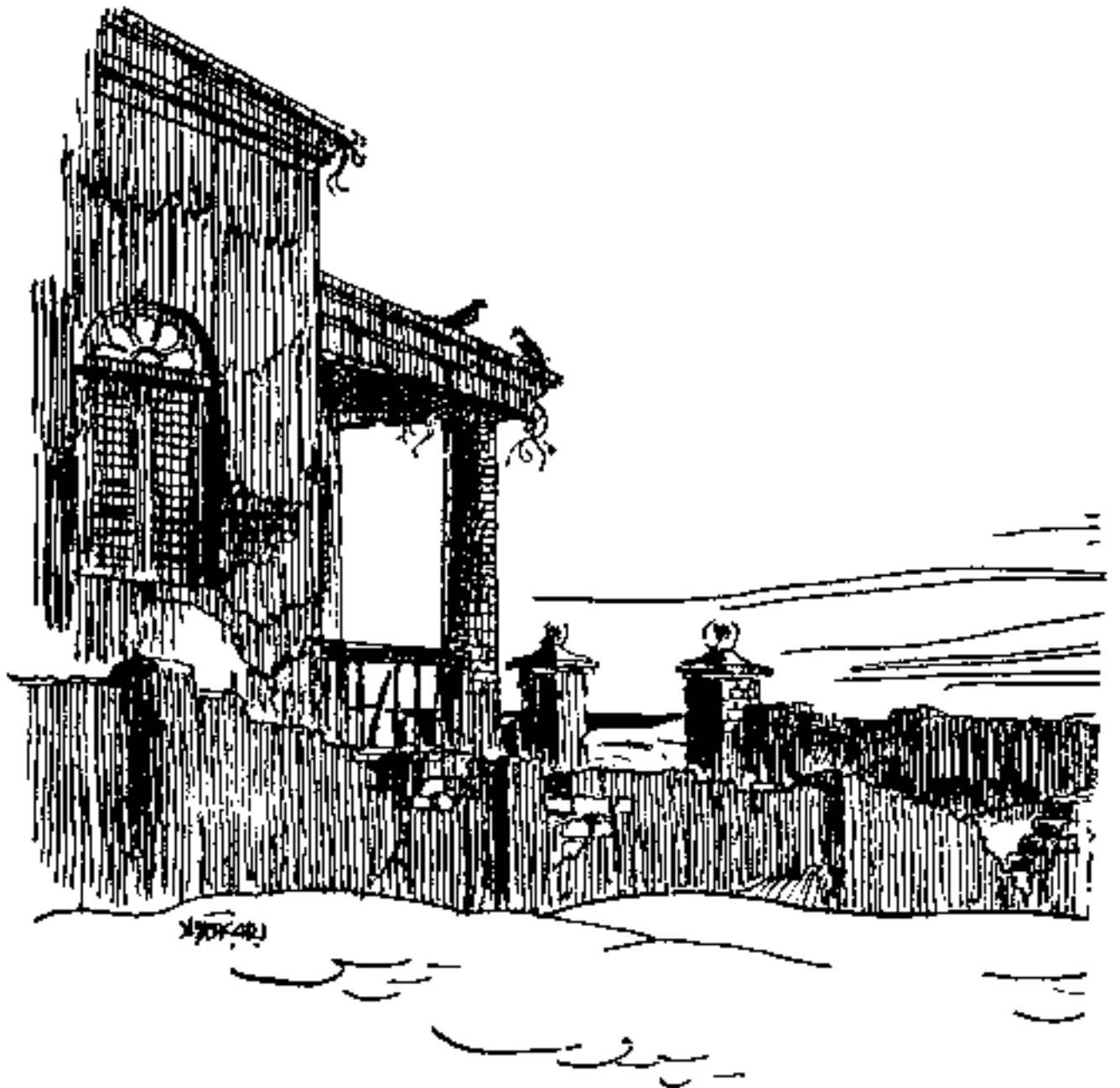
‘হত্যাপুরী’, বললেন লালমোহনবাবু ।

‘সে কী মশাই,’ প্রতিবাদের সুরে বলল ফেলুদা, ‘হত্যা কোথায় হল যে হত্যাপুরী বলছেন ? বরং চুরিপুরী বলতে পারেন ।’

‘নট সাগরিকা,’ বললেন লালমোহনবাবু । —‘আমি এ দিকের বাড়িটার কথা বলছি ।’

সাগরিকা থেকে আন্দাজ ত্রিশ গজ এই দিকে বালিতে বসে যাওয়া এই বাড়িটার কথা আগেই বলেছি। লালমোহনবাবু খুব ডুল বলেননি। এমনভেই পোড়া নোনাধরা বাড়ি দেখলে কেমন গা ছমছম করে, এটার আবার তলার দিকের হাত-পাচেক বালিতে বসে যাওয়াতে, আর কাছাকাছি অন্য কোনও বাড়ি না থাকাতে সত্যিই বেশ ভূতুড়ে মনে হচ্ছিল। দিনের বেলাতেই এই, রাত্রে না জানি কী রকম হবে।

অন্যান্য দিন বাড়িটাকে পাশ কাটিয়ে যাই, আজ একটু কাছ থেকে দেখার লোভ সামলাতে পারল না বোধহয় ফেসুদা। ফটকের খামগুলো এখনও রয়েছে, তার একটার গায়ে কালসিতে মেঝে যাওয়া ক্ষেতপাথরের ফলকে লেখা 'ভুজঙ্গ নিবাস'। বালি আর এক হাত উঠলেই ফলকটা ঢাকা পড়ে যাবে। ফটক পেরিয়ে বোধহয়



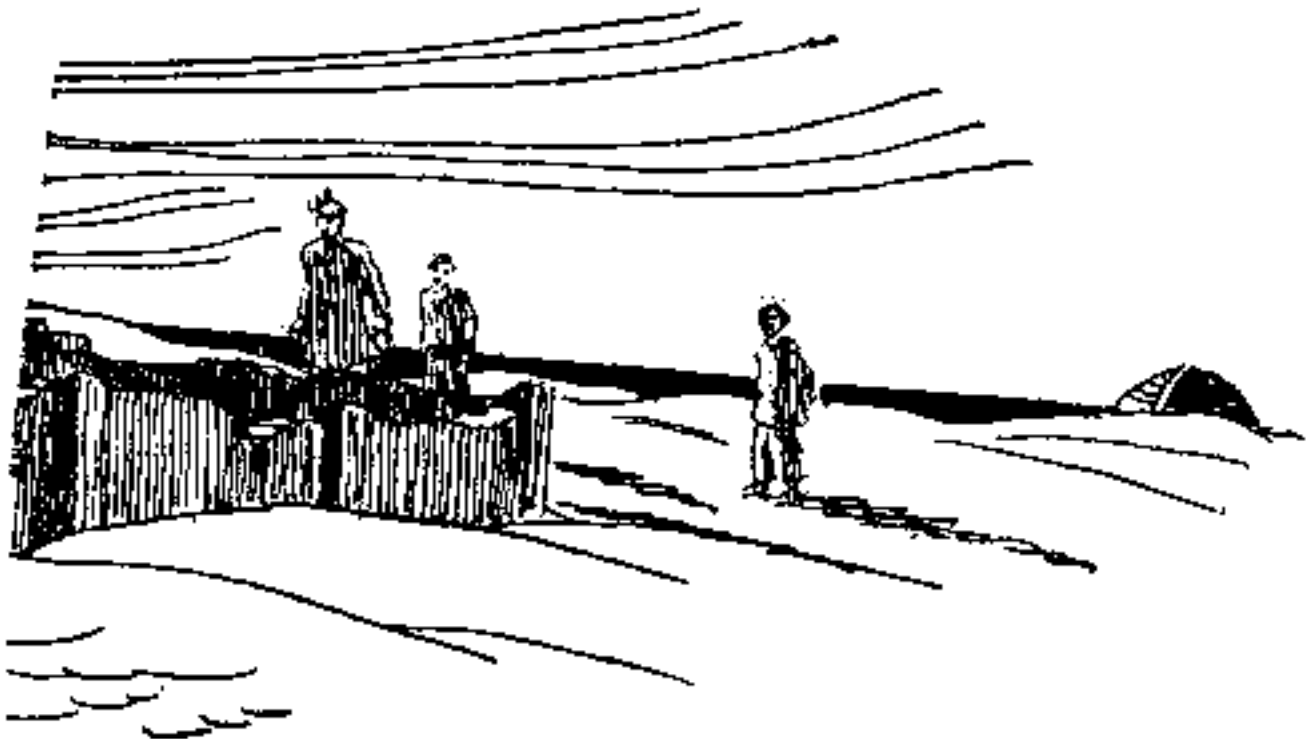
এককালে একটা ছোট্ট বাগান ছিল, তারপরেই সিঁড়ি উঠে গিয়ে বারান্দা । সিঁড়ির শুধু ওপরের দুটো ধাপ বেরিয়ে আছে, বাকিগুলো বাগির নীচে । বারান্দার রেলিং দিয়ে গেছে, ছাত যে কেন ধসে পড়েনি জানি না । বারান্দার পরে যে ঘর, সেটা নিশ্চয়ই বৈঠকখানা ছিল ।

‘এক্কেবারে পরিত্যক্ত বলে তো মনে হচ্ছে না,’ ফেলুদা মন্তব্য করল । করার কারণটা স্পষ্ট । লোকের যাতায়াত আছে, সেটা বারান্দার বাগির উপর পায়ের ছাপ থেকে বোঝা যায় ।

‘আর দেশলাইয়ের কাঠি, ফেলুদা ।’

একটা নয়, তিন-চারটে । সিঁড়ি উঠেই বারান্দার বাঁদিকের খামটার পাশে ।

‘সমুদ্রের হাওয়ায় সিগারেট ধরাতে গেলে কাঠি খরচা একটু বেশি হবেই ।’



আমরা ফটকের মধ্যে ঢুকলাম। সাংঘাতিক কৌতূহল হচ্ছে বাড়িটার ভিতরে ঢোকার। দরজা নিশ্চয়ই খোলা যায়, কারণ দমকা বাতাসে সেটা খটখট করে নড়ছে; একেবারে যে খুলছে না, সেটা ঘরের মেঝেতে জমে থাকা বালিতে বাধা পাওয়ার জন্য।

পায়ের ছাপগুলো ফেলুদা খুব মন দিয়ে দেখল। প্রায় দেখা যায় না বললেই চলে, কারণ ক্রমাগতই হাওয়ার সঙ্গে বালি এসে তার উপর জমা হচ্ছে।

কিন্তু জুতোর ছাপ তাতে সন্দেহ নেই।

এ ছাড়াও আর একটা জিনিস আছে সেটা পা দিয়ে খানিকটা বালি সরতেই বেরিয়ে পড়ল।

আমার মনে হল পানের পিক, যদিও লালমোহনবাবুর মতে নিঃসন্দেহে ব্লাড।

লালমোহনবাবু একবার মৃদুস্বরে 'ব্রেকফাস্ট' কপাটা বসাতে বুঝলাম ওর আর এগোতে সাহস হচ্ছে না। আমারও বুক টিপটিপ করছে, কিন্তু ফেলুদা নির্বিকার।

'তা হলে হত্যাপরীকৃত একবার প্রবেশ করতে হয়।'।

এটা জানাই ছিল। এতদূর এসে পায়ের ছাপটাপ দেখে ফেলুদা চট করে পিছিয়ে যাবে না।

কার্—চ শব্দে দরজার দুটো পালাই খুলে গেল ফেলুদার দু হাতের চাপে।

বসুড়ে গন্ধ। বাইরে থেকে ভিতরের কিছুই দেখা যায় না, কারণ ভিতরে জানালা থেকে থাকলেও তা নিশ্চয়ই বন্ধ। আর দরজা দিয়ে যে আলো ঢুকবে তার পথ আপাতত আমরাই বন্ধ করে রেখেছি।

ফেলুদা চৌকাঠ পেরোল। আমি জানি খুঁটখুঁটে বাস্তব হলেও ও বিধা করতে না, তফাত হত এই যে ওর সঙ্গে তখন হয়তো ওর কোন্ট ব্রিডলভারটা থাকত।

'আসুন ভিতরে।'।

আমি ঢুকে গেছি, কিন্তু লালমোহনবাবু এখনও চৌকাঠের বাইরে।—'অল ক্রিয়ার কি?' অস্বাভাবিক রকম চড়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক।

'ক্রিয়ার তো বটেই। আরও ক্রিয়ার হবে ক্রমে ক্রমে। এসে দেখুন না কী আছে ঘরের মধ্যে।'।

আমি অবিশ্যি এর মধ্যেই দেখে নিয়েছি।

প্রথমেই চোখে পড়েছে একটা টিনের ট্রাক আর শতরক্মিতে মোড়া একটা বেডিং। ঘরের এক পাশে দেয়ালের সামনে যেমন-তেমন করে ফেলে রাখা হয়েছে সে দুটো।

'পুলিশের পণ্ডশ্রম,' বলল ফেলুদা, 'নিশীথবাবু যাননি'।

'তবে কোথায় গেলেন ভদ্রলোক?' লালমোহনবাবু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন। ফেলুদা কথাটা গ্রাহ্য করল না।

'হু—ভেরি ইন্টারেস্টিং।'।

ঘরের এক কোণে স্থূপ করে রাখা রয়েছে সরু আর লম্বা-করে কাটা কাঠ, আর পাশেই ফিতেয় মোড়া দিস্তা দিস্তা ফিকে হলদে রঙের সস্তা কাগজ।

'বলুন তো এ থেকে কী বোঝা যায়,' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।



‘ও ভো পুথির কাঠ বলে মনে হচ্ছে । আর ওই, ইয়ে—’

লালমোহনবাবু এত সময় নিচ্ছেন কেন জানি না । আমি বললাম, ‘মনে হচ্ছে নিশীথবাবু একেবারে ব্যবসা খুলে বসেছিলেন—ডামি পুথি তৈরি করার । সাইজমাফিক কাগজ কেটে দুদিকে কাঠ চাপা দিয়ে শালুতে মুড়ে দিলে বাইরে থেকে ঠিক পুথি ।’

‘এগজ্যাক্টলি,’ বলল ফেলুদা—‘আমার বিশ্বাস, সেন মশাইয়ের সব পুথিগুলো বার করে খুললে দেখা যাবে তার অনেকগুলোই কেবল সাদা কাগজ । আসলগুলো পাচার হয়ে গেছে হিন্দোরানি সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে ।’

‘ও হো হো !’—লালমোহনবাবু চোঁচিয়ে উঠলেন—‘সাপ, সাপ ! সেদিন একটা কাগজের ফালি দেখেছিলাম সাগরিকার গলিতে—সে তা হলে এই কাগজ !’

‘নিঃসন্দেহে,’ বলল ফেলুদা ।

এর পরে যে ঘটনাটা ঘটল সেটা মিথ্যে আমার হাত না কাঁপলেও, বুক কাঁপছে ।

বৈঠকখানায় ঢুকেই ডাইনে-বাঁয়ে মুখোমুখি দুটো দরজা রয়েছে পাশের দুটো ঘরে যাবার জন্য । জালমোহনবাবু ডানদিকের দরজাটার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন । আমরা সামনের দরজা খুলে ঢোকাতে সেটা দিয়ে শৌঁ শৌঁ শব্দে সমুদ্রের বাতাস ঢুকছিল । একটা দমকা হাওয়ার ফলে হঠাৎ ডাইনের দরজাটা প্রচণ্ড শব্দে খুলে গেল, জালমোহনবাবু চমকে উঠে খোলা দরজাটার দিকে চাইলেন, আর চাইতেই তাঁর চোখ কপালে উঠে গেল । ভদ্রলোক পড়েই যেতেন যদি না ফেলুদা এক লাফে গিয়ে ঠেকে জাপটে ধরে ফেলত ।

এগিয়ে গিয়ে দেখি একটা লোক চোখ উলটে মরে পড়ে আছে পাশের ঘরের মেঝেতে । তার মাথা থেকে বেরোনো রক্ত চাপ বেঁধে আছে মেঝের উপর ।

লোকটাকে চিনতে কোনওই অসুবিধা হল না ।

ইনি দুর্গাগতি সেনের সেক্রেটারি নিশীথ বোস ।

ফেলুদার আর ব্রেকফাস্ট খাওয়া হয় না।

রেলওয়ে হোটেল থেকে টেলিফোনে পুলিশ খবর দিয়ে আমরা আমাদের হোটেল চলে এলাম। ফেলুদা বলল যে ওর দু-একটা কাজ আছে, বিশেষ করে নুনিয়া বস্তিতে একবার যাওয়া দরকার, কাজেই ও একটু পরে ফিরবে। লাশ ছোঁয়াছুঁয়ি না করেই ও বলল যে, বোঝাই যাচ্ছে লোকটাকে মারা হয়েছে একটা ব্লাস্ট ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে—যদিও সে ধরনের কোনও হাতিয়ার কাছাকাছির মধ্যে পেলাম না।

লালমোহনবাবু না জেনে মোক্ষম নাম দিয়েছিলেন বাড়িটার এটা স্বীকার করতেই হবে, যদিও পরে বলেছিলেন যে পুরী কথাটা বাড়ি অর্থে ব্যবহার করেননি। উনি মিন করেছিলেন পুরী শহর। ‘তিন দিনের মধ্যে দু-দুটো খুন, হত্যা পুরী ছাড়া আর কী?’

একটা সুখবর দিয়ে রাখি। দুর্গাতিবাবুর সঙ্গে তাঁর ছেলের মিটমাট হয়ে গেছে। অন্তত দেখে তাই মনে হল। আমরা যখন ভুজঙ্গ নিবাস থেকে বেরোচ্ছি, তখন সাগরিকার দিকে চোখ পড়তে দেখি ছাতে দুজন লোক। বাপ আর ছেলে। শুধু তাই নয়, ছেলে আমাদের দিকে হাত নাড়লেন, কাজেই বুঝলাম খোশ মেজাজে আছেন। এটাও আমার কাছে কম রহস্য নয়।

ফেলুদা যখন ঘরে এসে ঢুকল তখন পৌনে এগারোটা। আমার মনে পড়ে গেল নেপালে টেলিফোনের কথাটা। বললাম, ‘কলটা পেয়েছিলে?’

‘এই তো কথা বলে আসছি।’

‘কলটা কি কাঠমাণ্ডুতে করেছিলে?’

‘উহু, পাটন। কাঠমাণ্ডুর কাছেই বাঘমতী নদী পেরিয়ে একটা পুরনো শহর।’

লালমোহনবাবু বললেন, ‘হাই বলুন, লাশের কাছে ভূত কিছুই না। এখনও ভাবলে শিভারিং হচ্ছে।’

‘সব শিভারিং স্বরূপ করে ফেলবেন না, রাস্তিরের জন্য কিছু হাতে রাখবেন।’

‘রাস্তিরে?’

আমরা দুজনেই ফেলুদার দিকে চাইলাম। ও একটা ওমলেটের আধখানা মুখে পুরে দিয়ে বলল, ‘এক পায়ে না হলেও, খাড়া থাকতে হবে আজ রাস্তিরে।’

‘কোথায়?’ লালমোহনবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

‘দেখতেই পাবেন।’

‘কারণটা কী ?’

‘জানতেই পাবেন ।’

লালমোহনবাবু চুপসে গেলেন । অবিশ্যি এটা ঠর কাছের নতুন কিছু না ।

‘সেনাপতি দিবি স্মার্ট ডাক্তার,’ বলল ফেলুদা ।

‘তুমি এর মধ্যে ডিসপেনসারি ঘুরে এলে ?’

‘ভদ্রলোক দুর্গা সেনের ট্রিটমেন্ট করেছেন সেটা জানলাম । এপ্রিলে আমেরিকা ঘুরে এসেছেন । ওষুধটা ঠরই আনা ।’

‘ডায়াপিড ?’—নামটা মনে ছিল তাই জিজ্ঞেস করলাম ।

‘তোমার প্রশ্ন শুনে বুঝতে পারছি ওষুধটা তোমার কোনও কাজে লাগবে না ।’

থানা থেকে ফোন এল শৌনে বারোটায় । ডাক্তারের রিপোর্ট বলছে, নিশীথবাবু খুন হয়েছেন গতকাল সন্ধ্যা ছটা থেকে রাত আটটার মধ্যে, আর তাঁকে খারাপ হয়েছিল কোনও ব্লাস্ট ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে । হাতিয়ার খুঁজে পাওয়া যায়নি । ভূজঙ্গ নিবাসের বাইরে গেটের ধারেই মনে হয় খুনটা হয়েছে, তারপর মৃতদেহ টেনে নিয়ে ওই ঘরে ফেলে দেওয়া হয়, কারণ বারান্দার বালির নীচে বস্ত্রের দাগ পাওয়া গেছে ।

আমি একটা জিনিস আন্দাজ করছি, যদিও ফেলুদাকে এ বিষয়ে কিছু বলিনি এখনও । যে লোক নিশীথবাবুকে খুন করেছিল, সে লোকই ফেলুদার মাথায় বাড়ি মেরেছে, আর একই অস্ত্র দিয়ে । তাই ফেলুদার মাথায় রক্ত লেগে ছিল ।

সাড়ে বারোটা নাগাত ভাবছি লাঞ্চটা সেরে নেওয়া যায় কি না, কারণ লালমোহনবাবু কিছুক্ষণ থেকেই বলছেন রান্নাঘর থেকে টেরিফিক পের্যাক্স-রসুনের গন্ধ পাচ্ছেন, এমন সময় বিলাস মজুমদার এসে হাজির ।

‘কী মশাই, যাবেন নাকি ?’ ঘরে ঢুকেই ভদ্রলোকের প্রশ্ন ।

‘কোথায় ?’—ফেলুদা বিছানায় কাত হয়ে শুয়ে কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে ওর খাতায় কী যেন লিখছিল ।

‘টুরিস্ট ডিপার্টমেন্টের এয়ার-কন্ডিশন লিমুজিন । ই জনের জায়গা, মাত্র দুজন মাছি । আমি, আর একটি অ্যামেরিকান—নাম স্টেডম্যান । ভাবতে পারেন—এও ওয়াশিংটন লাইফ ! কেওনঝরগড় যাচ্ছে । খুব মিশুক । ভাল লাগত আপনার ।’

‘কখন বেরোচ্ছেন ?’

‘লাঞ্চ খেয়েই ।’

‘না, থ্যাঙ্ক ইউ,’ বলল ফেলুদা, ‘আমার একটু কাজ আছে । বরং আপনি যদি থেকে যেতেন তো পুরীর ওয়াশিংটন লাইফের কিছুটা নমুনা দেখে যেতে পারতেন ।’

‘নো, থ্যাঙ্ক ইউ,’ হেসে বললেন বিলাস মজুমদার ।

ভদ্রলোক ঘর থেকে বেরোনের মিনিট খানেকের মধ্যেই একটা ভারী অ্যামেরিকান গাড়ির শব্দ পেলাম । বুঝলাম গাড়িটা মুখ ঘুরিয়ে উত্তর দিকে চলে গেল ।

শেষ কবে যে চাপা উত্তেজনার মধ্যে এতটা সময় কাটাতে হয়েছে তা ভেবে মনে করতে পারলাম না।

রাত্রিরেখা খাওয়া সারার প্রায় ঘণ্টা খানেক পর দশটা নাগাত ফেলুদা বলল যে যাবার সময় হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলে দিল যে যদিও ওর মন বলছে যে একটা কিছু ঘটতে পারে, পশ্চিম যে হবে না এমন কোনও গ্যারান্টি নেই। —‘ফিটফট স্মার্ট হয়ে নে। ওসব কুর্তা পায়জামা চলবে না। সাদা জামা চলবে না। অন্ধকারে গা-ঢাকা দেবার জন্য কী পরতে হয় সেটা আশা করি আর বলে দিতে হবে না।’

না। তার দরকার নেই। পার্ক স্ট্রিটের গোরস্থানেও আমাদের ঠিক এই কাজই করতে হয়েছিল।

হোটেল থেকে বেরিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে দেখলাম তারা দেখা যাচ্ছে না। লালমোহনবাবু এমনভাবেই ঘন ঘন আকাশের দিকে দেখেন, তবে সেটা তারা দেখার জন্য নয়, স্বাইল্যাবের চিহ্ন দেখার জন্য। আজ সমুদ্রের দিক থেকে প্রচণ্ড হাওয়া বইছে দেখে বললেন, ‘হাওয়া উলটোমুখে হলে টুকরোগুলো তাড় সমুদ্রে পড়ার চান্স ছিল। এখন কিস্যু বলা যায় না।’

ভুক্তঙ্গ নিবাসের গারিডিকে যদিও বাজি, বিচটা কিন্তু বাড়ি থেকে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট গজ পূর্বে। যেখানে বিচ শুরু হয়েছে সেখানে রেলওয়ে হোটেল থেকে যারা জান করতে আসে তাদের জন্য বাঁশের খুঁটির ওপর হোগলা দেওয়া কয়েকটি ছাউনি রয়েছে। তারই একটার পাশে এসে ফেলুদা থামল।

পশ্চিম দিকের আকাশটা শহরের আলোর জন্য খানিকটা ফিকে, আমাদের পিছনে সমুদ্রের দিকে গাড়ি অন্ধকার। সামনের দিকে লোক হেঁটে গেলে তাকে ছায়ামূর্তির মতো দেখা যাবে, কিন্তু চেনা যাবে না। সে লোক কিন্তু আমাদের দেখতেই পারে না।

মনে মনে বললাম, মোক্ষম জয়গা বেছেছে ফেলুদা, যদিও কেন বেছেছে জানি না, জিজ্ঞেস করলেও কোনও উত্তর পাব না। ওর এই অভ্যেসটার জন্য লালমোহনবাবু একবার বলেছিলেন, ‘আপনি মশাই সাসপেন্স ফিল্ম তৈরি করুন। লোকে দেখে দম ফেলতে পারবে না। কোথায় লাগে হচকিক্।’

সাগরিকার তিনতলায় দুর্গাগতিবাবুর ঘরে এখনও আলো জ্বলছে; দোতলার আলো এইমাত্র নিভল। পাঁচিলের উপর দিয়ে লক্ষ্মণ ভট্টাচার্যের একতলার ঘরের জানালার একটি ফালি দেখা যাচ্ছে; বুঝতে পারছি সে ঘরে এখনও আলো জ্বলছে।

আমরা তিনজনেই ছাউনির তলায় বালির উপর বসেছি। কথা বলার কোনও প্রসঙ্গই ওঠে না, আর বলতে হলও গলা না তুললে হাওয়ায় আর সমুদ্রের গর্জনে কথা হারিয়ে যাবে। চোখ খানিকটা সয়ে এসেছে অন্ধকারে; ডাইনে চাইলে বেশ বুঝতে পারছি জটায়ুর কানের পাশের চুলগুলো বাতাসে মোরগের ঝুঁটির মতো ঝাড়া হয়ে উঠেছে। বাঁয়ে ফেলুদা; ও এইমাত্র বাঁ কব্জিটা চোখের কাছে এনে ওর রেডিয়াম-ডায়াল ঘড়িটাতে সময় দেখল। তারপর বুঝলাম বেলাতে হাত ঢুকিয়ে

একটা জিনিস ব্যর করে ওর চোখের সামনে ধরল ।

ওর জাপানি বাইনোকুলার ।

ফেলুদা কী দেখছে জানি ।

দুর্গগতি সেনকে দেখা যাচ্ছে ওর শোবার ঘরের জানালায়, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দু'পা বাঁয়ে সরে ডান হাত বাড়িয়ে কী জানি একটা তুলছেন ।

গেলাস ।

কী খেলেন ভদ্রলোক গেলাস থেকে ?

একতলার ঘরে বাতি এইমাত্র নিভে গেছে, এবার তিনতলার বাতি নিভল, আর নিভতেই আমাদের আশেপাশের অঙ্ককার যেন হঠাৎ আরও গাঢ় হয়ে গেল ।

কিন্তু এখনও আমাদের মধ্যে কেউ নড়াচড়া করলে বেশ বুঝতে পারছি ।

যেমন লালমোহনবাবু তাঁর পকেট থেকে টর্চটা বার করলেন ।

কিন্তু কেন ? কী মতলব ভদ্রলোকের ?

আমি তাঁকে পড়ে ওর কানের সঙ্গে মুখ লাগিয়ে বললাম, 'জ্বালাবেন না, খবরদার !' ভদ্রলোক উত্তরে আমার কানে মুখ এনে বললেন, 'ব্রাফ্ট ইনস্ট্রুমেন্ট, হাতে থাক ।'

উনি মুখ সরিয়ে নেওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা জিনিস দেখে আমার হৃৎপিণ্ডটা এক লাফে গলার কাছে চলে এল ।

ডাইনে হাত দশেক দূরে আরেকটা হোগলার ছাউনি ।

তার পাশে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে ।

কখন এসেছে জানি না ।

লালমোহনবাবুও দেখেছেন, কারণ ওর কাঁপা হাত থেকে টর্চটা রূপ শব্দ করে বালির উপর পড়ে গেল ।

আর ফেলুদা ?

ও দেখেনি ।

ওর দৃষ্টি সোজা সাগরিকার দিকে ।

আমিও জোর করে চোখ সেই দিকেই ঘোরালাম ।

আর তাই বোধহয় ফেলুদার সঙ্গে সঙ্গেই লোকটাকে দেখতে পেলাম ।

সাগরিকার দিক থেকে লোকটা আসছে আমাদের দিকে ।

না, এই দিকে না । ভুজঙ্গ নিবাসের দিকে ।

লোকটাকে চেনার কোনও উপায় নেই ।

এগিয়ে এল । ওই তো ভুজঙ্গ নিবাসের গেটের থাম ।

গেটের কাছাকাছি পৌঁছে লোকটা হাঁটার গতি কমাল, তারপর হাঁটা থামল ।

এবারে আরেকটা লোক । এতক্ষণ দেখিনি । বোধহয় বাড়িটার আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল ।

দ্বিতীয় লোকটা প্রথম লোকটার দিকে এগিয়ে গেল ।

গেটের সামনে এখন দুজনে লোক ।

এবার দুজনে ভাগ হল । যে সাগরিকার দিক থেকে এসেছিল সে আবার



ফিরে—

সর্বনাশ ! লালমোহনবাবুর অসাবধান আঙুলের চাপে ঠর পাগলা টর্চ স্থলে উঠেছে !

ফেলুদা এক ধাক্কাড়ে টর্চটা বালিতে ফেলে দিল, আর সেই মুহূর্তে লালমোহনবাবুর চার ইঞ্চি ডাইনের বাঁশের খুঁটিতে কান-ফটানো শব্দের সঙ্গে একটা গুলি এসে লাগল ।

‘তুই ওটাকে ধর !’

ফেলুদা হাউইয়ের মতো লাফিয়ে উঠে ছুটে গেছে দ্বিতীয় লোকটাকে লক্ষ্য করে ।

আশ্চর্য এই যে ওই একটা কথাতেই দেখলাম যে বিপদের তোয়াক্কা না করে আমিও নিশাঙ্গে তীরবেগে ছুটে গুরু করেছি বালির উপর দিয়ে প্রথম লোকটাকে লক্ষ্য করে ।

ফেলুদার আর আমার পথ ভাগ হয়ে গেল ।

রাগবি খেলায় যেমন ফ্লাইং ট্যাকল করে একজন খেলোয়াড় আরেকজনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে জাপটে ধরে, আমিও ঠিক সেই ভাবে অস্বার্থ লক্ষ্য লোকটার পা দুটোকে জাপটে ধরলাম ।

লোকটা হুমড়ি খেয়ে পড়ল বাগির ওপর। আমি লোকটার পিঠে, আমার দৃষ্টি ঘুরে গেছে ফেলুদার দিকে।

একটা হাড়ে-হাড়ে সংঘর্ষের শব্দের সঙ্গে ফিকে আকাশের সামনে দেখলাম একটা ছায়ামূর্তি আরেকটা ছায়ামূর্তিকে ঘূঁসি মেরে ধরাশায়ী করল।

ইতিমধ্যে লালমোহনবাবু এসে পড়েছেন, এবং এসেই মহা ক্রোধে আমার হাতে বন্দি লোকটার মাথা লক্ষ্য করে তাঁর হাতের ব্লাস্ট ইনস্ট্রুমেন্টটা নিক্ষেপ করেছেন। একটা ভোঁতা শব্দে বোঝা গেল হাতিয়ার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে এখন বালিতে জুটোপুটি খাচ্ছে।

‘ওকে নিয়ে আয় এদিকে!’

আমরা দুজনে লোকটার দুই পা ধরে বাগির উপর দিয়ে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে গেলাম যেখানে রয়েছে ওরা দুজন। ফেলুদা দাঁড়ানো, অন্য লোকটি চিত্ত, ফেলুদার একটা পা তার পেটের উপর, আর অন্যটা ডান হাতের তেলোর উপর—যে হাত থেকে রিভলভারটা আলাগা হয়ে পড়ে আছে বালিতে।

‘আপনার খুতনিতে ক্ষতচিহ্ন ছিল না, কিন্তু আজ থেকে থাকবে।’

আমার ওয়াইশ্চ লাইফ কথাটা মনে পড়ল। অদ্ভুত হিংস্র চেহারা নিয়ে টর্চের তীব্র আলোতে কপাল কুঁচকে ফেলুদার দিকে চেয়ে আছেন বিলাস মজুমদার, তাঁর বাঁ হাতে আঁকড়ানো রয়েছে লাল শালু দিয়ে মোড়া একটা পুঁথি।

ফেলুদা ঝুঁকে পড়ে এক ঝটকায় পুঁথিটা ছিনিয়ে নিয়ে নিজের কোলার মধ্যে রেখে দিল।

তারপর ওর টর্চ ঘুরে গেল আমাদের বন্দির দিকে।

‘আপনার থার্ড আই কী বলছে লক্ষণবাবু? শেষটায় এই ছিল আপনার কপালে?’

অন্ধকার থেকে আরও লোক বেরিয়ে এসেছে।

‘আসুন মিঃ মহাপাত্র,’ ফেলুদা হাঁক দিল।—‘এঁদের দুজনকে তুলে দিচ্ছি আপনাদের হাতে, তবে কাজ ফুরোয়নি। আমরা হত্যাপুত্রীর বৈঠকখানায় একটু বসব। এঁরা দুজনও থাকবেন।’

চারজন কনস্টেবল এগিয়ে এসে বিলাসবাবু আর লক্ষণবাবুকে তুলে নিল।

‘মহিমবাবু আছেন তো!’ ফেলুদা পিছনের অন্ধকারের দিকে ফিরে প্রশ্ন করল।

‘আছি বইকী।’

অন্ধকার থেকে সেই রহস্যজনক চতুর্থ ব্যক্তি বেরিয়ে এলেন।—‘বাবাও এসে পড়লেন বলে। ওই যে টর্চের আলো।’

‘কোনও চিন্তা নেই,’ বললেন, মিঃ মহাপাত্র, ‘মোড়া এনে রাখা হয়েছে ঘরে—সবাই বসতে পারবেন।’

লালমোহনবাবুর ‘বইরেই তো বেশ—’ কথাটা কারুর কানে গেল কি না জানি না, কারণ সবাই রওনা দিয়েছে ভুজঙ্গ নিবাসের দিকে।

‘আসুন, মিঃ সেন, আপনার জন্যই ওয়েট করছি।’

ফেলুদা এগিয়ে গেছে দরজার দিকে।

মহিমবাবু তাঁর বাবাকে নিয়ে ঢুকলেন। তিনটে লণ্ঠন জ্বলছে ঘরের ভিতর। পুলিশের লোক ঝাড়পোঁছ করে ঘরের চেহারা ফিরিয়ে দিয়েছে।

দুর্গাগতিবাবু আর মহিমবাবু দুটো পাশাপাশি মোড়ায় বসলেন।

‘এই নিন আপনার কলসূত্র।’

ফেলুদা সদ্য-পাওয়া পুঁথিটা দুর্গাগতিবাবুর হাতে দিলেন। ভদ্রলোক একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে তক্ষুনি আবার গভীর হয়ে গিয়ে উৎকণ্ঠার সুরে বললেন, ‘আর অন্যটা?’

‘সেটার কথায় আসছি,’ বলল ফেলুদা। — ‘আপনি একটু ধৈর্য ধরুন। আপনি আজ আবার ঘুমের ওষুধ খাননি তো?’

‘পাগল। ঘুমের ওষুধই তো আমার সর্বনাশ করল। কাল কী মিশিয়ে দিয়েছিল জলের সঙ্গে কে জানে?’

দুর্গাগতিবাবু গভীর বিরক্তির ডাব করে পুলিশের হাতে বন্দি লক্ষ্মণ ভট্টাচার্যের দিকে চাইলেন।

ফেলুদা বলল, ‘এত ভাল একজন অ্যালোপ্যাথ থাকতে আপনি এই হাতুড়ে ছামবাগাটিকে প্রত্নয় দিচ্ছিলেন কেন বলুন তো?’

‘কী করব বলুন। লোক যাচাই করার ক্ষমতা কি আর ছিল? সবাই এত সুখ্যাত করলে, যেচে এসে আমার কাছে, বললে নিজের গরজে আমাকে সারিয়ে দেবে। আরও বললে, ওর সম্বন্ধে ভাল পুঁথি আছে—জ্যোতিষশাস্ত্রের পুঁথি...’

‘ওই তো মুশকিল। পুঁথির কথা বললেই আপনার মন গলে যায়। যাই হোক জাম্বাপিণ্ডে কাজ দিয়েছে তো? লুপ্ত স্মৃতি ফিরিয়ে আনার পক্ষে ওটাই তো সবচেয়ে নতুন আর সবচেয়ে ভাল ওষুধ বলে।’

‘আশ্চর্য ওষুধ,’ বললেন মিঃ সেন, ‘মুহূর্তে মুহূর্তে যেন স্মৃতির এক-একটা দরজা খুলে যাচ্ছে। সেনাপতি নিজে এসে ওষুধটা দিল বলেই তো হল। সেই যে আমার ডাক্তার সে কথাও তো ভুলে গিয়েছিলেন।’

‘তা হলে বলুন তো, এই ভদ্রলোককে চেনেন কি না।’

ফেলুদা তার চর্চ ফেলল বিলাস মজুমদারের মুখে। দুর্গাগতিবাবু তাঁর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, ‘কালকেই চিনেছিলাম গলার স্বর আর চাহনি

থেকে । কেন যে তবু খটকা লাগছিল জানি না ।’

‘এঁর নামটা মনে পড়ছে ?’

‘পরিষ্কার—যদি না উনি নাম ভাঁড়িয়ে থাকেন ।’

‘সরকার কি ?’ ফেলুদা প্রশ্ন করল ।

‘সরকার,’ সায় দিয়ে বললেন দুর্গাগতিবাবু । ‘পুরো নামটা কোনওদিন জানিনি ।’

‘লায়ার !’ চোখমুখ লাল করে চিৎকার করে উঠলেন অভিযুক্ত ভদ্রলোক ।

‘পাসপোর্ট দেখতে চান আমার ?’

‘না, চাই না’—বরফের মতো ঠাণ্ডা গলায় বলল ফেলুদা ।—‘আপনার মতো ধূর্ত লোকের পাসপোর্টের কী মূল্য ? কী আছে পাসপোর্টে ? বিলাস মজুমদার নাম আছে তো ? আর চেহারার বিশেষত্বের মধ্যে কপালের আঁচিলের কথা বলেছে ?—‘ডিসটিংগুইশিং মার্ক—মোল অন ফোরহেড’—এই তো ? তবে দেখুন—’

কথাটা বলেই ফেলুদা ভদ্রলোকের দিকে হনহনিয়ে এগিয়ে গিয়ে পকেট থেকে এক খটকায় একটা ক্রমশ বার করে সেটা দিয়ে একটা চাপড় মারল ভদ্রলোকের কপালে, আর তার কলে কৃত্রিম আঁচিল কপাল থেকে খুলে ছিটকে গিয়ে পড়ল অন্ধকারে মেঝেতে ।

‘আপনি বিলাস মজুমদার সম্বন্ধে অনেক খবর নিয়েছিলেন,’ ফেলুদা বলল দৃষ্টকণ্ঠে, ‘নো লেপার্ডের ছবি তুলতে গিয়ে পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়া, কোন হাসপাতালে গিয়েছিল, কী কী হাড় ভেঙেছিল, গত মাস অবধি সে হাসপাতালে ছিল—এ সবই আপনি জানতেন । কিন্তু একটি সংবাদ আপনার কানে পৌঁছয়নি । খবরের কাগজে সেই সংবাদটাই আমি পড়েছিলাম, কিন্তু তেমন মন নিয়ে পড়িনি । খবরটা কালকে আমি পেয়েছি কাঠমাণ্ডুর বীর হাসপাতালের ডাঃ ভার্গবের কাছ থেকে । সেটা হল এই—বিলাস মজুমদারের সবচেয়ে মারাত্মক ইনজুরি হয়েছিল স্নেহে । তিন সপ্তাহ আগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে ।’

লঠনের আলোতেও বুঝতে পারছি লোকটার মুখ কাগজের মতো সাদা হয়ে গেছে ।

‘শুনুন মিঃ সরকার,’ ফেলুদা বলে চলল, ‘আপনার পেশা পাসপোর্টে লেখা যায় না । আপনার পেশা স্মাগলিং । নিজেকে সব সময় চুরি না করলেও, চোরাই মাল পাচার করেন আপনি । ভাতগাঁওয়ের প্যালেস মিউজিয়াম থেকে চুরি করা পুঁথি আপনার হাতে আসে কাঠমাণ্ডুতে । তার পরের ঘটনা যে কী, সেটা শুনুন মিস্টার সেনের মুখে ।’

দুর্গাগতি সেনের চাহনিতে এমন কঠিন গাভীরের ডাব এর আগে দেখিনি । ভদ্রলোক বললেন :

‘কাঠমাণ্ডুতে একই হোটেলে ছিলাম এই ভদ্রলোক আর আমি । পাশাপাশি ঘর—একদিন ভুল করে আমার চাবি ওঁর ঘরে লাগিয়ে দেখি দরজা খুলে গেছে । ভেতরে উনি ছাড়া দুজন লোক, তাদের একজন বাস্তব থেকে একটা লাল মোড়ক

বার করে ঠেকে দিচ্ছে। দেখেই বুঝলাম পুঁথি। খটকা লাগল। মাপ চেয়ে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। সেই রাতে ঘুমের মধ্যে কী হল জানি না, স্বপ্ন হল হাসপাতালে। মাথা ব্যাক। এই ঘটনার আগের সব স্মৃতি মন থেকে মুছে গেছে! হোটেল খোঁজ করে আমার নাম-ঠিকানা পায়, এখানে খবর দেয়, নিশীথ গিয়ে আমাকে নিয়ে আসে। সাড়ে তিন মাস ছিলাম হাসপাতালে।

‘আপনার না-জানা অংশ আমি বলছি,’ বলল ফেলুদা, ‘ভুল হলে মিঃ সরকার যেন শুধরে দেন।—আপনাকে সেই রাতে অস্ত্রাঘাত করে গাড়িতে নিয়ে তুলে শহরের বাইরে গিয়ে পাহাড়ের গা দিয়ে পাঁচশো ফুট নীচে ফেলে দেওয়া হয়। মিঃ সরকারের ধারণা ছিল আপনার মৃত্যু হয়েছে। ন মাস পরে হয়তো চোরাই মাল পাচার করতেই পুরীতে এসে ডি. জি. সেন নাম দেখে খটকা লাগে। আমার ধারণা আপনার বাড়ির একতলার বাসিন্দা গণৎকার লক্ষ্মণ ভট্টাচার্যের কাছ থেকে আপনার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে যাবতীয় ইনফরমেশন পান মিঃ সরকার। তাই নয় কি?’

খিমিয়ে পড়া লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য হঠাৎ যেন চাক্ষু হয়ে উঠলেন—‘এ সব কী বলছেন মশাই—উনি তো আপনাদের সঙ্গে প্রথম এসেন আমার বাড়িতে!’

‘বটে?’—ফেলুদা এগিয়ে গেছে লক্ষ্মণ ভট্টাচার্যের দিকে। ‘তা হলে বলুন তো গণৎকার মশাই, পরিচয় হবার আগেই আপনি কেন ভদ্রলোককে তত্পরপোশে বসতে বললেন আর আমাদের চেয়ার দেখিয়ে দিলেন? উনিই যে বিলাস মজুমদার, আমি নই, সেটা আপনি কী করে জানলেন?’

এই এক প্রশ্নে লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য আশ্চর্যভাবে কঁকড়ে গেলেন।

ফেলুদা বলে চলল, ‘আমার বিশ্বাস দুর্গাগতিবাবুর স্মৃতি লোপ পাবার কথাটা জেনে, এবং লক্ষ্মণ ভট্টাচার্যের সাহচর্যের প্রতিশ্রুতি পেয়ে, সরকার মশাইয়ের মনে পুঁথি চুরির আইডিয়াটা আসে। ডাল খন্দেরও রয়েছে একই হোটেল—মিঃ হিন্দোরানি। কিন্তু এই ব্যাপারে তিনটে মুশকিল দেখা দেয়। প্রথমটা হল—একজন অবাক্কিত লোক মিঃ সরকারকে ধাওয়া করে এখানে এসে হাজির হয়। সে হল রূপচাঁদ সিং। ভারী মুশকিল, না, মিঃ সরকার? যে গাড়িতে করে আপনি বেইশ মিস্টার সেনকে নিয়ে গেছিলেন পাহাড় থেকে ফেলে হত্যা করতে, তার ড্রাইভার—সাকে হয়তো আপনি ভালরকম ঘুর দিয়েছিলেন—সে যদি হঠাৎ আরও লোভী হয়ে পড়ে, এবং আপনাকে ব্র্যাকমেল করে ছমকি দিয়ে আরও টাকা আদায় করতে চায়? ভারী মুশকিল। তখন তাকে খতম করা ছাড়া আর রাস্তা থাকে কি?’

‘মিথো, মিথো, মিথো!’—মরিয়া হয়ে চিৎকার করে উঠলেন মিঃ সরকার।

‘কিন্তু যদি প্রমাণ হয় যে তার মাথায় যে গুলিটা লেগেছিল সেটা আপনার এই রিভলভারটা থেকেই বেরিয়েছে, তা হলে?’

মিঃ সরকার আবার নেতিয়ে পড়লেন। বেশ দেখতে পাচ্ছি যে ভদ্রলোকের সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে গেছে। আমিও ঘামছি, তবে সেটা স্বাস্রোধ করা উদ্বেজনার। ফেলুদার খাতায় দেখা ছিল ‘কালোডাক’। এখন বুঝতে পারছি সেটা হল ব্র্যাকমেল। আমার পাশে লালমোহনবাবু যেন ফেনসিং ম্যাচ দেখছেন।

কথার তলোয়ার খেলায় ফেলুদার জুড়ি নেই সেটা স্বীকার করতেই হবে। আর সে খেলা এখনও শেষ হয়নি।

‘অতএব রূপচাঁদ সিং হল মার্জারি নাথার ওয়ান,’ ফেলুদা বলে চলল।—‘এখন দ্বিতীয় যুদ্ধকিলে আসা যাক। সেটা হল শ্রীক্ষেত্রে গোয়েন্দার আগমন। ফেলু মিড্ডিরকে ধোঁকা না দিয়ে সরকার মশাইয়ের কার্যসিদ্ধি ছিল অসম্ভব। সেখানে বলব যে, বিলাস মজুমদারের ভূমিকায় নিজেকে এস্টাবলিশ করতে, এবং নিজের অপরাধ একজন স্মৃতিশ্রুতি অসহায় প্রৌড়ের স্বল্পে চাপাতে, তিনি বেশ কিছুটা সফল হয়েছিলেন। এই সাফল্যই তাঁর মনে একটা বেপরোয়া ভাব এনে দেয়। পরিকল্পনা খুবই সহজ। পুঁথি এনে দিতে পারলে হিঙ্গোরানি কিনবেন; সরাসরি মালিকের কাছ থেকে কেনার উপায় নেই, কারণ দুর্গাগতিবাবুর টাকার লোভ নেই এবং পুঁথিগুলি তাঁর প্রাণস্বরূপ। সুতরাং আলমারি থেকে পুঁথি বার করতে হবে। উপায় কী? অতি সহজ। কাজটা করবেন লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য, কারণ এ কাজ তিনি বেশ কিছুদিন থেকেই করে আসছেন। আগে পুরো টাকাটাই তিনি নিজে পকেটস্থ করেছেন; এখানে টাকাটা অনেক বেশি, কাজেই সেটা অন্যের সঙ্গে শেয়ার করতে আপত্তি নেই। কিন্তু এখানে একজনের কথা একটু ভাবতে হবে। সেক্রেটারি নিশীথ বোস।’

* ফেলুদা থামল। তারপর লক্ষ্মণ ভট্টাচার্যের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, ‘মংগলা রোডে কীর্তনের কথা বলেছিলেন না আপনি?’

লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য একটা বেপরোয়া ভাব আনবার চেষ্টা করে বললেন, ‘মিথ্যে বলেছি?’

‘না, মিথ্যে বলেননি,’ বলল ফেলুদা, ‘প্রতি সোমবার সেখানে কীর্তন হয় সেটা ঠিকই! কিন্তু আপনি যে বলেছিলেন আপনি সেখানে যান, সেটা ঠিক না। আপনি কোনওদিন যাননি। আমি খোঁজ নিয়েছি। তবে এ বাড়ি থেকে একজন যেতেন। নিশীথ বোস। সোমবার বিকেলে পাঁচটা থেকে সাড়ে ছটা নিশীথবাবু বাড়ি থাকতেন না। চাকর থাকত। এই সোমবার অর্থাৎ গত কালও নিশীথবাবু ছিলেন না। চাকরটা অপদার্থ। তাকে ঘুষ দিয়ে হাত করা কিছুই না। আপনি দুপুরে মিঃ সেনের ঘুমের ওষুধের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে সাড়ে পাঁচটায় তাঁর ঘরে ঢুকে, বালিশের নীচ থেকে চাবি বার করে নিয়ে আলমারি থেকে পুঁথি বার করে নিয়ে যান। সেটা মিঃ সরকারের হাতে তুলে দিতে হবে। তার জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয় ভুক্ত নিবাসের ব্যালান্ডায়। আপনি অপেক্ষা করছিলেন সেখানে। আপনার জুতোর ছাপ, আপনার দেশলাইয়ের কাঠি ও আপনার পানের পিক তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। কিন্তু এই সময় একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে যায়।’

আমরা সবাই কাঁঠ। লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য ধর ধর করে কাঁপছেন, কারণ মিঃ সরকার ছাড়া ঘরের সবাইয়ের দৃষ্টি এখন তাঁর দিকে।

ফেলুদা আবার শুরু করল—‘একজন আমেরিকান ড্রনোক সাড়ে ছটার আসবেন মিঃ সেনের পুঁথি দেখতে। তাই ছটার মধ্যে নিশীথবাবু ফিরে আসেন। হয়তো কতর্জকে তখনও ঘুমোতে দেখে তাঁর সন্দেহ হয়। আলমারি খুলে দেখেন

পুঁথির খসলে সাদা কাগজ । আপনি বাড়ি নেই । সন্দেহটা নিশ্চয়ই বাড়ে । বাইরে এসে দেখেন বলিতে পারেন ছাপ । চলে আসেন ভুক্ত নিবাসে । বলুন তো লক্ষণবাবু, এই অবস্থায় তাকে কি কাঁচতে দেওয়া চলে ? একটি ভোঁতা হাতিয়ার তো ছিল আপনার সঙ্গে, তাই না ? তাই দিয়ে তাকে মেরে, লাশ সরিয়ে, সাগরিকায় ফিরে গিয়ে নিশীথবাবুর বাজ বিছানা ভুক্ত নিবাসে রেখে হঠাৎ খেয়াল হয় হাতিয়ারে রক্ত লেগে আছে । তখন সেটা সমুদ্রের জলে ফেপতে গিয়ে পথে আমায় দেখে সেটা দিয়ে আমার মাথায় বাড়ি মেরে, তারপর সেটাকে জলে ফেলে দেন—তাই তো ?

ফেলুদা জানে যে এ-প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই, কিন্তু তাও সে থামল, কারণ পরের প্রশ্নটায় জোর দেবার জন্য । আদিকাল্পের পোড়ো বৈঠকখানার চার দেয়াল কাঁপিয়ে প্রশ্নটা করল সে—

‘কিন্তু তাতেও কি আপনার কার্যসিদ্ধি হয়েছিল ?’

উত্তরটাও ফেলুদাই দিল, কারণ লক্ষণ ভট্টাচার্যকে দেখে মনে হয়, তিনি বাক্যবাণে আধমরা ।

‘না, তাতেও হয়নি । সে পুঁথি হিন্দোরানি পায়নি । মিঃ সরকারও পাননি । তাই অন্য পুঁথিটিকে সরাবার দরকার হয়েছিল আজকে । তার আগে, হয়তো কাল রাতেই, আপনি নিশীথবাবুর মায়ের অসুখের গল্পটি ফেঁদেছেন । কিন্তু প্রথম দিন এত করেও আপনার পরিশ্রম ব্যর্থ হল কেন সেটা এঁদের একটু বুঝিয়ে বলবেন ? বলবেন না ? তা হলে আমিই বলি—কারণ এত আশ্চর্য একটি ঘটনা বর্তমান অবস্থায় আপনার পক্ষে গুছিয়ে বলা সম্ভব না । আমি অনেক রহস্যের সমাধান করেছি কিন্তু বর্তমান রহস্যটি এতই অদ্ভুত ও অসামান্য যে, আমাকে বোকা বানিয়ে দিয়েছিল । ভোঁতা হাতিয়ারের কথা বলছিলাম, কিন্তু সেই ভোঁতা হাতিয়ার যে প্রজাপারমিতার পুঁথি, তা আমি কী করে বুঝব ? আপনার হাতে যে আর কিছুই ছিল না, তা আমি কী করে বুঝব ! নিজের মাথায় কাঠের পাটার বাড়ি সবেশেও আমি বুঝিনি । সেই রক্ত লাগা পুঁথি কেমন করে আপনি সরকারের হাতে তুলে দেবেন, আর সরকারই বা হিন্দোরানিকে দেবেন কেমন করে ?’

‘হায়, হায়, হায় !’—দুর্গাগতি সেন দু হাত মাথায় দিয়ে উপুড় হয়ে পড়েছেন । —‘আমার এত সাধের পুঁথি শেষটায়—’

‘আপনাকে একটা কথা বলি মিস্টার সেন’—ফেলুদা দুর্গাগতিবাবুর দিকে এগিয়ে এসেছে—‘আপনি কি জানেন যে সমুদ্র মাঝে মাঝে দান গ্রহণ করে না, ফিরিয়ে দেয় ? এমনকী তৎক্ষণাৎ ফিরিয়ে দেয় ?’

এবার ফেলুদা তার কোলার ভিতর হাত ঢুকিয়ে টেনে বার করল আরেকটা শালুতে মোড়া পুঁথি ।

‘এই নিন আপনার অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা । এটাকে “নাই মামা” বলতে পারেন । শালু যেমন ছিল তেমনই আছে । পাটার রং ফিকে হয়ে গেছে, তবে লেখা যে খুব বেশি নষ্ট হয়েছে তা বলব না । কাপড় আর কাঠ ভেদ করে জল বেশি ঢুকতে পারেনি ।’